ক্রাচের কর্নেল

শাহাদুজ্জামান

Remember, the storm is a good opportunity for the pine and the cypress to show their strength and their stability.

Ho Chi Minh

ক্রাচের কর্নেল

নক্ষত্রের ইশারা

এক কর্নেলের গল্প শোনা যাক। যুদ্ধাহত, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা এক কর্নেল। কিংবা এ গল্প হয়তো শুধু ঐ কর্নেলের নয়। জাদুর হাওয়া লাগা আরও অনেক মানুষের। নাগরদোলায় চেপে বসা এক জনপদের। ঘোর লাগা এক সময়ের।

গল্পটি শুরু করা যাক লালমাটিয়ার ঐ শ্যাম্পুর বিরাট বিলবোর্ডটি থেকে। বিলবোর্ডটিতে দিনের শেষ আলো আছড়ে পড়ছে। তার ঠিক নিচে একা দাঁড়িয়ে আছেন লুৎফা। আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে বুঝি বা। কোনো দূর দেশ থেকে শীত শীত হাওয়া আসছে। একটা আকাশি রঙের চাদর গায়ে জড়িয়েছেন লুৎফা। শিরিশ গাছের কয়েকটি পাতা উড়ে এসে পড়ছে লুৎফার চাদরে। লুৎফা সেই কর্নেলের স্ত্রী। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তার ছোট ছেলে মিশুর জন্য। মিশুর অফিসের বাস প্রতিদিন ঐ শ্যাম্পুর বিলবোর্ডের নিচে এসে দাঁড়ায়। লুৎফা সেই বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন অন্যমনস্ক, বিষণ্ন। যেন অন্য কোনো গ্রহের ধুলো লেগে আছে তার গায়ে। বাস থেকে নামলে মিশুকে নিয়ে একটি রিকশায় উঠবেন লুৎফা। লাল আকাশকে পেছনে রেখে বাড়ি ফিরবেন তারা। কেউ কোনো কথা বলবেন না। এভাবেই চলছে প্রতিদিন। এরকমই নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন ডাক্তার।

মিশুকে নিয়ে সমস্যায় আছেন লুৎফা। সাইকিয়াট্রিস্টের চিকিৎসাধীন আছে মিশু। মিশুর সাম্প্রতিক লেখা কবিতাটি পড়ে সাইকিয়াট্রিস্ট চিন্তিত। কবিতা মিশু লেখে মাঝে মাঝে। সম্প্রতি সে লিখেছে, 'খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমি একজনকে হত্যা করতে চাই।' তারপর ঐ কবিতাজুড়ে অদ্ভুত সব ইমেজ। সে নাকি মানসপটে একটি গোলাপি ট্রেনকে ঝিকঝিক করতে করতে ছুটে যেতে দেখে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় মহাখালী রেল ক্রসিং-এ সেই গোলাপি ট্রেনটি আসে। তখন খুব হাওয়া বয় চারদিকে। রেললাইন আর ট্রেনের চাকা পরস্পরকে লেপ্টে থাকে। মিশুর মনে হয় যেন দুটি ধাতব ঠোঁট, চুম্বন করছে পরস্পরকে। মনোলোকে সে রেল ক্রসিং এ দাঁড়িয়ে ঐ মায়াবী প্রেমের দৃশ্য দেখে। দমকা হাওয়ায় তার চুল উড়ে, শরীর কাঁপে। রেললাইন আর ট্রেনের চাকার অঙ্গ অঙ্গ মিলনে যেন আশ্চর্য

এক সৌন্দর্য রচিত হয়। মিশু লিখেছে 'আমি ঐ সৌন্দর্য চেখে দেখতে চাই। অন্যভাবে বললে একজনকে হত্যা করতে চাই আমি।'

ডাক্তার কথাটি আগেও বলেছেন কিন্তু এই কবিতটি পড়ে আরও নিশ্চিত হলেন এবং আবারও বললেন, মিশুর ভেতর আত্মহত্যা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ওকে একা হতে দেওয়া যাবে না। নজরে রাখতে হবে সবসময়। নৃবিজ্ঞানে পড়াশোনা শেষে মিশু একটি সংস্থায় গবেষণার কাজ করছে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অফিসের সময়টিতে মিশুর ওপর চোখ রাখছেন ওর অফিসের এক শুভানুধ্যায়ী। আর অফিসের বাস মিশুকে রাস্তায় নামিয়ে দেবার পর বাড়ি ফেরার পথটুকু তাকে আগলে রাখছেন তার মা লুৎফা। মিশু বাসের হ্যান্ডেল ধরে নামবার সময় যখন ডানে বামে দেখে তখন হঠাৎ মুহূর্তের জন্য ওর চাহনি, চোয়ালের জায়গাটুকু দেখায় তাহেরের মতো। আবু তাহের, সেই কর্নেল, মিশুর বাবা।

আবু তাহেরের ফাঁসি হয়েছে। ফাঁসির আগের দিন সবাই দেখা করতে গিয়েছিলেন তাহেরের সঙ্গে। লুৎফা নীতুকে নিয়েছেন, যীশুকে নিয়েছেন কিন্তু মিশুকে নিতে পারে নি। মিশুর বয়স তখন নয় মাস, ছিল নানার বাড়িতে। তাহেরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব অল্প সময় দিয়েছে তারা, মিশুকে নেবার আর সুযোগ হয়নি। সঙ্গে করে মিশুর একটা ছবি নিয়েছিলেন লুৎফা। জেলে ঢুকবার আগে নিয়মমাফিক তল্লাসী চালায় প্রহরীরা। আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে মিশুর ছবিটাও জেলগেটে রেখে দেয় তারা। না মিশুকে, না তার ছবি কোনোটিই আর শেষবারের মতো দেখা হয়নি তাহেরের। মিশু অবশ্য যথারীতি বহন করছে তাহেরের চোয়াল। রোজকার মতো মিশুর অফিসের বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন লুৎফা। বৃষ্টির খবর নিয়ে আসা শীত শীত হাওয়ায় কয়েকটি শিরিশ পাতা এসে পড়ছে তার গায়ের চাদরে।

লুৎফাকে মিশুর অপেক্ষায় ঐ বিলবোর্ডের নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে বরং চলে যাওয়া যাক বেশ অনেক বছর পেছনে। যাওয়া যাক নেত্রকোণার ঈশ্বরগঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তখন ১৯৬৮ সাল। এক ঝকঝকে সকালে লুৎফ' ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পাটের ক্ষেত। ঈশ্বরগঞ্জের বিখ্যাত পাট। বিলবোর্ডের নিচে দাঁড়ানো আজকের লুৎফার চোখে যে বিষণ্নতা ঈশ্বরগঞ্জের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লুৎফার চোখে তা নেই। আছে স্বপ্ন, বিহ্বলতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের ছাত্রী লুৎফা ছুটি শেষে ফিরছেন রোকেয়া হলে। ছিপছিপে লুৎফা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন আনা কারেনিনার মতো।

এর বেশ কয়েক বছর পর তাহেরের সঙ্গে অক্সফোর্ডে ডা. রক্ষের বাড়িতে বসে লুৎফা যখন পিয়ানোতে টুং টাং আঙুল বুলাবেন মিস্টার রক্ষ তখন তাঁকে কারেনিনা নামেই ডাকবেন। কোনো এক রুশ স্টেশনেই টলস্টয় আমাদের প্রথম

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কারেনিনার সঙ্গে। আর কারেনিনার মতোই কি এক নক্ষত্রের ইশারায় রেল স্টেশন জড়িয়ে যাবে লুৎফার জীবনে। সিগনাল পড়ে গেছে। ট্রেন আসবে এখনই। দেখা যাবে স্টেশন মাস্টার মুন্সেফ উদ্দীন তালুকদার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লুৎফাকে বিদায় জানাচ্ছেন : আবার কবে আসবা মা, আবার কবে ছুটি?

ঈশ্বরগঞ্জের সরকারি ডাক্তার খুরশীদুদ্দিনের মেয়ে লুৎফা। স্টেশন মাস্টার মুন্সেফ উদ্দীন ভাবেন বন্ধু খুরশীদুদ্দীনের মেয়েটা দেখতে দেখতে কেমন বড় হয়ে গেল। মুন্সেফ উদ্দীন যখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লুৎফাকে বিদায় জানান তখন দূর আকাশে তারায় তারায় জল্পনা চলে।

ঈশ্বরগঞ্জের কয়েক স্টেশন পরেই শ্যামগঞ্জ। সেখানে আছেন মুন্সেফ উদ্দীন তালুকদারের বড় ভাই মহিউদ্দীন আহমেদ। তিনিও স্টেশন মাস্টার। স্টেশনে স্টেশনে জীবন কাটিয়ে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। থিতু হয়েছেন শ্যামগঞ্জে তাঁদের নিজের গ্রাম কাজলায়। অবসর নেবার পর তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁর ছেলে আবু তাহেরের বিয়ের ব্যাপারে। আবু তাহের উঠতি তরুণ ক্যাপ্টেন। মহিউদ্দীন আহমেদ সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন তাহেরের জন্য মেয়ে খুঁজতে। বলেছেন ভাই মুন্সেফ উদ্দীনকেও।

মুন্সেফ উদ্দীনের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে লুৎফার কথা। খুরশীদুদ্দিনের ডিসপেনসারিতে গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে বসেন মুন্সেফ উদ্দীন : আমার ভাইয়ের ছেলে, ক্যাপ্টেন, দারুণ স্মার্ট। ইন্ডিয়ার সাথে সিক্সটিফাইভের ওয়ারে জয়েন করেছে, গুলিও লেগেছিল, আর্মি থেকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

খুরশীদুদ্দিন বলেন, ভালোই তো? লুৎফার মার সঙ্গে কথা বলে দেখি।

লুৎফার মা মল্লিকা আপত্তার বাধ সাধেন : আর্মিতে চাকরি করে, ওটা একটা জীবন হলো নাকি? ঐসব গোলগুলি, যুদ্ধ। শুধু শুধু মেয়েটাকে ঐসব ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কি? কথা আর এগোয় না।

কিন্তু নক্ষত্রের ইশারা কে আর উপেক্ষা করতে পারে? বছর ঘুরে ঈশ্বরগঞ্জের বাতাস আবার ভরে ওঠে কাঁঠালের গন্ধে। একদিন আবারও লুৎফাকে দেখা যায় প্ল্যাটফর্মে। গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছেন তিনি। স্টেশন মাস্টার মুন্সেফ উদ্দীন এবার ভাই মহিউদ্দীন আহমেদকে খোঁজ পাঠান। বলেন : এবার আপনে আসেন বিয়ার প্রস্তাব নিয়া।

মহিউদ্দীন আহমেদ ভেতর গোটানো মানুষ, এসব বৈঠকি আলাপে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তিনি তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফকে পাঠান। ইউসুফ তাহেরকেও সঙ্গে নিয়ে চলেন। খুরশীদুদ্দিন লুৎফাকে বলেন : বিকালে মেহমান আসবে, একটা ভালো শাড়ি পড়ে নে।

লুৎফার বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি বেঁকে বসেন : আমি কোনো সাজগোজ করতে পারব না। আর আমার বিয়ের কথা কিন্তু তুলবেন না এখন। মা মল্লিকা আখতারেরও আগ্রহ কম।

খুরশীদুদ্দিন বোঝান : ওদের এত আগ্রহ, ভালো পরিবার, আর মেয়েকে তো বিয়ে দিতে হবে নাকি?

বিকালে আসেন মুন্সেফ উদ্দীন, আবু ইউসুফ, তাহের। একটা সাধারণ শাড়ি পড়েই হাজির হন লুৎফা। কথা বলেন আবু ইউসুফই। নানা টুকরো আলাপ চলে। ইউসুফ এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : কি করতে তোমার ভালো লাগে? লুৎফা বলেন : নাটক। কলেজে নিয়মিত নাটক করতেন লুৎফা, ইডেন কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকাও ছিলেন। লুৎফা ভাবেন নাটকের কথা শুনে হয়তো ভয় পাবে, নাটক করা মেয়েকে আর কে বিয়ে করতে চায়? তাহেরের সঙ্গে কোনো কথা হয় না সেদিন। বারকয়েক দৃষ্টি বিনিময় শুধু। আলাপি ইউসুফ মন জয় করে নেন মল্লিকা আখতারের।

ওদিকে আটপৌরে, অকপট লুৎফাকে ভালো লাগে তাহেরের। ইউসুফকে বলেন : ভাইজান এ মেয়েটিকেই বিয়ে করব আমি।

দিন যায়, আসে। একদিন ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা রোকেয়া হলে এসে লুৎফাকে ডাকেন : শোন মেয়ে তোমার চুড়ির মাপ নিতে এসেছি।

কেমন উচাটন লাগে লুৎফার : সত্যিই বিয়ে হয়ে যাবে আমার? একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে? কেমন হয় আর্মির মানুষেরা?

১৯৬৯ সালের ৭ আগস্ট ঈশ্বরগঞ্জের মানুষ হঠাৎ দেখে ইউনিফর্ম পড়া এক দল সৈন্য আকাশে গুলি ছুড়তে ছুড়তে মার্চ করে গ্রামে ঢুকছে। হচকচিয়ে যায় সবাই, ভয় পায়। কোনো যুদ্ধ বেধে গেল নাকি? সেদিন লাল, নীল, হলুদ কাগজের তিনকোণা পতাকায় সাজানো ঈশ্বরগঞ্জের সরকারি ডাক্তার খুরশীদুদ্দিনের বাড়ি। মেয়ে লুৎফার বিয়ে সেদিন, সবাই বরের জন্য অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে এসব কি হাঙ্গামা?

একটু পর কে একজন হন্তদন্ত হয়ে বলে : কারবার দেখছেননি, ঐটা তো আর্মি না, বরযাত্রী।

তাহের ঐ সেনা কায়দাতেই তাঁর বন্ধু আর প্লাটুন নিয়ে হাজির হয়েছেন বিয়ের আসরে। বাইরে যখন বন্দুকের শব্দ হচ্ছে ঘরের ভেতর লাল শাড়ির মধ্যে জুবুথুবু লুৎফা তখন কুকড়ে গেছেন ভয়ে। যখন জানতে পারেন এ তাঁর হবু বরেরই কাণ্ড তখন অবাক হয়ে ভাবেন : এ কেমন অদ্ভুত লোক রে বাবা!

কোনো এক দুঃসম্পর্কের বোন যখন কনে সাজাবার নামে লুৎফার কপাল, গাল তিব্বত ক্রিমের ছোট ছোট বিন্দুর নকশায় ভরে দিচ্ছে তখন তার জানবার কথা নয় কতটা অদ্ভুত এক লোকের সঙ্গে জীবন বাঁধা পড়ছে তার।

মধু নেই, চন্দ্রিমা নেই

বিয়ের দুদিন পরই ঈশ্বরগঞ্জ থেকে ট্রেনে ঢাকা রওনা দেন লুৎফা আর তাহের। বিয়ের আগে তাহেরের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি লুৎফার। কনে দেখবার দিন আড়চোখে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল শুধু। বিয়ের পর তাহেরকে একটু একটু করে বুঝবার চেষ্টা করছেন লুৎফা।

লুৎফার হাত থেকে হঠাৎ তাঁর রুমালটি পড়ে যায় ট্রেনের ফ্লোরে। তুলতে গেলে লুৎফাকে থামিয়ে দেন তাহের। বলেন : আমার বউয়ের পড়ে যাওয়া রুমাল সে নিজে তুলবে কেন? যেন তাহের কোনো এক অজানা রাজ্যের বাদশাহ আর লুৎফা তার বেগম। লুৎফা লক্ষ করছেন গুলি চালিয়ে বিয়ের আসরে আসবার মতো একধরনের নাটকীয়তা সবসময় লেগে আছে তাহেরের চরিত্রে। কথাবার্তায় তিনি সতর্ক কিন্তু পাশাপাশি খুব প্রাণবন্তও বটে। 'লোকটা কি খুব মেজাজী হবে? কেমন হবে তাঁর সংসার এই লোকটির সঙ্গে?' ট্রেনের বগিতে বসে চুরি করে তাহেরকে দেখতে দেখতে সামান্য পরিচিত এই মানুষটিকে নিয়ে ভাবনার জাল বোনেন লুৎফা।

চলতে চলতে ময়মনসিংহ স্টেশনে এসে আটকে পড়ে ট্রেন। প্ল্যাটফর্মে প্রচুর ভিড়। কোনো এক মিটিংফেরত সব মানুষ। লুৎফা তাহেরের কানে কানে বলেন : ঐ যে মতিয়া আপা।

তাহের লক্ষ করেন ভিড়ের মানুষ ঘিরে আছে মতিয়া চৌধুরী আর অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদকে। সে সময়ের রাজনীতির আলোচিত মানুষ এঁরা।

লুৎফা বলেন, মতিয়া আপা আমাকে দেখলে খুশি হতেন।

তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি মতিয়া চৌধুরীর? : খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করেন তাহের। তুখোড় নেত্রী মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে লাজুক লুৎফার যোগসূত্র ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তিনি।

ইডেন কলেজে পড়তে তো তাঁর পার্টিই করতাম। চিনি কিনা মতিয়া আপাকে জিজ্ঞাসা করে দেখলেই হয় : জানালায় তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে একটু যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন লুৎফা।

উৎসাহী হয়ে ওঠে তাহের : সত্যি বলছ?

নতুন বউয়ের সঙ্গে খুনসুটি করা ছাড়াও তাহেরের ইচ্ছা মতিয়া চৌধুরী আর অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে আলাপের। ছোট ভাই আনোয়ারকে পাঠান তাহের। প্ল্যাটফর্মের ভিড় ঠেলে আনোয়ার পৌঁছে যান মতিয়া চৌধুরীর কাছে। ছুটে আসেন মতিয়া চৌধুরী। লুৎফার তখনও নতুন বউয়ের সাজ।

লুৎফাকে জড়িয়ে ধরেন মতিয়া চৌধুরী : লুৎফা তোর বিয়ে হলো আমি কিচ্ছু জানলাম না?

লুৎফা পরিচয় করিয়ে দেন স্বামী ক্যাপ্টেন থেকে সদ্য মেজর হওয়া তাহেরের সঙ্গে।

মতিয়া বলেন : ভালোই হলো তোদের সঙ্গে গল্প করতে করতেই যাবো আজকে। দাঁড়া মোজাফ্‌ফর ভাইকে ডেকে আনি।

মতিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফব আহমেদ আরও কজন সঙ্গী নিয়ে উঠে পড়েন লুৎফাদেরই কামরায়।

তাহেরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসেন লুৎফা। তাহেরের সঙ্গে ছোটখাটো একটা জিত তো হলো তার?

শরীরে বিয়ের শাড়ির ঘ্রাণ নিয়ে লুৎফা এতক্ষণ ট্রেনের জানালায় চোখ ভাসিয়ে রেখেছিলেন দিগন্তে। স্বপ্ন দেখছিলেন আগামীর। আশৈশব পরিচিত ট্রেনের সেই শব্দ আর দুলুনিতে তাহেরেরও খানিকটা ঝিম ধরেছিল বুঝিবা। কিন্তু এখন ট্রেনের কামরায় অনেকগুলো উত্তেজিত মানুষ। হৈ চৈ, বিতর্ক। আনমনা স্বপ্ন বুনবার আবহ আর নেই। ১৯৬৯-এর সেই আগস্ট তাহের আর লুৎফার মধুচন্দ্রিমার মাস। কিন্তু দেশজুড়ে তখন কোথাও কোনো মধু নেই, চন্দ্রিমা নেই।

চারদিকে এক উত্তপ্ত, আগ্নিগর্ভ সময়। পূর্ব পাকিস্তানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে শুধু মিটিং, মিছিল আর বিক্ষোভ। বাতাসে স্লোগান, 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা যমুনা'। মিছিলে গুলি। গুলিতে নিহত ছাত্র আসাদের শার্ট তখন হয়ে গেছে মিছিলের পতাকা।

পূর্ব আর পশ্চিমে ডানা মেলে দেওয়া পাকিস্তান পাখি তখন আর উড়ছে না। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে জমে ওঠা ঘৃণা আর আক্রোশ তখন তুঙ্গে। প্রতিবাদ চলছে প্রকাশ্যে, গোপনে। ট্রেনের কামরায় উঠে পড়া মানুষগুলো ফিরছিল তেমনি এক প্রতিবাদ সভা থেকেই।

ইয়াহিয়া কি ইলেকশন দিবে? : জিজ্ঞাসা করে একজন।

দিবে মানে? ওর চৌদ্দগুষ্টি দিবে : উত্তেজিত উত্তর আরেকজনের। ট্রেনের কামরাভরা ক্ষুব্ধ মানুষ। ট্রেন রওনা দেয় আবার। আগস্টের ঝাঁ ঝাঁ দুপুর।

আরেক আগস্ট

তাহের আর লুৎফাকে ট্রেনের কামরায় রেখে এবার আরও খানিকটা পেছনে চলে যাওয়া যাক। চলে যাওয়া যাক এমনি আরেক আগস্টের দিনে। ওরা যখন ট্রেনে করে ঢাকার পথে যাচ্ছেন তার ঠিক বছর বাইশ আগে। ১৯৪৭ সালের আগস্টের ১৪ তারিখ। সেদিনই আকাশে উড়েছিল পাকিস্তান পাখি, যে পাখির এখন ডানা ভাঙবার উপক্রম। অথচ ঐদিন বাতাসে উৎসবের ঘ্রাণ। সেদিন গুজরাটি ঝীনা ভাইয়ের ছেলে মহম্মদ আলী ঝীনা যিনি কিনা সাহেবদের কল্যানে স্যুট টাই পড়া ব্যারিস্টার জিন্নাহ, শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে ইসলামাবাদে লাঞ্চ করছিলেন। জাঁকজমকপূর্ণ লাঞ্চ পার্টি। কারণ সেদিন পৃথিবীর মানচিত্রে পূর্ব

আর পশ্চিম মিলিয়ে পাকিস্তান নামে এক নতুন দেশের জন্ম হচ্ছে। পূর্বের মানুষেরা বাঙালি, পশ্চিমে অবাঙালি। তাতে কি? সবাই তারা মুসলমান। পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য একটি দেশের আবির্ভাব ঘটছে। কিন্তু কি মজার ব্যাপার দেখুন সেটি ছিল রোজার দিন। মুসলমানদের নেতা কিনা রোজা রমজানের দিনে দিব্বি লাঞ্চ পার্টি করে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে জিন্নাহ কখনই তেমন আচারনিষ্ঠ ছিলেন না। তিনি তো তরুণ বয়সে হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথাই বলতেন। মাঝবয়সে এসে বিয়ে করলেন অমুসলিম তরুণী ঋতুকে। কিন্তু সে কথা এখন বাসি, এখন তিনি মুসলমানদের নেতা।

সারাদিন উৎসব করে তিনি রাতে যখন ঘুমাতে গেলেন, তখন কয়েক শত মাইল দূরে দিল্লিতে আতশবাজি পুড়িয়ে শুরু হয়েছে আরেক উৎসব। এ উৎসব আরেকটি নতুন দেশের জন্মের। ১৫ আগস্ট জন্ম নিচ্ছে হিন্দুদের দেশ ভারত। একদিনের ব্যবধান। দুটি দেশের জন্ম। একটি মুসলমানদের, অন্যটি হিন্দুদের। কিন্তু হিন্দুদের নেতা আরেক ব্যারিস্টার করমচাঁদ গান্ধী উৎসবের ধুমধামের মধ্যে নেই। স্যুট, টাই ফেলে তিনি গায়ে চড়িয়েছেন ধুতি, চপ্পল। দিল্লি থেকে অনেক দূরে কলকাতায় বিষণ্ন বসে তিনি রাতের তারা দেখছেন। তিনিও চাননি দুটো দেশ হোক। বলেছিলেন, 'ভারতকে ভাগ করবার আগে তোমরা আমাকে দু ভাগ করো।' কিন্তু সময়ের পাগলা ঘোড়া গান্ধী আর জিন্নাহকে নিয়ে গেছে দুপ্রান্তে।

ভারতকে দুভাগ করবার নানা আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছিল কদিন আগেই। লন্ডন থেকে জরুরি তলব করে নিয়ে আসা হয়েছিল ড্রাফ্‌টম্যান র‍্যাডক্লিফকে। দিল্লির ভাইসরয়ের অফিসের টেবিলে ছড়ানো অবিভক্ত ভারতের বিশাল ম্যাপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর দায়িত্ব ভারতকে দুভাগ করা, একভাগে হিন্দু, অন্যভাগে মুসলমান। কোনোদিন ভারতে আসেন নি র‍্যাডক্লিফ, তাঁর কাছে ভারত মানে টেবিলের উপর ছড়ানো ঐ ম্যাপ। র‍্যাডক্লিফ হিসাব করলেন কোথায় হিন্দু বেশি, কোথায় মুসলমান, তারপর পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে কেটে ভাগ করলেন ভারতকে। দাগের এদিকে ভারত ওদিকে পাকিস্তান। ১৫ আগস্ট ভোরে ঘুম ভেঙ্গে ভুরুঙ্গামারির আবদুল মোতালেব জানতে পারলেন তার পাশের বাড়ির নিবাস শর্মা আজ থেকে আর তার দেশের মানুষ নয়, বিদেশি। র‍্যাডক্লিফের পেন্সিলের খোঁচায় পাটগ্রামের খলিলের বাড়ির বৈঠক ঘর পড়ল পূর্ব পাকিস্তানে আর রান্নাঘর ভারতে। কি তুলকালাম কাণ্ড আর কি অদ্ভুত। তল্পিতল্পা গুটিয়ে এপারের হিন্দু পালালো ওপারে আর ওপারের মুসলমান এলো এপারে। যার যার নতুন দেশে। পথে পথে কত অশ্রু ঝরল, বইল রক্তের স্রোত।

> 'তেলের শিশি ভাংলো বলে খুকুর পরে রাগ করো,
> তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙ্গে ভাগ করো
> –তার বেলা?' আক্ষেপ করলেন অন্নদাশংকর।

বড় মুস্কিলে পড়ল স্কুলের খোকা খুকুরা। ক্লাসে শিক্ষক বলেন : বাবুরা পাকিস্তানের ম্যাপ আঁক তো? খোকা খুকুরা রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে আঁকে তার দেশের কিম্ভূত মানচিত্র। এক টুকরো পূর্বে, আরেক টুকরো পশ্চিমে। মাঝে বিস্তর পারাবার। খোকা খুকুদের খটকা লাগে।

কিছুদিন পর খটকা শুরু হয় বুড়ো খোকাদের মধ্যেও। পূর্ব পাকিস্তানের বুড়ো খোকারা লক্ষ করেন পূর্ব আর পশ্চিম নিয়ে পাকিস্তান হলেও সবকিছুতেই পাল্লা ভারী পশ্চিমে। দেশের হর্তাকর্তা, আমলা, ব্যবসায়ী, সেনাকর্তা প্রায় সবাই পশ্চিম পাকিস্তানি। এমনিতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা কম, সামান্য গুটিকয় যে শিল্প কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে তার মালিক সব অবাঙালি, আর এ অঞ্চলে বিত্তবৈভব যাদের ছিল সেই হিন্দু জমিদাররা তো দেশ ছেড়েই পালিয়েছেন। ফলে বুড়ো খোকারা লক্ষ্য করেন প্রায় এতিম এই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর রীতিমতো জেঁকে বসেছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা।

পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর জীবনে ঢাকায় আসলেন শুধু একবার। এসেই বাঁধিয়ে দিয়ে গেলেন বিশাল খটকা। বললেন, জলাজংলার দেশের চাষাভুষাদের ভাষা বাংলা নয় আশরাফ মুসলমানদের ভাষা, নবাবদের ভাষা, কায়েদে আযমসহ পাকিস্তানের শাসকদের ভাষা অভিজাত উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তারপর সেই তো '৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারির কিংবদন্তি। রাজপথে সালাম, বরকত, জব্বারের রক্ত। প্রতি বর্ষায় ধুয়ে যায় ঢাকার রাস্তা তবু রক্তের দাগ মোছে না। শুরু হয় পাখির ডানা ভাঙ্গার আয়োজন।

মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই এই ছড়ায় আর কাজ হয় না। ইতোমধ্যে মারা গেলেন জিন্নাহ, খুন হলেন তাঁর উত্তরসূরি লিয়াকত আলী খান। গণপরিষদে শুরু হলো সরকারি আর বিরোধী দলের তুমুল বাকবিতণ্ডা, মন্ত্রীরা সব একে একে পদত্যাগ করতে শুরু করলেন। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়ে উঠল যে একদিন পরিষদের অধিবেশনে চেয়ার ছুড়ে মেরেই ফেলা হলো ডেপুটি স্পিকারকে। পাকিস্তানের রাজনীতির এই লেজেগোবরে অবস্থায় সবাইকে শায়েস্তা করতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে গোঁফ বাগিয়ে এসে শাসনভার হাতে তুলে নিলেন সেনাপতি আইয়ুব খান। সব রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ করে দিয়ে, বাংলার সব নেতাদের জেলের ভেতর পুরে আইয়ুব খানই হয়ে উঠলেন সর্বময় কর্তা। ধীরে ধীরে নিজের সুবিধামতো আবারও রাজনীতির দরজা খুললেন তিনি, সৈনিকের পোশাক খুলে নিজেই বানিয়ে নিলেন রাজনৈতিক দল, নির্বাচন করলেন, হয়ে বসলেন দেশের রাষ্ট্রপতি।

আইয়ুব খান তখন ডায়েরি লিখছেন। সে ডায়েরি আমরা পড়তে পেলাম তার মৃত্যুর বহু বছর পর। দেখলাম তিনি লিখেছেন, 'বাঙালিরা হচ্ছে ছোট মনের নিচু জাতের মানুষ।'

তিনি এও লিখেছেন যে, বাঙালি মুসলমানরা বড় বেশি বাঙালি, যথেষ্ট মুসলমান নয়। মারমুখী, উদ্ধত, ক্রুর ভঙ্গিতে তিনি ইসলাম রক্ষার নামে বাঙালিদের দাবড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন। বললেন, হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথের গান চলবে না। আইয়ুব খানের বাঙালি চামচারা লেগে পড়লেন বাংলা কবিতার মুসলমানী করবার কাজে। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি' হয়ে গেল 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি, হররোজ আমি যেন নেক হয়ে চলি'।

পূর্বের বাঙালিদের যখন মুসলমান বানানোর পাঁয়তারা চলছে তখন ওদিকে কেবলই পাল্লা ভারী হতে থাকে পশ্চিমের। পূর্ব পাকিস্তানের পাট, চা, চামড়া বিক্রির টাকায় সুরম্য হয়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি। সব শীর্ষ সামরিক অফিসার, সব শীর্ষ আমলা, প্রায় সব শীর্ষ সরকারি পদ, সব শীর্ষ ব্যবসাবাণিজ্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের। বাঙালির ভাগ্যে তলানীর কাছাকাছি কিছু কাজ, অধস্তন কিছু পদ, উচ্ছিষ্ট কিছু ধন।

কিন্তু ঐ ছোট মনের নিচু জাতের মানুষেরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে ততদিনে। আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে তারা শুরু করে দিয়েছে তীব্র প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আন্দোলন। চারদিকে স্লোগান, 'আইয়ুব শাহীর গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে'।

বাঙালির স্যুট নাই পড়া ব্যারিস্টার নেতা নেই, নেই ইউনিফর্ম পড়া জেনারেলও। তারা দাঁড়িয়েছে ফরিদপুরের গৃহস্থের ছেলে শেখ মুজিবুর রহমানের পেছনে। দাঁড়িয়েছে সিরাজগঞ্জের দরিদ্র কৃষকের মাদ্রাসায় পড়া সন্তান মওলানা ভাসানীর পেছনে। দিনের পর দিন ধরে কি করে বেড়ে চলেছে পশ্চিম পাকিস্তানের জৌলুশ আর পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে শ্মশান, জাদুকরী বক্তৃতায় সারাদেশ ঘুরে সে ইতিবৃত্ত সবাইকে শোনান শেখ মুজিব। অসাধারণ বক্তা তিনি। কোথাও বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে যায় হাজার, লক্ষ মানুষ। বাঙালিদের দীর্ঘদিনের নানা দাবিকে শেখ মুজিব চুম্বক আকারে ছয়টি দফায় পরিণত করে আন্দোলন করেন স্বায়ত্তশাসনের। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ করবার জন্য তাঁকে জেলে পুরে দেয় পাকিস্তানি শাসক। কিন্তু জনগণের তীব্র দাবির মুখে তাঁকে ছেড়ে দিতেও বাধ্য হয় আবার। দিকে দিকে স্লোগান ওঠে 'জেলের তালা ভেঙ্গেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি'।

অন্যদিকে গ্রামে গ্রামে দাপিয়ে বেড়ান মাওলানা ভাসানী। উত্তপ্ত করে রাখেন কৃষকদের বিশাল সমাবেশ। কৃষকরা সব লাল টুপি পড়ে জমায়েত হয়ে ধুলায় ধুলিময় করে তোলেন গ্রামের জনপদ। হরতাল ডেকে তিনি বন্ধ করে দেন গ্রামের হাট। জোতদার, পুঁজিপতিদের গদিতে আগুন লাগিয়ে দিতে বলেন তিনি। তালের টুপি মাথায় দিয়ে লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পড়ে স্লোগান দিতে দিতে তিনি এগিয়ে চলেন মিছিলের সামনে। ঘেরাও করেন গভর্নরের অফিস। এগিয়ে আসা আইয়ুব খানের

পুলিশের রাইফেল খামচে ধরে তিনি বলেন, 'খামোস'। বিদেশি পত্রিকা তার নাম দেয় 'রেড মাওলানা' বলে 'প্রফেট অব ভায়ওল্যান্স'।

পাশাপাশি তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে ছাত্ররাও। শেখ মুজিবের ছয় দফার পাশাপাশি তারা তুলে ধরে এগারো দফা দাবি। দাবি তোলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিলের, দাবি তোলে স্বায়ত্তশাসনের। আন্দোলন বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতির অঙ্গনেও। রবীন্দ্রনাথকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে তোলে 'ছায়ানট'। হরতাল, মিছিল, স্লোগানে তখন উত্তপ্ত সারাদেশ।

ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া খটকার দেশ পাকিস্তান তখন নড়বড়ে। একটা কোনো চূড়ান্ত পরিণতির অপেক্ষায়। এক দশক দাপটে শাসনের পর অবশেষে ছোট মনের নিচু জাতের বাঙালিদের তীব্র প্রতিবাদ আর আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন আইয়ুব খান। ক্ষমতা ছেড়ে দেন আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে।

১৯৪৭-এর ১৪ আগাস্ট জিন্নাহ আর মাউন্টব্যাটেনের লাঞ্চের মধ্য দিয়ে দুই টুকরো দেশের যে বেতাল নাটকের সূচনা হয়েছিল তার শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছিল ১৯৬৯-এর আগস্টে যখন নবদম্পতি লুৎফা আর তাহের ট্রেনে চেপে চলছেন ময়মনসিংহের ধান ক্ষেত পেরিয়ে। পেছনের এই গল্প না জানলে তাহের আর লুৎফার গল্পও ঢাকা থাকবে মেঘে।

মেজরের গোপন মুখ

ট্রেনের ভেতর চলছে তুমুল তর্ক। ইয়াহিয়া খান নামে যে নতুন জেনারেল ক্ষমতায় বসলেন তিনি কি ইলেকশন দেবেন নাকি আইয়ুব খানের মতোই মার্শাল ল দিয়ে গদিতে বসে থাকতে চাইবেন?

এ নিয়ে উত্তপ্ত আলাপ চলছে মতিয়া চৌধুরী, মোজাফ্‌ফর আহমদ আর তাঁদের সঙ্গীদের মধ্যে। ময়মনসিংহে এক সাংগঠনিক সভা করে ফিরছেন তাঁরা। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠন যখন মস্কো আর চীনের দ্বন্দ্বে বিভক্ত, তখন মতিয়া যোগ দিয়েছেন মস্কোপন্থীদের দলে। তুখোড় বক্তা তিনি, লোকে তাঁকে বলে অগ্নিকন্যা। অন্যদিকে মাওলানা ভাসানীর দল থেকে বেরিয়ে মোজাফ্‌ফর আহমদ গড়েছেন ন্যাপের নিজস্ব দল। ব্যঙ্গবিদ্রূপ মেশানো বক্তৃতায় তিনিও মাতিয়ে রাখেন সভা।

লুৎফা নীরব শ্রোতা। তাহের আগ্রহের সঙ্গে শোনেন তাদের আলাপ।

মোজাফ্‌ফর আহমেদ রসিকতা করে তাহেরকে বলেন : এই যে মেজর সাহেব, আপনাদের এক জেনারেল তো ল্যাজ গুটাইয়া পালাইয়াছে, এই জেনারেলের ল্যাজে কিন্তু আমরা ঘণ্টা বাঁধিয়া দিব, যাহাতে পালাইবার সময় সবাই খবর পায়।

তাহের হাসে।

মতিয়া চৌধুরী অভিযোগের সুরে তাহেরের কাছে জানতে চান : আপনারা বাঙালি অফিসাররা আর্মিতে বসে কি করছেন বলেন তো?

তাঁর সদ্য বিবাহিত স্বামী বেশ একটু চাপের মধ্যে পড়েছে দেখে অস্বস্তিবোধ করেন লুৎফা। কিন্তু তাহেরকে তেমন বিচলিত দেখায় না। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তিনি বেশ ধীরশান্ত ভঙ্গিতেই বলেন : বাঙালি আর্মি অফিসারদের মধ্যেও কিন্তু প্রচুর ক্ষোভ আছে, একটা কিছু চূড়ান্ত ঘটলে সবাই না হলেও অনেক অফিসারই বাঙালির পক্ষে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু ইলেকশন কি হবে? আপনাদের কি মনে হচ্ছে?

মোজাফ্ফর বলেন : সে তো নির্ভর করছে আপনার জেনারেলের ওপর।

তাহের : জেনারেল তো চাইবে ইলেকশন যতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়।

মতিয়া চৌধুরী : ইলেকশন নিয়ে তাল বাহানা করলে আরও রক্ত ঝরবে।

তাহের : কিন্তু মাওলানা ভাসানী তো ইলেকশন নিয়ে তেমন ইন্টারেস্টেড নন।

মোজাফ্ফর : না, না, ভাসানীর ঐ জ্বালাও পোড়াও করলে তো হবে না। এখন একটা নিয়মতান্ত্রিক ইলেকশনে যেতে হবে।

মতিয়া মোজাফ্ফরকে সমর্থন করে বলেন : বরং শেখ মুজিব যে গণআন্দোলনের পরিবেশ তৈরি করেছেন আমাদের এখন সেটিকেই সমর্থন করা দরকার।

হুইসেল বাজিয়ে চলে ট্রেন। এক অচেনা মেজরের সঙ্গে কথা বলেন সে সময়ের তুখোড় দুই রাজনীতিক। তাহের বলেন : কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন দিয়ে কি আপনাদের লক্ষ্য অর্জন হবে? আমি তো জানি আপনারা কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চান। আওয়ামী লীগের যে ছয় দফাকে আপনারা সমর্থন করছেন তার মধ্যে কিন্তু শ্রমিক, কৃষকের কথা নেই।

মোজাফফর : আপনাকে বুঝতে হবে যে এখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরাই আমাদের প্রধান শত্রু, আগে তাদের হটাতে হবে তারপর শ্রমিক কৃষকের কথা ভাবা যাবে এবং নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তাদের হটাতে হবে। চীনাপন্থীদের মতো এখনই শ্রেণীশত্রু খতম করার আওয়াজ তুললে তো হবে না।

তাহের : কিন্তু চীনাপন্থীরা তো মনে করেন বাঙালি অবাঙালি স্ট্রাগলটাকে একটা ফলস স্ট্রাগল। আসল হচ্ছে ক্লাস স্ট্রাগল। আর সংঘাত, সহিংসতা ছাড়া তো ক্লাস স্ট্রাগল হয় না।

মোজাফফর : শোনেন মেজর সাহেব, টাইমটাকে আপনার বুঝতে হবে। ক্লাস স্ট্রাগল আর কমিউনিজম ঠেকানোর জন্য ক্যাপিটালিস্টরা বসে আছে, ওরা এখন আগের যে কোনো সময়ের চাইতে শক্তিশালী। ওদের হাতে এখন অ্যাটোমিক পাওয়ার। খামোখা সংঘাতে জড়িয়ে গেলেই তো চলবে না। আমি তো মনে করি

মস্কোর নেতারা যে বলছেন এখন কৌশলে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে হবে সেটা ঠিক। তাছাড়া শুধু শ্রমিক, কৃষকদের নিয়েই সংগ্রাম করতে হবে, সেটা তো না। দেশের মঙ্গল চায় এমন মধ্যবিত্ত, বুর্জুয়া সবাইকে নিয়েই সংগ্রাম করতে হবে। সংঘাত ছাড়াই রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটানোর সময় এসেছে এখন।

তাহের : তবে আপনারা যেমন শেখ মুজিবের পেছনে আছেন, চীনাপন্থীদের তো দেখছি সবাই দাঁড়িয়েছেন মাওলানা ভাসানীর পেছনে। আপনি নিজেও তো দীর্ঘদিন ভাসানীর সঙ্গে কাজ করেছেন।

মোজাফফর : তা করেছি। কিন্তু উনি তো নানা কনফিউশন তৈরি করেন। আমরা এখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। সিক্সটি ফাইভের ওয়ারে চীন যখন আইয়ুব খানকে সাপোর্ট করল উনি উল্টে গেলেন। যেহেতু তিনি চীনের পক্ষে আর চীন নিয়েছে আইয়ুব খানের পক্ষ ফলে উনি বললেন আইয়ুব খানের ইনটারনাল পলিসি খারাপ হলেও ফরেন পলিসি ভালো। এসব কন্ট্রাডিক্টরি কথার কারণে আমি বেরিয়ে এসেছি। এখন আবার তিনি ভোটের আগে ভাত চাচ্ছেন, জোতদারের গদিতে আগুন লাগিয়ে দিতে বলছেন। এভাবে তো হবে না। আগে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের দরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, দরকার আইয়ুব সরকারের পতন, দরকার একটা ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট। এরপর আমরা সোসালিস্ট মুভমেন্টের দিকে যাব।

তাহের : কিন্তু পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থেকে, আওয়ামী লীগের মতো একটা বুর্জুয়া দলের নেতৃত্বে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আপনারা কি আল্টিমেটলি সোসালিজম কায়েম করতে পারবেন বলে মনে করেন?

কথায় যোগ দেন মতিয়া : রিস্ক তো আছেই কিন্তু মানুষের পালসটা তো বুঝতে হবে। অধিকাংশ মানুষ এখন এটাই চায়। আমরা জানি শেখ মুজিব কমিউনিস্ট নন, কিন্তু তিনি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা, তার দল আওয়ামী লীগও সমাজতান্ত্রিক দল না তবু তারা সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়। আপনি জানেন যে, এখন ওপেনলি কমিউনিজমের কথা বলা সম্ভব না। এই গভর্নমেন্ট কমিউনিস্টদের ইসলামের শত্রু ঘোষণা করেছে। দেদারসে জেলে ঢুকাচ্ছে। আমাদের এখন এদের সঙ্গেই কাজ করতে হবে।

তাহের : সে অর্থে মাওলানা ভাসানীও কমিউনিস্ট না। অথচ চীনাপন্থীরা ভিড়েছে তার পেছনে। আপনারা তো মস্কোপন্থী আর চীনাপন্থী করে নিজেদের এভাবে বিভক্ত করে রেখেছেন।

মোজাফফর : মেজর সাহেব আপনি তো পলিটিক্সের বেশ খবর রাখেন বলে মনে হচ্ছে। আপনার কি মনে হয় বলেন।

লুৎফা জানালা দিয়ে দূরে হলুদ সরিষা ক্ষেত দেখলেও কান পেতে আছেন কামরার ভেতরের আলাপে। ক্লিন শেভড, কালো গোঁফের আড়ালে মৃদু হাসি নিয়ে

মেজর তাহের বলতে থাকেন : আমার তো মনে হয় আরও পথ আছে। যারা কমিউনিস্ট তাদের কি প্রয়োজন অকমিউনিস্ট লিডারের পেছনে যাওয়ার? নিজেদের লিডারশীপে পূর্ব পাকিস্তানকে পুরোপুরি স্বাধীন করে একটা কমিউনিস্ট স্টেট করে ফেলা যেতে পারে। এমনিতে সেটা হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নামতে হবে। সেই যুদ্ধকে গ্র্যাজুয়ালি একটা সোসালিস্ট রেভুলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

মোজাফফর : ইয়াংম্যান, ক্যান্টনমেন্টে থাকেন তো তাই মাথায় আপনাদের সবসময় যুদ্ধ। কিন্তু এ মুহূর্তে ওসব হঠকারী ভাবনা। টাইম ইজ নট রাইপ ফর দ্যাট।

রাজনীতি নিয়ে এই তরুণ আর্মি অফিসারের কৌতূহলী ভাবনা দেখে বেশ অবাক হন মোজাফ্ফর এবং মতিয়া। অবশ্য তাদের জানবার কথা নয় যে, এই মেজরের রয়েছে আরেকটি গোপন মুখ। যে মুখ গভীর, গহীন রাজনীতিরই। ট্রেনের জানালা দিয়ে দূরে হলুদ সরিষা ক্ষেত দেখছেন যে লুৎফা, জানেন না তিনিও।

যুথভ্রষ্টের দল

ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে ঢাকায় ফিরে লুৎফা এবং তাহের ওঠেন কলাবাগান বশিরুদ্দিন রোডে তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফের বাসায়। পরদিন নাস্তার টেবিলে বসেছেন সবাই। নতুন বউ লুৎফার জড়তা তখনও কাটেনি। ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা বলেন : তাহের তুমি কিন্তু বিয়ের দিন গুলি টুলি ছুড়ে মেয়েটাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

তাহের : একটু আর্মি কায়দায় সেলিব্রেট করলাম। তাছাড়া কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে একটু বুঝিয়ে দিতে হবে না, ভাবী?

ফাতেমা : তুমি আবার তোমার ইউসুফ ভাইয়ের মতো বিয়ের রাতে বৌকে মাও সেতুং-এর বই দাও নাই তো?

তাহের : ইউসুফ ভাই আপনাকে বাসর রাতে মাও দিয়েছিল নাকি? জানতাম না তো।

ফাতেমা : কি বলব, আমি এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

তাহের : নট এ ব্যাড আইডিয়া। আগে জানলে আমিও একটা সঙ্গে নিয়ে যেতাম ঈশ্বরগঞ্জে।

ফাতেমা : তবে তোমরা যে সিরাজ শিকদারের সঙ্গে মিলে তোমাদের ঐসব মিটিং আর ট্রেনিং বন্ধ করেছ আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি। তা না হলে কবে যে তুমি বিয়ে করার সময় পেতে!

তাহের : তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন ভাবী, বিয়ে আর এ জনমে করা হতো না। কিন্তু ট্রেনিংটা বন্ধ হয়ে যাওয়া আনফরচুনেট। আনোয়ার তুমি আরেকবার সিরাজের সঙ্গে কথা বলে দেখবে নাকি?

ইউসুফ বলেন : ওটা আর রিভাইব করার কোনো সম্ভাবনা দেখি না আমি।

ভাইরা মিলে কি প্রসঙ্গে কথা বলছে সব? মনে মনে ভাবেন লুৎফা। কথার কোনো খেই না পেয়ে লুৎফা নাস্তার টেবিল ছেড়ে অন্য ঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। তাহের খপ করে লুৎফার হাত টেনে ধরে, বলেন : যাওয়া চলবে না, যে কথা আলাপ করছি সেটা তোমারও শোনা দরকার।

বাদশা তাহেরের হুকুম তামিল না করে উপায় থাকে না বেগম লুৎফার। বসে পড়েন আবার। তাহের এবং তার পরিবারের লোকজনেরা যে গড়পড়তা মানুষের মতো নন, তা লুৎফা একটু একটু করে টের পেয়েছেন আগেই। তাদের আলাপ সারাক্ষণ দেশ আর রাজনীতি নিয়ে। কিন্তু লুৎফা জেনে অবাক হন যে বিয়ের মাত্র সপ্তাহখানেক আগে কলাবাগানের বশিরুদ্দিন রোডের এই বাড়িতে বসেই তাহের আর তার ভাইয়েরা সিরাজ শিকদার নামের ঐ মানুষটির সঙ্গে মিলে রাজনীতিরই এক দুর্ধর্ষ অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছিল।

তাহের এবং তাঁর ভাইয়েরা তখন টগবগে তরুণ। আবু ইউসুফ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, তাহের আর্মিতে, ছোট ভাইয়েরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। আপাতদৃষ্টিতে ছিমছাম মধ্যবিত্ত পরিবার। পঞ্চাশ ষাট দশকে এদেশে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত তরুণদের জীবন এগোচ্ছিল একটা নির্দিষ্ট গতিতে। দেশভাগের পর মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ বেড়েছিল। তরুণ তরুণীরা পড়াশোনা করছিল একটা সরকারি চাকরি পাবার লক্ষ্য নিয়ে। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সুযোগও বেড়েছিল। অবসর কাটছিল ম্যাটিনি বা নাইট শো-তে সিনেমা দেখে। ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পাকিস্তানে ভারতীয় ছবি আসা বন্ধ হয়ে গেল, সুচিত্রা, উত্তম বা অশোক কুমার, মধুবালার সিনেমার জায়গা নিলেন রাজ্জাক, কবরী বা মোহাম্মদ আলী, যেবার সিনেমা। কলকাতা রেডিও থেকে ভেসে আসা অনুরোধের আসরের সতীনাথ, শ্যামল মিত্রের গান শোনায় অবশ্য কোনো ছেদ পড়ল না। গলায় তখন তাদের গুন গুন গান "আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে, সাত সাগর আর তেরো নদীর পারে...।" কারো কারো সঙ্গী হয়তো বুদ্ধদেব বসু বা জীবনানন্দ দাশ।

কিন্তু এর মধ্যেও কিছু কিছু তরুণ চোরাস্রোতের মতো ধরেছিল অন্য এ পথ। তারা এই মধ্যবিত্তের ছক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তারা স্বপ্ন দেখছিল বিপ্লবের। পুরো সমাজটাকে ভেঙ্গে একেবারে নতুন করে গড়বার। তারা স্বপ্ন দেখছিল কমিউনিজমের। 'কমিউনিজম' তখন অনেক তরুণের কাছেই এক নিষিদ্ধ, রোমাঞ্চকর শব্দ। এ অঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা চলে এসেছে সেই বিশ শতকের গোড়া থেকেই। মাঝে দেশ ভাগ, কমিউনিস্ট শিবিরে মস্কো, চীন বিভেদ, পাকিস্তান সরকারের কঠোর কমিউনিস্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপ্লবের স্বপ্ন ম্লান হয়নি তরুণদের মনে। দেশ বিদেশের বিপ্লবের খবর তখন তরুণদের কাছে। রাশিয়া আর চীনে তো বিপ্লব ঘটে গেছে সেই কবে। আমেরিকার মতো

প্রতাপশালী কমিউনিস্ট বিরোধী দেশের একেবারে নাকের ডগায় বসে কিউবায় কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন তেত্রিশ বছরের তরুণ ফিদেল ক্যাস্ট্রো। কিউবায় সাফল্যের পর তার বন্ধু চে গুয়েভারা গেছেন বলিভিয়ার বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে। এদিকে দেশের কাছে ভিয়েতনামে কমিউনিস্টরা হো চি মিনের নেতৃত্বে সে দেশের অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে। বার্মাতেও বেশ কিছু এলাকা দখল করেছে কমিউনিস্টরা, গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে অন্য এলাকায়। লাওসেও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট পার্টি। ইন্দোনেশিয়ার বিশাল কমিউনিস্ট পার্টি এক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে সে দেশের সরকারের কাছে। আশপাশের তৃতীয় বিশ্বের ছোটখাটো দেশগুলোতে এগিয়ে চলেছে কমিউনিজমের অগ্রযাত্রা।

উত্তরে, পশ্চিমে, পূর্বে চেনা, অচেনা জনপদের দুর্ভাগা মানুষেরা আশ্চর্য শক্তিতে তখন দ্রিমি দ্রিমি বাজাচ্ছে বিপ্লবের ঢাক। দূর থেকে ভেসে আসা সে ঢাকের শব্দে এদেশের অনেক তরুণেরও বুক কাঁপে। একটা বৈষম্যহীন, শোষণহীন আগামী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাচ্ছে কমিউনিজম। নানা দৈন্য, দুর্দশায় জর্জরিত দুঃখী একটি দেশ আমাদের। এদেশের অনেক তরুণকেই তাই কমিউনিজম টেনেছে চুম্বকের মতো, যেন কোনো জাদুর পাথর। পাথরের মন্ত্রবলে যুথভ্রষ্ট হয়েছে তারা। পড়াশোনা, চাকরির বাধা পথ ছেড়ে ধরেছে অজানা, বিপদসঙ্কুল পথ।

তাহের এবং তাঁর ভাইরা কমিউনিজমের ঘোর লাগা সেইসব যুথভ্রষ্ট তরুণদের দলে। বিয়ের মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে তাহের, বড় ভাই আবু ইউসুফ, ছোট ভাই আনোয়ার আর সিরাজ শিকদার মিলে কলাবাগান বশিরুদ্দীন রোডের ঐ বাড়িতেই অবতারণা করেছিল চোরাগোপ্তা এক দুঃসাহসিক বিপ্লবী মিশনের।

ইউসুফের স্ত্রী ফতেমা বলেন : বুঝলে লুৎফা এরা তো সব ঘরের ভেতর রীতিমতো যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেছিল। কমিউনিস্ট বিপ্লব নাকি করবে। ভাগ্যিস ঐ সিরাজ শিকদার লোকটার সাথে একটা গণ্ডগোল বাধল, তা না হলে তোমার আর এ বাড়িতে আসা হতো না।

লুৎফার বাবা বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, লুৎফা নিজে কলেজে থাকতে মতিয়া চৌধুরীর দল করেছেন ফলে এ জগতটা তার কাছে নতুন নয়। লুৎফা ঘোমটা ঠিক করতে করতে জিজ্ঞাসা করেন : সিরাজ শিকদার কে?

তাহের বলেন : ইঞ্জিনিয়ার, খুবই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। মেনন গ্রুপে ছিল, মাওইস্ট। কিন্তু ওদের সাথে বনিবনা হয়নি। দল থেকে বেরিয়ে এসে কিছু ছেলে নিয়ে একটা রিডিং সার্কেল তৈরি করছিল। তার সাথে আমাদের চিন্তা মিলে গিয়েছিল, দুজনে মিলে শুরু করেছিলাম ট্রেনিং।

লুৎফা বলেন : কিসের ট্রেনিং?

লুৎফার আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হয়ে ওঠে তাহের, বলেন : মনে আছে ট্রেনে মোজাফফর ভাইকে বলছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নামার

কথা, সেই যুদ্ধকে গ্র্যাজুয়ালি একটা সোসালিস্ট রেভুলিউশনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা?

লুৎফা : হ্যাঁ, এরকমই তো কি যেন একটা বলছিলে।

তাহের : সেই প্ল্যানই করছিলাম আমরা। সিরাজ শিকদার আর আমি মিলে কিছু ইয়াং ছেলেদের ট্রেনিং দিচ্ছিলাম এই রকম একটা যুদ্ধের প্রিপারেশন নিতে। সিরাজ পলিটিক্যাল ক্লাস নিত আমি শেখাতাম আনকনভেনশনাল যুদ্ধের কৌশল।

লুৎফা : কিন্তু আর্মিতে থেকে এভাবে বাইরের লোকদের ট্রেনিং দেওয়া যায়?

আনোয়ার : ভাবী আপনি তো জানেন না, তাহের ভাই কিন্তু আর্মি থেকে ছুটিতে এসে আমাদেরও মিলিটারি ট্রেনিং দিতেন। আমাদের সব ভাইবোনকে। আমাদের একটা ফ্যামিলি বিপ্লবী স্কোয়াড আছে। আপনার সব দেবর, ননদরা কিন্তু বোমা বানাতে পারে, গেরিলা যুদ্ধের টেকনিক জানে।

ইউসুফ বলেন : বুঝলে লুৎফা কঠিন জায়গায় এসে পড়েছ, সব বিপ্লবীর দল। বিপদ আছে কিন্তু তোমার।

মুচকি হাসে লুৎফা।

তাহের বলেন : সিরাজ শিকদারের সঙ্গে মিলে এ ট্রেনিংটা দেবার জন্য আর্মি থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছিলাম। অনেক বড় প্ল্যান ছিল। কথা ছিল ছেলেরা ট্রেনিং নিয়ে চলে যাবে চিটাগাং হিলট্রাকসের বান্দরবানে, সেখানে তারা ঘাঁটি গড়ে তুলবে। যোগাযোগ করা হবে বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। চিটাগাং ক্যান্টনমেন্টের আমার কমান্ডো সিপাইদের ট্রেনিংএর জন্য প্রায়ই আমাকে যেতে হয় বান্দরবানে। ঠিক করেছিলাম, সুযোগমতো একদিন আর্মি ছেড়ে দিয়ে আমার কমান্ডো ট্রুপ নিয়ে আর্মসসহ যোগ দেবো বান্দরবানের তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে। বান্দরবান এরিয়াকে মুক্ত ঘোষণা করা হবে, সেখান থেকে শুরু হবে গেরিলা যুদ্ধ।

নতুন বউকে বিপ্লবের গল্প বলতে শুরু করেন তাহের। লুৎফা লক্ষ করেন অন্য কোনো আলাপের চাইতে এ আলাপেই তিন ভাইয়ের সমান আগ্রহ। ঘটনাটি জানতে তিনিও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন : কি হলো তারপর? ট্রেনিং বন্ধ হলো কেন?

ফাতেমা বলেন : সে অনেক লম্বা কাহিনী। আরেকদিন শুনো। আজকে তো তোমাদের মোহাম্মদপুরে দাওয়াত। দাওয়াত খেয়ে আস।

তাহের : ভাবী, দাওয়াতের পোলাও খেতে খেতে তো এখন পেটের অবস্থা খারাপ। অবশ্য ঠিকই বলেছেন, আরিফ ভাইয়ের দাওয়াত তো আর মিস করা যাবে না। লুৎফা কুইক রেডি হয়ে নাও।

নোনা দরিয়ার ডাক

নক্ষত্রের ইশারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকাল্টির করিডরে বুকে বই চেপে হেঁটে বেড়ানো লুৎফার সঙ্গে বিয়ে হলো ক্যান্টনমেন্টে লেফট রাইট করে

বেড়ানো মেজর তাহেরের। খাকি পোশাক পড়া, রাইফেল কাঁধে সামরিক মানুষের ছবি দেখেছে লুৎফা কিন্তু এমন একজন মানুষের সঙ্গে ঘর করতে হবে ভাবেনি কখনো। বিয়ের রোমাঞ্চ ছাপিয়ে একটা অজানা আশঙ্কা তাই নিরন্তর ভর করে ছিল লুৎফাকে। বান্ধবীরা বলেছিল, দেখিস, মিলিটারি মেজাজ বলে কথা!

কিন্তু এ কয়দিনে তাহের তাঁর উষ্ণতা দিয়ে মুছে দিয়েছে লুৎফার আশঙ্কা। প্রমাণ করেছে সে প্রেমিকও বটে। কিন্তু ইতোমধ্যে উন্মোচিত হয়েছে অনিশ্চয়তার অপ্রত্যাশিত এক জানালার। লুৎফা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি তাঁর সঙ্গে কিনা পরিচয় হবে এক ছদ্মবেশী ঘোর বিপ্লবীর।

পরদিন সকালে ইউসুফ গেছেন অফিসে। তাহেরও বেরোন একটা কাজে। যাবার সময় আনোয়ারকে বলেন : তুমি তোমাদের টেকনাফ মিশনের গল্পটা শোনাও তোমার ভাবীকে। ওর জানা দরকার।

লুৎফাকে বলেন : তুমি আনোয়ারের সাথে গল্প করো, আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চলে আসছি।

ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা ঢোকেন রান্নাঘরে। আর মেহেদী রাঙা হাতে ঘোমটা ঠিক করতে করতে নতুন বউ লুৎফা বসে দেবর আনোয়ারের কাছে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের গল্প শুনতে। আনোয়ার তারই ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র ছাত্র। ডিপার্টমেন্টে দেখা হয়েছে দু-একবার কিন্তু আলাপ হয়নি কখনো। এখন সে তার ঘরের মানুষ।

আনোয়ার বলেন : ঐ যে সিরাজ শিকদারের কথা বলছিলেন তাহের ভাই, তাঁর সাথে যোগাযোগ হয়েছিল আমারই মাধ্যমে। আমি তখন পড়ি তেজগাঁওয়ের সরকারি বিজ্ঞান কলেজে। কলেজের হোস্টেলে থাকি। সেখানে আমার সঙ্গে পড়ত রাজীউল্লাহ আজমী। উর্দু স্পিকিং। ওর বড় ভাই সানীউল্লাহ আজমী আমাদের এক বছর সিনিয়র। উনিও থাকেন হোস্টেলে। ওরা দুই ভাই কিন্তু মনে হবে যেন দুই বন্ধু। সবসময় একসঙ্গে। ওদের বাড়ি ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশ, ঘরে ওরা কথা বলে উর্দুতে। বাবা স্টেশন মাস্টার। উত্তর প্রদেশে থেকে এদেশে এসেছিলেন বদলি হয়ে আর ফিরে যাননি। আমাদের বাবাও স্টেশন মাস্টার, লাইফ কেটেছে স্টেশনে। এসব নিয়ে গল্প করতে করতেই ওদের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। দেখতাম পড়াশোনার বাইরে দুই ভাইয়ের ধ্যান, জ্ঞান হচ্ছে রাজনীতি। ওদের রুমের ভেতর মার্ক্স, লেনিন, মাও সে তুং-এর বই ভরা। দুভাই বসে বসে বিদেশি নানা পত্রিকা থেকে কঠিন সব রাজনৈতিক প্রবন্ধ অনুবাদ করে। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম : অনুবাদ করছ কোথাও ছাপাবার জন্য?

রাজীউল্লাহ খানিকটা উর্দু টানে বলে : 'না, না, আমাদের একটা রিডিং সার্কেল আছে এগুনা সেখানে ডিসকাশন হোবে। পরে ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম ওদের একটা গোপন পাঠচক্র আছে যার নাম 'মাও সে তুং চিন্তাধারা গবেষণাগার'। ঐ পাঠচক্র থেকে একটা পত্রিকা বের করে ওরা 'লাল ঝাণ্ডা' নামে

সেটাও দেখালো। ওদের নেতাই হচ্ছে সিরাজ শিকদার। রাজীউল্লাহ আর সানীউল্লাহর সারাক্ষণ চিন্তা কি করে বাঙালির মুক্তি আসবে। বলে বাঙালিরা যতই আইয়ুব খানের এগেইনস্টে আন্দোলন করুক না কেন কমিউনিস্ট রেভ্যুলেশন ছাড়া তাদের মুক্তি আসবে না।

লুৎফা বলেন : ওরা না বললে উর্দু স্পিকিং, বাঙালিদের নিয়ে এত চিন্তা?

আনোয়ার : সেটাই তো ইন্টারেস্টিং। দুই ভাইই সিরাজ শিকদারের খুব ঘনিষ্ঠ। সিরাজ শিকদার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ছাত্র ইউনিয়নের বড় নেতা ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন যখন মতিয়া, মেনন গ্রুপে ভাগ হয়ে গেল সিরাজ গেলেন মেননের দলে। ভাবী আপনি তো মতিয়া আপার সাথে কাজ করেছেন?

লুৎফা : হ্যাঁ, মেনন ভাইরা তো শেখ মুজিবকে সাপোর্ট করলেন না, ভাসানীর সঙ্গে গেলেন। বাঙালিদের স্বায়ত্ত্বশাসনের আন্দোলনের সঙ্গে তো উনারা থাকলেন না।

আনোয়ার : এই পয়েন্টেই কিন্তু সিরাজ শিকদার মেনন ভাইদের কাছ থেকে সরে আসেন। সিরাজ মুজিবের পক্ষেও গেলেন না, ভাসানীর পক্ষেও না। নিজের একটা পথ বের করার জন্য শুরু করলেন পাঠচক্র। তো আমিও রাজীউল্লাহকে জানালাম যে, আমাদের পুরো ফ্যামিলিও সবাই কমিউনিজমে বিশ্বাসী। বললাম যে, আমাদের ভাই আর্মি থেকে এসে আমাদের গেরিলা ট্রেনিং দেন, আমাদের একটা ফ্যামিলি রেভ্যুলেশনারী স্কোয়াড আছে এইসব। শুনে ঐ দুই ভাইও খুব কৌতূহলী হলো। বলল আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে সিরাজ শিকদারের সাথে। একদিন গেলাম ওদের সাথে।

লুৎফা : তাহের তোমাদের আবার গেরিলা ট্রেনিং দিত কি?

আনোয়ার : ছুটিতে বাড়িতে এলেই স্টেশনের পাশের মাঠে তাহের ভাই ফল ইন করাতেন আমাদের সবাইকে। আমি, সাঈদ ভাই, শেলী আপা, বাহার, বেলাল। আমাদের কমান্ডো প্যারা পিটি শেখাতেন, শেখাতেন কিভাবে খালি হাতে শত্রুকে কাবু করা যায়। বোমা বানানোর ফর্মুলাও শেখাতেন। লোকজনরা অবাক হয়ে দেখত, ভাই-বোনেরা দুই হাতে দুই ইট নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

লুৎফা : তোমাদের কেন ট্রেনিং দিত এসব?

আনোয়ার : তাহের ভাই বলতেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে একটা যুদ্ধ হবে, আমাদের সে যুদ্ধে জয়েন করতে হবে।

লুৎফা : ও! তো সিরাজ শিকদারের কথা কি যেন বলছিলে?

আনোয়ার : হ্যাঁ, একদিন রাজীউল্লাহ আর সামীউল্লাহর সাথে গেলাম সিরাজ শিকদারের সাথে দেখা করতে। মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার কাছে একটা টিনের ঘরে ওরা বসে। সেখানে পরিচয় হলো সিরাজ শিকদারের সঙ্গে। স্মার্ট মানুষ, কথা বলেন সুন্দর। আরও গোটা দশেক ছেলে। গোপনে ওরা ওখানে বসে অনেক রাত পর্যন্ত মার্ক্সবাদ আলাপ করে। ঘরের ভেতর অল্প পাওয়ারের বাল্বের হলুদ আলো।

সিরাজ শিকদার আমাকে তাঁর থিয়োরি বোঝালেন। উনি বললেন, আমি মাওইস্ট। কিন্তু আমাদের দেশের চীনাপন্থীদের দলে আমি নেই। ছিলাম একসময় কিন্ত আমি মনে করি তারা ভুল পথে যাচ্ছে। মাও-এর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, একটা সমাজে কোনো একটা বিশেষ সময়ে অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা থাকে প্রধান দন্দ্ব, বাকিগুলো অপ্রধান দন্দ্ব। চীনাপন্থীরা যে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের কথা বলছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের এই গণআন্দোলনের মুহূর্তে শ্রেণী দ্বন্দ্ব হচ্ছে অপ্রধান দ্বন্দ্ব, বরং বাঙালি জনগণের সাথে পাকিস্তানি শাসকদের যে দ্বন্দ্ব সে দ্বন্দ্বই হচ্ছে প্রধান দ্বন্দ্ব। বিপ্লবের জন্য তাই এই জাতীয়তার দ্বন্দ্বকে মোকাবেলা করতে হবে প্রথম। তবে মস্কোপন্থীরা যেভাবে জাতীয়তার দ্বন্দ্ব মোকাবেলার কথা বলছে, বৈঠক করে কিংবা নির্বাচন করে এই দ্বন্দ্ব ঘুচবে না। দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে সশস্ত্র পথে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের এই আন্দোলনকে একটা কমিউনিস্ট ওয়ারের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ জন্য মাও সে তুংয়ের দেওয়া রণকৌশল অনুযায়ী গ্রামে নিজেদের ঘাঁটি অঞ্চল তৈরি করতে হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলতে হবে। আজমীদের কাছে শুনেছি তোমার আর্মস ট্রেনিং আছে। তুমি কি আসবে আমাদের সঙ্গে?

এসময় ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা চা নিয়ে আসেন। আনোয়ারকে বলেন : তোমাদের আর কোনো আলাপ নাই? এই নতুন বউটার সাথে এসব রাজনীতির আলাপ শুরু করে দিলে? বুঝলে লুৎফা এরা ভাইগুলো সব একত্র হলেই শুরু হয় এই প্রধান দ্বন্দ্ব, অপ্রধান দ্বন্দ্ব এসব।

আনোয়ার বলেন : না ভাবী, তাহের ভাই বলে গেলেন এসব একটু জানিয়ে রাখতে। আর তাহের ভাইয়ের বউ কি পলিটিক্সের বাইরে থাকতে পারবেন? আমি একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে রাখছি আর কি।

ফাতেমা : দেখো আবার মাথাটা তোমাদের মতো খারাপ করে দিও না।

হাসেন লুৎফা। আনোয়ারকে বলেন : তারপর তোমাদের ঐ ট্রেনিংয়ের কথা বলো।

আনোয়ার চায়ে চুমুক দিয়ে বলতে থাকেন : না ভাবী, ঐ ট্রেনিংয়ের কথা বলবার আগে আরেকটু পেছনের কথা বলতে হবে। ঐ যে বলছিলাম সিরাজ শিকদারের সাথে পরিচয় হলো, তারপর তাঁকে তাহের ভাইয়ের কথা বললাম। বললাম তাঁর চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমাদের মিল আছে এবং সময় হলে তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করব। কিছুদিন পর কলেজের পরীক্ষা দিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লাম আমরা। আমি তো ভর্তি হলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির বায়োকেমিস্ট্রিতে, রাজীউল্লাহ জিওলজিতে। ওদিকে সানীউল্লাহ চলে গেল জগন্নাথ কলেজে। যোগাযোগ একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আমাদের মধ্যে। একদিন হঠাৎ রাজীউল্লাহ এসে উপস্থিত আমার ইউনিভার্সিটি হলে। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল তোপখানা রোডের ইগলু আইসক্রিমের দোকানে। একটা টেবিলে বসে দুটো ভ্যানিলা

আইসক্রিমের অর্ডার দিল সে , দুপুর বেলা তেমন ভিড় নাই। রাজীউল্লাহ বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল 'আনোয়ার, আমাদের প্রিপারেশন শেষ হয়েছে, এখোন আমরা মাঠে নামব। আমরা যাবো টেকনাফ।' রাজীউল্লাহ বললো চিটাগাং বালুখালি টু টেকনাফ একটা রোড হবে যার প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে জয়েন করতে যাচ্ছেন সিরাজ শিকদার। তারা ঠিক করেছে ঐ পাঠচক্রের ছেলেরা জয়েন করবে তার সাথে। টেকনাফ হবে তাদের ঘাঁটি। ওখান থেকে বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ করবে এবং তাদের কানেকশনে যোগাযোগ করবে চীনের পার্টির সঙ্গে। চীন থেকে আর্মস আনবে এবং তারপর শুরু হবে গেরিলা ফাইট। দরকার হলে বার্মার আরাকানে তারা শেলটার নেবে। রাজীউল্লাহ জিজ্ঞাস করল আমি তাদের সাথে জয়েন করব কিনা।

অনেক বড় সিদ্ধান্ত। বললাম, পরদিন জানাবো। ওদের সাথে জয়েন করা মানে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া। আর পেছনে ফিরবার সুযোগ নাই। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম চলে যাবো ওদের সাথে।

লুৎফা : ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিলে?

আনোয়ার : হ্যাঁ, বিপ্লবের পোকা তো মাথায় ঢুকে আছে অনেক আগে থেকেই। মনে মনে সমসময় ভাবতাম পড়াশোনা করে কি হবে, বিপ্লব করতে হবে। একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম। সে সুযোগ পাওয়া গেল।

লুৎফা : তাহেরকে জানালে?

আনোয়ার : না, ঠিক করলাম আগে ওদের সাথে যেয়ে দেখি কি পরিস্থিতি, তারপর তাহের ভাইকে জানাবো। পরদিন রাজীউল্লাহকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। শুরু হলো টেকনাফে যাবার প্রস্তুতি। ফান্ড যোগাড় করা হলো। আমি আমার ব্যাংকে জমানো স্কুল বৃত্তির টাকা সব তুলে দিয়ে দিলাম বিপ্লবী ফান্ডে। একজন ওর মায়ের হাতের সোনার বালা এনে জমা দিল। ফান্ডের টাকা দিয়ে হাতুড়ি, শাবল, স্ক্রু ড্রাইভার, হেক স, হ্যাভারস্যাক, যেখানে সেখানে শুয়ে পড়বার জন্য ম্যাট ইত্যাদি কেনা হলো। পটকার দোকান থেকে কাঁচামাল কিনে আমি তাহের ভাইয়ের শেখানো বিদ্যায় বানিয়ে ফেললাম কয়েকটা মলোটভ ককটেল। সবাই রেডি, দুই অবাঙালি ভাই রাজীউল্লাহ আর সানীউল্লাহ তো আছেই, রাব্বি, মতি, রানা, মুজিব, এনায়েত, মুক্তা ঢাকা ইউনিভর্সিটি আর বুয়েটের এমনি আরও কজন স্টুডেন্ট মিলিয়ে মোট ১৫ জন। ট্রাঙ্কের ভেতর কিছু যন্ত্রপাতি, কয়েকটা বোমা আর মাও সে তুংএর লাল বই নিয়ে আমরা সব রেডি হয়েছি চিটাগাংএ সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দেব। পড়াশোনায় ইস্তফা, নেমে পড়ব বিপ্লবে।

চুড়ির শব্দ তুলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে লুৎফা হেসে বলেন : এভাবে বিপ্লব হয় নাকি?

আনোয়ার : শুরুটা তো এভাবেই হয় ভাবী। হো চি মিন ভিয়েতনামের পাহাড়ে অল্প কজন সঙ্গী নিয়েই ভিয়েতমিন দল তৈরি করেছিলেন।

লুৎফা : তারপর কি হলো?

আনোয়ার : যেদিন চিটাগাংঙের ট্রেন ধরবার জন্য রেডি হচ্ছি সেদিন হঠাৎ ফজলুল হক হলে দাদা ভাই এসে উপস্থিত।

লুৎফা : তুমি সাঈদের কথা বলছ?

আনোয়ার : হ্যাঁ, দাদা ভাই এসে রাজীউল্লাহর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বসে। আমি তো বাড়ির কাউকে জানাইনি। রাজীউল্লাহর সঙ্গে কথা বলে সব খবর নিয়ে নেন দাদাভাই। তারপর বলেন, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। আমি বললাম, আপনার ব্যবসা? দাদাভাই তখন কি একটা ব্যবসা করবে বলে প্যাড ট্যাড ছাপিয়েছেন।

দাদা ভাই বলেন : রাখো তোমার ব্যবসা, ঐসব ব্যবসা কইরা কি হবে। তাহের ভাই কি শুধু তোমারে ট্রেনিং দিছে, আমারে দেয় নাই? আমি যামু তোমদের সঙ্গে।

দাদাভাইও চললেন আমাদের সঙ্গে।

লুৎফা : এভাবে হুট করে এসে রওনা দিয়ে দিল?

আনোয়ার : দাদাভাই এরকমই ক্ষেপাটে মানুষ, তুমিও দেখবে। তো আমরা সব উঠে পড়লাম চিটাগাংএর ট্রেনে।

দাদাভাই বললেন : আর কাউরে না বলি, মারে একটা চিঠি লিখা দেই। বুঝলেন ভাবী মা আমাদের জীবনে অনেক বড় একটা ব্যাপার। দাদাভাই পোস্টকার্ডে লিখলেন, 'দেশের কাজে যাচ্ছি। চিন্তা করবেন না।'

লুৎফা : শুধু ঐটুকুই?

আনোয়ার : হ্যাঁ, মা ঐটুকু জানলেই খুসি হবেন আমরা জানতাম। ট্রেনের কামরায় এক বয়স্ক যাত্রী জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা সব স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছ বুঝি? আমি মনে মনে ভাবি, যদি জানতেন কোনো ট্যুরে যে যাচ্ছি!

শুনতে শুনতে আনোয়ারের এই গল্পে বেশ মজাই পেয়ে যায় লুৎফা। তাহের তখনও ফেরেননি। লুৎফা জানতে চান আনোয়ারদের টেকনাফ পর্ব।

আনোয়ার বলে চলেন : চট্টগ্রাম থেকে বাসে করে আমরা গেলাম বালুখালি। সেখানে দেখি একটা জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছেন সিরাজ শিকদার। আমাদের নিয়ে টেকনাফের পাহাড়ি জঙ্গলের দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে চলল জীপ। সবার মনে উত্তেজনা। মনে মনে সবাই তখন আমরা যেন এক একজন চে গুয়েভারা, ছুটে চলেছি বলিভিয়ার অরণ্যে। সবাই গিয়ে উঠলাম ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের গেস্ট হাউজে। আদিম প্রকৃতি, কাছেই নাফ নদী, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা কিছু স্থানীয় মানুষ, এর মধ্যে বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে উপস্থিত হলাম আমরা কয়জন। গেস্ট হাউজে শুরু হলো আমাদের যৌথ জীবন। নিয়ম করা হলো এখন থেকে আর কারো কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, সব কিছুই যৌথ সম্পত্তি। টাকা পয়সা তো বটেই শার্ট, ঘড়ি এসবও। সব কিছু এক জায়গায় থাকবে, যখন যার

প্রয়োজনমতো সেখান থেকে নিয়ে নেবে। রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করা সবই নিজেরা পালা করে করব। পরদিন থেকেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম গ্রামে।

লুৎফা : এতগুলো ছেলে যে তোমরা গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলে,নিজেদের কি পরিচয় দিলে গ্রামের মানুষের কাছে?

আনোয়ার : বলতাম আমরা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র, গবেষণা করতে এসেছি। লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে ধনী-গরিবের ব্যবধানের কথা বলতাম, বলতাম সমাজ পাল্টানোর কথা, পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার কথা। আমাদের কথা শুনে গ্রামের লোকেরা বলে আপনারা কি কাশেম রাজার লোক?

লুৎফা : কাশেম রাজা কে?

আনোয়ার : প্রথমে আমরাও বুঝতে পারিনি। পরে জানলাম নাফ নদীর ওপারেই কাশেম রাজা বলে এক লোক ছিল যে মারা গেছে কিছুকাল হলো। তাকে নিয়ে নানা কিংবদন্তি। সে ছিল অনেকটা ঐ এলাকার রবিন হুডের মতো। বড়লোকদের কাছ থেকে সম্পদ লুট করে বিলিয়ে দিত গরিবদের মধ্যে। ওদিকে আরাকানি কমিউনিস্ট গেরিলারাও মাঝে মধ্যে নাফ নদী পেরিয়ে এপারে চলে আসত আত্মগোপন করতে। এদের কাছ থেকেই স্থানীয় লোকেরা শুনেছে বিপ্লবের কথা। আমরা বরং খুশিই হলাম যে এখানকার লোকদের অন্তত এধরনের কথার সঙ্গে পরিচয় আছে। এখন দরকার এদের সংগঠিত করা। দরকার অস্ত্র। সিরাজ ভাই চেষ্টা করতে লাগলেন বার্মিজ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের।

মোক্তার বলে একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হলো আমাদের, যে নিজেকে বার্মিজ কমিউনিস্ট পার্টির আরাকান অঞ্চলের নেতা বলে পরিচয় দিল। মোক্তার প্রস্তাব দিল আমরা যেন আমাদের যা কিছু আছে সেসব নিয়ে আরাকানে গিয়ে কিছুদিন থাকি। তাতে করে আমরা ওখানকার কমিউনিস্ট গেরিলাদের কাছ থেকে আরও নানা অস্ত্র চালানো শিখতে পারব, বোমা বানাতে পারব এবং ওদের সাথে মিলে অপারেশনের পরিকল্পনা করতে পারব। সিরাজ ভাই আমাদের বললেন, তোমরা তাহলে যেয়ে দেখো অবস্থাটা, আমি পরে যোগ দেব। একদিন গভীর রাতে নৌকায় চেপে নাফ নদী পাড়ি দিলাম আমরা। সঙ্গে করে নিলাম আমাদের বোমা বানাবার সরঞ্জামগুলো। অন্ধকারে গোলাবারুদ নিয়ে ছপ ছপ বৈঠা বেয়ে আমরা পার হচ্ছি কয়জন বিপ্লবী। আমাদের গাইড মোক্তার। নাফ নদীর ওপারে নৌকা থেকে নেমে বেশ কিছুদূর হেঁটে আমরা ঢুকে গেলাম বার্মার সীমান্তের ভেতর। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। আমরা অনুসরণ করছি মোক্তারকে। একপর্যায়ে আমাদের সবাইকে পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে নিয়ে বসালো মোক্তার। একটু পরেই আসছে বলে বেরিয়ে গেল সে, সঙ্গে নিয়ে গেল আমাদের বোমার বাক্সগুলো। তারপর আমরা একঘণ্টা বসে আছি মোক্তারের আর দেখা নাই।

লুৎফা : তোমরা তো ওখানকার পুলিশের হাতেও ধরা পড়তে পারতে।

আনোয়ার : সেই ভয়েই তো ছিলাম। পরে দাদাভাই সাহস করে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলেন। দাদাভাই চিটাগাংঙে ভাষা কিছুটা পারতেন ঐ দিয়ে তাদের সাথে আলাপ করেন। ওদের কাছ থেকেই জানতে পারি যে, মোক্তার আসলে সীমান্ত এলাকার নামকরা একজন চোরাকারবারী এবং ডাকাত। আমাদের বোমার সরঞ্জামগুলো নেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। পরে এলাকার লোকেরা আমাদের সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে নৌকা করে আবার পৌঁছে দেয় নাফ নদীর এপারে।

লুৎফা : তোমাদের বিপ্লব তো তাহলে প্রথমেই ধাক্কা খেলো।

আনোয়ার : তা ঠিক। ফিরে এসে সবাই বেশ হতাশ হয়ে গেল। সিরাজ ভাই হাল ছাড়লেন না। বললেন, বার্মিজ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আমদের যোগাযোগ করতেই হবে। এবার সবাই না যেয়ে একজন আমাদের পক্ষ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাবে আরাকানে। সে সেখানে থাকবে এবং ধীরে ধীরে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের পথ খুঁজে বের করবে। আরাকানের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হলে সে সিরাজ শিকদারের পক্ষ থেকে চিঠিটা দেবে তাদের। সিরাজ ভাই আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে, তাদের সাহায্য চেয়ে একটা চিঠি লেখেন। বাংলায় লেখা চিঠিটা ইংরেজিতে অনুবাদ করল সানীউল্লাহ। ইংরেজিতে সেই সবচেয়ে ভালো। এখন কে যাবে এই চিঠি নিয়ে? কে এগিয়ে আসল জানেন? দাদাভাই।

লুৎফা : সাঈদের তো অনেক সাহস দেখা যাচ্ছে।

আনোয়ার : হ্যাঁ, ঐ মোক্তারের ঘটনা দাদাভাই যেভাবে ট্যাকল করেছেন তাতে দলের সবাই মুগ্ধ। কিভাবে কার সঙ্গে দেখা করবে কিছুই নির্দিষ্ট নেই। তবু ফররুক নামে আরাকানের মংডু এলাকার এক ছেলেকে সঙ্গে করে দাদাভাই আবার পাড়ি দিলেন নাফ নদী। এদিকে সিরাজ ভাই আমাদের বললেন আত্মগোপন করার জন্য গভীর জঙ্গলে একটা ট্রেঞ্চ তৈরি করতে। হায়দার আলী নামে এক কাঠুরিয়া আমাদের নিয়ে গেল দুর্গম জঙ্গলের ভেতরে, সেখানে পাহাড় কেটে আমরা বানাতে লাগলাম ট্রেঞ্চ, টানেল। পাহাড় কাটতে কাটতে কোনো কোনো দিন রাত হয়ে যেত। চাঁদের আলোয় দেখতাম পাহাড়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরনায় পানি খাওয়ার জন্য দল বেঁধে আসছে অজস্র বন্য হাতি। কেমন যেন অচেনা জগত মনে হতো।

বিপ্লবের নেশায় পাওয়া, নোনা দরিয়ার ডাকে সাড়া দেওয়া, চন্দ্রাহত এইসব যুবকদের গল্পে বেশ বুঁদ হয়ে যায় লুৎফা।

আনোয়ার বলে চলেন : বেশ কিছুদিন অধীর আগ্রহে থাকি আমরা সবাই। কিন্তু দাদাভাইয়ের আর কোনো খোঁজ নাই। সবাই ভাবে হয়তো দাদাভাই বার্মিজ বর্ডার ফোর্সের হাতে ধরা পড়েছে। এদিকে দলের ছেলেরা আধপেটা খেয়ে দিনের পর দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে, শাবল, কোদাল দিয়ে পাহাড় কেটে সব ক্লান্ত। দলের

অনেকেরই মনোবল ভাঙ্গতে শুরু করে। অস্ত্রশস্ত্র নাই, আরাকানের সঙ্গে যোগাযোগ নাই এভাবে আর কতদিন? আমার পরিশ্রম করার অনেক অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এরা সব অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে এত পরিশ্রম জীবনে কখনো করেনি। এরা শহরে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। সবার বাড়িতেও ইতোমধ্যে খোঁজ পড়েছে। একজন দুজন করে পালিয়ে যেতে লাগল দল থেকে। ফান্ডের টাকাতেও টান পড়তে শুরু করে। এর মধ্যে সিরাজ ভাইও এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন। তার সঙ্গে বিরোধ বাধলো কোম্পানির কন্ট্রাক্টারদের। কন্ট্রাক্টাররা সেখানে নানারকম করাপশন করছিল, সিরাজ ভাই সেগুলো বাধা দিতে গেলে গণ্ডগোল বাঁধে। এক পর্যায়ে সিরাজ ভাইও সিদ্ধান্ত নেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে যাবেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো সবাই আবার ঢাকায় ফিরে যাবে এবং আরও প্রস্তুতি নিয়ে নতুন করে সংগঠিত হবার চেষ্টা করবে।

লুৎফা : তাহলে তোমাদের বিপ্লবের ওখানেই শেষ? কিন্তু সাঈদের কি হলো?

আনোয়ার : হ্যাঁ, বলতে পারো আমাদের বিপ্লবের প্রথম তারাটা ঐ টেকনাফের জঙ্গলেই খসে পড়ল।

লুৎফা : কিন্তু সাঈদের কি হলো?

আনোয়ার : হ্যাঁ, সবাই চলে গেলেও আমি রয়ে গেলাম দাদা ভাইয়ের জন্য। ভাবলাম বিপ্লবের পথে যখন বের হয়েছি আর ফিরব না। চট্টগ্রামের ষোলশহরের আমিন জুটমিলের বস্তির এক চা দোকানে টেবিল বয় হিসেবে কাজ করলাম কিছুদিন, তারপর আবার চলে গেলাম টেকনাফ। সেখানে সেই হায়দার আলী কাঠুরিয়ার সঙ্গে মাছ মেরে, কাঠ কেটে দিন কাটাতে লাগলাম আর অপেক্ষা করতে লাগলাম সাঈদ ভাইয়ের জন্য। একদিন সত্যি সত্যি ফিরে এলেন সাঈদ ভাই আর সাথের সেই ফররুক। সেদিন খুব ঝড় বাদল। দাদা ভাইকে দেখে বুকের উপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল আমার। তার কাছে শুনলাম জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তারা ধরা পড়ে আরাকানি কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনের হাতে। তারা দাদাভাই আর ফররুককে গুপ্তচর, সিআইএ-র লোক ভাবে। গভীর জঙ্গলে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। দাদাভাই অনেক সাহসী, ওদের সাথে তর্ক করেন—কেমন কমিউনিস্ট তোমরা, বন্দীকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দাও না? পরে তারা দাদাভাইকে কথা বলার সুযোগ দেয়। উনি সবকিছু বোঝান ওদের, সিরাজ শিকদারের চিঠিটা দেন। শেষে ওরা কনভিন্সড হয়। পরে বার্মার কমিউনিস্ট সেই গেরিলাদের সঙ্গে মিলে দাদাভাই আরাকানের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ান। তখন আকিয়াব শহরের আশপাশের এলাকা পুরোপুরি কমিউনিস্টদের দখলে। সেখানকার গ্রামবাসীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমিউনিস্ট গেরিলাদের খাবার দাবার টাকা পয়সা দিচ্ছে। এসব দেখে দাদাভাই খুব উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে আসেন। বার্মিজ কমিউনিস্টরা সহযোগিতা করবে তেমন প্রতিশ্রুতিও দেয় তাকে। কিন্তু এদিকে তো সব ওলটপালট হয়ে গেছে। দাদাভাই খুব হতাশ হলেন। শেষে

আমরা ঠিক করলাম ঢাকায় ফিরব। হাতে ট্রেন ভাড়ার টাকাও নাই। আমার হাতঘড়িটা বিক্রি করলাম, ঐ টাকা দিয়ে টিকিট কিনে চলে এলাম ঢাকায়। অনেকদিন পর দেখা হলো তাহের ভাই, ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে।

লুৎফা বলে : তোমরা যে এতসব কাণ্ড করে ফিরলে তোমাদের কেউ কিছু বলল না?

আনোয়ার : অনেক দিন চুল, দাঁড়ি না কেটে অদ্ভুত চেহারা হয়েছিল আমার। তাহের ভাই দেখে বললেন, আনোয়ার তো দেখি পুরোদস্তুর গেরিলা হয়ে গেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা শুনতে চাইলেন। না উনি রাগ করলেন না, বললেন, তাকে বলে গেলে ভালো হতো। সিরাজ শিকদারের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। আমাকে বললেন ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যেতে, দাদাভাইকেও ব্যবসা শুরু করতে বললেন। বললেন সময় মতো আবার মাঠে নামা যাবে। প্রায় এক বছর পর আবার ঢুকলাম বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে। দাদাভাইকে কিন্তু বিপ্লবের নেশা ছাড়ল না। উনি আবার কাউকে না জানিয়ে গোপনে বর্ডার ক্রস করে চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানে তখন নকশালবাড়ি বিপ্লবীদের তোড়জোড়। দাদাভাই তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, জেলও খাটলেন।

রান্নাঘর থেকে ফাতেমা আসেন এক ফাঁকে। বললেন, রান্না করতে করতে আমিও শুনছিলাম। আনোয়ারের এসব কাহিনী এত ডিটেইল কিন্তু আমিও জানতাম না। লুৎফা বুঝতেই পারছো কাদের মধ্যে এসে পড়েছ।

লুৎফা বলে : ওদের ঐ ট্রেনিং এর গল্প তো এখনও শুনলাম না।

আনোয়ার : হ্যাঁ এবার ঐ পর্যায়েই আসছিলাম।

ফাতেমা : এই পর্বটা আমি ভালোই জানি। সব তো হলো আমার বাসাতেই।

ফাতেমা আবার চলে যান রান্নাঘরে।

আনোয়ার বলেন : টেকনাফ থেকে ফিরে তো সব যার যার মতো ব্যস্ত হয়ে গেল। রাজীউল্লাহর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। সে আমাকে জানাতো যে ঢাকার বাইরেও ওরা সংগঠন করছে। ইতোমধ্যে তো আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান রিজাইন করল। একদিন রাজীউল্লাহ এসে বলল আমাকে আবার সিরাজ ভাই দেখা করতে বলেছেন। দেখা করলাম তার সঙ্গে। উনি বললেন মানুষ এখন অনেক জঙ্গি হয়ে উঠেছে, মানুষ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা বলছে, এ সুযোগটা আমাদের নিতে হবে। তুমি আবার একটা ঘাঁটি এলাকা ঠিক করো, আমরা আবার শুরু করব। এবার টেকনাফ না, চলে যাও বান্দরবান। আমাদের ঐদিকটাই থাকতে হবে কারণ আমাদের শেলটারের জায়গা সবসময় হবে বার্মা।

এবার ঠিক করলাম সেজ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো সিরাজ শিকদারের। পুরো প্ল্যানিংএ তাহের ভাইকেও ইনভলব করব। উনি তখন চিটাগাং ক্যান্টনমন্টে। দুজনের সাথে কথা বলে ঠিক করলাম মিটিং হবে তাহের ভাইয়ের বন্ধু চট্টগ্রাম সরকারি সায়েন্স ল্যাবেরেটরির ফার্মাকোলজিস্ট ড. হাইয়ের বাসায়।

তার বাসা চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কাছেই, আর নিজেও তিনি কমিউনিস্ট। সেখানে দেখা হলো তাহের ভাই আর সিরাজ ভাইয়ের। একজন ইঞ্জিনিয়ার কমিউনিস্ট একজন আর্মির কমিউনিস্ট। অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ হলো তাদের মধ্যে। দুজনের চিন্তার অনেক মিল। দুজনেই অনেকদিন থেকে একটা আর্মস রেভ্যুলেশনের কথা চিন্তা করছেন। দেশের পরিস্থিতি তখন উত্তপ্ত। সিরাজ শিকদারের প্রথম উদ্যোগটা ফেইল করেছে। তিনি আবার কিছু ছেলে নিয়ে একটা আর্মস স্ট্রাগল শুরু করতে চান। তারা ঠিক করলেন এবার আরও ওর্গানাইজডভাবে এগোবেন। সিরাজ ভাইয়ের পাঠচক্রের বাইরের ছেলেদেরও নেওয়া হবে। তাহের ভাই তাদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দেবেন আর সিরাজ শিকদার দেবেন পলিটিক্যাল ট্রেনিং। বলতে পারো একজন মাও সে তুং আরেকজন মার্শাল চুতে, কিংবা ধরো একজন হো চি মিন আরেকজন জেনারেল গিয়াপ। একজন 'পলিটিক্যাল কমিশার', আরেকজন 'মিলিটারি কমিশনার'। ঠিক হলো তাহের ভাই ট্রেনিং মডিউল তৈরি করবেন এবং তারপর একটা লম্বা ছুটি নিয়ে এসে ট্রেনিং দেবেন ছেলেদের।

সিরাজ শিকদার তাহের ভাইকে বললেন, আপনার দিক থেকে রিস্কগুলো ভেবে রেখেছেন তো? আর্মিতে কোনোভাবে যদি ইনফরমেশন যায়!

তাহের ভাই বললেন, তাহলে ডেফিনিটলি আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নেওয়া হবে। রিস্ক নেব বলেই তো এখানে এসেছি। আই হ্যাভ বিন প্রিপিয়ারিং মাইসেলফ অল মাই লাইফ জাস্ট ফর দিস।

ইতোমধ্যে আমি ঘুরে এলাম বান্দরবান। বাসে চড়ে, পায়ে হেঁটে পৌঁছালাম বান্দরবানের রুমার মুরং পাড়ায়। ওখানে পৌঁছে মনে হলো টাইম মেশিনে চড়ে পিছিয়ে গেছি কয়েক শ বছর, চোখের সামনে যেন লুই মর্গনের সেই আদিম সমাজ। নারী পুরুষরা সব পাহাড়ে জুম চাষ করে ফলাচ্ছে জঙ্গলি ধান, কাউন, পাহাড়ের উপত্যকা থেকে সংগ্রহ করছে ফল, সবজি, ঘরে শুকর। গায়ে সামান্য পোশাক। শামুক, ঝিনুক, সাপ, ব্যাঙ, পোকা সবই খাচ্ছে। আমি মুরংদের বলি আপনাদের ভাষায় বলেন তো 'দুনিয়ার গরিব এক হও', তারা বলে 'বক বক নারাই মরিছা লক'। ঠিক হয় ঐ মুরং পাড়াই হবে আমাদের ঘাঁটি এলাকা। সেখানে প্রাথমিক কিছু সাংগাঠনিক কাজ সেরে ফিরে আসি। তাহের ভাইও ইতোমধ্যে আর্মি থেকে মাস দুয়েকের ছুটি নিলেন।

এসময় তাহের ঢোকেন ঘরে। বলেন : কি আনোয়ার তোমার ভাবীকে হিস্ট্রি সব শোনালে?

আনোয়ার : এতক্ষণ টেকনাফের হিস্ট্রি শোনাচ্ছিলাম। কেবল শুরু করছিলাম ট্রেনিংয়ের কথা।

তাহের লুৎফাকে বলেন : কি মনে হচ্ছে?

লুৎফা : কি আর মনে হবে? ঐ যে ইউসুফ ভাই বলেছিলেন, আমার বিপদ আছে, তাই মনে হচ্ছে। ট্রেনিংয়ের গল্প তো এখনও শুনিই নাই।

তাহের : ট্রেনিং তো শুরু করলাম এখানেই। এই বাসাতেই। এই তো কিছুদিন আগেই।

লুৎফা : এই বাসাতে? ইউসুফ ভাই রাজি হলেন?

তাহের : রাজি কি, উনিই আমাকে বললেন, ট্রেনিংএর ভেন্যু নিয়ে ভাববে না। আমার বাসাতেই ট্রেনিং হবে।

লুৎফা : এরকম ছেলেরা সব ট্রেনিং নিতে আসছে লোকজন সব জেনে যাবে না?

আনোয়ার : ভাবী আমরা কঠোর গোপনীয়তা মেনে চলতাম। যাতে কেউ টের না পায় সেজন্য আমরা ছোট ছোট গ্রুপে ট্রেনিং করতাম, একসাথে ৪/৫ জনের বেশি না। দিনে বেশ কতকগুলো ব্যাচে ট্রেনিং হতো।

লুৎফা : কিসের ট্রেনিং দিতে তোমরা?

তাহের : সিরাজ শিকদার তার পলিটিক্যাল থিসিস তুলে ধরত। এ মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে সায়ত্ত্বশাসনের দাবির চাইতে সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রাম কেন জরুরি, আওয়ামী লীগ কিংবা চীনাপন্থী বা মস্কোপন্থীদের সঙ্গে কোথায় আমাদের পার্থক্য ইত্যাদি আলোচনা করে বোঝাতো। আর আমি আলোচনা করতাম বিপ্লবের মিলিটারি দিকটা নিয়ে। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন হাতিয়ার দিয়ে কি করে শত্রুকে কাবু করা যায় এসব। শেখাতাম কি করে বোমা বানাতে হয়। আনোয়ার পুরো ট্রেনিংটা কো-অর্ডিনেট করত।

লুৎফা : ভালোই তো, তুমি ট্রেনিং দিচ্ছ, ইউসুফ ভাই বাসা ছেড়ে দিচ্ছে, আনোয়ার ট্রেনিংয়ের দেখা শোনা করছে, বেশ তোমরা ভাইরা ভাইরাই তো সব।

আনোয়ার : ট্রেনিং কিন্তু খুব ভালোই চলছিল। সেজো ভাইয়ের সেশনগুলো ছেলেরা খুবই পছন্দ করত।

লুৎফা : কিন্তু এভাবে আর্মি থেকে এসে গোপনে ট্রেনিং দিচ্ছ। এতগুলো সব অচেনা ছেলে, কেউ যদি ফাঁস করে দিত।

তাহের : তা ঠিক, রিস্ক তো ছিলই। কিন্তু এসব কাজে রিস্ক তো ইনএভিটেবল। রিস্ক নিতেই হবে। কেউ ফাঁস করে দিলে ফায়ারিং স্কোয়াডে যেতে হতো আমাকে। কিন্তু কিভাবে মারা যাবো এই নিয়ে চিন্তা করলে তো আর বিপ্লব করা যাবে না কোনোদিন। আর সেকেন্ডলি মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে। মানুষকে বিশ্বাস না করলে কিছুই করা সম্ভব না। কিন্তু সমস্যাটা তো হলো অন্য জায়গায়। সিরাজ বলল, এই ট্রেনিং সে চালাবে না।

লুৎফা : কেন?

আনোয়ার : আমি যেহেতু ট্রেনিংটা কো-অর্ডিনেট করছিলাম একদিন আমাকে ডেকে সিরাজ ভাই বললেন, এই ট্রেনিং আর চালাবো না। আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন? উনি এক অদ্ভুত কথা বললেন। বললেন, তাহের একজন পেটি বুর্জুয়া আর্মি অফিসার, তার কাছ থেকে ছেলেরা বিপ্লবের ট্রেনিং নিতে পারে না। তাহের ভাইকে এখনই আর্মি ছেড়ে দিতে হবে, তা না হলে তার সঙ্গে আমি ট্রেনিং করব না। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, বললাম, এটা কেমন কথা বলছেন আপনি, তাহের ভাই এখনই কি করে আর্মি ছেড়ে দেবে, আমাদের তো কিছুই রেডি হয়নি।

লুৎফা : সিরাাজ সিকদার হঠাৎ এমন বললেন কেন?

আনোয়ার : আসলে ঐ যে আপনি বলছিলেন পুরো ট্রেনিংটায় আমাদের ভাইদের একটা প্রাধান্য ছিল। ইউসুফ ভাইয়ের বাসায় ট্রেনিং হচ্ছে, তাহের ভাই স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব পপুলার হয়ে উঠেছে, আমি পুরো ট্রেনিংয়ের ম্যানেজমেন্ট করছি এতে হয়তো সিরাজ ভাই মনে করছিলেন লিডারশিপটা তার হাত থেকে সরে যাচ্ছে, তিনি সেটা চাচ্ছিলেন না।

তাহের : সিরাজ আমাকে পেটি বুর্জুয়া বলে একটা থিওরিটিক্যাল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমি কি কারণে আর্মিতে গেছি তার সে কতটুকু জানে? আর আমি যদি পেটি বুর্জুয়া হই সে কি? আমি গেছি আর্মিতে, সে পড়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং। আর সে মুহূর্তে আমি যদি আর্মি ছেড়ে দিতাম তাহলেও বা কি লাভ হতো? আসলে এই পারস্পরিক সন্দেহ, লিডারশীপ নিয়ে দ্বন্দ্ব এসব আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির কালচারেরই একটা অংশ। এসব অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে কত হত্যা, খুন হয়ে যায়। যাহোক, আমি আলাপ করতে চাইলাম তার সঙ্গে, কিন্তু সে রাজি হলো না।

আনোয়ার : আমি সিরাজ ভাইকে গিয়ে বললাম যে তাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমি মনে করি যে তার এধরনের সিদ্ধান্ত হঠকারী।

তাহের : যাহোক বন্ধ করে দিতে হলো ট্রেনিং। একটা দারুণ চান্স আমরা মিস করলাম। লাইফে একটা বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম, কিন্তু তা কাজে লাগল না। সিরাজ যদি কখনো তার চিন্তা বদলায় হয়তো আবার তার সঙ্গে কাজ করা হবে। লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছিলাম, ছুটির অর্ধেক শেষ না হতেই এই ঝামেলা বাঁধল।

কথার এই পর্যায়ে আবার যোগ দেন ফাতেমা । বুঝলে লুৎফা ওদের বিপ্লব যখন হলো না আর তাহেরের ছুটি যখন আরও বাকি তখন আমি ওদের ঠেলে পাঠিয়ে দিলাম ঈশ্বরগঞ্জে তোমাদের বাড়িতে। বিপ্লবীরা কি বিয়ে করে না? তোমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা আলাপ হচ্ছিল আগে থেকেই। এই সুযোগে সেটা পাকা করা গেল। যাহোক আমার রান্না রেডি, খেতে আস সবাই। আর খেতে বসে কোনো পলিটিক্সের আলাপ হবে না, সারাদিন অনেক পলিটিক্সের আলাপ হয়েছে। আর তাহের, লুৎফা তোমরা দুজন আজকে মধুমিতায় ইভিনিং শো দেখে আস।

বিকেলে মধুমিতা হলে সিনেমা দেখতে যায় দুজন। অন্ধকারে বসে সিনেমার পর্দার দিকে তাকিয়ে লুৎফা ভাবে অন্য কথা। সত্যিই এক বিচিত্র পরিবারের ভেতর এসে পড়েছে সে। এক ভাই ইউনিভার্সিটির পড়াশোনা ছেড়ে বিপ্লব করবে বলে টেকনাফের পাহাড়ে আস্তানা গাড়ে, আরেক জন ব্যবসার কাগজপত্র ফেলে ঘুরে বেড়ায় বার্মার জঙ্গলে, এক ভাই আর্মির ভেতরে থেকে লুকিয়ে এসে বোমা বানানো শেখায় অচেনা তরুণদের, আরেক জন তার বেডরুম ছেড়ে দেয় গেরিলা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য।

লুৎফার তখনও জানবার কথা নয় যে সামনেই যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে তখন এই সবকটি ভাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে যুদ্ধে, এদের সঙ্গে যোগ দেবে ছোট দুই ভাই বেলাল, বাহার, আর দুই বোন ডালিয়া এবং জুলিয়াও। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতির নাটকীয়তম ঘটনাটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়বে এই গোটা পরিবার। আসাম বাংলার স্টেশনে স্টেশনে বেড়ে ওঠা এই পরিবারটির দিকে এবার লক্ষ করা যাক।

ধুলায় ঈষৎ ঢাকা মহিলাটি

দৃশ্যটি ডালিয়ার খুব মনে পড়ে। শ্যামগঞ্জ স্টেশনে নেমে তারা হেঁটে যাচ্ছেন কাজলা গ্রামের দিকে। মাইল তিনেক পথ, কোনো যানবাহন নেই, হেঁটে যাওয়াই নিয়ম তখন। গ্রামের রাস্তার ধুলা উড়িয়ে তারা লাইন ধরে হাঁটছেন। সবার আগে মা। ছোটখাটো মানুষ, ঘাড়টা সামান্য কাত করে হন হন করে হেটে যাচ্ছেন তিনি। কাজলা পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত একবারও থামছেন না। কোনো মহিলাকে ডালিয়া এত একাগ্রতার সঙ্গে এত দ্রুত হাঁটতে দেখেননি কোনোদিন। ধুলায় ঈষৎ ঢাকা ঐ ছোটখাটো মহিলাটিকে আমাদের লক্ষ রাখা দরকার। একটি একনিষ্ঠ পাখির মতো একটু একটু করে ছানাদের তিনি মুখে পুরে দিয়েছেন অলৌকিক মন্ত্র। সে মন্ত্র বুকে নিয়ে তারা ছানারা সব উড়ে গেছে অসম্ভবের দেশে।

ব্রিটিশ রেলের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া তার মেয়ে আশরাফুন্নেসাকে বিয়ে দিয়েছিলেন লাকসামের আলী আশরাফের সঙ্গে। একটা ছেলেও হলো সে ঘরে। নাম রাখা হলো হিরু, ভালো নাম আরিফুর রহমান। আরিফের বয়স যখন সাত আট মাস তখন আলী আশরাফকে টাইফয়েডে ধরল। টাইফয়েড তখন এক ভুতুড়ে রোগ। পৃথিবী তখন স্যালাইন দেখেনি, এন্টিবায়টিক দেখেনি। আলী আশরাফ মারা গেলেন। শুরুতেই ব্যর্থ হয়ে গেল আশরাফুন্নেসার সংসারের স্বপ্ন। শিশু আরিফকে নিয়ে আশরাফুন্নেসা চলে এলেন বাবার কাছে আসামের বদরপুরে। বিধবা মেয়েটিকে দেখে বুক ভেঙ্গে আসে ইউনুস মিয়ার। আসামের গভীর অরণ্য চারপাশে। সুর্য ডুবলেই কেমন নিঝুম হয়ে আসে চারদিক। হরিণেরা উঠানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক রাতে বাঘ এসে ঘরের দেয়ালে গা ঘষে। গভীর রাতে ঘটং ঘট,

ঘটং ঘট শব্দ করে লম্বা মালগাড়ি যায়। হরিণেরা দৌড়ে পালায়। বোন মরিয়মন্নেসার সঙ্গে মিলে আরিফের দেখাশোনা করতে থাকেন আশরাফুন্নেসা।

একদিন বদরপুর রেলস্টেশনে চাকরি নিয়ে আসেন নেত্রকোণার তালুকদার বাড়ির ছেলে মহিউদ্দীন আহমেদ। ইউনুস মিয়ার নিস্তরঙ্গ আরণ্যক জীবনে একটা মৃদু ঢেউ ওঠে যেন। খানিকটা লাজুক, সুদর্শন মহিউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে বেশ আড্ডা জমে ইউনুস মিয়ার।

ইউনুস মিয়া জিজ্ঞাসা করেন : তোমার দাদারা তাহলে তালুক পেয়েছিলেন দুর্গাপুরের মহারাজার কাছ থেকে?

মহিউদ্দীন : হ্যাঁ ঐ পূর্বধলা থানার কাজলাসহ গোটা তিনেক গ্রাম পেয়েছিলেন তারা।

ইউনুস : তা তুমি বাবা নামের শেষে তালুকদার লাগাও না কেন?

মহিউদ্দীন : না, ঐ পদবি বাদ দিতে চাই। আমি তো আর তালুকদার না। তাছাড়া খাজনা তোলার ব্যাপারে দাদাদের যেসব কীর্তি কাহিনী শুনি তাতে ঐ পদবি ব্যবহার করতে লজ্জাই হয়।

মহিউদ্দীনদের পূর্বপুরুষের তালুক অনেক আগেই ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে পৌঁছেছিল। মহিউদ্দীনের বাবার তেমন বিশেষ সম্পত্তিও ছিল না। মহিউদ্দীন এন্ট্রান্স পাস করার পর হঠাৎ মারা গেলেন তার বাবা। অকালমৃত্যু তখন নেহাত আটপৌড়ে ব্যাপার। মহিউদ্দীনের আর পড়াশোনা হলো না। জমি জিরেতের ওপরও ভরসা করার উপায় রইল না। চাকরি খুঁজতে হলো একটা। ব্রিটিশ ভারতে চাকরির কটাই বা সুযোগ? খুঁজতে খুঁজতে মিলল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের একটা চাকরি। শর্ত এই, চাকরি দেওয়া হবে কিন্তু চার বছর কোনো বেতন দেওয়া হবে না। তাই সই। বছর চারেক বাবার সম্পত্তি দিয়ে চালিয়ে নিতে পারবে মহিউদ্দীন। তালুকদার বাড়ির প্রথম একজন সদস্য কৃষি জীবন ছেড়ে শুরু করল চাকরি জীবন। মহিউদ্দীনের প্রথম পোস্টিং হলো বদরপুরে। বিদেশ বিভুঁইয়ের ঐ জঙ্গলাকীর্ণ জনপদে মহিউদ্দীনের স্বস্তির আশ্রয় হলো ইউনুস মিয়া আর তার পরিবার।

মহিউদ্দীন যখন ইউনুস মিয়ার সঙ্গে গল্প করেন তখন প্রায়ই বাচ্চার দুধের বাটি হাতে দ্রুত উঠান পেরিয়ে যান আশরাফুন্নেসা। এই কিশোরী বিধবাকে দেখতে দেখতে বাঘ, হরিণ আর ধাতব ট্রেনের প্রেক্ষাপটে মহিউদ্দীনের মনে একটা ইচ্ছা ফুল ফুটে উঠতে থাকে ক্রমশ। দিন যায়। দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে মহিউদ্দীন ইউনুস মিয়াকে একদিন বলে বসেন : আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি আশরাফুন্নেসাকে বিয়ে করতে চাই।

নিভৃত ঐ জনপদে বিষণ্ন এক বালিকার মুখ বুঝিবা বিহ্বল করেছিল সারা জীবনই চুপচাপ, লাজুক মানুষ মহিউদ্দীন আহমেদকে। সাহসের সঙ্গে মেয়ের

বাবার কাছে নিজেই বিয়ের এই প্রস্তাব রাখা মহিউদ্দনের স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। অবাক হন ইউনুস মিয়া কিন্তু বুক থেকে একটা পাথর নেমে যায় তার।

এইটুকুই বুঝি দরকার ছিল আশরাফুন্নেসার। একটা পাটাতন। তারপর তার সেই ঘাড় একটু বাঁকিয়ে হন হন করে কেবলই এগিয়ে যাওয়া। একবারও পেছনে না তাকানো। বদরপুর ছেড়ে তারপর স্টেশন মাস্টার স্বামীর সঙ্গে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে। সমান্তরাল রেললাইন, ট্রেনের হুইসেল, লাল ইটের দালান কোন মন্ত্রবলে তার জীবনের অনিবার্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। আরিফসহ এগারোটি সন্তানের জন্ম দিলেন আশরাফুন্নেসা। সবাই প্রায় পিঠাপিঠি। একটি মারা গেল অল্প বয়সে। দশটি সন্তানের একটি সংসার রীতিমতো একটা প্রতিষ্ঠানের মতো করে গড়ে তুললেন আশরাফুন্নেসা।

সব ছেলে মেয়েদের বেশ মনে আছে বাবা মা দুজনেই খুব ভোরবেলা উঠতেন। তারা সবাই তখন বিছানায়। বিছানায় আধো ঘুমের মধ্যে তারা শুনছে মা অবিরাম নিচুস্বরে বাবাকে শাসন করে যাচ্ছেন। 'আপনি এত পরিশ্রম করেন কেন?' 'এত বেশি চা খান কেন?'। বাবা স্টেশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে একটা চায়ের কাপে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছেন। তার মুখে প্রশান্তি। যেন তিনি এই বকা বেশ উপভোগ করছেন। ছেলে মেয়েরা ঘুম থেকে উঠলে চালু হয়ে যাবে চাকা। সব কিছু রুটিন করে দেওয়া। আজ সোমবার, অতএব—

শেলী অর্থাৎ সালেহা রুটি বেলবে।
হীরু অর্থাৎ আরিফ কুয়ো থেকে পানি তুলবে,
মন্টু অর্থাৎ ইউসুফ হাঁস মুরগি আর কবুতরের খোপ খুলে দেবে,
নান্টু অর্থাৎ তাহের গরুকে খৈল দেবে,
খোকা অর্থাৎ সাঈদ গোয়াল ঘর পরিষ্কার করবে,
মনু অর্থাৎ আনোয়ার উঠান ঝাড়ু দেবে,

মঙ্গলবার অন্যের দায়িত্ব অদল বদল হবে। এভাবে চলবে প্রতিদিন। স্কুলে যাবার আগে এবং পরে প্রতিটা ছেলেমেয়ের জন্য বরাদ্দ আছে নির্দিষ্ট কাজ। সংসারে যারা পরে এসেছে, বেলাল, বাহার, ডালিয়া, জুলিয়া কেউই বাদ যায়নি এ নিয়ম থেকে। তার সন্তান বাহিনীর কাজ কঠোরভাবে তদারকী করেন আশরাফুন্নেসা। বন্ধুরা ডাকছে মাঠে খেলার জন্য কিন্তু ঘর ঝাড়ু দেওয়া না হওয়া পর্যন্ত কোথাও নড়া যাবে না, গরুর খৈল দেওয়া না পর্যন্ত অন্য কোনো কাজ করা চলবে না। কত কত পয়েন্টসম্যান স্টেশনে, স্টেশন মাস্টার বাবুর যে কোনো কাজ করে দেবার জন্য দুই হাত, পা বাড়িয়ে আছে তারা। কিন্তু না আশরাফুন্নেসা সরকারি কোনো লোক নিজের বাড়ির কাজে লাগাবেন না।

স্টেশন থেকে ফিরে মহিউদ্দীন আহমেদও হাত লাগান ঘরের কাজে। ছেলে মেয়েদের চোখে এখনও ভাসে বাবা দূরের মাঠ থেকে মাথায় ঝাঁকা ভর্তি করে গরুর জন্য ঘাস কেটে আনছেন, হাতে কাঁচি। মহিউদ্দীন আহমেদের ছিল সবজি

বাগানের শখ। যে স্টেশনেই যেতেন, স্টেশনের আশপাশে পতিত জায়গার অভাব হতো না। মহিউদ্দীন আহমেদ সেখানে শুরু করে দিতেন নানা রকম সবজির চাষ। আলু, মটর, কালাই, পেঁয়াজ। সহযোগী তার ছেলেমেয়েরা, কেউ নিড়ানি দিচ্ছে, কেউ আগাছা সাফ করছে, কেউ সার দিচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই মাটির তলায় পুষ্ট পুষ্ট আলু। তারপর দল বেঁধে মাটির তলা থেকে আলু তোলা, আলুর গায়ে লেগে থাকা মাটি পরিষ্কার করা। যেন এক উৎসব।

এক স্টেশনে বছর তিনেক পার হলেই আশরাফুন্নেসা ছেলেমেয়েদের বলেন, আমার পা চুলকাচ্ছে, তোদের বাবা আবার বোধহয় বদলি হবেন।

ব্যাপারটা তাই হতো। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যেত বদলির অর্ডার এসে হাজির হয়েছে। হয়তো আসাম সিলেট সীমান্তের জুড়ি স্টেশন থেকে টিলাগাও স্টেশন। পরিচিত জায়গা ছেড়ে যেতে চাইত না ছেলেমেয়েরা। বলত : বদলিটা ঠেকানো যায় না আব্বা? না, মহিউদ্দীন আহমেদ বদলি ঠেকানোর কোনো চেষ্টাই করতেন না। ছেলেমেয়েদের বলতেন—মন্দ কি? নতুন নতুন জায়গা দেখবে তোমরা।

ছেলেরা বায়না ধরত : বদলি যদি হতেই হয় তাহলে একটা বড় কোনো জংশনে বদলি হলেই তো ভালো?

মহিউদ্দীন আহমেদের তাতেও আগ্রহ নেই। বলতেন, বড় স্টেশনে অনেক ঝামেলা, আমি নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চাই।

বদলির অর্ডার এলে নেমে পড়তেন বদলির আয়োজনে। ওয়াগনে মালপত্র উঠানো শুরু হতো, সঙ্গে গরু, ছাগল, মুরগী, কবুতর সব। গরুকে রেলের ওয়াগনে উঠানো মহাঝক্কি। মাচা বানিয়ে তারপর উঠাতে হয়। সেসব নিয়ে ছেলে মেয়েদের বিপুল উত্তেজনা। সবাই মিলে ওঠে পড়ে ওয়াগনেই। খুবই ধীর গতিতে চলে ওয়াগন। ২/৩ দিন ধরে চলে তবে পৌঁছায় গন্তব্যে। পথে পথে থেমে বাজার ঘাট হয়, খাওয়া দাওয়া হয়। একবার তো ওয়াগনের ভেতরেরই গাভীর বাচ্চা প্রসব হয়ে গেল।

নতুন স্টেশনে গিয়ে মহিউদ্দীন আহমেদ আবার ছেলেমেয়েদের নিয়ে নেমে পড়েন আশপাশের জমি সাফ করায়, কোদাল দিয়ে কুপিয়ে চাষ উপযোগী করায়। তারপর শুরু হয় ঋতু অনুযায়ী নানা শস্য আর সবজির চাষ। শীতকাল এলে কাছের শহর থেকে কিনে আনেন র‍্যাকেট আর কর্ক। কোয়ার্টারের সামনের খালি জায়গায় কোর্ট কেটে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলে ব্যাডমিন্টন খেলেন। মাটি, প্রকৃতি আর তার সন্তানদের নিয়ে তার নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। ৫০, ৬০ দশকজুড়ে আসাম, বাংলা এলাকার নানা অখ্যাত স্টেশনে স্টেশন মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেছেন মহিউদ্দীন আহমেদ। নিজের পেশায় ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। সততার জন্য একবার ব্রিটিশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন স্বর্ণপদক।

নতুন স্টেশনে গিয়ে আশরাফুন্নেসাও ফিরে যান পুরনো নিয়মে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেন গৃহাস্থালির কাজ। এভাবে শ্রম বিভাজন করার কারণে আশরাফুন্নেসা আর মহিউদ্দীন আহমেদের পক্ষে দশ সন্তানের বিশাল পরিবারের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছিল বটে কিন্তু এতে করে অলক্ষে সন্তানদের হয়ে যাচ্ছিল কঠোর নিয়ামনুবর্তিতার প্রশিক্ষণ, হচ্ছিল প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ, কেটে গিয়েছিল কায়িক শ্রম নিয়ে শিক্ষিত মানুষের প্রচলিত দূরত্বের বোধ। কৈশোরের এই প্রস্তুতি তাদের সবাইকে দিয়েছে বৃত্ত ভাঙ্গার সাহস।

রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলোর যে পরিসর তাতে মহিউদ্দীন আহমেদের এত বড় পরিবারের জায়গা হতো না। তিনি নতুন স্টেশনে গিয়ে একটা বাড়তি ঘর বানিয়ে নিতেন যাতে লম্বা একটা বারান্দা থাকত, নিয়ম ছিল সব ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যে হলেই সে বারান্দায় লাইন করে পড়তে বসবে। পড়তে হবে শব্দ করে জোরে জোরে যাতে আশরাফুন্নেসা অন্য ঘর থেকে শুনতে পান। প্রতি সন্ধ্যা তাই মহিউদ্দীন আহমেদের রেলওয়ে কোয়ার্টার সরগরম হয়ে উঠত অনেক ছেলেমেয়ের পড়ার শব্দে। আশরাফুন্নেসার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি দূর ছিল না, পড়েছিলেন প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত কিন্তু তার পড়বার আগ্রহ, জানার আগ্রহ ছিল প্রবল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে পড়ার নেশা সবচেয়ে বেশি নান্টু অর্থাৎ তাহেরের। ক্লাসের বই নয় সে পড়ে বাইরের বই, যার নাম তখন 'আউট বই'। আশরাফুন্নেসার নজর ঐ আউট বইগুলোর দিকে। তাহের একটু বড় হয়ে হোস্টেলে চলে গেলে আশরাফুন্নেসা ফরমাস করতেন : নান্টু, ছুটিতে আসবার সময় আমার জন্য অবশ্যই কয়টা আউট বই আনবি।

তাহের প্রতিবার মনে করে বই আনেন মার জন্য। সব রাজনীতি আর স্বদেশপ্রেমের বই। সব কাজ শেষ হলে রাতে আশরাফুন্নেসা হারিকেন জ্বালিয়ে আলোর কাছে মেলে ধরেন সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর বই 'ভাগনা দিহীর মাঠে' কিম্বা স্বদেশী আন্দোলনের উপর লেখা 'কাঞ্চনজংঘার ঘুম ভাঙ্গছে'।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে আহ্লাদ, আদিখ্যেতা একদম অপছন্দ আশরাফুন্নেসার। একদিন বটিতে পা কেটে বেশ রক্ত ঝরছে বেলালের। ভয় পেয়ে হাউ মাউ করে কাঁদছে বেলাল। আশরাফুন্নেসা মোটেও বিচলিত নন। তিনি একবারও বাবা আমার, সোনা আমার এসব করবেন না। ক্ষতস্থান ধুয়ে, গাঁদা পাতা ছেঁচে পট্টি দিয়ে বেঁধে দেন তিনি। বলেন, কান্নাকাটির কিছু নাই, যা খেলতে যা, একটু পরেই ভালো হয়ে যাবে।

ডালিয়া, জুলিয়াকে ৫/৬ বছর বয়সেই তিনি ভর্তি করে দিয়েছিলেন ভারতেশ্বরী হোমসের হোস্টেলে। বলতেন, নিজের মতো থাকতে শিখুক।

ছুটি শেষ হলে ডালিয়া, জুলিয়া যেতে চাইত না হোস্টেলে। আশরাফুন্নেসা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে ওদের বলেন : নো ক্রাইং। মার্চ করতে করতে চলে যাবি স্কুলে, একদম পেছনে তাকাবি না।

মনু অর্থাৎ আনোয়ার তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। ছুটি হয়েছে। আশরাফুন্নেসা বললেন : কাজলায় চলে যা, ধান উঠেছে , কামলাদের মাড়াইয়ে সাহায্য কর।

আনোয়ার এর আগে একা কখনো ময়মনসিংহ থেকে কাজলায় যায়নি। আশরাফুন্নেসা বললেন : পথ চিনে চিনে চলে যাবি।

মহিউদ্দীন আহমেদ সাবধানী মানুষ। বলেন : এতটুকু ছেলে , রাস্তা হারিয়ে টারিয়ে ফেলে কিনা?

আশরাফুন্নেসা বলেন : এতটুকু ছেলে কোথায়? রাস্তা হারালে খুঁজে নেবে। একা চলতে হবে না?

এরকমই ছিলেন আশরাফুন্নেসা। সন্তানকে আগলে রাখা বাঙালি মায়েদের পরিচিত চেহারার সঙ্গে কোনো মিল নেই তার। টিলাগাঁও স্টেশনে থাকতে একবার কাছাকাছি এক জায়গায় আসাম থেকে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন মাওলানা ভাসানী। খোকা অর্থাৎ সাঈদ তার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কাউকে না জানিয়ে চলে যায় সেই বক্তৃতা শুনতে। সন্ধ্যায় তাদের খোঁজ পড়ে। না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে দুই পরিবার। কে একজন বলে দুজনকে লোকাল ট্রেনে উঠতে দেখেছে। খোকার বন্ধুটির বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন প্ল্যাটফর্মে। মহিউদ্দীন আহমেদ স্টেশনে খোঁজ নিতে গেলে আশরাফুন্নেসা বাধা দেন : বস তো। ও ঠিকই চলে আসবে।

বেশ রাতে লোকাল ট্রেনে বক্তৃতা শুনে ফেরে দুজন। খোকার বন্ধুটির বাবা বন্ধুটিকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকেই পেটাতে পেটাতে বাড়ি নিয়ে যায়। আর আশরাফুন্নেসা খোকাকে বাড়ির এক কোণে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : ভাসানী দেখতে কেমনরে? বক্তৃতায় কি কি বলল আমাকে খুলে বল।

স্টেশন মাস্টারের এমন বিশেষ আর্থিক সঙ্গতি ছিল না যাতে সব ছেলেমেয়ের সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে পারবেন। তাদের বিলাস ছিল বছরে দুবার, হাফ ইয়ারলি আর ফাইনাল পরীক্ষা শেষে সবাই মিলে কাছের শহরে সিনেমা দেখতে যাওয়া। প্রতি ঈদে সবার নতুন জামা মিলত না। পালা করে পাওয়া যেত নতুন জামা। শীতে পুরনো সোয়েটার খুলে সেই উল দিয়েই ছেলেমেয়েদের নতুন ডিজাইনের সোয়েটার বুনে দিতেন আশরাফুন্নেসা। মাঝে মাঝে ঘরে বসাতেন আসর। আশরাফুন্নেসা বলতেন, শেলী মা, গান ধরো তো একটা। শেলীর গলায় ছিল মিষ্টি সুর, গাইত, 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কি বা মৃদু বায়'। তাহেরকে বলতেন, নান্টু, নজরুলের ঐ কবিতা কর তো, ঐ যে কি যেন অর্ধেক নারী...। তাহের আবৃত্তি করতেন—এ পৃথিবীতে যা কিছু মহান, চির কল্যাণকর, অর্ধেক

তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। আশরাফুন্নেসা নিজেও গান ধরতেন। যদিও গলায় সুর ছিল না তেমন, তবু কণ্ঠে আবেগ নিয়ে কবিতার মতো করে গুনগুন করে আওড়াতেন—

জোনাকী জ্বালবে আলো
বঁধূ কি বাসবে ভালো
মালা কি পড়বে গলে?

মহিউদ্দীন আহমেদ ছিলেন নীরব শ্রোতা। আশরাফুন্নেসার সব রকম কর্মকাণ্ড, উদ্যোগকে নীরবে সমর্থন দিয়ে গেছেন তিনি। মহিউদ্দীন আহমেদ ছিলেন যতটা চুপচাপ, নিভৃতচারী, আশরাফুন্নেসা ছিলেন ততটাই সরব। কথা বলতে পছন্দ করতেন তিনি, পছন্দ করতেন মানুষের সঙ্গ। যে নতুন স্টেশনে যেতেন অল্প সময়ের মধ্যে সেখানকার পয়েন্টসম্যান, গার্ড, রেলের ড্রাইভার একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে যেত তার। ট্রেন হয়তো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, লেট হবে, গার্ড এসে নির্ঘাত এক কাপ চা খেয়ে যাবেন আশরাফুন্নেসার হাতে। শুধু রেলের কর্মচারী নয়, আশপাশের গ্রামের সাধারণ মানুষ হয়ে উঠত তার অতি আপনজন। বিকেল বেলা দল বেঁধে গ্রামের মহিলারা আসতেন তার সঙ্গে গল্প করতে। সুযোগ পেলে তিনিও চলে যেতেন গ্রামের এ বাড়ি ও বাড়ি। কাজলায় যখন থাকতেন তখন তো তিনি যেন পুরো গ্রামের অভিভাবক। গোলাপ নামে কাজলার এক দুস্থ আত্মীয় বালককে লালনপালন করতেন তিনি। সন্ধ্যায় গোলাপকে ডেকে বলতেন, হারিকেনটা নে তো গোলাপ, আমার সঙ্গে চল।

তারপর গ্রামের অন্ধকার পথে হারিকেনের আলো ফেলে ফেলে তিনি যান এবাড়ি থেকে ও বাড়ি। আয়েশার জ্বর হয়েছে দেখে আসা দরকার, বাবুলের মার সংসারে অশান্তি, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, একটা কোনো ব্যবস্থা করা দরকার।

একেবারে অচেনা মানুষকে নিমেষে আপন করে নেবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল আশরাফুন্নেসার। মহিউদ্দীন আহমেদের মৃত্যুর পর ঢাকায় ছেলেমেয়েদের বাড়িতে সময় কাটাতেন তিনি। ঢাকায় থাকতে তার এক নিত্যকালীন অভ্যাস দাঁড়িয়েছিল সকালে মর্ণিং ওয়াক করা। সকালে হাটতে গিয়ে অগণিত বন্ধু, ভক্ত, অনুরাগী তৈরি হয়েছিল তার। বিশেষ করে ডালিয়ার উত্তরার বাসায় যখন থাকতেন তখন প্রায়ই সকালে হাঁটতে গিয়ে একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন বাসায়, একদিন আনলেন এক বাদামওয়ালাকে, একদিন রাস্তার পাশে ইট ভাঙ্গে এমন এক মহিলাকে। এনে বলেন : ওকে নাস্তা খেতে দাও। মাঝে মাঝে বিরক্ত হন ডালিয়া। রেগে যান আশরাফুন্নেসা, বলেন : একজন অতিরিক্ত মানুষকে নাস্তা খাওয়াতে কি তোমাদের খুব অসুবিধা? চুপ হয়ে যান ডালিয়া।

আশরাফুন্নেসার মৃত্যুর পরের একটি স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে ডালিয়ার স্বামী রানার মনে। আশরাফুন্নেসা মারা গেছেন সপ্তাহখানেক হলো। একদিন রানা

দেখেন একজন লুঙ্গি, গেঞ্জি পড়া লোক মাথায় মস্ত বড় এক অ্যালুমেনিয়ামের পাতিল নিয়ে হন হন করে উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে। দরজা খুলে দিলে লোকটি বলেন, নানী কই? রানা বুঝতে পারেন লোকটি আশরাফুন্নেসকে খুঁজছেন এবং সে তার মৃত্যুর খবর জানে না। রানা লোকটিকে ভেতরে আসতে বলেন এবং তাকে আশরাফুন্নেসার মৃত্যু সংবাদ জানান। লোকটি মাথা থেকে পাতিলটিকে নামিয়ে মেঝের উপর রাখেন এবং হু হু করে কাঁদতে থাকেন। এরপর জানান যে, তিনি একজন রিকশাচালক এবং আশরাফুন্নেসা যখন রোজ সকালে হাঁটতে যেতেন তখন তাঁর বস্তির বাড়িতে ঢুকে খবর নিতেন। তাঁর মেয়েটির বড় অসুখ হয়েছিল এবং আশরাফুন্নেসা টাকা দিয়েছিলেন চিকিৎসার। সে চিকিৎসায় ভালো হয়ে উঠেছিল তাঁর মেয়ে। রিকশাচালক লোকটি আশরাফুন্নেসাকে কথা দিয়েছিলেন যে গ্রামের বাড়ি থেকে জিওল মাছ এনে খাওয়াবেন। লোকটি আপসোস করতে থাকেন : পাতিল ভইরা জিওল মাছ আনলাম আর নানী দুনিয়া ছাইরা চইলা গেল?

অন্যকে দেবার একটা নেশা যেন আশরাফুন্নেসার। বেঁচে থাকতে নিজের সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব তার সবটুকু উজার করে দিয়েছেন, মৃত্যুর আগে দিয়ে গেছেন তার চোখ। আশরাফুন্নেসার চোখের আলো নিয়ে এখন পৃথিবী দেখে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ির বেতকা গ্রামের আমজাদ। আমাদের জীবন শুধু আমাদের নিজের জন্য নয়, এ জীবনের ওপর দাবি আছে আশপাশের চেনা অচেনা মানুষেরও, এমন একটা বোধ আশরাফুন্নেসা তার সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চালিত করেছেন বরাবর। তিনি তার ছেলেমেয়েদের খুব ছোটবেলাতেই মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের কাদা মাটির দিকে, সাধারণ আটপৌরে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের দিকে, কল্যাণের দিকে। আর নিরন্তর বলেছেন বৃত্ত ভঙ্গবার কথা : খালি নিজের কথা ভাববি না, মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করবি।

একটা কিছু করা যা শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নয়, অন্যের জন্য, অন্য কোনো বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এই খেয়াল পোকা আশরাফুন্নেসা আর মহিউদ্দীন আহমেদের সব ছেলেমেয়েই তাদের করোটিতে বহন করে বেড়িয়েছে। এরা কেউ যেন ঠিক একক মানুষ নয়, পুরো পরিবার মিলে যেন একটা যৌথ ব্যক্তিত্ব। পরিবারের সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধে, একত্রে নেমে পড়েছে দুর্ধর্ষ বিপ্লবে। সবার মধ্যে নিভৃতে লুকিয়ে থাকা মোমবাতির আলোটুকু নিজ হাতে জ্বালিয়ে দিয়েছেন ঈষৎ ঘাড় বাঁকানো, ছোটখাটো এই নারী। কোনো এক অজানা জনপদের পৌরাণিক কোনো চরিত্র যেন বা এই আশরাফুন্নেসা।

সহদোর সহোদরা

বিপ্লবের ঘোর লাগা আনোয়ার আর সাঙ্গদের চোরাগোপ্তা জীবনের খোঁজ আমরা পেয়েছি। দেশের এক ক্রান্তিকালে আমরা বেলাল আর বাহারকে দেখতে পাবো রোমহর্ষক এক আত্মঘাতি অভিযানে। পরিবারের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য ডালিয়া

আর জুলিয়ার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে। শেলের আঘাতে যখন উড়ে যাচ্ছে তাহেরের পা তখন তার কয়েক গজ দূরত্বেই থাকবে তার সবকটি ভাইবোন।

সবার বড়ভাই আরিফ বাকি সব ভাইবোনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সামাল দিয়েছেন পেছন থেকে। মহিউদ্দীন আহমেদ চাকরি থেকে অবসর নিলে এই বিরাট সংসারের ভার নিয়েছিলেন আরিফ। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতেন তিনি। তখনও অনেক ভাইবোন স্কুল, কলেজে পড়ছে। চাকরি করে, টিউশনি করে সে পড়ার খরচ যুগিয়েছেন তিনি। শান্তশিষ্ট, নেপথ্যের মানুষ আরিফ, পরিবারের ঘোর সংকটের মুহূর্তগুলোতে হয়ে উঠেছেন প্রধান অবলম্বন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন সব ভাইবোনেরা রণাঙ্গনে, যখন তাদের বাবা মা পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন তখন আরিফকে আমরা দেখব তাদের পাশে। স্বাধীনতার পর যখন দেশের এক ঘোর রাজনৈতিক সংকটে জড়িয়ে পড়েছে পুরো পরিবার, যখন ভাইদের কেউ জেলে, কেউ পলাতক তখনও আরিফকে দেখবো সামাল দিচ্ছেন সে ক্রান্তিকাল। বাকি নয় ভাইবোন দীর্ঘদিন জানতেনই না যে আরিফ তাদের সৎ ভাই। আশরাফুন্নেসা আর মহিউদ্দীন আহমেদ জানাননি ছেলেমেয়েদের। সবাই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে নানা ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছেন তার পরিচয়। তাতে অবশ্য তাদের ভাবান্তর হয়নি কোনোই। বড় ভাইজানের ছায়া তাদের পিঠের উপর তারা অনুভব করেছেন সারা জীবন।

আবু ইউসুফকে ভর্তি করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের মারীর লোয়ারটোপা স্কুলে, যেখান থেকে তিনি সরাসরি যোগ দেন বিমান বাহিনীতে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে দ্রুত উপার্জনের কথা ভেবেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইউসুফ সৌদি আরবে কিন্তু পালিয়ে এসে যোগ দেন রণাঙ্গনে তার অন্য ভাইদের সঙ্গে। যুদ্ধে অবদানের জন্য ভাইদের সবাই পেয়েছেন খেতাব, কেউ বীরপ্রতীক, কেউ বীরউত্তম। আবু ইউসুফ পেয়েছেন বীরবিক্রম। ভাইয়ের বিপ্লবী প্রশিক্ষণের জন্য আবু ইউসুফ ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর বাড়ি। স্বাধীনতার পর তাহের যখন দ্বিতীয় এবং চূড়ান্তবার আরও একটি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন তখনও আমরা দেখব সে বিপ্লবের সব গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকগুলো বসছে আবু ইউসুফের বাড়িটিতেই। অন্য ভাইদের সঙ্গে তাকেও দেখা যাবে ব্যর্থ বিপ্লবের গোপন এক বিচারের আসামি হিসেবে কারাগারের গরাদের আড়ালে।

আশরাফুন্নেসা আর মহিউদ্দীন আহমদের সপ্তম সন্তান এবং প্রথম মেয়ে, ছোটদের বুবু আর বড়দের শেলীকে বড় পয়মন্ত ভাবতেন মহিউদ্দীন আহমেদ। শেলীর জন্মের পর বেতন বেড়েছিল মহিউদ্দীন আহমেদের। ষাট দশকের শেষের দিকে ময়মনসিংহ জংশনের কাছের ছোট স্টেশন ময়মনসিংহ রোড স্টেশনের স্টেশন মাস্টার মহিউদ্দীন আহমেদ। সেটাই ছিল তার শেষ পোস্টিং।

ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে পাস করে শেলী ভর্তি হয়েছেন মমিনুন্নেসা কলেজে। কলেজে সবাই এক নামে চেনে শেলীকে। স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ান, শ্যুটিংয়ে ফার্স্ট, বক্তৃতায় সেরা শেলী দূরন্ত এক পাখির মতো দাপিয়ে বেড়ান কলেজ। আশ্চর্য সাহস তার, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নেমে তাক লাগিয়ে দেন ভাইদের। মন যখন ভালো থাকে মহিউদ্দীন আহমেদ শেলীকে গান গাইতে বলেন। মিষ্টি গলায় গান শোনান শেলী। শেলী এক পর্যায়ে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে রাজনীতিতে। ভাইবোনদের মধ্যে শেলীই প্রথম সাংগঠনিকভাবে রাজনীতি শুরু করেন। জনপ্রিয় শেলী নির্বাচিত হন মমিনুন্নেসা কলেজের ভিপি। তার সংশ্লিষ্টতা বাম ধারার ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গেই। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ। ময়মনসিংহ এলাকার তুখোড় কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তখন যোগাযোগ তার। এক পর্যায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংগুলো বসতে থাকে শেলীদের ময়মনসিংহ রোডের বাসাতেই। কমিউনিস্ট নেতা আলোকময় নাহা, রবী নিয়োগী গোপনে আসেন বৈঠক করতে। মহিউদ্দীন আহমেদ এসবে জড়ান না কিন্তু সমর্থন দিয়ে যান নীরবে।

এর মধ্যেই হঠাৎ ঘটে যায় এক ছন্দ পতন। কলেজ ম্যাগাজিনে শেলীর একটি লেখা পড়ে এবং ছাপানো ছবি দেখে তাকে চিঠি লিখে বসে লন্ডন প্রবাসী এক বাঙালি যুবক। সেই চিঠিতে থাকে শেলীর মেধার প্রশংসা আর তার মুগ্ধতা। দূরন্ত পাখির পালকে এক অজানা পৃথিবীর হাওয়া এসে লাগে। মন উচাটন হয় শেলীর। শেলীও সে চিঠির উত্তর দেন। চিঠি দেওয়া নেওয়া চলতে থাকে অনেকদিন। গোপনে বুঝি শেলীর মনের পাড় ভাঙে, একটু একটু করে বদলে যেতে থাকে নদীর গতিপথ। গোপন মিটিং, শ্যুটিংয়ের বন্দুক আর বক্তৃতার মঞ্চ ছেড়ে একদিন শেলী পাড়ি জমায় কুয়াশাচ্ছন্ন লন্ডনে সেই যুবকের ঘরণী হতে। কিন্তু হিসেব মেলে না। লন্ডনের হিমে অচিরে শীতল হয়ে যায় তাদের অনুরাগ। একটি অসুখী সংসার জীবন কাটে শেলীর। একটি মেয়ের জন্ম হয় তাদের কিন্তু এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন শেলী। স্বাধীনতার পর পরই অকাল মৃত্যু ঘটে শেলীর। আশরাফুন্নেসা আত্মীয়দের চিঠি লেখেন, 'আমাদের মেয়ে শেলী শান্তি কুলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।' এভাবে ধূমকেতুর মতো জ্বলে উঠে চকিতে নিভে যান শেলী। পয়মন্ত মেয়েটির মৃত্যুর সাথে সাথে যেন অশুভ ছায়া নেমে আসে পরিবারের ওপর। শেলীর মৃত্যুর পর অল্প সময়ের ব্যবধানে তার আরও দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয় অপঘাতে।

আমি যাতি যুদ্ধে হেথায় সেথায়

তাহের আশরাফুন্নেসার তিন নম্বর সন্তান। আমাদের গল্পের কর্নেল। তৃতীয় সন্তান হলেও তিনিই ভাই বোনদের নেতা। যে পাগলা হাওয়ার তোড়ে এ পরিবারের প্রতিটি সদস্য বার বার বেরিয়ে এসেছেন পারিবারিক গণ্ডি অতিক্রম করে সে

হাওয়া সবচেয়ে দূরে টেনে নিয়ে গেছে তাহেরকে। এক নাটকীয় জীবনে নিজেকে ঠেলে দিয়েছেন তাহের।

তাহের যখন ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করছেন, নিজ হাতে পড়ে নিচ্ছেন ফাঁসির দড়ি তখন তার সাহসিকতায় জেলার, কারাগারের ডাক্তার, জল্লাদ বিস্মিত। কিন্তু সে কথা পরে শুনে অবাক হয়নি তার পরিবারের কেউ। তাহেরের সাহসের গল্প তারা একে অন্যকে বলেছে বহুবার।

আশরাফুন্নেসা বলেন : তোদের শাফাত ডাকাতের কথা মনে আছে? আমরা তখন সিলেটের জুড়ি স্টেশনে। ওখানে সবাই চিনত ঐ শাফাত ডাকাতকে। হীরু, মন্টু ওদের হয়তো মনে পড়বে। পাকিস্তান ভাগ হলো তখন, চারদিকে দাঙ্গা। হিন্দুরা সব দলে দলে চলে যাচ্ছে আসামে। একদিন এক হিন্দু সাধু বর্ডার পার হওয়ার জন্য রওনা দিয়েছে। ঐ শাফাত ডাকাত দিনের বেলা সবার সামনেই এই সাধুর সবকিছু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। ওর হাতে ছুড়ি। কেউ সাহস পাচ্ছে না তার সামনে যাবার কিন্তু নান্টু গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ালো। কতই আর বয়স তখন ওর, বারো, তেরো। ঐটুকু ছেলের সাহস দেখে সবাই অবাক।

ইউসুফ বলেন : আপনার মনে আছে মা, ঐ জুড়ি স্টেশনেই একটা ঘোড়া নিয়ে কি কাণ্ড ঘটেছিল? কোথা থেকে যেন একটা বেওয়ারিশ ঘোড়া এসে হাজির হয়েছিল জুড়ি স্টেশনে। এলাকার ছেলেরা সব ঘোড়টা নিয়ে হৈ চৈ। একজন একজন করে ঘোড়ার পিঠে চড়ছে। আমরা তখন নতুন গেছি ঐ স্টেশনে। ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে তখনও ভালো পরিচয় হয়ে ওঠেনি। আমারও একটু ইচ্ছা হলো ঘোড়ায় উঠার। ঘোড়ার কাছে গিয়ে একবার উঠবারও চেষ্টা করলাম কিন্তু ঐ ছেলেরা এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল আমাকে। আমি ভাবলাম ওদের সাথে আর ঝামেলা করে লাভ নাই, সরে আসলাম ওখান থেকে। দূর থেকে ব্যাপারটা দেখছিল তাহের। ও এসে বলে, 'মেজ ভাই দাঁড়ান।' তারপর সোজা চলে গেল ছেলেগুলোর কাছে। বলে, তোমরা আমার ভাইরে ফেলে দিলা কেন? এক ছেলে বলে, কি হইছে তাতে? তাহের বলে, কি হইছে মানে? বলে সে এক ঘুষি বসিয়ে দেয় ছেলেটাকে। বাকি ছেলেরা মিলে তখন সব মারতে আসে তাহেরকে। তাহেরও একাই মারামারি করে যায় অতগুলো ছেলের সঙ্গে। পরে আমি গিয়ে মারামারি থামালাম।

আশরাফুন্নেসা বলেন : খুব মনে আছে আমার। পরে নান্টুরে বলছিলাম, ঠিক করছিস। অন্যায়রে প্রশ্রয় দিবি না।

বাবা মহিউদ্দীন ভুলতে পারেন না ট্রেনে ঢিল ছোড়ার সেই ঘটনাটি। তার চাকরি নিয়ে রীতিমতো ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। এবার একা নয়, দল বেঁধে ঘটনা ঘটান তাহের। সেটা ১৯৫২ সাল। রক্তাক্ত ২১ ফেব্রুয়ারি গেছে মাস কয়েক আগে। তিনি তখন চট্টগ্রামের ষোলশহর স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। একদিন শোনা গেল ভাষা আন্দোলনের রক্তারক্তির হোতা মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন

ট্রেনে চেপে দোহাজারী যাবেন। তাকে যেতে হবে ষোলশহর স্টেশন পেরিয়ে। তাহের আরও কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে ঠিক করে নুরুল আমিনের ট্রেনে পাথর ছুড়ে মারবে। নুরুল আমিন ঠিক ঠিক যখন ষোলশহর পেরিয়ে যাচ্ছেন, তাহেরের নেতৃত্বে ঝোপের আড়ালে বসে থাকা কিছু বালক ট্রেনটিকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারে। নুরুল আমিনের গায়ে লাগল না ঠিক কিন্তু মনের ঝালটা তো মেটানো গেল? কিন্তু পুলিশের নজর এড়ায়নি ব্যাপারটি। তদন্ত হয় এবং খোঁজ পাওয়া যায় যে স্টেশন মাস্টারের ছেলেও জড়িত আছে এতে। ব্যাপারটিকে অল্প বয়সী ছেলেদের দুষ্টুমী হিসেবে তখন বিবেচনা করা হলেও ছেলের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয় স্টেশন মাস্টার মহিউদ্দীন আহমদকে। বলা হয় ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটলে তার চাকরি চলে যাবে।

কৈশোরে তাহেরের সঙ্গে মিলে জঙ্গল অভিযানের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে ছোট ভাই আনোয়ারের। আসাম, চট্টগ্রাম আর সিলেটের রেল স্টেশনগুলো সব একরকম জঙ্গলের ভেতরেই। আর সুযোগ পেলেই তাহের চলে যেতেন জঙ্গলের ভেতরে। দুর্গম সব এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন একা একা। তখন তারা চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই স্টেশনে। পাশেই পাহাড় আর তার ওপর ঘন বন।

আনোয়ার বলেন, আমার মনে আছে একদিন রাতে ভাত খেতে খেতে তাহের ভাই বললেন, 'কালকে খুব ভোরে নাস্তা খাওয়ার আগে জঙ্গলে যাব। শুনলাম অনেক ভিতরে নাকি একটা আমলকী বন আছে, খুজে বের করব। কে কে যাবে?' আমি হাত তুললাম, হাত তুললেন দাদাভাই, শেলী আপা। মা আপনি ভাত বেড়ে দিতে দিতে বললেন : সঙ্গে একটা ম্যাচ নিবি, জন্তু জানোয়ার দেখলে আগুন জ্বালায়ে দিবি।

পরদিন সূর্য ওঠার আগে জঙ্গলে রওনা দিলাম আমরা। আমলকী বন খুঁজে বের করব। আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের নেতা তাহের ভাই। আমি, দাদাভাই, শেলী আপা ফলোয়ার। ঘন গাছ আর লতা পাতা সরিয়ে অনেক ভেতরে যেতে যেতে সত্যি আবিষ্কার করলাম আমলকী বন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। চারদিকে শুধু আমলকী আর আমলকী। গাছে গাছে আমলকী, মাটিতে পড়ে আছে আমলকী। মুখে পুরলাম অনেক। শুরুতে টক, পরে মিষ্টি ঐ আজব ফল খেলাম কতকগুলো, পকেটে পুরলাম। হঠাৎ এক বিপদ। দেখি চারদিক থেকে অনেক বিশাল বিশাল হনুমান সব ছুটে আসছে আমাদের দিকে। মা আপনার কথা মতো তাহের ভাই পকেটে ম্যাচ নিয়েছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি কতকগুলো শুকনা পাতা জড়ো করে পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে আগুন ধরিয়ে দিলেন উনি। পালিয়ে গেল হনুমানগুলো। সেদিন সত্যি ভয় পেয়েছিলাম খুব।

আকৈশোর অ্যাডভেঞ্চারের জন্য মুখিয়ে থাকতেন তাহের। তখন তার অ্যাডভেঞ্চারের পরিধি অবশ্য ডাকাত ধরা আর হনুমান তাড়ানোর মতো নিরীহ বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাহেরের ভাবনায় একটা বড় বদল ঘটে চট্টগ্রাম

প্রবর্তক সংঘ স্কুলে পড়বার সময়। তার ভাবনায় তখন যোগ হয় রাজনৈতিক মাত্রা। প্রবর্তক সংঘ স্কুলে তাহের এক শিক্ষককে পান যিনি ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের সহযোগী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তাহের তার কাছ থেকে শোনেন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের গল্প।

শিক্ষক ক্লাসে বলেন : তোমাদের এখন যা বয়স তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বয়স, অসম্ভবকে সম্ভব করার বয়স। আমরা যখন ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার লুট করে জালালাবাদ পাহাড় থেকে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম তখন আমার বয়স তোমাদের মতোই, পনেরো, ষোলো। আমাদের দলের অধিকংশই ছিল এমনি নবীন কিশোর। আমরা কজন মিলে এই চট্টগ্রামে বসে পুরো ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলাম। চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে ফেলতে চেয়েছিলাম আমরা।

রোমাঞ্চিত হন তাহের, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আরও গল্প শুনতে চান সেই শিক্ষকের কাছে। কিশোর তাহেরের উৎসাহ দেখে সে শিক্ষক একদিন তাহেরকে বলেন : চলো, তোমাকে একদিন জালালাবাদ পাহাড়ে নিয়ে যাবো।

সেই শিক্ষক আর তাহের একদিন গিয়ে পৌঁছান চট্টগ্রাম হাটহাজরী রোডের ঝরঝরিয়া বটতলীর কাছের জালালাবাদ পাহাড়ে। ওই পাহাড়ের উঁচু নিচু খাদে প্রবীণ শিক্ষকের পাশে পাশে হাঁটেন তাহের।

শিক্ষক বলেন : মাস্টারদা পুরো ভারতবর্ষকে একটা ঝাঁকুনি দিতে চেয়েছিলেন। সেই ত্রিশ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিল। 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' এসব বিপ্লবী দল ছিল কিন্তু তারা তখন শুধু শরীরচর্চা আর আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের সীমিত রেখেছিল। মাস্টারদা তখন অনেক বিপ্লবীদের সঙ্গে কথা বলেছেন একটা বড় কোনো অভ্যুত্থান সংগঠিত করবার সম্ভাবনা নিয়ে। কিন্তু তারা সবাই বলতেন অভ্যুত্থানের সময় এখনও আসেনি। মাস্টারদা তাঁদের সাথে একমত ছিলেন না। তিনি তখনই একটা চূড়ান্ত কিছু করতে চাইছিলেন। নিজেই তাই একটা গোপন বিপ্লবী দল করে অভিনব একটা কিছু করবার পরিকল্পনা করেন। আমি সেই গোপন দলে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করব।

তাহের : কিন্তু স্যার, এতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতর শুধু চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে কি খুব একটা লাভ হতো, আপনারা পুরো ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার কথা ভাবলেন না কেন?

শিক্ষক : আমাদের অত শক্তি তো ছিল না। আমরা জানতাম শুধুমাত্র একটা জেলায় অভ্যুত্থান করলে বিশাল ক্ষমতাধর ব্রিটিশরা তা দমিয়ে দেবে। কিন্তু মাস্টারদা বলতেন আমরা যদি কিছুদিনের জন্য হলেও চট্টগ্রামকে স্বাধীন রাখতে পারি, তাহলে সেটাও ব্রিটিশদের জন্য একটা বিরাট আঘাত হতে পারে। আমরা যদি ব্যর্থও হই, মৃত্যুবরণ করি তাহলেও এটি হতে পারে ভারতবর্ষের মানুষের

জন্য বিশাল প্রেরণা। আমাদের আত্মহুতি ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করতে পারে।

আগ্রহী তাহের ঐ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গল্পটি আরও বিস্তারিত জানতে চান, বলেন : আপনারা স্যার কয়জন ছিলেন ঐ দলে?

শিক্ষক : আমরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অপারেশনে সর্বসাকুল্যে তেষট্টিজন ছিলাম। পাহাড়তলী রেলওয়ের ওখানে ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার ছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম সেই অস্ত্রাগার লুট করব। সেই অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করব দামপাড়ার রিজার্ভ পুলিশ ঘাঁটি। পাশাপাশি আমরা ব্রিটিশদের প্রমোদের জায়গা ইউরোপিয়ান ক্লাব এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিসও আক্রমণ করব। আরও ঠিক করেছিলাম জেলের ফটক খুলে মুক্ত করে দেবো সব রাজবন্দিদের। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শহরের প্রধান শক্তিগুলো আমাদের দখলে আনবার পর আমরা চট্টগ্রামকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করব এবং মাস্টারদা সূর্যসেনকে ঘোষণা করব প্রজাতন্ত্রের সভাপতি।

তাহের : এই সব কাজই কি স্যার করতে পেরেছিলেন?

শিক্ষক : সবগুলোতে সফল না হলেও টেলিগ্রাফ অফিস আর অস্ত্রাগার ঠিকই দখল করেছিলাম। যদিও শেষ পর্যন্ত আমরা সেটা রক্ষা করতে পারিনি। পুরো অপরেশনের নির্দেশনা দিয়েছিলেন মাস্টারদা। ১৮ এপ্রিল ১৯৩০-এ আমরা অপারেশনটি করেছিলাম। আগের দিন চট্টগ্রাম শহরে তিনটি ইস্তেহার বিলি করেছিলাম। একটি আমাদের দল ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর উদ্দেশ্যে, একটি ছাত্র, যুবকদের উদ্দেশ্যে, একটি সাধারণ চট্টগ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে। এখনও আমার সেই ইস্তেহারের ভাষ্য মনে আছে "... ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছে যে, যুগ যুগ ধরিয়া যে ব্রিটিশ এবং তার সরকার ভারতের ত্রিশ কোটি জনসাধারণকে তাহাদের হিংস্র শোষণনীতি দ্বারা নিপীড়িত করিয়াছে ... তাহার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম ঘোষিত হইল। ভারতবর্ষের জনসাধারণই ভারতের প্রকৃত অধিকারী ..." এরকম।

তাহের : আপনারা কি অস্ত্রাগারই প্রথম আক্রমণ করলেন?

শিক্ষক : আমরা অনেকগুলো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পোশাক খাকি শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে নিয়েছিলাম। সাথে ছিল গুর্খা ভোজালি, ওয়াটার পট এসব। আমাদের প্রথম দলটি যায় নন্দনকাননে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অফিসে ওদের সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল করে দিতে। ঐ দলে ছিল আনন্দগুপ্ত, তখন মিউনিসিপল স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ত। ঠিক তোমার সমান। অম্বিকা চক্রবর্তী ঐ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আনন্দই গিয়ে টেলিগ্রাফ অপারেটরকে ঘায়েল করে দখল করে নেয় দপ্তরটি। অস্ত্রগার দখলের নেতৃত্বে ছিলেন নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ আর লোকনাথ বল। তাদের দলটি পিস্তল দিয়ে পাহাড়তলীর অস্ত্রাগার রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্রিটিশ সার্জেন্ট ফ্যারেলকে হত্যা

করে। অন্য রক্ষীরা আত্মসমর্পণ করলে তারা অস্ত্রাগারের সব অস্ত্র ভাড়া করা একটি মোটরগাড়িতে করে দামপাড়া রিজার্ভ পুলিশ ঘাঁটিতে নিয়ে আসে। মাস্টারদা সেখানেই তার দল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেখানেই ছিল অভ্যুত্থানের হেডকোয়ার্টার। আমিও মাস্টারদা সঙ্গে ছিলাম। সেদিন রাতে ঘর থেকে বেরুবার আগে মাকে প্রণাম করেছিলাম। মা অবাক হয়ে বলেছিলেন, হঠাৎ এই রাতের বেলা প্রণাম করছিস কেন? আমি বলেছিলাম, এমনিতেই প্রণাম করতে ইচ্ছা হলো তাই। কিন্তু বলতে পারিনি যে কিছুক্ষণ পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাব, হয়তো আর ফিরব না।

অস্ত্রাগার থেকে আনা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমরা দামপাড়া ঘাটি আক্রমণ করি। আমাদের সব খাকি পোশাক দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল পুলিশেরা। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা প্রতিবাদ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ ফাঁড়ি আমাদের দখলে চলে আসে। আমরা স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তুলি চট্টগ্রামের আকাশ, 'বন্দে মাতরম', 'স্বাধীন ভারত কি জয়।' আরেকটি দল ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ক্লাবেও আক্রমণ করতে যায়। পরে অবশ্য খোঁজ পেয়ে ব্রিটিশ বাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণ চালায় দামপাড়ায়। মাস্টারদা আমাদের এখান থেকে সরে যাবার নির্দেশ দেন। আমরা যথাসম্ভব অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নানা পথ ঘুরে শেষে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেই।

কিন্তু শেষে এক কাঠুরিয়া আমাদের দেখে খোঁজ দেয় পুলিশকে। পুলিশ ঘিরে ফেলে জালালাবাদ পাহাড়। শুরু হয় দুর্ধর্ষ লড়াই। পুলিশ কিছুক্ষণ পাহাড়ের নিচ থেকে তারপর পাশের একটি পাহাড়ে উঠে সেখান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। আমরাও পাল্টাগুলি চালাই। যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো সেখানে শুয়েই রাইফেল হাতে বিপ্লবীরা তুমুল যুদ্ধ চালিয়ে গেছে।

তাহের : ঠিক এ জায়গাটাতেই স্যার?

শিক্ষক : হ্যাঁ। আমার মনে পড়ছে মাস্টারদা ক্রলিং করে করে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আমার পাশেই প্রথম গুলিবিদ্ধ হলো হরিগোপাল বল, ক্লাস নাইনে বুঝি পড়ত সে। আমাদের সাথে প্রচুর গোলাবারুদ ছিল। ফলে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাই। পুলিশ ভাবতেই পারেনি যে আমরা সংখ্যায় এত কম হতে পারি। এক পর্যায়ে তারা পিছু হঠে। আমাদের সাময়িক বিজয় হয়। যদিও আমরা সে যুদ্ধে আমাদের তেরো জন বিপ্লবীকে হারাই।

শিহরিত তাহের জালালাবাদ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে যেন শোনেন বহুবছর আগের সেই গুলির শব্দ। অবচেতনে ঘটে যায় তার অভ্যুত্থানের পাঠ। এ গল্প গভীরভাবে মনে গেঁথে যায় তাহেরের। সেই শিক্ষক তাকে নানা দেশের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ইতিহাস বিষয়ক বই দেন। তার কাছ থেকেই তাহের খোঁজ পান আইরিশ নেতা মাইকেল কলিন্স আর ডি—ভ্যালেরার। তোলপাড় ঘটতে থাকে তাহেরের কিশোর মনে। মনে ভাবেন, শাফাত ডাকাত নয়, দরকার একটা বড় কোনো শত্রু, যার

সঙ্গে এভাবে লড়াই করা যাবে। বহু বছর পর তাহের যে অভ্যুত্থানটির নেতৃত্ব দেবেন আমরা দেখে অবাক হবো সেই অপারেশনটির সঙ্গে কি বিস্তর মিল রয়েছে তার কিশোর মনে ঘোর লাগা এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অপারেশনের।

প্রবর্তক সংঘের সেই শিক্ষকের সঙ্গে তাহেরের সাহচর্যে ছেদ পড়ে তার বাবার বদলি হবার কারণে। আবার স্কুল বদল করতে হয় তাহেরকে। এবার তিনি ভর্তি হন কুমিল্লার ইউসুফ স্কুলে। পড়াশোনায় মনোযোগী হলেও ইতোমধ্যে তার মনের ভেতর ঢুকে গেছে বিপ্লব আর গোপন বিপ্লবী রাজনীতির বীজ। বই পড়ার নেশায় পেয়েছে তাকে। ইউসুফ স্কুলে বিতর্ক আর খেলাধুলা করে বেশ নামও হয়েছে তার। স্কুলের এক বিতর্ক অনুষ্ঠানে তাহেরের পরিচয় হয় তাহের উদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ নেতা তাহের উদ্দীন ঠাকুর। চৌকশ তাহের নজর কাড়ে তাহের উদ্দীন ঠাকুরের। তাহেরকে তিনি বলেন : ম্যাট্রিক পাস করে চলে এসো ভিক্টোরিয়া কলেজে, আমার সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়ন করবে। তাহের উদ্দীন ঠাকুর রাজনীতির আরও নতুন অনেক বই তুলে দেন তাহেরের .হাতে। রুশ বিপ্লব, চীনা বিপ্লবের বই। একটু একটু করে নতুন এক জগত ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে তার সামনে।

এর মধ্যে তাহের ব্যস্ত হয়ে পড়েন ম্যাট্রিক পরীক্ষা নিয়ে। কিন্তু ঝামেলা বাধে একটি ব্যাপারে। নিয়মমাফিক ম্যাট্রিকে ছাত্র ছাত্রীদের বিষয় হিসেবে হয় উর্দু নয়তো আরবি নিতে হবে। তাহের বাগড়া বাধেন।

প্রধান শিক্ষককে গিয়ে বলেন : স্যার আমি আরবি পড়ব না।

শিক্ষক বলেন : তাহলে উর্দু পড়ো।

তাহের : উর্দু তো স্যার প্রায়ই ওঠে না।আমি সংস্কৃত পড়তে চাই। আমি স্যার বোর্ড থেকে সিলেবাস বই যোগাড় করে দেখেছি, কেউ চাইলে বিকল্প হিসেবে সংস্কৃতও পড়তে পারে।

শিক্ষক বলেন : কিন্তু আমাদের তো সংস্কৃত শিক্ষক নাই, তোমাকে কে পড়াবে?

তাহের : আমি স্যার তাহলে বোর্ডে লিখব একটা কোনো ব্যবস্থা করতে।

শেষে খোঁজ পাওয়া যায় যে দূরের একটি স্কুলে একজন সংস্কৃত শিক্ষক আছেন। তাহেরকে বলা হয় যদি তিনি ঐ শিক্ষকের কাছে গিয়ে সংস্কৃত পড়ে আসতে পারেন তবে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। বেশ অনেকটা হাঁটা পথ কিন্তু তিনি তাতেই রাজি। নাছোড়বান্দা তাহের আরবি নয় সংস্কৃত নিয়েই ম্যাট্রিক দেন।

খানিকটা চারন বিপ্লবীপনা, কিছুটা গোপন রাজনীতির রোমাঞ্চের ছোঁয়া আর নিরন্তর প্রতিবাদের উত্তেজনা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকেন তাহের। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ভর্তি হতে চান ভিক্টোরিয়া কলেজে। তাহের উদ্দীন ঠাকুর তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন আগেই। বাধ সাধেন বড় ভাই আরিফ। আরিফই অভিভাবক

তখন। তাহেরের পড়াশোনার খরচও চালাচ্ছেন তিনি। আরিফ বলেন : 'ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়া চলবে না, ওখানে গেলে তুমি পলিটিক্স করবে, পড়াশোনা আর হবে না।

আরিফ তাকে বলেন সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজে ভর্তি হতে। মুরারী চাঁদ কলেজ, এম সি কলেজ নামে পরিচিত। ভালো একটা হোস্টেল আছে সেখানে। তাছাড়া কড়া শাসন আর শৃঙ্খলার জন্য কলেজটি তখন বিখ্যাত। মৃদু প্রতিবাদ করলেও তাহেরের সঙ্গে বড় ভাই আরিফের সম্পর্ক শ্রদ্ধার। তার সিদ্ধান্তই মেনে নেন তাহের। তাহের উদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে সেখানেই যোগাযোগের ছেদ পড়ে তাহেরের। অনেক বছর পর আবার তাহেরুদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে তাহেরের দেখা হবে দেশের নাটকীয় এক পরিস্থিতিতে। তখন তারা দুজন পৃথক দুই জগতের বাসিন্দা।

এম সি কলেজে গিয়ে ভালোই লাগে তাহেরের। ব্যারাকের মতো চারটা ব্লকে হোস্টেল, ঘণ্টা বাজিয়ে ডাইনিং এ দেওয়া হয় খাবার। সকাল বেলা রুমে রুমে চা দিয়ে যায় ডাইনিং বয়। বেশ আয়োজন। তবে তিনি লক্ষ করেন ছাত্রদের মধ্যে দুটো ভাগ সেখানে। সিলেটি আর অসিলেটি। দুদলের মধ্যে বেশ একটা চাপা দ্বন্দ্বও আছে। অবশ্য অসিলেটি দলটি খুবই ক্ষুদ্র। কলেজের পঁচানব্বই ভাগ ছাত্রই সিলেটি। ফলে অসিলেটিরা বেশ কোণঠাসা। তাহের যদিও অসিলেটি কিন্তু কলেজে এসেই খেলাধুলা, বক্তৃতা ইত্যাদি করে তার জায়গাটা বেশ শক্ত করে নিয়েছেন।

অধিকাংশ অসিলেটিরা একটু অপ্রতিভ থাকলেও দুজন ছাত্রকে তাহের বেশ দাপটে ঘুরে বেড়াতে দেখেন। একজন বগুড়ার মঞ্জু আর অন্যজন আসামের মজুমদার। দুজনই তার এক ক্লাস নিচে পড়াশোনা করছেন কিন্তু তাদের সাহসী চলাফেরার কারণে ওদের সঙ্গেই সখ্যতা গড়ে ওঠে তাহেরের।

মঞ্জু এক কাণ্ড করে বসেন একদিন। ঘটনা জালালী কবুতর নিয়ে। কলেজের হোস্টেলে ভিড় করে থাকে প্রচুর জালালী কবুতর। সিলেটিদের কাছে অতি পবিত্র এই পাখি। কথিত আছে এই পাখি সিলেটের হযরত শাহজালালের স্নেহধন্য। সিলেটিরা তাই জালালী কবুতরকে সমীহের চোখে দেখে। ধরা তো দূরের কথা কখন বিরক্তও করে না। কিন্তু একদিন কয়েকটি জালালী কবুতর ধরে একেবারে জবাই করে রান্না করেন মঞ্জু। সিলেটিদের মধ্যে তুলকালাম পড়ে যায়। ওদের ক্ষেপানোর জন্যই কাজটা করেন তিনি। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ সিলেটি ছেলেরা মঞ্জুকে পেটানোর পরিকল্পনা করে। তাহেরের মধ্যস্থতায় শেষে ব্যাপারটার নিস্পত্তি হয়।

আগে হলে তাহেরও হয়তো মজা পেতেন এই অ্যাডভেঞ্চারে কিন্তু ইতোমধ্যে এসব বালখিল্যতার পর্ব যেন পেরিয়ে এসেছেন তিনি। মঞ্জুকে বলেন : এসব করে পারবে ওদের সঙ্গে? এসব পেটি এনিমির বিরুদ্ধে, সিলি প্রটেস্ট করে কোনো লাভ নেই। লেট আস থিংক বিগ।

তাহেরের মাথায় তখন বিগ থিংকিং। তিনি সত্যিই তখন ধীরে ধীরে নিজেকে অনেক বড় ভাবনায় জড়িয়ে ফেলছেন। কলেজে উঠে পড়াশোনার মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে তাহেরের। দিনরাত বই পড়ার নেশায় মত্ত তিনি। যতটা পড়ার বই, তার চেয়ে বেশি 'আউট বই'। দেশ বিদেশের আন্দোলন আর বিপ্লবের বই বুঁদ হয়ে পড়েন তাহের। রুশ, চীন, আলজেরিয়ার সশস্ত্র বিপ্লব, এমনকি এদেশের সাঁওতাল বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহের ইতিহাস পড়েন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রাজনীতির নতুন নতুন পাঠে তাহের তখন উত্তেজিত।

ইতিহাসের পাতা থেকে যখন ফিরে আসেন নিজের দেশে তখন বুঝে নিতে চেষ্টা করেন রাজনীতির সমীকরণগুলো। মনে তার ভাবনার বুদ্বুদ। একটা বড় কিছু করতে হবে বড় কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে। বাঙালি তরুণের কাছে তখন মূর্তিমান শত্রু পশ্চিম পাকিস্তান। লড়তে হবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। সেসব নিয়ে আড্ডা চলে মঞ্জু আর মজুমদারের সঙ্গে।

মফস্বল শহর সিলেটের এম সি কলেজের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে টগবগ করেন তাহের, মঞ্জু, মজুমদার। একবার ঠিক করেন তিনজন মিলে একটা দেয়াল পত্রিকা বের করবেন। বের হয় পত্রিকা এবং তিনজন মিলেই লেখেন পত্রিকার লেখাগুলো। রাজনৈতিক লেখা। তাহের লেখেন ভাষা আন্দোলন নিয়ে। স্পষ্ট লেখেন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বনবে না কখনোই। এখন ওরা ভাষা নিয়ে বাগড়া বাঁধিয়েছে, সামনে আরও নতুন নতুন ঝামেলা তৈরি করবে। লেখেন 'ব্রিটিশরা ভারত ভেঙ্গেছে এবার আমাদের পাকিস্তান ভাঙ্গতে হবে।' এ লেখা পড়ে ছেলেরা হাসে। তাকে খেতাব দেয় 'দেশ ভাঙ্গার মিস্ত্রি'।

সন্দেহ নেই পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি মফস্বলের এক কলেজের অখ্যাত তরুণের দেশ ভাঙ্গার ভাবনা নিতান্তই ঠাট্টার ব্যাপার। তবে অখ্যাত এই তরুণের মনের কথা কিছুদিনের মধ্যেই শোনা যায় বিখ্যাত এক রাজনৈতিক নেতার মুখেও। মাওলানা ভাসানী এক সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিজাতীয় আচরণ নিয়ে কড়া ভাষায় বক্তৃতা দেন। এও বলেন আপনাদের সঙ্গে বনিবনা না হলে আমরা কিন্তু বলে দেব, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম'।

তাহেরের হাতে একদিন আসে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'। বইটি পড়ে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন তাহের। বইটি বদলে দেয় তার সব ভাবনা। বইটি তাকে এতই প্রভাবিত করে যে অনেক বছর পরে ছোট ভাই আনোয়ারকে যখন তিনি বইটি পাঠান তখন সাথে লেখেন—'রিড দিস। দিস ইজ দি বেস্ট বুক দ্যাট আই হ্যাভ রেড সো ফার।'

কাঁচা বয়সের নানা বিক্ষিপ্ত উত্তেজনা এম সি কলেজে থাকতেই ক্রমশ তাহেরের মধ্যে একটা সুসংহত রূপ নিতে থাকে। তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের প্রণোদনার সঙ্গে যুক্ত হয় স্পষ্ট রাজনৈতিক মাত্রা। কৈশোরে ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের রোমহর্ষক অভিযান, তাদের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম তাহেরকে

উদ্দীপিত করলেও যৌবনে এসে তাহের টের পান শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্য এগুলোই শেষ কথা নয়, প্রয়োজন একটি বিশ্ববীক্ষা। শত্রুকে সরিয়ে ঠিক কি ধরনের একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই প্রয়োজন তার একটা স্পষ্ট রূপরেখা। তাহের সেই বিশ্ববীক্ষা পান মার্ক্সবাদী বইপত্র পড়ে। তার মনে হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দিয়েই পৃথিবীকে দেখা যায় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে। মনে হয় পৃথিবীতে বুঝিবা এখনও চলছে প্রাগৈতিহাসিক কাল, যেদিন মানুষের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ব্যবধান ঘুচে যাবে, যেদিন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র বুঝি সেদিনই শুরু হবে প্রকৃত ইতিহাস।

তাহের সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে আকৃষ্ট হন তখনকার অনেক তরুণের মতোই। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপারে তার কৈশোরিক আকর্ষণ। ফলে মার্ক্সবাদের সামরিক দিকটির ব্যাপারে তাহের বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে হলেও চাই যুদ্ধ, চাই অস্ত্র এই ধারণা তাহেরকে উদ্বুদ্ধ করে বেশি। কমিউনিজমের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক নিয়ে মার্ক্স, এঙ্গেলস উভয়ের লেখাগুলোই খুঁটিয়ে পড়েন তিনি। পান পলিটিকো মিলিটারি লিডারশিপের কথা। এ নিয়ে ভাই ইউসুফ আর আনোয়ারের সঙ্গে শুরু করেন আলাপ, বইপত্র দেওয়া নেওয়া।

বিশেষ করে এঙ্গেলস তাঁর 'এন্টিডুরিং' বইয়ে যুদ্ধের সমাজতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক দিক নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহেরের। লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে রাখেন সে সব লাইন যেখানে তৎকালীন প্রুশিয়ার জেনারেল ক্লাউসউইৎস বলছেন, যুদ্ধবিদ্যাকেও শিখতে হবে ঠিক চিকিৎসাবিদ্যা বা পদার্থবিদ্যার মতো। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে একটা ন্যায়যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে তাহের উপলব্ধি করেন লেনিন, রোজা লুক্সেমবার্গ, বুখারিন, ট্রটস্কি এদের লেখা পড়ে। মাও সে তুং এর মিলিটারি রাইটিংগুলো আনোয়ারকে নিয়মিত পাঠাতে থাকেন তিনি। যাঁরা কমিউনিস্ট, পাশাপাশি সশস্ত্র যোদ্ধা তাদের ব্যাপারেই আকর্ষণ বোধ করেন তাহের। সে সূত্র ধরেই পরবর্তীতে তিনি ভক্ত হয়ে ওঠে হো চি মিন, ক্যাস্ট্রো আর চে গুয়েভারার। কৈশোরে জালালাবাদের পাহাড়ে শোনা অদৃশ্য গুলির শব্দ তাহের যেন বয়ে বেড়ান আজীবন। চিকিৎসাবিদ্যা আর পদার্থবিদ্যার মতো যুদ্ধবিদ্যাটি শিখবার অদম্য ইচ্ছা হয় তাঁর।

একদিন মঞ্জুকে ডেকে তাহের বলেন, ভেবে দেখলাম পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের একটা যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ ছাড়া ওদের হঠানো যাবে না।

মঞ্জু : কি বলেন আপনি এসব, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা কি করে যুদ্ধ করব তাহের ভাই?

তাহের : কেন ব্রিটিশদের মতো এমন বিশাল পাওয়ারের বিরুদ্ধে আমাদের ইয়াং ছেলেমেয়েরা ফাইট করেনি? ওরা অর্গানাইজড ছিল না বলে হেরে গেছে

কিন্তু রীতিমতো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশদের। তবে ইউ আর রাইট এমনি যুদ্ধে পারা যাবে না ওদের সাথে, গেরিলা ওয়ার করতে হবে। ঠিক করেছি কলেজ থেকে পাস করে আর্মিতে যাব।

মজুমদার : জোক করছেন? পাকিস্তান আর্মিতে যেয়ে আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?

তাহের : ওয়ার ফেয়ারটা শিখতে হবে না? ওদের কাছ থেকে যুদ্ধ বিদ্যাটা শিখে ওদের বিরুদ্ধেই সেটা ব্যবহার করব। আর্মি ট্রেনিংটা নেওয়া থাকল সময় সুযোগমতো আর্মি থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই একটা গেরিলা দল তৈরি করব। আই এম সিরিয়াস। জোক করছি না কিন্তু।

মঞ্জু : ভালো কথা জোক করছেন না। কিন্তু আমাদের কি হবে? আমাদের নেবেন আপনার গেরিলা দলে?

তাহের : অফকোর্স। মঞ্জু তুমি হবে আমার সেক্রেটারি আর মজুমদারের গায়ে তো বেশি শক্তি নাই, ও যুদ্ধ পারবে না, মজুমদার হবে আমার পারসোনাল অ্যাডসস্টান্ট।

মঞ্জু : গুড আইডিয়া। তাহলে ধরে নেন আজকে থেকেই আপনি প্রেসিডেন্ট, আমি সেক্রেটারি আর মজুমদার পি এ।

তাহের বলেন : ওকে দেন। সেক্রেটারি দেখে আস তো আজকে ডাইনিং এ কি মেন্যু।

মঞ্জু স্যালুট দিয়ে বলে : ইয়েস স্যার।

অ্যান্ড ইউ মাই পিএ, গেট মি সাম পেপারস : মজুমদারকে বলেন তাহের।

মজুমদার ছুটে যান কাগজ আনতে।

সেই থেকে তিনজনের মধ্যে এই এক খেলা শুরু। খেলাচ্ছলে যেন নেতৃত্বের প্র্যাকটিস চলে তাহেরের। আশ্চর্য এই যে সেদিনের পর থেকে তারা সারা জীবন কখনো আর একে অপরকে নাম ধরে ডাকেননি। মঞ্জু আর মজুমদারের কাছে তাহের স্যার আর তাহেরের কাছে একজন সেক্রেটারি অন্যজন পিএ।

তাহেরের অভ্যাস পরীক্ষার আগের রাতে কিছু না পড়া, বইয়ের ধারে কাছেও না যাওয়া। মঞ্জু আর মজুমদাররের রুমে গিয়ে তাহের বলেন : ইউ সেক্রেটারী অ্যান্ড পি এ, আজকে কোনো পড়াশোনা নাই। উই শুড গো আউট টু ওয়াচ এ মুভি টু নাইট এ্যান্ড দ্যাটস এন ওর্ডার।

দুজন দাঁড়িয়ে বলেন : ইয়েস স্যার। তিনজন মিলে দেখতে যান সুচিত্রা উত্তমের ছবি।

সুখে দুখে মান অভিমানে এই তিনজন এম সি কলেজের দিনগুলো কাটিয়ে দেন একসাথে। কলেজ জীবনের এই দুই বন্ধুই কেবল সাক্ষী হয়ে থাকেন পঞ্চাশ দশকের তাহেরের। তাহেরের মৃত্যুর পর তার স্মরণে যখন কর্নেল তাহের সংসদ গঠিত হলো, তখন সে সংসদে সবচেয়ে মোটা অঙ্কের অনুদান দিলেন লন্ডন

প্রবাসী এক ভদ্রলোক, নাম মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। জানা গেল ইনিই তাহেরের সেই কলেজ বান্ধব মঞ্জু। প্রৌঢ় মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করলেন আনোয়ার, তার সূত্রে দেখা হলো মজুমদারের সঙ্গেও, যিনি তখন কৃষিবিদ্যার অধ্যাপক। সেইসব সোনালী দিনগুলোর কথা স্মরণ করলেন তাঁরা। মঞ্জু বললেন : আমরা কিন্তু সেই ফিফটিজেই ধরে নিয়েছিলাম স্যার একদিন ওরকম একটা আর্মড রেভ্যুলেশনকে লিড করবেন। কিন্তু কতকগুলো ভুল করে ফেললেন স্যার।

কত বছর পেরিয়ে গেছে তবু সেই মৃত বন্ধুকে স্যার বলেই সম্বোধন করেন তারা। অশ্রু সজল হয়ে ওঠে মঞ্জু, মজুমদার দুজনেরই চোখ।।

এম সি কলেজ থেকেই বি এ পাস করেন তাহের। শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাইয়ের দুর্গাপুর স্কুলে। কিন্তু লক্ষ তাহের আগেই স্থির করে রেখেছেন, যোগ দেবেন আর্মিতে। চোখ কান খোলা রাখেন কখন সেনাবাহিনীতে ভর্তির ঘোষণা হয়। তারপর একদিন ঘোষণা হতেই আবেদন করে বসেন তিনি। ভর্তি পরীক্ষায় লেগে যায় গোলমাল। লিখিত, শারীরিক সব পরীক্ষায় পাস করলেও ঝামেলা বাধে মৌখিক পরীক্ষায়। ভাইবা বোর্ডে পশ্চিম পাকিস্তানি সব জাঁদরেল কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার। নানা রকম প্রশ্ন করবার পর এক অফিসার তাহেরকে নামাজের কয়েকটি সূরা পড়তে বলেন। আর্মিতে ঢুকবার শর্ত হিসেবে তার মুসলমানিত্বের পরিচয় নেওয়া হচ্ছে দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হন তিনি। তাছাড়া সূরাও তেমন মুখস্থ ছিল না তাঁর। ফলে আটকে যান তাহের। তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। আর্মিতে ঢুকবার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহেরের।

হতাশ হন কিন্তু হতোদ্যম হন না। ঠিক করেন আবার চেষ্টা করবেন। এই ফাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে এম এ তে ভর্তি হন তিনি। ভাবেন এ সুযোগে সমাজবিজ্ঞানটা খানিকটা ভালোমতো পড়ে নেওয়া যাক। একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন তাহের। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো পড়ে ইতোমধ্যেই পুরোপুরি বাম রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছেন তিনি। ঢাকায় এসে মার্ক্সীয় সাহিত্যের আরও লেখাপত্র যোগাড় করে তার ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিতে থাকেন তাহের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ে পড়তে পড়তেই পরের বছর আবার আর্মিতে পরীক্ষা দেন তিনি। এবার আগে থেকে কিছু সূরাও শিখে রাখেন। কিন্তু এবার আর ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নের জটিলতায় পড়তে হয়নি তাকে। তাহের সেনাবাহিনীর জন্য নির্বাচিত হয়ে যান।

শুরু হয় মিলিটারি একাডেমীর নতুন জীবন। মাথার ব্রহ্মতালু কাঁপিয়ে প্যারেড, পিটি করেন তাহের, শেখেন অস্ত্রচালনার খুঁটিনাটি। কিন্তু একডেমীর কারো জানবার কথা নয় তার গোপন মিশনের কথা, টের পাবার কথা নয় যে প্রশিক্ষণরত একজন ক্যাডেট বস্তুত ছদ্মবেশী বিপ্লবী। প্রশিক্ষণ শেষে বালুচ রেজিমেন্টে কমিশন পান তাহের। যদিও কমিশন পেয়ে অফিসার হওয়াই তাঁর মূল

উদ্দেশ্য নয়, তবু তিনি জানেন পেছনের সারির অফিসার হয়ে থাকলে তাঁর চলবে না। সম্ভাব্য সব রকম অভিজ্ঞতা তাঁকে নিতে হবে। তাহেরের একাগ্রতা আর উদ্যম নজর কাড়ে সিনিয়র অফিসারদের। তাঁকে নেওয়া হয় প্যারা কমান্ডো দলে। ১৯৬৫-র পাক ভারত যুদ্ধে তাহের যুদ্ধ করেন কাশ্মীর আর শিয়ালকোট সেক্টরে। আহতও হন। অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী তাহের বিশেষ কৃতিত্ব দেখান প্যারাসুট জাম্পিংয়েও। তিনি তখন একমাত্র বাঙালি অফিসার যাকে 'মেরুন প্যারাসুট উইং' সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানে না, ' তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।'

যেমন বলেছিলেন মণ্টুকে তেমন পরিকল্পনা নিয়েই এগুতে থাকে তাহের। সবসময় ভাবেন তার শেখা যাবতীয় সামরিক বিদ্যা ছড়িয়ে দিতে হবে বাঙালিদের মধ্যে, তাদের প্রস্তুত করতে হবে একটা যুদ্ধের জন্য, পাশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তাহের তার কল্পনার প্রথম গেরিলা বাহিনীটি গড়ে তোলেন তাঁর ছোট ভাই বোনদের নিয়ে। আর্মি থেকে যখন ছুটিতে আসেন তখন কিছুদিনের জন্য তাদের রেলওয়ে কোয়ার্টারটিকে তিনি বানিয়ে তোলেন একটা মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্প। তাহের সাধারণত আসেন শীতের সময়। সঙ্গে করে আনেন অনেক ফল। ডালিয়া আর জুলিয়া ঘুম থেকে উঠে দেখে বাড়ির বারান্দায় দড়িতে ঝুলছে আঙ্গুর, মাটিতে আপেল, আখরোট। চিলগোজা নামের এক ধরনের ফল আনেন তাহের যা এদেশে পাওয়া যায় না। ডালিয়া আর জুলিয়ার কার্ডিগানের পকেটে ছোট ছোট চিলগোজা গুঁজে তাহের বলেন, স্কুলে সবাইকে দিয়ে খাবেন, একা একা খাবেন না কিন্তু। ছোট দুটি বোনকে আদর করে সবসময় 'আপনি' বলেই ডাকেন তাহের।

ভোর বেলা কোয়ার্টারের সামনের মাঠে তাহেরের নির্দেশে লাইন করে দাঁড়ান আনোয়ার, সাঈদ, শেলী, বাহার, বেলাল। তার ব্যক্তিগত ব্যাটালিয়ান। তাহের তাদের শেখান আর্মি থেকে শিখে আসা কমান্ডো প্যারা পিটি, শেখান কিভাবে খালি হাতে শত্রুর শরীরের স্পর্শকাতর জায়গায় আঘাত করে তাকে কাবু করা যায়। শেখান হাত বোমা বানাতে। বলেন, শোন একদিন বাঙালিদের সাথে যুদ্ধ হবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের। সে যুদ্ধে তোমরা হবে গেরিলা ফাইটার।

কুয়াশায় ঢাকা কয়েকজন ক্ষুদে যুদ্ধবাজ গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে তাদের কমান্ডারের নির্দেশ।

শীতের রাতে কোনো কোনোদিন উঠানে সবাই গোল হয়ে বসে। আশরাফুন্নেসা বানান উঠান পোড়া পিঠা। চালের গুঁড়াকে পেঁয়াজ, মরিচ, আদা দিয়ে মাখিয়ে কলা পাতা দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়। উঠানে বিছানো হয় খড়, সে খড়ের উপর রাখা হয় কলা পাতায় মোড়ানো সেই পিঠা, তারপর আবার সেই পিঠাগুলোকে চাপা দেওয়া হয় এক গাদা খড় দিয়ে। এর পর সেই খড়গুলোতে লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। পিঠা পুড়তে থাকে আবার চারপাশে বসে শীতের রাতে আগুন পোহানও হয়। খড়ের আগুন উঁচু হতে থাকে। আরেকটু খড় দিলে

আরেকটু উঁচু হয় আগুনের শিখা। তাহের বলেন, শর্ত আছে। যারা লাফ দিয়ে এই আগুন পার হতে পারবে, শুধু তারাই এই পিঠা পাবে।

শীতের রাত। হিম অন্ধকারে নিঝুম হয়ে আছে কাজলা গ্রাম। আশরাফুন্নেসার উঠানে জ্বলে আগুন। তাহেরের নির্দেশে এক এক করে ভাই বোনেরা দেন আগুন পার হওয়ার পরীক্ষা। যেন কোনো আদিম গোত্র প্রধান নিজেদের টোটেমকে সামনে রেখে দলের সদস্যদের দীক্ষিত করছেন আসামি কালের বাইসন শিকারের মন্ত্রে।

খানিকটা দলছুট, ছেলেমানুষের মতো পারিবারিক প্লাটুন বানালেও তাহের জানেন যে এভাবে বিপ্লব হয় না। প্রয়োজন যথার্থ পার্টির। কোনো পার্টির সাথে নিজেকে যুক্ত করবার চেষ্টাও চালিয়ে যান তিনি। তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। আর্মিতে থাকবার কারণে সে যোগাযোগটা দুরূহ হলেও ছুটিতে বাড়ি এলে এব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান তিনি। সুযোগটা তিনি বিশেষভাবে পান ময়মনসিংহে। বাবা তখন ময়মনসিংহ রোডের স্টেশন মাস্টার। ভাইবোনদের মধ্যে সক্রিয় পার্টি রাজনীতিতে প্রথম যোগ দিয়েছেন ছোট বোন শেলী। আমরা আগেই জেনেছি যে ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে মমিনুন্নেসা কলেজের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তার সূত্র ধরেই তাদের ময়মনসিংহ রোডের বাড়িতে তখন অনেক কমিউনিস্ট নেতার আনাগোনা। ছুটিতে এলেই সে সব নেতা কর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন তাহের।

কিন্তু বিপ্লব বিষয়ে তার চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মেলে এমন কাউকে পান না তিনি। তাহের সশস্ত্র কমিউনিস্ট বিপ্লবের কথা বলেন। কিন্তু ষাট দশকের মাঝামাঝি এ অঞ্চলের কমিউনিস্টদের মধ্যে সশস্ত্র ধারার আন্দোলনে আগ্রহী কাউকে পাওয়া দুষ্কর। পাকিস্তান সরকারের কঠোর দমন নীতির মধ্যে তখন হিমশিম খাচ্ছেন কমিউনিস্টরা। কোনোরকম আত্মগোপন করে চালিয়ে যাচ্ছেন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম। কমিউনিস্টদের মধ্যে এমন কাউকে সে সময় পাওয়া দুর্লভ যিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে একটা গেরিলা যুদ্ধে নেমে পড়বার কথা ভাবছেন। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিশাল কমিউনিস্ট পার্টিতেও তখন সশস্ত্র ধারাটি তেমন আলোচিত নয়। পশ্চিম বাংলার নকশালবাড়ি থেকে চারু মজুমদারের সশস্ত্র কমিউনিস্ট বিপ্লবের আওয়াজ তোলেন আরও পড়ে, ষাট দশকের শেষে। ফলে তাহের ছুটিতে এসে যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলাপ করেন তাদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবে আগ্রহী কারো সঙ্গে দেখা হয় না তার।

বিচ্ছিন্নভাবে এ অঞ্চলে কেউ কেউ সে সময় এ সম্ভাবনার কথা ভাবছেন অবশ্য। ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখরা মিলে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটা নিউক্লিয়াস গড়ে তুলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে একটা জঙ্গিরূপ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবার সম্ভাবনার কথা ভাবছেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে

তাহেরের যোগাযোগ হয়নি। ফলে একরকম নিঃসঙ্গভাবেই নিজেকে তখন প্রস্তুত করছেন তিনি। প্রস্তুত হচ্ছেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের জন্য, যে যুদ্ধ একই সঙ্গে হবে স্বাধীনতার এবং সমাজতন্ত্রের জন্য। ঠিক যেমন হচ্ছে ভিয়েতনামে। যেমন হো চি মিন গেরিলা যুদ্ধ করছেন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা থেকে ভিয়েতনামকে মুক্ত করে সেখানে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কায়েমের জন্য। প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে তাই নিজের পরিবারের মধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন গেরিলা ট্রেনিং।

ষাট দশকের শেষের দিকে কমিউনিস্ট পার্টি যখন বিভক্ত হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে যখন গণআন্দোলন তীব্র হচ্ছে তাহের তখন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে। কিন্তু পরিস্থিতির ওপর গভীর নজর রাখছেন তিনি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পড়ে তো বটেই, ক্যান্টনমেন্টে বসে নিয়মিত নানা দেশের রেডিও শোনা তাহেরের নিত্যকার অভ্যাস তখন। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, রেডিও অস্ট্রেলিয়া। তাহের কান পেতে থাকেন কখন কোথায় পাকিস্তান বিষয়ে খবর থাকে। আর দেশে তিনি নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগ রাখেন বড় ভাই ইউসুফ আর ছোট ভাই আনোয়ারের সঙ্গে। চিঠিতে বিশেষ করে আনোয়ারের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেশের পরিস্থিতি জানতে চান তাহের। আনোয়ারও সবিস্তারে সব কিছু লিখে চিঠি পাঠিয়ে দেন ক্যান্টনমেন্টের ঠিকানায়। কমিউনিস্ট পার্টির মস্কো আর মাওবাদী ভাঙ্গনের সব খবরাখবরই পান তিনি।

আনোয়ারকে লেখেন, ওদের দেখাদেখি আমাদের দেশের কমিউনিস্টদেরও চীনা আর মস্কোপন্থীতে ভাগ হয়ে যাওয়া ঠিক হলো কিনা আমি জানি না। কিন্তু মস্কো তো আর্মস স্ট্রাগল বন্ধ করে দিয়েছে, সুতরাং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে চীনাপন্থীদের দিকে। সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া আমাদের দেশের মুক্তি আসবে না জেনে রেখো।

ব্যাপারটা মোটেও কাকতালীয় নয় যে পূর্ব পাকিস্তানে চীনাপন্থী দলের সবচেয়ে জঙ্গি যে অংশ সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে তখন দানা বাঁধছিল তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায় আনোয়ার আর তাহেরের। কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হবার পর সশস্ত্র আন্দোলনের যে ভাবনা তাড়িত করেছে তাহেরকে, সে ভাবনার সঙ্গী তিনি খুঁজছিলেন দীর্ঘদিন, খুঁজছিলেন একটা পার্টি। সিরাজ শিকদারের ভেতর সেটি পেয়ে যান তিনি। সিরাজ শিকদারও পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা বলছেন, বলছেন সশস্ত্র সংগ্রমের মধ্য দিয়ে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কথা। ঠিক এইরকম একটি ভাবনা করোটিতে নিয়েই তাহের শুরু করেছেন তার নিঃসঙ্গ যাত্রা, সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ সেই যাত্রারই একটি ধাপ। ফলে সিরাজ শিকদারের সঙ্গে পরিচয়ের পর আর একমুহূর্তও দেরি করেননি তিনি। নেমে পড়েছিলেন কাজে। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে সেনাবাহিনীর ভেতরে থেকেও গোপনে শুরু করেছিলেন

বিপ্লবীদের সামরিক ট্রেনিং। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সময় সুযোগমতো সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ঝাঁপিয়ে পড়বেন বিপ্লবী আন্দোলনে।

শৈশবে মা বলেছিলেন, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবি না। শাফাত ডাকাতের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন তাহের। জালালাবাদ পাহাড়ের উঁচুতে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের অস্ত্র লুটের গল্প শুনতে শুনতে বুঝেছিলেন ক্ষমতাবানরা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় দেয় না, কেড়ে নিতে হয়। কমিউনিস্ট মেনুফেস্টো পড়ে পেয়েছিলেন পৃথিবীকে দেখবার নতুন চোখ, পেয়েছিলেন পৃথিবীটাকে বদলে ফেলবার মন্ত্র। যুদ্ধ করে পৃথিবীকে বদলে ফেলবেন বলে নিলেন কমান্ডো ট্রেনিং। এবার তিনি প্রস্তুত মাঠে নামবার জন্য, নেমেও ছিলেন।

কিন্তু হিসাব মেলে না। জীবন আমাদের জন্য অনেক অপ্রত্যাশিত বাঁক মজুদ রাখে। মানুষ কাছকাছি আসে আবার সরে যায় দূরে। নানা পথ ঘুরে দুই টগবগে তরুণ বিপ্লবী মিলেছিলেন এক বিন্দুতে। একজন বিপ্লবী সৈনিক, একজন বিপ্লবী প্রকৌশলী। কিন্তু ইতিহাসের অভিপ্রায় তা নয়। তুচ্ছ কারণে বিভক্ত হয়ে গেলেন তারা। নিলেন ভিন্ন দুই পথ। স্বাধীন বাংলাদেশের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ফুলকির মতো আবার আবির্ভুত হবেন তারা, অপঘাতে মৃত্যু হবে দুজনেরই। কিন্তু আপাতত দুজনের পথ বেঁকে গেল দুদিকে।

স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন তাহের, পতন হলো অকস্মাৎ। মন খানিকটা ভাঙ্গল বটে তার। কিন্তু সে মনের ওপর তখন এসে পড়েছে এক নতুন ছায়া। একজন নারীর, তার জীবনসঙ্গিনীর। যেন বিপ্লবের জন্য মজুত রাখা উত্তেজনাগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন আকাশে, তেমনি কায়দায় গুলি ছুড়তে ছুড়তে অভিনব বর সেজে ঢুকলেন বিয়ের আসরে। বিপ্লবীর মনে তখন বসন্তের হাওয়া।

না প্রেমিক, না বিপ্লবী

অভ্যুত্থান, এঙ্গেলস আর প্যারাসুট জাম্পিংয়ের ঝড়ে ধুলোয় ঢাকা ছিল তাহেরের প্রেমিক মন। তেমন একটা মন তার আছে কিনা তাও ঠিক স্পষ্ট ছিল না তার কাছে যেন। কোনো সহপাঠিনীর চুলের অরণ্যে হারিয়ে যাবার চকিত বাসনা হয়েছিল হয়তো কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে প্লেখানভের বইটা পড়ে শেষ করতে হবে, কিংবা লেনিনের। ডুবে গেছেন বইয়ে আর সেই সহপাঠিণী কখন তার চুলের অরন্য নিয়ে চলে গেছে দূরে। হালকা পাখায় ভর করা প্রেম প্রজাপতি ব্যস্ত, চঞ্চল তাহেরের মনে আলতো করে বসবারও ফুসরত পায়নি কখনো। লুৎফার মধ্য দিয়েই নারীর এক নতুন দিগন্তের সঙ্গে পরিচয় তাহেরের। এ যেন এক নতুন গ্রহে অবতরণ। কত তার অজানা প্রান্তর। নতুন এক ঝড়ে হঠাৎ উড়ে যায় জমে থাকা সব ধুলো। সেখান থেকে মাটি ফুড়ে বের হন প্রেমিক তাহের। বিয়ের পর দিনরাত লুৎফাকে পাঠ করেন তাহের যেন পড়ছেন কোনো নিষিদ্ধ ইস্তেহার।

কিন্তু ঘণ্টা বাজে জীবনের। ছুটি শেষ। ফিরে যেতে হবে কাজে। তাহের তখন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। খবর আসে তাকে বদলি করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের আটক ফোর্ট। চট্টগ্রামে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তাকে যেতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান। লুৎফার যাওয়া হবে না এখনই কারণ কদিন পরেই তার এমএসসি পরীক্ষা। চিটাগাং মেলে তাহেরকে তুলে দিয়ে হঠাৎ বুকটা কেমন ফাঁকা লাগে লুৎফার। এই তো সেদিন পরিচয় মানুষটির সঙ্গে অথচ এরই মধ্যে সে নেই বলে কেমন শূন্য লাগছে চারদিক। পরীক্ষার পড়ায় আর মন বসে না লুৎফার। চোখ বইয়ের পাতায় থাকলেও চোখের নিচে ফুটে থাকে তাহেরের কথা বলবার ভঙ্গি, খুনসুটি, আলিঙ্গন। বায়োকেমেস্ট্রির ফর্মুলা ভুল হয়ে যায় বার বার। পরীক্ষা দিয়ে প্রতিদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বিরস মনে ফেরেন লুৎফা। মনে মনে ভাবেন কবে যে ছাই শেষ হবে এই পরীক্ষা।

একদিন বিকেলে পরীক্ষা দিয়ে ফিরছেন লুৎফা, বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে তার চোখ। লুৎফা ঘুরে দেখেন তার সামনে তাহের। একটু ঘোর লাগে লুৎফার, স্বপ্ন দেখছেন না তো? তাহের বলেন : দু'টা খবর নিয়ে এসেছি। একটা ভালো খবর, একটা খারাপ।

লুৎফা : আগে ভালো খবরটা বলো।

তাহের : আমেরিকায় যাচ্ছি ট্রেনিং-এ। নর্থ ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্রেগের স্পেশাল ফোর্সেস অফিসার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে ছয় মাসের ট্রেনিং। আমিই প্রথম বাঙালি অফিসার এই ট্রেনিংয়ের জন্য সিলেক্টেড হয়েছি।

লুৎফা : আর খারাপটা?

তাহের : আর খারাপ খবর হলো আবার আমাদের বিচ্ছেদ হবে।

দ্বিতীয় খবরটাই লুৎফার কাছে বড় খবর। বিষণ্ন হয়ে পড়েন তিনি। নিঃশব্দে তাহেরের পাশেপাশে ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকেন লুৎফা। চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে টের পান তার হাতের আঙ্গুলগুলো চেপে ধরছে আরেকটি হাত। লুৎফা বলেন : হাত ছাড়ো। এটা কি তুমি আমেরিকার রাস্তা পেয়েছ?

তাহের : আরে বউয়ের হাত ধরেছি তাতে অসুবিধা কি? আর আমেরিকার কথা যখন বললে, আমি ঠিক করেছি আমাদের হানিমুনটা হবে আমেরিকাতেই। ইচ্ছামতো হাত ধরাধরি করে হাঁটব সেখানে।

ঢাকা থেকে আটক ফোর্ট হয়ে আমেরিকায় উড়ে যান তাহের। বিয়ের পর মাত্র সপ্তাহ তিনেকের হযবরল সংসার লুৎফার।

আমেরিকা থেকে তাহের লেখেন : এখানে বোধহয় হানিমুনটা করা হবে না। প্রচণ্ড কড়া ট্রেনিং, এক মুহূর্তও ফাঁক নেই। ভিসার সমস্যা আছে, টেনিংয়ের পর বেশিদিন এখানে থাকাও যাবে না। আমরা বরং ইংল্যান্ডে হানিমুন করব।

তাহেরের ছোট বোন শেলী তখন স্বামীর সঙ্গে লন্ডনে আর লুৎফার বড় ভাই রাফি আহমেদ তখন ফিজিক্সে পিএইচডি করছেন অক্সফোর্ডে। সিদ্ধান্ত হয় মাস

ছয়েক পরে লুৎফা চলে যাবেন অক্সফোর্ডে তার ভাইয়ের কাছে আর তাহের আমেরিকা থেকে ট্রেনিং শেষ করে সেখানে মিলিত হবেন লুৎফার সঙ্গে। অক্সফোর্ড, লন্ডনে বেশ কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে তারপর ফিরবেন তারা। দিন গোনেন লুৎফা। স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে কখন পেরিয়ে যায় ছয় মাস। আমেরিকা থেকে তাহের চিঠি লিখে পাঠান আবু ইউসুফকে, 'আমার বউকে আমি চাই অক্সফোর্ডে।' বাদশা তাহেরের হুকুম।

ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন লুৎফা। গিয়ে ওঠেন অক্সফোর্ডের নর্থ পার্কের পাশে, নরহাম গার্ডেন রোডে ভাই রাফি আহমদের ছোট্ট ফ্ল্যাটে। রাফি লেজার নিয়ে গবেষণা করছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুদিন পর ট্রের্নিং শেষে আমেরিকা থেকে উড়ে আসেন তাহের। অক্সফোর্ডে শুরু হয় লুৎফা আর তাহেরের মধুচন্দ্রিমা।

পৃথিবীর প্রাচীন একটি বিশ্ববিদ্যালয় বুকে নিয়ে ছিমছাম দাঁড়িয়ে আছে অক্সফোর্ড শহর। পাথরের রাস্তা, শতাব্দী পুরনো দালান, রাস্তার পাশে পুরনো দিনের ল্যাম্পপোস্ট। নিরিবিলি শহরে সাইকেলে টুং টাং শব্দ তুলে আরও নিরিবিলি সব গলিতে অদৃশ্য হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ঐ ছবির মতো শহরে নিশ্চিন্তে হাত ধরা ধরি করে ঘুরে বেড়ান লুৎফা আর তাহের। এমনিতে কুয়াশা আর মেঘেই বছরের বেশির ভাগ সময় ঢেকে থাকে ইংল্যান্ডের আকাশ। কিন্তু লুৎফা আর তাহের যখন গেছেন তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল, ওদের সামার। আকাশ পরিষ্কার, বাইরে রোদ্দুর, চারদিকে ডেফোডিল ফুলের ছড়াছড়ি, মানুষের মনে ফুর্তি। ফুরফুরে বাতাস আর বিকালের সোনালি রোদে সুরম্য নর্থ পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসেন দুজন। নাম না জানা গাছের পাতা এসে পড়ে ওদের পায়ের কাছে। তাহের কণ্ঠে উত্তেজনা নিয়ে লুৎফাকে শোনান নর্থ ক্যারোলিনার ট্রেনিংয়ের গল্প।

তাহের : কি যে সব টাফ ট্রেনিং কি বলব তোমাকে। একবার তো আমাদের এক ডিপ ফরেস্টে ছেড়ে দিয়ে বলল দশ দিন এখান থেকে বের হতে পারবে না। সঙ্গে খাবার দাবার কিচ্ছু না, শুধু কয়েকটা যন্ত্রপাতি। জঙ্গলে ঘোরার অভ্যাস অনেক আছে আমার কিন্তু, খাবার দাবার, তাবু টাবু ছাড়া দশ দিন! গাছ কেটে পাতা টাতা দিয়ে ঘর একটা বানিয়ে থাকা গেল। কত রকম যে পোকা মাকড়, আর সাপ। বানর ছিল অনেক। বানর কোনো গাছের ফল খায় তাই দেখে দেখে ফল খেলাম। জঙ্গলে তো নানা রকম পয়জনাস ফল আছে, বানর খেলে বুঝতে পারি ঐটাতে বিষ নাই। ফল খেয়ে আর কত দিন চলে। একদিন এক খরগোশ ধরে পুড়িয়ে খেলাম, ব্যাঙ খেয়ে কাটালাম কয়েকদিন।

লুৎফা চেঁচিয়ে উঠেন : ব্যাঙ খেয়েছ তুমি?

তাহের : ব্যাঙ কি, যা অবস্থা তাতে পারলে তখন সাপও খাই।

দূরে বেজে ওঠে চার্চের ঘণ্টা। বেঞ্চেই লুৎফার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে তাহের। বলে : কেমন অদ্ভুত লাগে চার্চের ঘণ্টা, তাই না? আমার হেমিংওয়ের উপন্যাসটার কথা মনে পড়ে : ফর হুম দি বেল টোলস।

রাতে ঘরে ফিরে লুৎফাকে ফোর্ট ব্যাগের সার্টিফিকেট দেখান তাহের : দেখ দেখ কি লিখেছে ওরা। সার্টিফিকেটে লেখেছে, "আবু তাহের ইজ ফিট টু সার্ভ উইথ এনি আর্মি আন্ডার এনি কন্ডিশন ইন দি ওয়ার্ল্ড।"

তাহের বলেন : ওরা লিখেছে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি কাজ করতে সক্ষম। কিন্তু আমি তো পৃথিবীর কোথাও যেতে চাই না লুৎফা। আমি ফিরে যেতে চাই বাংলাদেশে। যে কাজটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে সেটা শেষ করতে চাই। আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ, অ্যান্ড মাইলস টু গো বিভোর আই স্লিপ ... প্রেমিক তাহেরের বুকের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা বিপ্লবী বাঘটি মুহূর্তের জন্য আড়মোড়া ভাঙ্গে।

কিন্তু অক্সফোর্ডে বিপ্লবী নয়, প্রেমিক তাহেরেরই জয়। রাফি আর তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে এক উৎসব মুখর, নির্ভার সময় কাটে লুৎফা আর তাহেরের। তখন বেশ কিছু পাকিস্তানি তরুণ পড়াশোনা করছেন অক্সফোর্ডে, অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের। বাঙালি হলেও মেধাবী, আমুদে রাফি আহমেদই পাকিস্তানি তরুণদের নেতা। অক্সফোর্ডের পাকিস্তান সোসাইটির সেক্রেটারি তিনি। রাফি ব্যাচেলার মানুষ, কোনো পিছু টান নেই, প্রায়ই কোনো পাবে বা বন্ধুর বাড়িতে চলে অনেক রাত অবধি আড্ডা। শুধু স্বদেশী নয় বিদেশিদের কাছেও সমান জনপ্রিয় রাফি। অনেক ব্রিটিশ বন্ধু, বান্ধবী রাফির।

কাছেই টেমস নদীর একটি শাখা, সেখানে কোনো কোনো দিন ক্যানুইংএ যান কয়জন মিলে। লুৎফা কিছুতেই নৌকায় উঠতে চান না। কিন্তু তখন তাহেরের যাবতীয় বীরত্ব যেন লুৎফাকে ঘিরে। লুৎফাকে জয় করার মধ্যেই যেন যাবতীয় আনন্দ। তাহের বলেন : আরে ভীতুর ডিম, আসো তো!

একরকম জোর করেই তাহের লুৎফাকে টেনে তোলেন ছোট ক্যানুইং বোটে। দুদিকে বৈঠা ঠেলে তর তর করে এগিয়ে যান প্রবল স্রোতের দিকে। লুৎফা চিৎকার করেন : থামো, থামো নেমে যাবো আমি।

তাহের আরও জোরে ছুটে চলেন খরস্রোতের দিকে। লুৎফা চোখ বুজে তাহেরকে জাপটে ধরে বসে থাকেন।

কোনোদিন সারাটা সময় কাটান কাছের অ্যাসমোলিয়াম মিউজিয়ামে। মিসরের পিরামিড আর মমীর রহস্যময় জগতে ঘুরে বেড়ান দুজন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বদলিয়ান লাইব্রেরিতে ঢুকে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকেন তাহের। পাঁচ শ বছরের পুরনো লাইব্রেরি। লাইব্রেরির ভূগর্ভস্থ অংশ আর উপরের অংশ মিলিয়ে কয়েক লাখ বই। তাহের কিছু কিছু বই ছুঁয়ে দেখেন, গন্ধ শুঁকে দেখেন, অন্যমনস্ক হয়ে বলেন, এই সব বই পড়তে কটা জীবন লাগবে? সময়

পেলেই তাহের ঢুঁ মারেন বিখ্যাত বইয়ের দোকান ব্ল্যাকওয়েলে। কিনে ফেলেন পছন্দের নানা বই।

কোনো কোনোদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাটে পার্টিতে হুল্লোড় করে। বিশেষ করে রাফির বন্ধু রক্ষ প্রায়ই তার বাসায় নিমন্ত্রণ করেন তাহের আর লুৎফাকে। তাঁরা সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আসেন রক্ষের বাসায়। বিচিত্র এক মানুষ রক্ষ। পেশায় ডাক্তার। জার্মানিতে গিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ইয়ুংয়ের মনস্তত্ত্ব নিয়ে। একসময় সবকিছু ছেড়েছুড়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন নৃবিজ্ঞানে। আদিম মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন তিনি। তার আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় নানা প্রচীন গুপ্তবিদ্যা। ভারতের তান্ত্রিক সাধনা, আফ্রিকার ভুদু এদের নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। চিকিৎসা আর নৃবিজ্ঞানের বাইরে রক্ষ সাহিত্য, চিত্রকলা আর সঙ্গীতের গভীর সমঝদার। তার ঘরের দেয়াল মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত পেইন্টিংএ ভরা, এক ঘরে ঠাসা ধ্রুপদী মিউজিকের লং প্লে। আর নানা রকম বইয়ের বিশাল সংগ্রহ তো আছেই। ব্যাচেলর রক্ষ নিজের বাসায় বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে প্রায়ই ড্রিংকসের আয়োজন করেন। নিজে খুব বেশি কথা বলেন না কিন্তু অন্যের সাহচর্য উপভোগ করেন। বহুমুখী আগ্রহের মানুষ এই রক্ষের সঙ্গে আড্ডা তাহেরও উপভোগ করেন। তাহের আর লুৎফাকে দেখলেই রক্ষ বলে উঠেন, হ্যালো, লাভ বার্ডস।

ডিনারে দাওয়াত দিয়ে জগৎ সংসারের যাবতীয় প্রসঙ্গে আলাপ করেন তিনি। ফ্রয়েড আর ইয়ুংয়ের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলাপ করতে করতে চলে যান মোজার্ট আর বিঠোফেন প্রসঙ্গে। এক ফাঁকে উঠে গিয়ে সিবাস্তিয়ান বাখের সঙ্গীত ছেড়ে দেন রক্ষ।

রক্ষ লুৎফাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার পেইন্টিং এ আগ্রহ আছে?

লুৎফা বলেন : আমি পেইন্টিং তেমন বুঝি না।

রক্ষ : চল তোমাকে পেইন্টিং দেখাই।

ঘরের অন্য এক কোণে বসেন রাফি আর তাহের। তাহেরের হাতে ওয়াইনের গ্লাস। রক্ষ লুৎফাকে নিয়ে তার ঘরের দেয়ালজুড়ে থাকা পেইন্টিংগুলো ঘুরে ঘুরে দেখান। রাফায়েল, রিউবেনসহ সব মাস্টার পেইন্টারদের ছবি। পেইন্টিংগুলোর কিছু মৌলিক, অধিকাংশই রিপ্রোডাকশন। রক্ষ লুৎফাকে বোঝান কি করে এল গ্রেকো ভিন্ন ধারার যীশুর ছবি এঁকেছেন, শোনান চিত্রকর মদিগ্লিনির বেদনার্ত জীবনের কথা। পেইন্টিংগুলো দেখতে দেখতে লুৎফা নিঃশব্দে রক্ষের কথা শোনেন। একফাঁকে রক্ষকে জিজ্ঞাসা করেন : এত বড় বাড়ি তোমার একা থাকো বিয়ে করনি কেন?

রক্ষ হাসতে হাসতে বলেন : বিয়ে করিনি বলাটা ঠিক হবে না আসলে আমাকে কেউ বিয়ে করেনি।

মুচকি হাসেন লুৎফা। তাদের কথাকে ঘিরে থাকে বাখের সঙ্গীত। এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে ঘুরতে ঘুরতে এক পর্যায়ে রক্ষ দূরে বসে থাকা তাহেরকে জিজ্ঞাসা করেন : তাহের, তোমার বউকে যদি আমি কারেনিনা নামে ডাকি তোমার কোনো আপত্তি আছে?

তাহের : নট এট অল। কিন্তু কেন বলো তো?

রক্ষ : টলস্টয়ের আনা কারেনিনার যে ইমেজ আমার মনে আছে তার সঙ্গে তোমার বউয়ের কোথায় যেন মিল আছে। ম্যালানকোলিক কিন্তু এলিগ্যান্ট।

হো হো করে হেসে ওঠে তাহের। বলেন : তাই নাকি? নোটিস করিনি তো।

রক্ষের ঘরের এক কোণে রাখা পিয়ানোর সামনে বসে টুং টাং বাজাতে চেষ্টা করেন লুৎফা। ছোটবেলায় হারমোনিয়াম বাজিয়েছেন লুৎফা। ফলে পিয়ানোতে সা রে গা মা'র সুর খানিকটা তুলতে পারেন। রক্ষ গ্লাসে নতুন করে ওয়াইন ভরে এনে ধুপ করে এসে বসেন পিয়ানোর পাশে রাখা সোফাটিতে। বলেন : কারেনিনা, তুমি পিয়ানো শিখবে? আমি তোমাকে পিয়ানো শেখাবো।

চোখে মুগ্ধতা নিয়ে বিষণ্ন রূপসী লুৎফার দিকে তাকিয়ে থাকেন রক্ষ। রক্ষের আগ্রহ যেন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে মনে হয় লুৎফার। অস্বস্তি বোধ করেন তিনি। লুৎফাকে ঘিরে মনের মধ্যে জেগে ওঠা এই অযাচিত মুগ্ধতার কথা পরে একদিন বন্ধু রাফির কাছে বলেই ফেলেন রক্ষ। বলেন : আই উইস আই কুড ফল ইন লাভ উইথ ইওর সিস্টার।

ক্ষেপে যান রাফি : ডোন্ট টক ননসেন্স।

ক্ষণিক পরিচয়ের এই নিঃসঙ্গ মানুষটিকে ভুলেই গিয়েছিলেন লুৎফা। অনেক বছর পর তাকে তার আবার মনে পড়বে যখন অপ্রত্যাশিত এক চিঠি আসবে তার কাছে অদ্ভুত এক সময়ে। তখন তাহের আর এই পৃথিবীতে নেই, লুৎফা তার তিনটি সন্তান নিয়ে অস্তিত্বের কঠিন লড়াই করছেন। ছোট্ট একটি চিঠি আসবে লুৎফার কাছে, "কারেনিনা, আমি সব খবর পেয়েছি, সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার নেই। তোমার জন্য আমার ঘরের দরজা সব সময় খোলা। তোমার এই দুর্দিনে এই অভাজন যদি তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে চায় তুমি কি তাকে গ্রহণ করবে?—রক্ষ।"

চমকে উঠবে লুৎফা। ভাববে, বলে কি লোকটা!

সেসব অনেক পরের কথা। আমরা আছি রক্ষের বাড়ির পার্টিতে। বাখের মিউজিক শুনে আর ওয়াইনের বোতল উজাড় করে অনেক রাতে গল্প করতে করতে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরেন তাহের, লুৎফা, রাফি। পথে হঠাৎ টিপ টিপ বৃষ্টি নামলে তাহের তার জ্যাকেটটা খুলে মাথা ঢেকে দেন লুৎফার।

লুৎফা জানেন না ইংল্যান্ডের এই দিনগুলোই হবে তাঁর জীবনের একমাত্র মধুময় সময়। তিনি জানেন না, এই ভাবনাহীন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সময় তার

জীবনে আর কখনো ফিরে আসবে না। জানেন না, তাহেরকে এতটা দীর্ঘ সময় ধরে, এতটা কাছে তিনি আর কখনই পাবেন না।

অক্সফোর্ড ছাড়াও কিছুদিন কার্ডিফ, কিছুদিন লন্ডনে সময় কাটান দুজন। লন্ডনে ঘুরে ঘুরে দেখেন পিকাডেলি সার্কাস, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, বার্কিংহাম প্যালেস। দেখতে দেখতে পেরিয়ে যায় মাস। আবারও শেষ হয়ে আসে ছুটি। শেষের দিকে বিভিন্ন শপিং মলে ঘুরে আত্মীয় স্বজনদের জন্য কেনাকাটা করেন দুজন মিলে। লুৎফার নিজের জন্য পছন্দ কার্ডিগেন। তাহের লুৎফাকে দামী দুটো কার্ডিগেন কিনে দেন লন্ডন থেকে। তাহেরের বিশেষ আগ্রহ জুতার ব্যাপারে। নিজের জন্য দামী দুজোড়া জুতা কেনেন তিনি। লুৎফা পছন্দ করে তাহেরকে কিনে দেন একটা সোনার আংটি।

ফিরবার সময় যখন ঘনিয়ে আসছে তখন তাহেরের মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপে। একদিন রাফি আহমেদের বাসায় নাস্তার টেবিলে তিনি বলেন : আমি ঠিক করেছি লন্ডন থেকে একটা গাড়ি কিনব এবং ড্রাইভ করে ইউরোপ, টার্কি, আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান পৌঁছাবো।

রাফি বলেন : ইন্টারেস্টিং আইডিয়া, কিন্তু রিস্কি।

তাহের : আরে রাফি লাইফে একটু রিস্ক না থাকলে চলে নাকি?

লুৎফা : বল কি? তুমি এই হাজার হাজার মাইল গাড়ি ড্রাইভ করবে?

তাহের : ভয় পাচ্ছ? রাফি তোমার এই ভীতু বোনটাকে নিয়ে বড় মুশকিল।

ধু-ধু প্রান্তরে ল্যান্ডরোভার গাড়িতে ধুলো উড়িয়ে একের পর এক সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে তাহের, পাশে প্রেমিকা, স্ত্রী লুৎফা। কোনো এক অজানা জনপদে তাঁবু খাটিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে রাত। এই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় তখন বুদ তাহের। লুৎফাকে বলেন : শোন প্লেনে গেলে ধুপ করে উঠে টুপ করে নেমে পড়ব, দেখার মধ্যে দেখা হবে আকাশের মেঘ। গাড়িতে দেশ দেখতে দেখতে, মানুষ দেখতে দেখতে যাবো।

লুৎফা ইতোমধ্যে টের পেয়েছেন, এ এক ছুটে চলা মানুষ, তার গতির সঙ্গে তাল মেলানোর দীক্ষা তাকে নিতে হবে। জানেন একবার যখন তাহেরের মাথায় ঢুকেছে এ কাণ্ড তিনি করেই ছাড়বেন। ফলে তিনিও এই অ্যাডভেঞ্চারের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকেন।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক পর গাড়ি কিনবার জন্য তাহের যখন দোকানে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, লুৎফা বলেন : গাড়িতে যাওয়া হবে না।

তাহের : কেন, ভয় পাচ্ছ এখনও ?

লুৎফা : হ্যাঁ, পাচ্ছি। আমার জন্য না অন্য আরেকজনের জন্য।

তাহের : মানে?

কিছু বলেন না লুৎফা। নিঃশব্দে কাপড় গোছাতে থাকেন। জুতার ফিতা লাগাতে লাগাতে থমকে যান তাহের, গভীরভাবে তাকান লুৎফার দিকে। লুৎফা মুচকি হাসেন। উত্তেজনায় লাফ দিয়ে উঠেন তাহের : মাই গুডনেস! বল কি?

লুৎফাকে জড়িয়ে ধরে চুমু এঁকে দেন কপালে। রাতে বিছানায় শুয়ে বলেন, দেখো ঠিক মেয়ে হবে। নাম রাখব জয়া।

মোগল দুর্গের দিন

ল্যান্ডরোভার গাড়ির অ্যাডভেঞ্চার আর হয় না। প্লেনেই পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসতে হয় দুজনকে। তাহেরের সবচেয়ে বড় ভাই আরিফুর রহমান তখন ইসলামাবাদে চাকরি করছেন প্ল্যানিং কমিশনে। তাঁর বাড়িতেই উঠলেন দুজন। লুৎফাকে ইসলামাবাদ রেখে তাহের চলে যান রাওয়ালপিন্ডি এবং পেশওয়ারের মাঝামাঝি টু কমান্ডো ব্যাটালিয়ান আটক ফোর্টে, এখানেই তাঁর নতুন পোস্টিং। কিছুদিন পর চলে এলেন লুৎফাও।

শের শাহর তৈরি গ্রান্ড ট্রাংক রোডের ঠিক উপরে মোগল সম্রাট আকবরের তৈরি আটক দুর্গ। অবাক হয়ে এই প্রকাণ্ড দুর্গটিকে দেখেন লুৎফা। দুর্গের চারপাশে গভীর পাথুরে খাদ, খাদের কিনারা ঘেষে দুর্গের আকাশচুম্বী দুর্ভেদ্য দেয়াল। পেটানো লোহার ভীষণ মজবুত দুর্গের বিশাল প্রধান ফটক। ফটকের দরজার পাল্লায় অসংখ্য সুচালো লোহার স্পাইক। সামনের দেয়ালে বড় বড় ছিদ্র, যে ছিদ্র দিয়ে মোগল সৈনিকেরা দুর্গ আক্রমণকারী শত্রুদের ওপর গরম পানি, বোল্ডার নিক্ষেপ করতেন। দুর্গের ভেতর অনেক গোপন, ভুগর্ভস্থ কক্ষ। এখন সেখানে থাকে টু কমান্ডো ব্যাটালিয়নের গোলা বারুদ। দুর্গ থেকে একটু দূরেই 'বেগম কি সরাই' বা রানীর পান্থশালা। সরাইয়ের সামনে বয়ে যাচ্ছে সিন্ধু নদ। মোগল রানীরা সখীদের নিয়ে জলকেলী করতে আসত এখানে। এখন এই সরাইয়ের পাশের মাঠে চলে টু কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের পিটি প্যারেড। সরাই থেকে খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেছে গ্রান্ড ট্রাংক রোড। এই ঢালের উপরেই টু কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের অফিসার্স মেস।

একদিকে ব্যাচেলার অফিসার্স কোয়ার্টার, কিছু দূরেই ম্যারিড অফিসার্স কোয়ার্টার। ম্যারিড অফিসার্স কোয়ার্টারে জায়গা না থাকাতে ব্যাচেলার কোয়ার্টারে দুটো রুম নিয়ে উঠেন তাহের, লুৎফা। মেজর তাহের তখন টু কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের কমান্ডিং অফিসার।

রাতে তাহেরের আটক ফোর্টে যোগদানের উপলক্ষে ডিনারের আয়োজন। ইউনিটের সব অফিসার সেখানে উপস্থিত। স্যুট টাই পড়া কেতাদুরস্ত অফিসাররা চারদিকে। কাঁটা চামুচ দিয়ে খাওয়া, ইংরেজি কথা, আশপাশে মুহূমুহূ স্যালুট, স্যার স্যার সম্বোধন এ সবই নতুন লুৎফার কাছে। তাহের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন স্ত্রী লুৎফাকে। পশ্চিম পাকিস্তানি কর্নেল সোলেমান খান তাহেরের বস। হাসিখুসি, সদালাপী মানুষ। তাকে ভালো লাগে লুৎফার। অন্যান্য জুনিয়র আফিসারদের সঙ্গেও পরিচয় হয়, ক্যাপ্টেন পারভেজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন

সাঈদ, ক্যাপ্টেন আনোয়ার এমনি আরও অনেকে। এদের মধ্যে শুধু ক্যাপ্টেন আনোয়ার বাঙালি। তাকে ডাকেন তাহের : হাই আনোয়ার, কি খবর তোমার?

একজন বাঙালির দেখা পেয়ে মনে স্বস্তি আসে লুৎফার। তাহের ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে বলেন : এখন তো আমরা তোমাদের ব্যাচেলার কোয়ার্টারেই আছি, হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম অ্যান্ড হ্যাভ ডিনার এভরি ডে উইথ আস। বাংলায় কথা বলতে পেরে তোমার ভাবীর একটু ভালো লাগবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টে নতুন জীবন শুরু তাদের। তাহের বলেন : লুৎফা, চাকরি আমি করে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমার মিশন চলবে। সিরাজ শিকদারের সঙ্গে মিলে যে কাজটা শুরু করেছিলাম সে অসম্পূর্ণ কাজটা শেষ করতে হবে। ওয়েস্ট পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে অনেক বাঙালি অফিসার আছে, ওদেরকেও একটু ইন্সপায়ার করা দরকার।

ক্যাপ্টেন আনোয়ার মাঝে মাঝে খেতে আসেন তাহের আর লুৎফার সঙ্গে। খেতে খেতে তাহের আনোয়ারকে বলেন : তুমি কমান্ডোতে যোগ দিয়েছ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। বাঙালি কমান্ডো তো আর নাই। মনে রেখো দেশ স্বাধীন করতে হবে, তোমাদের দরকার।

রাজনীতির সঙ্গে আনোয়ারের কোনো সক্রিয় যোগাযোগ নেই আর তাহেরের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই তার। সিনিয়র অফিসারের মুখে এধরনের কথা শুনে ক্যাপ্টেন আনোয়ার অবাক। আমতা আমতা করে বলেন, কিন্তু স্যার পাকিস্তান তো একটা স্বাধীন দেশ।

ধমক দিয়ে উঠেন তাহের : ইউ স্টুপিড, ড্যাম উইথ ইওর পাকিস্তান। ভুলে যেও না যে তুমি একজন বাঙালি। সুতরাং বুঝতেই পারছ কোন দেশ স্বাধীন করার কথা বলছি। পাকিস্তানের সাথে থেকে আমাদের কিছু হবে না। উই মাস্ট হ্যাভ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স। আর্মির ভেতরেই কি লেভেলে ডিসক্রিমিনেশন টের পাও না? এক ব্রিগেডিয়ার সেদিন বলছিল, এই সব ছোটে ছোটে কালে কালে মাছলি খাওয়া বাঙালি আবার যুদ্ধ করবে কি? আর্মিতে নাকি বাঙালিদের রিক্রুট করারই দরকার নাই। যুদ্ধ কাকে বলে ও বেটাদের দেখিয়ে দিতে হবে, বুঝলে আনোয়ার ?

ইতোমধ্যে ম্যারেড অফিসার্স কোয়ার্টার খালি হলে তাহের, লুৎফা, সেখানে গিয়ে উঠেন। লুৎফা শুরু করেন তার সংসার সাজানো। তাহের বাড়ির বাজার ঘাট, কেনাকাটার ভার লুৎফার ওপর ছেড়ে দিয়ে চলে যান অফিসে। তাকে সাহায্য করবার জন্য হাজির থাকে ব্যাটম্যান, হাবিলদার। কিন্তু এদের সামলাতেই হিমশিম খান লুৎফা। তার সামান্য উর্দু জ্ঞান নিয়ে হাবিলদারদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাহেরকে বলেন, বাঙালি ব্যাটম্যান পাওয়া যায় না?

তাহের : আমার তো এই ব্যাটম্যানের ধারণাটাই খুব বাজে মনে হয়। স্রেফ ক্রীতদাস। সুযোগ পেলে এই সিস্টেমটাই আমি উঠিয়ে দিতাম। যাহোক, তোমার জন্য বাঙালি ব্যাটম্যান যোগাড় করে দিচ্ছি।

কোন কোনো দিন বেগম কি সরাইয়ের সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া সিন্ধু নদের পাড় ঘেষে গল্প করতে করতে হাঁটেন তাহের , লুৎফা। লুৎফা তখন গর্ভবতী। আসন্ন সন্তান নিয়ে কল্পনার জাল বোনেন দুজন। তবে যথারীতি তাহেরের গল্পে ঘুরে ফিরে আসে রাজনীতি আর দেশের কথা। তাহের বলেন : দেশে ট্রান্সফার নেওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে থেকে তো আমার সময় নষ্ট। আমি তো ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারেল হবার জন্য আর্মিতে ঢুকিনি। দেশের কমিউনিস্ট দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এখানে বসে সেটা তো ডিফিকাল্ট। একটা সোসালিস্ট রেভ্যুলেশন ঘটাতেই হবে বাংলাদেশে। সেটা হতে হবে একটা পার্টির থ্রুতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার আমার। লুৎফা, তোমাকে কিন্তু প্রিপিয়ার্ড থাকতে হবে। আমি যে কোনো সময় একটা ড্রাস্টিক ডিসিশন নিয়ে ফেলতে পারি। চাকরি ছেড়ে দিতে পারি।

লুৎফা চোখ তুলে তাহেরের কথা শুনতে শুনতে চাপা শ্বাস নেন। এই লোকটির সঙ্গে যখন জীবন বাধা পড়েছে তখন তাকে প্রস্তুত হতেই হবে অনাগত ঘটনাপ্রবাহের জন্য।

তাহের বলেন : আমি চাই তুমিও আমার সঙ্গে একটিভলি যুক্ত থাকো, আমার কাজের পার্ট হও। রেভ্যুলেশনের ব্যাপারে আমার ভাবনাগুলো নিয়ে আরও কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে।

লুৎফা : আমার কি আর তোমার মতো অত পড়াশোনা আছে?

তাহের : তাতে কি? পড়াশোনা করবে। এক কাজ করো, আমি যখন অফিসে তুমি তো বাসাতেই আছো। সারাদিন আর তোমার তো এখন বিশ্রাম নেবারই সময়। তুমি বরং টাইমটা পড়াশোনা করে ইউটিলাইজ করো। আমি তোমাকে একটা করে এসাইনমেন্ট দিয়ে যাবো, রাতে এসে সেটা নিয়ে কথা বলব, কি বলো?

রাজি হয় লুৎফা।

তাহের বলেন : মার্ক্সবাদের বেসিক কনসেপ্টগুলো তো তোমার জানা আছে?

লুৎফা : ঐ অ আ ক খ পর্যন্ত।

তাহের : ওতেই চলবে। তোমাকে আজকে লেনিনের 'সোসালিজম অ্যান্ড ওয়ার' বইটা দেব। পড়তে শুরু করো। আমি সোসালিস্ট রেভ্যুলেশনের জন্য কেন আর্মস স্ট্রাগলের কথা বলছি সেটা ব্যাখ্যা করব।

লুৎফা ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেন। বলেন : আর পেটের ভেতরে যেটা আছে, ওটার কি হবে?

তাহের হেসে বলেন : ওটাও হবে লিটল কমরেড। চলো উঠি আজকে।

বেগম কি সরাইয়ের সামনে দিয়ে হেঁটে দুজন ফেরে কোয়ার্টারে। সিন্ধু নদ থেকে আসা হাওয়ায় লুৎফার আঁচল উড়ে। পিঠের পিছন দিয়ে হাত বাড়িয়ে লুৎফাকে জড়িয়ে রাখেন তাহের। একটা অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপে লুৎফার। তবু মনে হয় এ লোকটি পাশে থাকলে তিনি যেন নিরাপদ।

তাহেরদের পাশের কোয়ার্টারে থাকেন ক্যাপ্টেন পারভেজ মোশাররফ। ফুর্তিবাজ মানুষ, নতুন বিয়ে করেছেন। স্ত্রী ইংরেজি সাহিত্যের তুখোর ছাত্রী। ক্যাপ্টেন পারভেজের স্ত্রী মাঝে মাঝে সঙ্গ দেন লুৎফাকে। এদিক ওদিক বেড়াতে নিয়ে যান, শহরে একসাথে যান কেনাকাটা করতে। ভাঙ্গা উর্দু, ভাঙ্গা ইংরেজিতে আলাপ চালিয়ে যান লুৎফা। একদিন লুৎফা তাহেরকে বলেন : এখানে যখন আছি তখন উর্দুটা একটু ভালোভাবে শিখে নিলে তো হয়।

তাহের বলেন : কোনো দরকার নাই। নতুন একটা ভাষা যদি ভালো করে শিখতেই হয় তাহলে ইংরেজিটা শেখ, উর্দু শিখতে যাবে কেন?

ক্যাপ্টেন পারভেজ মোশাররফ ছুটির দিনে প্রায়ই সস্ত্রীক তাহেরদের বাসায় এসে স্যালুট ঠুকে বলেন : স্যার চলে এলাম অসময়ে। চলেন দু ডিল কার্ড খেলি। ক্যাপ্টেন আনোয়ার আর সাঈদকে ডেকে আনি।

তাহের পারভেজের বস কিন্তু তাদের সম্পর্ক বন্ধুর মতোই। তাহের জুনিয়র ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে কার্ড খেলতে বসে যান। লুৎফা আর পারভেজ মোশারফের স্ত্রী ঢোকেন রান্নাঘরে, স্পেশাল মাংসের রেজালা রান্না করতে। আজ খাওয়া হবে একসাথে। রাজনীতি নিয়ে পারভেজের তেমন আগ্রহ নেই। নানা ঠাট্টা ইয়ার্কি করে তিনি মাতিয়ে রাখেন সবাইকে।

বহু বছর পর রাজনীতিতে অনুৎসাহী, ফুর্তিবাজ এই ক্যাপ্টেন পারভেজ মোশাররফই হয়ে উঠেন পাকিস্তানের রাজনীতির প্রধান কুশীলব। তিনি হন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে আঁতাত করে পরে আবার বুশের বিরুদ্ধেই বই লিখে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হন পারভেজ। শেষে নিজের দেশের রাজনীতির নানা পাকচক্রে পড়ে হন নাস্তানাবুদ। টেলিভিশনের পর্দায় বিপর্যস্ত জেনারেল মোশাররফকে পদত্যাগের ভাষণ দিতে দেখে লুৎফার মনে পড়ে অনেক বছর আগের সেই চপল তরুণ অফিসারটির মুখ। দেখতে দেখতে লুৎফা ভাবেন, জীবন কাকে কোথায় নিয়ে যে ঠেকায়!

আটক ফোর্টে তাহেরের পশ্চিম পাকিস্তানি বস কর্নেল সোলেমান তাহেরকে পছন্দ করেন। বস হলেও অফিসের বাইরে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন তিনি। প্রায়ই চলে আসেন লুৎফার বাড়িতে। লুৎফা মাছ খেতে পছন্দ করে কিন্তু আশপাশে মাছ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। কর্নেল সোলেমান তাই বাইশ মাইল দূরের নওশেরা লেকে গিয়ে মাছ শিকার করে বাড়িতে এনে ভেজে খাওয়ান তাহের আর লুৎফাকে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে তাহের তার ক্ষোভ কর্নেল সোলেমানের সঙ্গে খোলামেলাভাবেই আলাপ করেন। কর্নেল সোলেমান বলেন,

আই এগ্রি ইউথ ইউ তাহের। বাট দি ওয়ে ইওর লিডার মুজিব ইজ মুভিং ইজ ডেঞ্জারাস। ইন দ্যাট কেস পাকিস্তান উইল নট রিমেইন ইউনাইটেড এনি মোর।

তাহের : প্রবাবলি দ্যাট ইজ হোয়াট দি বাঙালিজ ওয়ান্ট।

কর্নেল সোলেমান : ওয়েল, উই উইল সি।

মাঝে মাঝে ইসলামাবাদে বড় ভাই আরিফুর রহমানের ওখানে চলে যান তাহের। পশ্চিম পাকিস্তানে দুই বাঙালি একত্রিত হলে আলাপের প্রসঙ্গ দাঁড়ায় একটাই, পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের সীমাহীন বৈষম্য। আরিফ প্ল্যানিং কমিশনে আছেন বলে অনেক ভেতরের খবর দিতে পারেন।

আরিফ বলেন : দেখছি তো ইস্ট পাকিস্তানের কোনো প্রজেক্ট হলে সেটা পাস করতে কেমন তালবাহানা করে এরা, তারপর পাস হলেও টাকাটা পাঠায় এমন দেরিতে যে ওটা কাজে লাগানোরও তখন আর সময় থাকে না। অথচ ওয়েস্টের ব্যাপার হলে সবকিছু ঝটপট। তোমাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। চীন একটা লোন দিয়েছিল ছয় কোটি মার্কিন ডলারের। সেখান থেকে মাত্র এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার খরচ করা হয়েছে পূর্ব পকিস্তানের ওয়াটার আর পাওয়ার সেক্টরে, বাকি পাঁচ কোটিরও বেশি ডলার খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। বাঙালিদের খুশি করার জন্য আইয়ুব খান ঢাকাকে সেকেন্ড ক্যাপিটেল ঘোষণা করেছে। কিন্তু জানো ইসলামাবাদকে ক্যাপিটেল করতে যেখানে ওরা খরচ করেছে তিন হাজার মিলিয়ন টাকা সেখানে ঢাকায় খরচ করেছে মাত্রে আড়াই শ মিলিয়ন।

তাহের যোগ করেন : দেখেন না, কোনো টপপোস্টে তো বাঙালি নাই। আর্মির কথা বাদ দিলাম, একজন বাঙালি সচিবও তো নাই। গভর্নমেন্টের একটা কোনো প্রতিষ্ঠানেরও হেড অফিস এখানে নাই, সব ওয়েস্ট পাকিস্তানে। কোনো বাঙালি কোনোদিন অর্থমন্ত্রী হলো না, স্টেট ব্যাংকের গভর্নর হলো না। এক ব্রিগেডিয়ার সেদিন আমাদের এক আর্মি ডিনারে বলে, বাঙালিরা তো গাদ্দার, এদের জন্মই হয়েছে গোলামি করার জন্য। বাঙালিদের পাক্কা মুসলমান করার দায়িত্ব নাকি পশ্চিম পাকিস্তানিদের।

আরিফ বলেন : এক পাঞ্জাবি জয়েন্ট সেক্রেটারি সেদিন এক মিটিংয়ে বলে, বাঙালিদের এত হায়ার স্টাডির দরকার কি, ওদের মাদ্রাসা পর্যন্ত পড়লেই চলে। চুপচাপ হজম করতে হলো এসব কথা।

কথা কেড়ে নিয়ে তাহের বলেন : আরিফ ভাই, এসব বাঙালি বেশিদিন সহ্য করবে না। একটা কিছু দফারফা হবে দেখবেন খুব শীঘ্র।

তাহেরের ভেতরে সবসময় যে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে লুৎফা তা টের পান।

তাহের বলেন : ট্রান্সফারের একটা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাঙালি অফিসারদের ওরা আর ইস্ট পাকিস্তানে ট্রান্সফার করছে না। ওখানে অবস্থা খুব সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। আনোয়ার লিখেছে, শেখ মুজিব সারাদেশ ঘুরে ঘুরে মোবিলাইজ করছেন মানুষকে। ঘটনা যে কোনোদিকে যাচ্ছে বলা মুশকিল।

অফিস থেকে ফিরে তাহের বসেন রেডিও নিয়ে, নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা স্টেশনের খবর শোনেন, অধীর আগ্রহে শোনেন পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের খবর। চাপা উত্তেজনার একটা উপজাত ব্যাপার হিসেবে তাহেরের ড্রিংক করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায়। একটু আধটু ড্রিংক তাহের সব সময়েই করেন। কিন্তু ঐ সময়টাতে মাত্রাটা বেশ বেড়ে যায়। চিন্তিত হয়ে পড়েন লুৎফা। নিষেধ করেন কিন্তু বিশেষ লাভ হয় না। লুৎফা শেষে ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে বলেন : ভাই আপনাকে তো বেশ স্নেহ করে, আপনি একটু বলেন তো ড্রিংকটা কমাতে।

আনোয়ার একদিন সুযোগমতো অনেক সাহস সঞ্চয় করে আলাপ তোলেন : স্যার ড্রিংকটা একটু কমালে ভালো হতো না? বলেই তিনি ঘামতে শুরু করেন।

তাহের বলেন : তুমি দিনে কয় কাপ চা খাও?

আনোয়ার : দশ কাপের মতো হবে।

তাহের : কেন?

আনোয়ার : একটু ফ্রেশ হবার জন্য, স্যার।

তাহের : তুমি যেমন ফ্রেশ হবার জন্য চা খাও আমিও তেমন ফ্রেশ হবার জন্য মদ খাই। মদ খেয়ে আমি তো মাতলামি করি না, বউকে পিটাই না। তাছাড়া মদ আমাকে খায় না আমি মদকে খাই। বুঝলে ইডিয়ট?

রাইট স্যার : তাড়াতাড়ি বলেন আনোয়ার।

তাহের : নিশ্চয় তোমার ভাবী বলেছে আমাকে এসব বলতে? নাহ, আমার বউটা ভেতো বাঙালিই রয়ে গেল। আচ্ছা ও যখন এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে গেছে ড্রিংক কমিয়ে দেব কিন্তু ছাড়তে পারব না পুরোপুরি।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের নানা ডকুমেন্টারি তখন দেখানো হয় পাকিস্তান আর্মিদের। আমেরিকান সেনাদের ভিয়েতনামে যুদ্ধের প্রস্তুতি সেসব ডকুমেন্টারির বিষয়। একদিন তাহের আর আনোয়ার ওরকম একটা ডকুমেন্টারি দেখছেন। ছবিতে দেখানো হচ্ছে আমেরিকান সৈন্যরা বাঁশের সাহায্য নিয়ে বিশেষ কায়দায় একটা খুব উঁচু দেয়াল পার হচ্ছে। তাহের হঠাৎ বেশ উত্তেজিত হয়ে পাশে বসা আনোয়ারকে বলেন : দারুণ, আমরাও তো ট্রাই করে দেখতে পারি।

আনোয়ার বলেন : কিন্তু খুব রিস্কি হবে স্যার।

ক্ষেপে যান তাহের : মাই ব্লাডি ফুট। রিস্কি শব্দটা কমান্ডোদের অভিধানে আছে নাকি? এই রোববারই আমি আটক ফোর্টের দেয়াল ওভাবে পার হবো। রেপেলিং করার জায়গায় ওটা করব আমি।

আনোয়ার চমকে ওঠেন : কিন্তু আমেরিকানরা যে দেয়ালটা পার হচ্ছে ওটা স্যার ম্যাক্সিমাম বিশ/ত্রিশ ফুট উঁচু হবে। আর আটক ফোর্টের ওয়াল তো এক শ বিশ ফুট। আপনি কি ঠাট্টা করছেন স্যার?

তাহের : শাট আপ। এটা কোনো ঠাট্টার ব্যাপার না। আই এম গোয়িং টু ডু ইট। এ বেটাদের দেখিয়ে দেব বাঙালি অফিসাররা কি করতে পারে।

পরদিন ইউনিটে টি ব্রেকের সময় তাহের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান সবাইকে। ইউনিটের চিফ কমান্ডিং অফিসার কর্নেল সোলেমান আপত্তি করেন ব্যাপারটায়। অন্য অফিসাররাও ব্যাপারটাকে একটা পাগলামি মনে করেন। কিন্তু তাহের তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। কর্নেল সোলেমান তাহেরকে স্নেহ করেন। শেষে কর্নেল সোলেমান রাজি হন এবং সবাইকে পরের রোববার রেপেলিং এরিয়ায় আসতে অর্ডার দেন। সব অফিসার বলাবলি করতে থাকে, ছুটির দিনটাই মাটি।

অফিসে ফিরে আনোয়ার তাহেরকে জিজ্ঞাসা করে : কিন্তু স্যার অত উঁচু বাঁশ পাবেন কোথায়?

তাহের : কেন ছোট ছোট বাঁশের টুকরা জোড়া দিয়ে।

আনোয়ার : কিন্তু স্যার জোড়া দেওয়া জিনিস কি আর আস্ত বাঁশের মতো শক্ত হবে?

তাহের : সেটা আমি ম্যানেজ করব।

রোববার সকাল। সব অফিসার আটক ফোর্টের রেপেলিং করার জায়গায় হাজির। দুর্গের দেয়ালের একটা জায়গা একটু বাঁক খেয়ে খাড়া কোনাকুনি গোল হয়ে উপরে উঠে গেছে। একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া দিয়ে একশ বিশ ফুট উঁচু একটা বাঁশ তৈরি করেছেন তাহের। তাহের দুই হাতে বাঁশের উপরের কোণাটি ধরেন এবং দশ জন বেশ তাগরা সিপাই বাঁশটাকে খাড়া দেয়ালের কোনাকুনি বরাবর ঠেলে একটু একটু করে উপরে উঠাতে থাকেন। তাহের দুই পা দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে অনেকটা হাঁটার ভঙ্গিতে দেয়াল বেয়ে উঠছেন। পঞ্চাশ ষাট ফুটের মতো উঠে গেছেন তাহের। নিচে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছেন সব অফিসার। বুক ধড়ফড় করছে আনোয়ারের। বাঁশটা বেশ দুলছে, যে কোনো মুহূর্তে একটা মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে। নিচে দাঁড়ানো অফিসারদের মধ্যে আতঙ্ক। কিন্তু তাহের দেয়াল বেয়ে উঠাতে উঠতে যে সিপাইরা বাঁশটা ঠেলছে তাদের বলছেন, দ্যাটস রাইট, ক্যারি অন। হ্যাঁ এভাবেই বাঁশটাকে একটু একটু করে ঠেলতে থাকো।

সবাই নিরব। একসময় সবার বিস্মিত চোখের সামনে তাহের আটক ফোর্টের এক শ বিশ ফুট দেয়ালের উপর গিয়ে দাঁড়ান। উপরে দাড়িয়ে চিৎকার করে নিচে কর্নেল সোলেমানকে বলেন, স্যার এটা কোনো ব্যাপারই না। আপনি আরেকজনকে পাঠান।

কর্নেল সোলেমান চারদিকে তাকান কিন্তু না কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। কর্নেল সোলেমান অন্যদের বলেন, তাহের যদি এটা পারে তোমাদেরও পারা উচিত। কিন্তু সবাই নিরুত্তর।

তাহের এবার পাকিস্তানি অফিসারদের হেয় করার মোক্ষম সুযোগটা নেন। তিনি বলেন : অল রাইট। একজন বাঙালি অফিসার যখন এটা পেরেছে আমার ধারণা আরেকজন বাঙালি অফিসার তা পারবে। আনোয়ার এবার তুমি চলে আস।

ক্যাপ্টেন আনোয়ার একটু দ্বিধান্বিত থাকলেও তাহেরের ডাকের পর তার আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না। তিনি সোজা গিয়ে ঐ বাঁশটাকে ধরেন। মনের সব সাহস সঞ্চয় করে শুরু করেন উপরে উঠা। উপর থেকে তাহের চিৎকার করে আনোয়ারকে উৎসাহ দিতে থাকেন : ব্রাভো, এই তো আর একটু, কুইক।

আনোয়ার প্রায় আশি ফুটের মতো উঠেও যান। কিন্তু তখন হঠাৎ বাঁশটা দুলতে শুরু করে এবং ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করতে থাকে। বাঁশটা প্রায় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলে তাহের তাড়াতাড়ি আনোয়ারকে নেমে আসতে বলেন। নেমে যান আনোয়ার।

নিচে নামলে তাহের আনোয়ারকে বলেন : ব্লাডি হেল কমান্ডো, তোমার মতো একটা ভীতু অপদার্থের কমান্ডোতে যোগ দেয়াই উচিত হয়নি। নাউ পুশ অফ।

আনোয়ার মাথা নিচু করে চলে যেতে নিলে, পেছন থেকে ডাক দেন তাহের : কাম অন, ইটস অল রাইট। আমি তোমার বিপদটা টের পাচ্ছিলাম। একবার ইউজের কারণে বাঁশটা তো উইক হয়ে গিয়েছে, তাছাড়া তোমার ওয়েটও তো আমার চেয়ে বেশি। বাদ দাও চলো এবার বারে গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে আসি।

তাহের যখন ক্যান্টনমেন্টের রেপলিং স্কায়ারে আর বারে তাঁর বুকের ভেতর চেপে থাকা উত্তেজনার প্রশমন ঘটাচ্ছেন, পূর্ব পাকিস্তানের অগ্নিগিরিতে তখন শুরু হয়ে গেছে লাভা উদ্‌গীরণ।

ব্যারিকেড, বেয়োনেট, বেড়াজাল

গণআন্দোলনের তোড়ে ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন ১৯৭০ এর ৫ অক্টোবর। প্রায় এক যুগের সামরিক শাসনের পর দেশে প্রথম নির্বাচন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে গড় পড়তা বাঙালির চেয়ে মাথায় উঁচু শেখ মুজিব তার তর্জনি তুলে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের। স্বপ্ন দেখাচ্ছেন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্তির।

হঠাৎ সেপ্টেম্বর মাসে প্রবল বন্যা হলো পূর্ব পাকিস্তানে। বাতিল করা হলো নির্বাচনের তারিখ। ইয়াহিয়া খান ভোটের নতুন তারিখ দিলেন ৭ ডিসেম্বর। কিন্তু প্রকৃতির পুতুল খেলার জায়গা যেন এই বাংলাদেশ, তখনও পূর্ব পাকিস্তান। কিছুদিনের মধ্যেই আবার নেমে এলো ভয়ংকর এক দুর্যোগ। ১২ নভেম্বর উপকূল অঞ্চলে ঘটে গেল এদেশের স্মরণকালের ভয়াবহতম প্রলয়ংকরী সাইক্লোন, মারা গেল দু লাখেরও বেশি মানুষ। কিন্তু এই অভাবনীয় ঘটনায় পাকিস্তান সরকার রইলেন নীরব, শীতল। কোনো সরকারি কর্মকর্তা উপদ্রুত এলাকায় গেলেন না, তৎক্ষণাৎ কোনো ত্রাণ পৌঁছালো না সেখানে। শুধু চীন থেকে ফেরার পথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বল্প সময়ের যাত্রা বিরতি করলেন ঢাকায়। একটি হেলিকপ্টারে করে তিনি উড়ে গেলেন পটুয়াখালীর এক উপদ্রুত চরে। ইয়াহিয়া

খানকে দেখানোর জন্যে কিছু লাশ টেনে এনে হেলিপ্যাডের কাছে রাখা হলো যাতে তাকে খুব বেশি দূর হেঁটে লাশ দেখতে যেতে না হয়। ইয়াহিয়া খান হেলিকপ্টার থেকে নামলে সাইক্লোনে বেঁচে যাওয়া অসংখ্য অভুক্ত মানুষ ঘিরে ধরেন তাঁকে, তাঁরা খাবার চান, হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট ঘর্মাক্ত কলেবরে উর্দুতে তাদের নানা রকম উপদেশ দেন এবং বলেন, কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। মনের ভেতর ফুর্তি রাখতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে এবং ভাতের বদলে রুটি খেতে হবে তাহলে শক্তি অনেক বাড়বে।

এই বলে তিনি আবার হেলিকপ্টারে উঠে চলে যান। ইয়াহিয়া চলে গেলে চরবাসী একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে : এই ব্যাটা কেডা?

বিদেশি মিডিয়াতে এই ঘূর্ণিঝড়ের খবর প্রচারিত হলে সাহায্য আসতে থাকে নানা দেশ থেকে। সরকারের এই সীমাহীন অবজ্ঞায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ক্ষোভ হয় তীব্রতর। নির্বাচন প্রাক্কালে পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই দুর্বলতাকে লুফে নেন শেখ মুজিব। তিনি তার চৌকস নির্বাচনী বক্তৃতায় তুলে আনেন এই নগ্ন অবহেলার কথা। বলেন, "... পশ্চিম পাকিস্তানে আজ বাম্পার গম উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস ঘূর্ণিঝড় বিদ্ধস্ত অঞ্চলে খাদ্য বোঝাই প্রথম জাহাজটি এসেছে বিদেশ থেকে। আমাদের পয়সায় পশ্চিম পাকিস্তানে লাখ লাখ সৈন্য পোষা হলেও আজ দাফনের কাজ করছে বিদেশিরা। পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের কলের মালিকেরা প্রধান বাজার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করলেও মৃতদেহের কাফনের জন্য এক টুকরো কাপড়ও পাঠায়নি তারা।..."

শেখ মুজিবের বক্তৃতা বাঙালির মনের আগুন উস্কে দেয় আরও। এবার আর নির্বাচনের দিন পরিবর্তন হয় না। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। বদলে যায় পূর্ব পাকিস্তানের নিত্যকার দিনের চেহারা। ভোট সেদিন। কত যুগ ধরে যেন বাঙালিরা অপেক্ষা করছে এই দিনটির জন্য। ভোটকে ঘিরে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা চারদিকে। ঐদিন ঢাকার হাট বাজার, দোকান পাট, অফিস সব বন্ধ। কর্ম চঞ্চল সদরঘাট সেদিন নিস্তব্ধ, জনাকীর্ণ নবাবপুর রোড, মতিঝিল সেদিন খাঁ খাঁ করছে। সব কাজকর্ম ফেলে ভোর বেলা থেকে সবাই লাইন দিয়েছে ভোট কেন্দ্রে। একই অবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে। সেখানে কেবলই নৌকার ছড়াছড়ি। কাগজের নৌকা, কাপড়ের নৌকা, কাঠের নৌকা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জামায় পিন দিয়ে আঁটা নৌকার ছবি। নৌকা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের প্রতীক।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি, মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, এমনি সব ইসলামী দল, এছাড়াও মোজাফফর আর ওয়ালীর ন্যাপ। ভাসানী বর্জন করেছেন নির্বাচন।

ক্যান্টনমেন্টে উদ্বিগ্ন পায়চারী করেন তাহের। লুৎফাকে বলেন : আনোয়ার লিখেছে, আওয়ামী লীগ অ্যাবস্যালুট মেজরিটি পেয়ে যেতে পারে। অথচ এখানকার আর্মি অফিসারদের কোনো ধারণাই নাই কি হচ্ছে বাংলাদেশে। এরা

মনে করছে আওয়ামী লীগ বড়জোর ৩০/৪০টা সিট পাবে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স থেকেও এমন রিপোর্টই দেওয়া হয়েছে।

বাঙালিদের জন্য প্রত্যাশিত আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য অপ্রত্যাশিত এক ফলাফলই ঘটে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিই পেয়ে যায় আওয়ামী লীগ। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি পায় ১৪৪টির মধ্যে ৮৮টি। সংসদে আওয়ামী লীগেরই দাঁড়ায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগড়িষ্ঠতা।

সারারাত ধরে রেডিওতে নির্বাচনের ফলাফল অনুসরণ করেন তাহের। নির্ঘুম, উত্তেজিত তাহের সকালে লুৎফাকে বলেন : খুবই ড্রামাটিক একটা সিচুয়েশন তৈরি হতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগকেই পাকিস্তানের গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে হবে। কিন্তু ওয়েস্ট পাকিস্তানিরা তো এটা হতে দেবে না কিছুতেই। এরা কোনোদিন বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা দেবে না।

অভূতপূর্ব এই জয়ের জন্য জনগণকে ধন্যবাদ জানান শেখ মুজিব। বলেন এই ভোটের মাধ্যমে জনগণ ৬ দফার প্রতি তাদের ম্যান্ডেট ঘোষণা করেছে। এবার চাই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসন। বিজয়োল্লাস পূর্ব পাকিস্তানের মাঠে, প্রান্তরে, পথে ঘাটে।

অপ্রস্তুত প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়া খান। কিন্তু নির্বাচনের ফল মেনে না নিয়ে উপায় নেই তার। ঘোষণা দিলেন ১৯৭১ এর ৩ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে ঢাকায়। কিন্তু বাগরা বাধালেন ভুট্টো। বললেন ছয় দফা তিনি মানেন না।

ঘটনাপ্রবাহের প্রতিটি মুহূর্ত অনুসরণ করছেন তাহের। তাঁর উত্তেজনা ভাগাভাগি করছেন লুৎফার সঙ্গে। তাহের বলেন : ভুট্টো কি বলে জানো? বলে, ছয় দফার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ নিজেদের মতো করে একটা সংবিধান অলরেডি বানিয়ে রেখেছে, শুধু সেটাকে সাপোর্ট করার জন্য আমি ঢাকায় যাবো না। ভুট্টো বলছে পশ্চিম পাকিস্তানে আমি মেজরিটি। সুতরাং মুজিব যদি ছয় দফার পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে থাকেন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছি ছয় দফা না মানার। তাছাড়া ছয় দফা মানলে পাকিস্তানের ইউনিটি বলে আর কিছু থাকবে না। বুঝলে লুৎফা ওরা আছে ওদের ইউনিটি নিয়ে। বাঙালিদের সেন্টিমেন্ট কিছুই বুঝতে পারছে না। আমার মনে হয় না ভুট্টো সংসদে যাবে। সে তো বলেই দিয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেউ ঢাকায় গেলে তার ঠাং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। আমি একটা সিভিল ওয়ার সেন্স করছি।

দৃশ্যপটের প্রধান চরিত্র তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। গাড়ির ড্রাইভিং সিট এখন তার দখলে। তার ওপর নির্ভর করছে গাড়ি চলবে কোনো দিগন্তে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানিকটা তোয়াজ করবার চেষ্টা করেন শেখ মুজিবকে। তাঁকে বলেন, পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী। ভুট্টোও সমঝোতার চেষ্টা চালান। তিনি এসে নতুন থিওরি দেন, বলেন যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো মেজরিটি এবং পূর্বে

শেখ মুজিব, ফলে দুই পাকিস্তানে দুটি সরকার হোক, হোক দুজন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'হাম ইধার, তুম উধার'। মুজিব প্রত্যাখ্যান করেন সে প্রস্তাব। বলেন ছয় দফা থেকে সরে আসবার কোনো উপায় তাঁর নেই।

এদিকে ঘনিয়ে আসছে লুৎফার প্রসবকাল। সেটা নিয়েও একটা ভাবনা তাহেরের। লুৎফাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান তিনি। ডাক্তার বলেন, লুৎফা সুস্থ আছেন, কোনো সমস্যা নেই। তবু ভয় করে লুৎফার। তাহের সাহস দেন : ভয় করো না লুৎফা। এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস। তোমার ডেলিভারিটা এখানে করাবো নাকি দেশ পাঠিয়ে দেবো তাই ভাবছি। দেশের অবস্থাটা যে কোনোদিকে যায় বুঝতে পাচ্ছি না।

লুৎফা : এই অবস্থায় দেশে যাব? ইলেকশন নিয়ে আর্মির ভিতরে কেমন রিয়াকশন দেখছ?

তাহের : আরে এদের তো ধারণা শেখ মুজিব হচ্ছে গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক। সে পাকিস্তান ভাঙতে চায়। আর তাকে পেছন থেকে সাপোর্ট করছে ইন্ডিয়া। বহু পাকিস্তানি আর্মি অফিসারের ধারণা আওয়ামী লীগ লোকের কাছ থেকে টাকা দিয়ে ভোট কিনেছে আর এই টাকা দিয়েছে ইন্ডিয়া। এদের আরেকটা ইন্টারেস্টিং ধারণা হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তানের সব স্কুল কলেজের টিচাররা যেহেতু মেইনলি হিন্দু, এরাই সব বাঙালি ছেলে-মেয়েদের মনে অনেকদিন ধরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিষ ঢেলে আসছে। আসলে কি জানো এতদিন যে লাঠি ওরা আমদের ওপর ঘুরিয়েছে সে লাঠি বাঙালিদের হাতে চলে যাচ্ছে, সেটা এরা কিছুতেই মানতে পারছে না।

ঘটনা গড়াতে থাকে দ্রুত। শেখ মুজিবের অনড় অবস্থান দেখে নাটকের পশ্চিম পাকিস্তানি কুশীলবেরা ধরেন ভিন্ন পথ। ভুট্টো একদিন ইয়াহিয়া খানকে তার গ্রামের বাড়ি লারকানায় দাওয়াত দেন পাখি শিকার করতে। লোকে বলে ইয়াহিয়ার নেশা তিনটি ব্যাপারে, মদ, নারী আর পাখি। ইসলামাবাদের প্রেসিডেন্ট হাউজের জন্য তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এনেছেন টিয়া, বিশেষভাবে লেক তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছেন অসংখ্য সারস। ফলে এ আর আশ্চর্যের কি যে ভুট্টোর ডাকে তিনি যাবেন পাখি শিকারে। কিন্তু দেশের এই ঘোর সংকট কালে পাখির মতো এমন নিরীহ ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠা রহস্যজনক। সে রহস্য উন্মোচিত হয় অনেক পরে। জানা যায় শিকারের ছলে লারকানায় বস্তুত চলেছে এক গোপন বৈঠক। ভুট্টো ছাড়াও সে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন বেশ কজন সিনিয়র আর্মি অফিসার। ছোটে ছোটে কালে কালে মাছলি খাওয়া বাঙালিদের হাতে কিছুতেই ক্ষমতা দেওয়া যাবে না, সে বৈঠকে এ বিষয়ে একমত হন তাঁরা। লারকানা থেকে ফিরে ইয়াহিয়ার সুর যায় পাল্টে। তিনি ঘোষণা করেন সংসদের অধিবেশন বাতিল।

এ ঘোষণায় বাঙালিদের ক্ষোভ আক্রোশ এবার পৌঁছায় একেবারে তুঙ্গে। শত শত মানুষ নেমে পড়েন রাস্তায়। জঙ্গি মিছিল করেন তাঁরা, তাঁদের হাতে লাঠি, লোহার রড, হকিস্টিক। পাকিস্তানের পতাকা পোড়ান, পোড়ান কায়েদে আযমের ছবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের এক নতুন পতাকা উড়িয়ে দেন একাত্তরের ২ মার্চ। ঢাকা জেলের সেল ভেঙ্গে বেরিয়ে যায় শত শত কয়েদি। শেখ মুজিব হরতাল ডাকেন মার্চের দুই আর তিন তারিখ। ঘোষণা দেন সাতই মার্চ তিনি রেসকোর্সে বক্তৃতা দেবেন। মারমুখো জনতার ওপর গুলি করে সৈন্যরা, মারা যান বেশ কয়জন। কার্ফু জারি হয় রাতে। কিন্তু কার্ফু ভেঙ্গেই ঢাকায় বেরিয়ে পড়ে অনেক মিছিল। টানটান উত্তেজনা চারদিকে।

তাহের লুৎফাকে বলেন, জানি না সাতই মার্চ শেখ মুজিব কি বলবেন কিন্তু ঘটনা এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে তাতে শেখ মুজিবের উচিত এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেওয়া।

ইয়াহিয়া খান বেতারে ভাষণ দেন ৬ মার্চ। সংসদের অধিবেশনের নতুন তারিখ দেন তিনি। বলেন : এবার অধিবেশন বসবে ২৫ মার্চ। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য শেখ মুজিবকে দোষারোপ করেন। বলেন, পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ নিতে তিনি প্রস্তুত। ইঙ্গিত দেন প্রয়োজনে মিলিটারি অ্যাকশনে যাবেন তিনি। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতেও বসনো হয় ভারী অস্ত্র। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় সেনা টহল।

সাতই মার্চ অভূতপূর্ব লোক সমাগম হয় রেসকোর্সে। লাঠি হাতে লাখ লাখ মানুষ। সাত লাখ, আট লাখ কিংবা দশ লাখ। সে সভায় একজনই শুধু বক্তা, শেখ মুজিব। লক্ষ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছেন তার নির্দেশের জন্য। রেসকোর্সে আসবার আগে ধানমণ্ডির বাসায় আওয়ালী লীগ নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ মিটিং করেন মুজিব। বক্তৃতায় কি বলবেন, সে ব্যাপারে তারা নানারকম পরামর্শ দেন মুজিবকে। এক ফাঁকে স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা তাকে নিয়ে যান শোবার ঘরে। বলেন : রওনা দেওয়ার আগে দশ মিনিট বিশ্রাম করো।

শেখ মুজিব শুয়ে পড়েন বিছানায়। পাশে বসে তার চুলে হাত বুলান বেগম ফজিলাতুন্নেসা। বলেন : লোকজন যে পরামর্শই দিক, তোমার মনে যা আছে, তুমি তাই বলবা। খালি একটা জিনিস মনে রাইখ, তোমার সামনে লাখ লাখ মানুষ লাঠি হতে কিন্তু ঐ মানুষগুলার পিছনে কিন্তু বন্দুক।

শেখ মুজিব যথাসময়ে রেসকোর্সে হাজির হয়ে উঠে যান মঞ্চে। তারপর শুরু করেন : আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ...।

মাত্র ১৯ মিনিটের একটি ভাষণ দেন শেখ মুজিব। তাঁর সুবিদিত কণ্ঠ নৈপুণ্য আর উপস্থাপনায় এই ঐতিহাসিক ভাষণ হয়ে যায় এ দেশের মানুষের যৌথ স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি তার ভাষণে পুরো পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবি করেন, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন, পুলিশের গুলিতে যে প্রাণহানি হয়েছে তার তদন্তের দাবি করেন এবং বলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই শর্তগুলো মেনে নেওয়া হলে বিবেচনা করে দেখবেন ২৫ মার্চের ঘোষিত এসেম্বলিতে বসবেন কি বসবেন না? শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, আজ থেকে কোর্ট কাছারী, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। রেডিও টিভিতে বাঙালিদের আন্দোলনের খবর না দিলে সব কর্মচারীদের রেডিও টিভিতে যেতে নিষেধ করে দেন তিনি। রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে বলেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে তাক করা একটি তর্জনির দিকে। শেখ মুজিবের তর্জনি। ঐ তর্জনিই তখন সংবিধান। ঐ তর্জনি যা বলবে তাই করতে প্রস্তুত প্রতিটি মানুষ। শেখ মুজিব তার ফরিদপুরের আঞ্চলিক বয়ানে বলেন, ' কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না, মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব..।' শেখ মুজিব ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বললেন, বললেন যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে। সবশেষে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

শেখ মুজিব যখন এই বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন বিমানে করে ঢাকায় নামছেন ইয়াহিয়ার পাঠানো পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান। তাঁর সঙ্গে আছেন জেনারেল রাও ফরমান আলীও। বিমান যখন বেশ নিচু দিয়ে যাচ্ছে তখন তাঁরা দেখতে পেলেন রেসকোর্সের ঐ বিশাল জনসমুদ্র। টিক্কা খান ভুরু কুঁচকালেন। রাও ফরমান আলী অনেকদিন ধরেই আছেন ঢাকায়, তিনি টিক্কা খানের দিকে ঘুরে বলেন, 'গড ড্যাম, দিস ইজ হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন ঢাকা! থিংস আর গেটিং কমপ্লিকেটেড।'

বুঝি মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফজিলাতুন্নেসার শেষ কথাগুলো মনে রেখেছিলেন শেখ মুজিব। সাতই মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না, বললেন স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। বেশ কৌশলে একটা মাঝামাঝি পথ নিলেন শেখ মুজিব। তিনি তার আন্দোলনকে যেমন আইনের আওতার মধ্যে রাখলেন আবার চরমপন্থীদেরও নিরাশ করলেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা না করায় অনেকে হতাশ হলো, তবে সাধারণভাবে শেখ মুজিবের এই বক্তৃতা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিল এক উত্তেজনার কাঁপন। শেখ মুজিবের ভাষণ রেডিওতে সরাসরি প্রচারের অনুমতি দিল না পাকিস্তান প্রশাসন। কিন্তু ঢাকা রেডিওর কর্মচারীরা কৌশলে পরদিন তার

ভাষণ প্রচারে করে দেন রেডিওতে। পূর্ব পাকিস্তান বস্তুত তখন চলতে থাকে শেখ মুজিবেরই নির্দেশে। ছয় দফা ক্রমশ পরিণত হয় এক দফায়। সে দফা স্বাধীনতার।

দুদিন পর ৯ মার্চ মাওলানা ভাসানীও বক্তৃতা দিয়ে সমর্থন করেন শেখ মুজিবের দাবি। তিনি বলেন : 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলি, অনেক হয়েছে আর না। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। লা কুম দ্বিনকুম ওয়াল ইয়া দিন—তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার এই নিয়মে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা স্বীকার করো।'

পাকিস্তান সরকারের বুঝতে বাকি থাকে যে পুরো পরিস্থিতি তাদের হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেছে। সমঝোতার শেষ চেষ্টা হিসেবে শেখ মুজিবের সাথে আলাপ করতে ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন ১৫ মার্চ। তাঁর সামনে পেছনে মেশিনগানবাহী ট্রাকের প্রহরা, সঙ্গে একাধিক পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেল। মিটিং চলে শেখ মুজিবের সঙ্গে। একজন বেসামরিক মানুষকে ঘিরে আলাপে বসেছেন উর্দি পড়া যুদ্ধবাজরা। পাকিস্তান কাঠামো না ভেঙেই একটা সমাধানের পথ তখনও খুঁজছেন শেখ মুজিব। কিছুদিন পর ভুট্টোও এসে যোগ দেন সে মিটিংয়ে। ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে সামনে পিছনে মেশিনগানের প্রহরা নিয়ে ভুট্টো যখন যাচ্ছেন শেখ মুজিবের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের কর্মচারীরা তখন কালো ব্যাজ পড়ে কাজ করছেন।

আটক ফোর্টে প্রতিদিন তাহের নিয়মমাফিক অফিস করছেন, প্যারেড করছেন, কমান্ড দিচ্ছেন কিন্তু তার মন পড়ে আছে ঢাকায়। রাতে ভাত খেতে খেতে লুৎফাকে বলেন : আমি কনফার্ম যে এরা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা ছাড়বে না। শেখ মুজিব শুধু শুধু ইয়াহিয়া, ভুট্টোর সঙ্গে মিটিং করছেন।

লুৎফা : একটা মীমাংসা তো হতেও পারে।

তাহের : কোনো মীমাংসা হবে না লুৎফা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি একটা সিভিল ওয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। শেখ মুজিব একজন গ্রেট ন্যাশনালিস্ট লিডার। কিন্তু এরকম একটা যুদ্ধ বেধে গেলে তিনি সেটাকে কিভাবে ট্যাকল করবেন বুঝতে পারছি না। উনি তো হো চি মিনের মতো একটা আর্মস স্ট্রাগল লিড করতে পারবেন না, উনার পার্টি তো সেভাবে প্রিপেয়ার্ড না।

ঢাকার পথে পথে তখন উত্তপ্ত জনতা। দেশের নানা অঞ্চলে রাইফেল, বেয়োনেট উঁচিয়ে চলাচল শুরু করেছে আর্মির ট্রাক, জীপ। ইতোমধ্যে রংপুর, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম, জয়দেবপুরে জনতার সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ। জনতা পথে পথে ব্যারিকেড দিয়ে বাধা সৃষ্টি করছে সেসব গাড়ি চলাচলের। গুলি চালাচ্ছে আর্মি। চারদিক থেকে আসছে মৃত্যুর খবর। খুলনার শিল্পী সাধন সরকার গাইলেন, 'ব্যারিকেড, বেয়োনেট বেড়াজাল, পাঁকে পাঁকে

তড়পায় সমকাল... ।' সেই কবে জিন্নাহ যে বলেছিলেন 'পাকিস্তান টিকে থাকবার জন্যই এসেছে', সে কথার ভিত তখন নড়বড়ে।

তোমরা প্রস্তুত হও

ইতোমধ্যে তাহেরকে পাঠানো হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা ইনফেন্ট্রি স্কুলে সিনিয়র ট্যাকটিক্যাল কোর্স করতে। ঢাকার ঘটনাবলির ওপর সতর্ক চোখ রাখছেন তিনি। আনোয়ারকে লিখলেন, "ভুট্টো এখানে বলে গেছে পাকিস্তানে তিনটি দল আছে, আওয়ামী লীগ, পি পি পি এবং আর্মি। আর্মিকে যে ইনভলব করা হচ্ছে তা খুবই স্পষ্ট। আমরা এখান থেকে টের পাচ্ছি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে আর্মি ডেপ্লয় করা হচ্ছে, আর্মস যাচ্ছে। এখানকার বাঙালি অফিসারদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ছুটি দেওয়া হচ্ছে না। আমি দেখতে পারছি একটা যুদ্ধ অনিবার্য। তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। সাঈদ, বেলাল, বাহার সবাইকে বলো প্রিপেয়ার্ড থাকতে। তোমাদের ট্রেনিং আছে, যুদ্ধ বাধলে সবাইকেই সেখানে যোগ দিতে হবে। মনে রেখো, এটা হবে একটা ন্যাশনালিস্ট ওয়ার কিন্তু এটাকে একটা সোসালিস্ট ওয়ারের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সে ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব আছে। যুদ্ধের ট্রেন্ডটা কোনোদিকে যাচ্ছে লক্ষ রাখতে হবে। আমি সময় সুযোগ মতো যোগ দেবো সেই যুদ্ধে।"

তাহের লুৎফাকে বলেন : এরা খুব শীঘ্রই একটা মিলিটারি অ্যাকশনে যাবে। যুদ্ধ একটা বাধবে। কিন্তু বাঙালিদের তো তেমন মিলিটারি এক্সপার্টিজ নাই। সিনিয়র আর্মি অফিসাররাও তেমন সেখানে নাই। আমাকে খুব দ্রুত সেখানে যেতে হবে। যদিও এটা হবে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কিন্তু যুদ্ধটাকে যদি দীর্ঘায়িত করা যায় তাহলে এটাকে একটা সোসালিস্ট আর্মস স্ট্রাগলের দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ভিয়েতনামের মতো। কিন্তু যুদ্ধটাকে সাসটেইন করতে হবে। এরা তো ডেফিনিটলি আমাকে ছুটি দেবে না। আমাকে পালাতে হবে।

লুৎফা : সেসব তো বুঝলাম কিন্তু আমার কি হবে?

তাহের : সেটাই তো ভাবছি। তোমার এমন অ্যাডভান্স স্টেজ তোমাকে নিয়ে তো পালাতে পারব না। তুমি বরং এখনই ঢাকায় চলে যাও। আমি ব্যবস্থা করছি।

লৎফা বলেন : কিন্তু রাস্তায় যদি কিছু হয়?

তাহের বলেন : কিছু হবে না। ডাক্তার তো বললেন তোমার সব কিছু নরমাল আছে। জানো চীনা মেয়েরা মাঠে কাজ করতে করতে পেইন উঠলে চলে যায় ঘরে। সেখানে বাচ্চাটা হয়ে যাবার কিছু দিন পরই আবার ফিরে যায় মাঠে কাজ করতে।

লুৎফা : আমি তো আর চীনা মেয়ে না।

তাহের : ভয় করো না, লুৎফা। আমি প্লেনে উঠিয়ে দেবো, ওরা প্লেনে স্পেশাল কেয়ার নেবে। আর ওখানে তো কেউ তোমাকে রিসিভ করবেই। খুব দ্রুতই সব ব্যবস্থা করতে হবে। কখন যে কি শুরু হয়ে যায় বলা মুশকিল।

লুৎফা ঢাকা যাবার প্রস্তুতি নেন। কাপড় চোপড় যখন গোছাচ্ছেন তখন সুটকেস থেকে তুলে রাখেন লন্ডন থেকে কেনা প্রিয় কার্ডিগেন দুটো। তাহেরকে বলেন, এ দুটো তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসো। এখন যদি নিয়ে যাই, সব কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। এতো পছন্দ আমার কার্ডিগেন দুটো!

লুৎফাকে প্লেনে উঠিয়ে দেন তাহের। ইসলামাবাদ থেকে লুৎফা ঢাকায় আসেন ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে। উঠেন তার ফুফাতো বোন হালিমা আর স্বামী জুনাবুল ইসলামের বাড়ি। ঢাকায় তখন অচল অবস্থা চারদিকে। গাড়ি, ট্রেন ঠিকমতো চলছে না কিছুই। প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল। কয়দিন পর ট্রেনে চেপে লুৎফা রওনা দেন ঈশ্বরগঞ্জে বাবার কাছে। অস্বাভাবিক ধীর গতিতে চলে ট্রেন। ঢাকা থেকে সকালে রওনা দিলেও পথে পথে মিটিং, মিছিল, পুলিশের চেকআপ মিলিয়ে ঈশ্বরগঞ্জে গিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে হয় সন্ধ্যা। ঈশ্বরগঞ্জে পৌঁছে দেখেন সেখানেও তুমুল উত্তেজনা। এসেম্বলি নিয়ে ইয়াহিয়া খানের তাল বাহানা, শেখ মুজিবের বক্তৃতা সব মিলিয়ে চারদিকে আলোড়ন। লুৎফার বাবা, ভাইরা মিলে সারাদিন আলাপ করছেন মুজিব আর ইয়াহিয়ার মিটিং নিয়ে। গ্রামের ছেলেদের হাতে লাঠি।

পাখির ডিম

ঢাকায় যখন ভুট্টো, ইয়াহিয়া, শেখ মুজিবের মিটিং হচ্ছে তখন এম ভি সোয়াত নামে একটি জাহাজ সন্তর্পণে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ঢুকছে চট্টগ্রাম বন্দরে, করাচি বন্দর থেকে ছেড়ে আসা সে জাহাজ বোঝাই অস্ত্র সস্ত্র, গোলবারুদ। সে সময়ই রাতের অন্ধকারে ঢাকা এয়ারপোর্টে পি আই এ প্লেনের ঘন ঘন ফ্লাইটে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেসামরিক পোশাকে দলে দলে নামছে পাঞ্জাবি সৈন্য, এসে পৌঁছেছে পাকিস্তানের চৌকস এস এস জি কমান্ডো গ্রুপ। ঢাকার নানা স্ট্রেটেজিক পয়েন্টে বসানো হয়েছে ভারী কামান আর মেশিন গান। মিটিং চলছে গণভবনে, তার ভেতরে বাইরে, মোতায়েন করা হয়েছে ট্যাংকের বহর।

বাতাসে ঝড়ের আভাস। জাতিসংঘের প্রধান উথান্ট ঢাকায় জাতিসংঘ অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। ২৩ মার্চের পাকিস্তান দিবসে ঢাকায় কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে না। উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। কোনো কোনো বিদেশি দূতাবাসে পাকিস্তানের পতাকা উড়ানো হলেও উত্তেজিত জনতা সেটি নামিয়ে ফেলতে বাধ্য করেছে। ঐদিন শেখ মুজিব তার মাজদা গাড়িতে কালো পতাকা নয়, বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে

গণভবনে গেলেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে মিটিং করতে। ২৫ মার্চ সংসদের অধিবেশন বসবার কথা। সংসদ বসবার আগেই শেখ মুজিবের দাবি অনুযায়ী মার্শাল ল প্রত্যাহার আইনসম্মত হবে কিনা মিটিংয়ে এসব কূট তর্ক করেন ইয়াহিয়া, ভুট্টো। কোনো মীমাংসা ছাড়াই স্থগিত হয় মিটিং। পরবর্তী মিটিং কবে হবে সে কথা টেলিফোনে জানানো হবে বললেন ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি জেনারেল পীরজাদা। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা অপেক্ষা করতে থাকেন সেই টেলিফোন কলের জন্য।

সেদিন রাতে ইয়াহিয়া হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসেন তার জেনারেলদের সঙ্গে, সাথে একমাত্র বেসামরিক মানুষ ভুট্টো। সিন্ধের বিশাল জমিদারের ছেলে, অক্সফোর্ডে পড়া চৌকস জুলফিকার আলী ভুট্টো, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে যিনি হয়েছিলেন আইয়ুব খানের মন্ত্রী। পাকিস্তানের জেনারেলদের সঙ্গে তার উঠাবসা বহুদিনের। ভুট্টো শেখ মুজিবকে কোনো গুরুত্বই দিতেন না কখনো। পরবর্তীতে তিনি যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তখন ইতালির সাংবাদিক ওরিয়েনা ফ্যালাচিকে স্পষ্টই বলেছেন, 'শেখ মুজিব অযোগ্য, বিভ্রান্ত, অশিষ্ট, বোধহীন। ..তিনি শুধু জানেন কি করে গলাবাজী করা যায় ... আমি তাকে কোনোদিনও গুরুত্ব দেইনি... আমি বুঝিনা কি করে বিশ্ব তাকে গুরুত্ব দিতে পারে ...?' রাজনীতিবিদ সম্পর্কে তার ধারণার কথা বলতে গিয়ে ভুট্টো ওরিয়েনা ফ্যালাচিকে বলেন, 'আপনি কি কখনো পাখিকে তার বাসায় ডিমের উপর তা দিতে দেখেছেন? হালকা আঙ্গুল দিয়ে পাখির নিচের সেই ডিমগুলো একটি একটি করে সরিয়ে আনার যোগ্যতা থাকতে হবে একজন রাজনীতিবিদের। যাতে পাখিটি কিছুতেই টের না পায়।'

সেইসব রাতে পাখির নিচের সেই ডিমগুলো নিঃশব্দে সরানোর ব্যবস্থা করছিলেন ভুট্টো এবং সেই জেনারেলরা। তারা ঠিক করেছিলেন পলিটিক্যাল সলিউশন যখন হলো না অনিবার্যভাবেই একটা মিলিটারি সলিউশনে যেতে হবে। বাঙালিদের শায়েস্তা করবার জন্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রচণ্ড সামরিক অ্যাকশন নিতে হবে। জেনারেল টিক্কা খান খুব সফলতার সঙ্গে বেলুচদের এমন বিদ্রোহ শায়েস্তা করেছেন, ইন্দোনেশিয়ার আর্মিরাও খুব দ্রুত মিলিটারি অ্যাকশনে খুবই সফলভাবে দমিয়ে দিয়েছে সে দেশের বিদ্রোহীদের। বাঙালিদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহকেও সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল রাও ফরমান আলীকে বলেন, 'কুস হো রাহা হ্যায়, তৈয়ারি মৈয়ারি কারো।'

টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী, হামিদ, খাদিম, বাঘা এইসব জেনারেলরা মিলে তৈরি করেন অপারেশনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা, নাম দেন 'অপারেশন সার্চলাইট'। সিদ্ধান্ত হয় শেখ মুজিব এবং তার অনুগামীদের দ্রুত বন্দি করে, শেল, মর্টারসহ সবরকম ভারী অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বাঙালিদের ওপর, তাদের ভড়কে দিতে হবে। তাহলেই সম্বিত আসবে বাঙালিদের। টিক্কা খান বলেন পুরো ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে তার বড়জোর বাহাত্তর ঘণ্টা সময় লাগবে।

সে রাতে চাঁদ দেখেনি কেউ

২৫ মার্চ রাতে একটি গাড়ি এসে থামে ঢাকা এয়ারপোর্টে, সাধারণ একটি গাড়ি। সে গাড়ি থেকে নামেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। তিনি অন্ধকারে এগিয়ে যান রানওয়ের দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি এরোপ্লেন। গুটিকয় সঙ্গী নিয়ে তিনি উঠে পড়েন প্লেনে। কিছুক্ষণ পর প্লেনটি উড়ে যায় করাচির পথে। যাবার আগে তিনি সবুজ সংকেত দিয়ে যান 'অপারেশন সার্চলাইট' কে। তবে বলেন রাত ১২ টার আগে যেন অ্যাকশন শুরু না হয়। ততক্ষণে তিনি পৌঁছে যাবেন করাচি। এর আগে জানাজানি হয়ে গেলে ভারত আক্রমণ করে বসতে পারে ইয়াহিয়ার বিমান।

এসময়ে টারম্যাকে দাঁড়িয়ে রাতের অন্ধকারে নিভৃতে প্রেসিডেন্টের দেশত্যাগের এই দৃশ্য দেখেন বিমানবাহিনীর এক বাঙালি অফিসার এ কে খন্দকার। বিস্মিত হন, আঁচ করেন সমূহ বিপদের। অফিসে ফিরে টেলিফোন তুলে নেন হাতে, দ্রুত এ খবর পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট কাউকে। টারম্যাকে দাঁড়ানো এ কে খন্দকার জানেন না অচিরেই তাকে দায়িত্ব নিতে হবে একটি মুক্তিযুদ্ধের সহঅধিনায়কত্বের।

রাত বাড়ে। শহরের কোলাহল কমে আসে ক্রমশ, বন্ধ হয় দোকানের ঝাঁপি, একটি একটি করে নিভে আসতে থাকে ঘরের বাতি, রাস্তার উপর বেরিকেডগুলো অবশ্য পড়ে থাকে অবিচল। শহর জুড়ে অজানা আশঙ্কা।

ঠিক মধ্যরাতে হঠাৎ বিকট শব্দে ট্যাঙ্ক, ভারী মর্টার, শেল, মেশিন গান নিয়ে রাজপথে নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। নানা দলে বিভক্ত হয়ে পথে পথে ফেলে রাখা বেড়িকেডগুলো সরিয়ে এগুতে থাকে তারা। তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট।

একদল এগিয়ে যায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের হেডকোয়ার্টার পিলখানায় আর রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। সেখানে শত শত ঘুমন্ত, অপ্রস্তুত বাঙালি পুলিশ আর সৈনিকদের অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করে তারা।

একদল যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মর্টার শেলের আঘাতে তারা গুঁড়িয়ে দেয় ছাত্রদের আবাসিক হল, শিক্ষকদের আবাস। নিহত হয় অসংখ্য ছাত্র শিক্ষক। হল থেকে ধরে এনে গুলি করা হয় ছাত্রদের।

অন্যদল আগুন ধরিয়ে দেয় পুরান ঢাকার শাখারীপট্টিসহ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, ঢাকার আসে পাশের নানা বস্তি।

রাতের অন্ধকারে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, মর্টার, শেলের আঘাতে পুলিশ, রাইফেলসের সদস্য, ছাত্র, পথের সাধারণ মানুষ মিলিয়ে শত শত লোককে হত্যা করতে করতে শহর দাপিয়ে বেড়ায় পাক আর্মি। আগুনে পুড়িয়ে দেয় পত্রিকার অফিস। আগুনের লেলিহান শিখা, গুলি আর আর্তচিৎকারে প্রকম্পিত হতে থাকে ঢাকার রাত। শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যার উৎসব।

চকিতে একটা ভয়ংকর ত্রাস সৃষ্টি করে পাক সেনারা স্তব্ধ করে দিতে চায় বাঙালিদের। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তুলনাহীন ভীতির সঞ্চার করে প্রতিষ্ঠা করতে চায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য। জেনারেল টিক্কা খান এগুতে থাকেন নির্মম এবং সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টায় পাকিস্তানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে।

রাত দেড়টার দিকে পাক কমান্ডো বাহিনী গুলি করতে করতে শেখ মুজিবের ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে ঢোকে। ঐ দিন রাতে এমন একটি আক্রমণের আশঙ্কা করে তাজউদ্দীনসহ অন্য নেতারা শেখ মুজিবকে আত্মগোপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তা শোনেননি। শেখ মুজিব মনে করেছিলেন তাঁকে গ্রেফতার করতে না পারলে পাকবাহিনী আরও নির্মম হয়ে উঠবে বাঙালিদের ওপর। পাকবাহিনী বন্দি করে মুজিবকে। তাঁকে বন্দি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানের করাচিতে। শেখ মুজিবের ধারণা ভুল প্রমাণ করে নির্মমতার শেষ নয় বরং হয় শুরু।

দীর্ঘদিন ধরে সুচারুভাবে প্রস্তুত করা একটি অভিযান নেমে আসে অপ্রস্তুত এক জাতির ওপর। সেদিন ঢাকার আকাশে চাঁদ উঠেছিল। কিন্তু শহরে একজন মানুষও ছিল না সে চাঁদের দিকে তাকাবার। লেখক আব্দুল হক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ছাদে উঠেছিলেন। কিন্তু চাঁদ দেখতে নয়, কোথা থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছে সেটা বুঝবার জন্য। তিনি দেখলেন অন্ধকার রাত্রির আকাশ লাল টকটকে হয়ে আছে আগুনের রঙে। দেখলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইন জ্বলছে, জ্বলছে রেল স্টেশনের দিকে কিছু এবং জ্বলছে হাইকোর্টের দিকে আরও কিছু। বহু দূরে মিরপুরের দিকেও লাল আকাশ। কালো আকাশ চিরে মাঝে মাঝে রক্তবর্ণ গুলি শূন্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। পুলিশ লাইনের দিক থেকে দলে দলে নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তার মনে হলো কোনো কোনো গুলি বুঝি তার বাড়িতে এসে লাগবে। ঘরে ফিরে দেখলেন ছেলে মঞ্জু কান্নাকাটি করছে। তাকে কিছুক্ষণ রাখলেন বাথরুমে, সেখানে গুলি লাগবে না এই ভরসায়, কিছুক্ষণ পর শুইয়ে দিলেন বিছানার নিচে। আশপাশের সমস্ত বাড়ি অন্ধকার কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলেন সবাই জেগে অন্ধকারে বসে আছে। পুরনো ঢাকার নানা মহল্লায় সে রাতে হাজার হাজার আতঙ্কিত মানুষ একসঙ্গে আজান দিয়ে উঠে, যেন রোজ কেয়ামত উপস্থিত। এই অভূতপূর্ব রাত এরপর এই জনপদের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে প্রবাহিত হবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক ড. নুরুল উলা থাকতেন ফুলার রোডের পুরনো এসেমব্লি হলের উল্টোদিকে অধ্যাপকদের জন্য বরাদ্দ ফ্লাটে। তার জানালা থেকে জগন্নাথ হল ছাত্রাবাসের একটি বিরাট মাঠ সরাসরি চোখে পড়ে। ২৫ মার্চের নির্ঘুম রাত কাটিয়ে পরদিন নিজের বাড়ির জানালা থেকে ঐ খেলার মাঠে তিনি দেখলেন বীভৎসতর দৃশ্য। দেখলেন হলের ভেতর থেকে ছাত্রদের ধরে এনে

লাইন করে দাঁড় করানো হচ্ছে সেই মাঠে, তারপর তাদের উপর গুলি চালানো হচ্ছে খুব কাছ থেকে। দেখলেন ছাত্রগুলোর পেছন থেকে উঠছে ধূলি, বুঝতে পারলেন যে, কিছু গুলি শরীর ভেদ করে মাটিতে ঠেকছে এবং সে থেকেই ধূলি উড়ছে। কোনো কোনো ছাত্র গুলি করবার আগে হাত জোর করে মাফ চাইছে , তাকে গুলি করা হচ্ছে আরও কাছ থেকে। এভাবে এক একটি ছোট দলে ছাত্রদের আনা হচ্ছে আর হত্যা করা হচ্ছে। মাঠের উপর পড়ে থাকা লাশের সংখ্যা তার চোখের সামনে একটু একটু করে বাড়ছে। ড. নুরুল উলার কাছে ছিল জাপানের তৈরি ভারী একটি পোর্টেবল মুভি ক্যামেরা। সেই ক্যামেরায় তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তায় তাঁর জানালা থেকে তুললেন সেই বীভৎস দৃশ্য। তার সেই ক্যামেরা ফুটেজ হয়ে গেল বাংলাদেশের গণহত্যার প্রথম ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল।

ঢাকার এই বীভৎস ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচবার আশায় শত শত মানুষ তখন পিছু হঠতে হঠতে পালিয়ে আশ্রয় নেয় বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরায়। পাকবাহিনীর লক্ষ্য তখন হয়ে দাঁড়ায় ঢাকার অদূরের জিঞ্জিরা। এক রাতে তারা হত্যা করে জিঞ্জিরার কয়েক শত মানুষ। বহু বছর পরে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষ স্মৃতি লিখে সবাইকে শিহরিত করবেন কবি নির্মলেন্দু গুণ।

কিন্তু একাত্তরে তাদের এই ধ্বংসযজ্ঞের খবর যেন সারা পৃথিবীর কাছে না পৌঁছায় সেটা নিশ্চিত করতে ২৫ মার্চ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সমস্ত বিদেশি সাংবাদিকদের আটকে রাখে পাকবাহিনী। ২৬ মার্চ সবাইকে সেনা প্রহরায় বিমানে উঠিয়ে বের করে দেওয়া হয় দেশ থেকে। কিন্তু ব্রিটিশ পত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সায়মন ড্রিং সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে থাকেন হোটেলে। হোটেলের রান্নাঘরে বাবুর্চিদের সহায়তায় তিনি লুকিয়ে থাকেন দুদিন। চুপিসারে বেরিয়ে এসে ঘুরে বেড়ান বিধ্বস্ত ঢাকায়। যে রিপোর্ট তিনি লেখেন তা কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে ব্যাংকক হয়ে নানা কৌশলে পাঠিয়ে দেন টেলিগ্রাফে। বিশ্ববাসী জানে এক মৃতনগরীর ইতিবৃত্ত। করাচি মর্নিং নিউজের সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকারানহাসও ব্রিটেনের 'সানডে টাইমস'এ তুলে ধরেন ঢাকার লোমহর্ষক কাহিনী। শুধু জিঞ্জিরা, কালুরঘাট, পিলখানা নয় গণহত্যার খবর জেনে যায় লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, সিডনির মানুষেরাও। ঢাকার পর পাকবাহিনী ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে দেশের অন্যান্য শহর আর গ্রামে। হাজার বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে উঠা একটি জনপদকে তছনছ করে দেবার জন্য যেন পাহাড় থেকে নেমে এসেছে হিংস্র দানব।

নাম জয়া

আতঙ্কিত ঈশ্বরগঞ্জের মানুষরা খোঁজ পায় দানব এগিয়ে আসছে তাদের দিকেও। ঢাকা ছেড়ে ইতোমধ্যে পাকিস্তান আর্মিরা চলে এসেছে কাছের শহর ময়মনসিংহে।

খবর রটে যায় তরুণদের ধরে ধরে গুলি করছে তারা। শহরের মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে পালায় গ্রামের দিকে। মিলিটারির তাড়া খেয়ে ময়মনসিংহ থেকে লুৎফার বাবার পরিচিত ছয়টি পরিবারের অসংখ্য সদস্য এসে উপস্থিত হয় তাদের ঈশ্বরগঞ্জের বাড়িতে। এত মানুষের স্থান সংকুলান হয় না বাড়িতে। সীমাহীন বিপর্যস্ত অবস্থা। এরই মধ্যে একদিন প্রসব বেদনা উঠে লুৎফার। যুদ্ধের ঐ ডামাডোলের মধ্যে, সর্বব্যাপী উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের ভেতর গ্রামীণ ধাত্রীর হাতে জন্ম নেয় লুৎফা, তাহেরের প্রথম সন্তান। সেদিন এপ্রিলের ছয় তারিখ। অক্সফোর্ডের ফুরফুরে রাতে যেমনটি বলেছিলেন তাহের, ঠিক তাই ঘটে, জন্ম হয় একটি মেয়ের। তাহেরের কথা মতোই লুৎফা মেয়ের নাম রাখেন জয়া।

কিন্তু উদ্বিগ্নতা বেড়ে যায় লুৎফার বাবা ডা. খোরশেদুদ্দীনের, তিনি বলেন : এ জায়গাটা আর মোটেও নিরাপদ না, যে কোনো দিন মিলিটারি চলে আসতে পারে ঈশ্বরগঞ্জ। আমাদের আরও ভেতরে চলে যেতে হবে। আর মা লুৎফা তুমি বরং তোমার শ্বশুরবাড়ি কাজলাতেই চলে যাও।

রেল চলাচল অনিশ্চিত, ঈশ্বরগঞ্জের স্টেশন মাস্টার তাহেরের চাচা মুন্সেফউদ্দীন তালুকদার একদিন রেল ইন্সপেকশনের স্পেশাল ছাদ খোলা চার চাকার ট্রলিতে উঠিয়ে দেন লুৎফাকে। সদ্যোজাত মেয়ে জয়াকে শাড়িতে ঢেকে আতঙ্কিত লুৎফা ঐ অদ্ভুত যানে চড়ে রওনা দেন শ্যামগঞ্জের পথে। শ্যামগঞ্জে পৌছালে তাঁকে পালকিতে করে নিয়ে যাওয়া হয় কাজলায়।

শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে লুৎফা দেখেন সেখানেও এলাহী কাণ্ড। ময়মনসিংহ শহরের নানা মানুষ মিলিটারির তাড়া খেয়ে এসে উঠেছে কাজলাতেও। বিশেষ করে নানা জেলা থেকে আসা ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে ফিরে যেতে না পেরে যে যেদিকে পেরেছে ঢুকে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামে। এতসব ছেলে মেয়ে কাউকেই চেনেন না লুৎফা, চেনেন না বাড়ির অন্য কেউ। রাজশাহীর মেয়ে লতা কেবলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। জানে না কি হয়েছে রাজশাহীতে থাকা তার বাবা মার, জানে না আর কোনো দিন দেখা হবে কিনা তাদের সঙ্গে।

আশরাফুন্নেসা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কাজলায় জড়ো হওয়া আগন্তুক ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তাদের জন্য রান্না আর খাওয়ার আয়োজন করছেন তিনি, ব্যবস্থা করছেন রাতের ঘুমাবার। তাহেরদের বাড়িতে যে কয়জনের জায়গা হয়েছে তারা রয়ে গেছে সেখানে বাকিদের গ্রামের অন্যদের বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছেন তিনি। এক বিছানায় একসঙ্গে আড়াআড়ি করে শুচ্ছে চার, পাঁচজন। একফাঁকে আদর করে যাচ্ছেন জয়াকে, লুৎফাকে দিচ্ছেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ।

যথারীতি এই ব্যস্ততার মধ্যেও চালু রয়েছে আশরাফুন্নেসার উদ্ভাবনী ভাবনা। একদিন তিনি ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন : গ্রামে তো কখনো এতগুলো শিক্ষিত ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে আসে না। এ সুযোগটাকে কাজে লাগানো দরকার।

যুদ্ধ কতদিন চলে কে জানে। তোমরা যতদিন গ্রামে আছ প্রত্যেকে অন্তত দুইজন করে ছেলে বা বুড়ারে পড়াশোনা শিখাও।

নানা জায়গা থেকে পালিয়ে আসা ছেলেমেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে লেগে পড়ে গ্রামের নিরক্ষরদের পড়ানোর কাজে। এত লোকজনের ভিড়ে খানিকটা উৎসবের আমেজ আসে যেন কাজলায়। যদিও সবার মধ্যেই নিরন্তর চাপা উদ্বিগ্নতা, ত্রাস। এই বুঝি দানবের পদধ্বনি শোনা যায় গ্রামের প্রান্তে।

যুদ্ধতাড়িত মানুষের ভিড়ে ছোট্ট জয়াকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে সহসা অন্যমনস্ক হয়ে যান লুৎফা। তাঁর চোখে চকিতে ভেসে ওঠে অক্সফোর্ডের সবুজ পার্ক, ডেফোডিল ফুলের বাহার। অচেনা গাছের ছায়ায় বসে তাহেরের সঙ্গে কাটানো বিকেল। জয়ার জন্মের খবর লিখে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্টের ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়েছেন লুৎফা কিন্তু এই যুদ্ধের ডামাডোলে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে চিঠি কে জানে?

রাতের পায়চারী

তাহের তখন কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টে। ঢাকার রাজপথে সৈন্য নেমে গেছে, শুরু হয়ে গেছে হত্যাযজ্ঞ, চালু হয়ে গেছে অপারেশন সার্চ লাইট। এ খবর তাহের পেয়েছেন ২৫ মার্চ গভীর রাতেই। উত্তেজনায় বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে। পায়চারী করেছেন ক্যান্টনমেন্টের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। একা একা। অন্ধকার ক্যান্টনমেন্টের প্যারেড গ্রাউন্ডে নিঃসঙ্গ পায়চারী করতে করতে তাহের সিদ্ধান্ত নেন যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে পৌঁছাতে হবে বাংলাদেশে। প্রতিহত করতে হবে এই আক্রমণ, ঘুরিয়ে দিতে হবে যুদ্ধের গতিপথ, যার প্রস্তুতি তিনি নিয়েছেন দীর্ঘদিন।

পরদিন সকালেই সতর্কতার সঙ্গে তিনি কথা বলেন কোয়েটায় অবস্থানকারী গুটিকয় বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে। তাঁদের বলেন : বাংলাদেশে একটা ফুল ফ্রেজেড ওয়ার শুরু হয়ে যাবে অচিরেই, সেখানে ট্রেইনড বাঙালি আর্মি অফিসার দরকার। আমাদের ওখানে জয়েন করা উচিত খুব শীঘ্রই।

বাঙালি অফিসাররা তখন ভীতসন্ত্রস্ত। একজন বলেন : কিন্তু কিভাবে স্যার?

তাহের : পালাতে হবে। আমি পালাবো এজ আর্লি এজ পসিবল। তোমরা থাকবে আমার সঙ্গে?

দু-একজন জুনিয়র অফিসার উৎসাহিত হন কিন্তু দ্বিধান্বিত থাকেন। একজন বলেন : আমরা কয়জন পালালে ওয়েস্ট পাকিস্তানের সব বাঙালি অফিসারদের মধ্যে বিপদ নেমে আসবে। সেটা কি ঠিক হবে?

তাহের : বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়াই এখন সবচেয়ে ঠিক কাজ এবং আমাদের কর্তব্য। তাতে যে কনসেকুয়েন্সই হোক না কেন, আমাদের তা মাথা পেতে নিতে হবে। আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি পালিয়ে যাবার, তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড তারা যোগাযোগ করবে আমার সাথে।

যে সিনিয়র ট্যাকটিক্যাল কোর্সটি করবার জন্য তাহেরকে কোয়েটায় পাঠনো হয়েছিল সেটি হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাহের খোঁজ পান কোয়েটা থেকে এক ডিভিশন আর খারিয়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে আরেক ডিভিশন সৈন্য প্লেনে করে পাঠানো হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে। এও খোঁজ পান সেসব ডিভিশনে যে বাঙালি অফিসার রয়েছে তাদের নেওয়া হয়নি।

কোয়েটার কোর্স বন্ধ হবার পর তাহের যখন নিজ ইউনিট খারিয়াতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন ট্রেনিং স্কুলের পশ্চিম পাকিস্তানি কমান্ডার মেজর জেনারেল বি এম মোস্তফা তাহেরকে ডেকে পাঠান। জেনারেল মোস্তফা তাহেরকে বলেন, তুমি আপাতত তোমার ইউনিটে ফিরে যেতে পারবে না, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমাকে কোয়েটাতেই থাকতে হবে।

শংকিত হয়ে পড়েন তাহের। ভাবেন, তাঁর পালাবার পরিকল্পনা ফাঁস হলো কি? তাহেরকে নজরবন্দি করে রাখা হয় কোয়েটায়।

মাইনর বনাম মেজর আর নির্জন চা বাগান

ওদিকে পাকবাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, বেপরোয়া গোলাগুলি আর ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়াতে হতচকিত বাংলাদেশের আপামর মানুষ। এ আর বুঝতে কারো বাকি নেই যে, এদেশের মানুষ সহসা একটা বর্বরোচিত যুদ্ধের পাকচক্রে পড়ে গেছে। ঠিক অপ্রত্যাশিত না হলেও অনেকটাই অপ্রস্তুত।

অপ্রস্তুত রাজনৈতিক নেতাকর্মী, সশস্ত্রবাহিনীর বাঙালিরাও। রাজনৈতিকভাবে বাঙালিদের সে সময় নেতৃত্ব দিচ্ছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু এরকম একটা সর্বাত্মক যুদ্ধের স্পষ্ট, সুষ্ঠু কোনো পরিকল্পনা ছিল না তাদের। পাকবাহিনীর ঐ আচমকা আক্রমণের শুরুর সময়টা বাঙালিরা তাই অনেকটাই দিকভ্রান্ত, অগোছালো। অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব বন্দি, আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা আত্মগোপনে।

প্রাথমিক প্রতিরোধের খানিকটা চেষ্টা চালান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা। ঢাকার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস আর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিক আর পুলিশরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেষ্টা করেন পাকবাহিনীর আক্রমণকে প্রতিরোধ করার। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন সেখানকার ইপিআরের সেক্টর অ্যাডজুটেন্ট বাঙালি ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম। পরিস্থিতির অবনতি দেখে তিনি চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড বাঙালি মেজর জিয়াউর রহমান আর চিফ ট্রেইনার লে কর্নেল এম আর চৌধুরীকে অনুরোধ করেছিলেন আগে থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে। রাজি হননি মেজর জিয়া এবং কর্নেল চৌধুরী। ফলে ঢাকার মতো চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টেও পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন অসংখ্য বাঙালি সেনা, নিহত হন কর্নেল চৌধুরীও।

নিহত হতেন মেজর জিয়াও। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের একজন চরিত্র হবেন বলে নিয়তি যেন বাঁচিয়ে রাখে তাকে। মেজর জিয়া বেঁচে যান কারণ তিনি তখন ক্যান্টনমেন্টের বাইরে। তাঁর অধিনায়ক পশ্চিম পাকিস্তানি লে. কর্নেল জানজুয়া মেজর জিয়াকে আদেশ দিয়েছিলেন 'এমভি সোয়াত' থেকে পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র নামাতে। তিনি সে কাজেই যাচ্ছিলেন। আগ্রাবাদের কাছে এসে তিনি পাকিস্তানিদের আক্রমণের খবর পান। শেষ মুহূর্তে পক্ষ ত্যাগ করে মেজর জিয়া যোগ দেন বাঙালিদের সঙ্গে।

এসময় এক কাকতালীয় ঘটনা বদলে দেয় এই দোদুল্যমান মেজরের জীবন। চট্টগ্রামের কাছে কালুরঘাটে তখন একটি ছোট্ট রেডিও রিলে সেন্টার দখল করে রেখেছেন বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দীপ, আবদুল্লাহ আল ফারুক প্রমুখ বেতার কর্মীরা। তাঁরা এই রেডিও স্টেশনের নাম দিয়েছেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র'। ২৫ মার্চের ভয়াবহ রাত কাটাবার পরদিন ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা এম এ হান্নানের কাছে ইপিআরের ওয়ারলেস মারফত এসে পৌঁছায় শেখ মুজিবের একটি বার্তা, যা তিনি আগের রাতে বন্দি হবার পূর্ব মুহূর্তে পাঠিয়ে গেছেন। সে বার্তায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সারাবিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের কাছ থেকে প্রার্থনা করেছেন সাহায্য।

পাক আক্রমণের ঘনঘটার মধ্যেই শেখ মুজিবের সেই স্বাধীনতার বার্তা প্রচারিত হতে থাকে গোপন সেই বেতার কেন্দ্র থেকে। কিন্তু বেতারকর্মীরা আশঙ্কা করছিলেন যে কোনো মুহূর্তে পাকিস্তানি সৈন্যরা দখল করে নিতে পারে কেন্দ্রটিকে। বেতার কেন্দ্রটির নিরাপত্তার জন্য সামরিক সাহায্য খুঁজছিলেন তাঁরা। ঘটনাচক্রে এসময় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে চট্টগ্রামে অবস্থিত বাঙালি মেজর জিয়ার সঙ্গে। বেতার কর্মীদের অনুরোধে ঐ রিলে সেন্টারের নিরাপত্তা দিতে সেখানে উপস্থিত হন মেজর জিয়া।

এসময় বেতারকর্মী বেলাল মোহাম্মদ খানিকটা ঠাট্টা করেই মেজর জিয়াকে বলেন, 'আমরা তো সব 'মাইনর' আপনি 'মেজর' হিসেবে নিজের কণ্ঠে কিছু প্রচার করলে ভালো হবে।"

প্রস্তাবটি গুরুত্বের সাথে নেন মেজর জিয়া। ২৭ মার্চ প্রথমে নিজের নামে পরে শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি। বলেন, 'আই মেজর জিয়া, প্রভিন্সিয়াল কমান্ডার ইন চিফ অফ দি বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি, হেয়ার বাই প্রক্লেইম, অন বিহাফ অফ শেখ মুজিবর রহমান, দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ ...।'

তারপর থেকে মেজর জিয়ার ঐ ভাষণ এবং তাঁর বাংলা তর্জমা লাগাতার প্রচারিত হতে থাকে কালুর ঘাট রিলে স্টেশন থেকে। একাত্তরের ঐ দিকচিহ্নহীন দিনে যারা বেতারে মেজর জিয়ার ঐ ঘোষণা শুনেছেন তাঁরা উদ্দীপিত হন। বিশেষ

করে একজন সেনা কর্মকর্তার মুখে এই ঘোষণা শুনে সবার স্বস্তি জাগে এই ভেবে যে বাঙালিরা শুধু পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে না, লড়াই করছে কোথাও। মেজর জিয়ার ঐ ঘোষণা এক পর্যায়ে চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য নদীতে নোঙ্গর করা এক জাপানি জাহাজে ধরা পড়ে, সেখান থেকে চলে যায় রেডিও অস্ট্রেলিয়ায়। রেডিও অস্ট্রেলিয়ার মাধ্যমে সারা পৃথিবী শুনতে পায় মেজর জিয়ার সেই ঘোষণা।

আর এই ঘোষণার মাধ্যমে সে সময় অপরিচিত জনৈক মেজর জিয়ার জীবনও জড়িয়ে যায় বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কঠিন পাকচক্রে। কালুরঘাট বেতারের সেই সন্ত্রস্ত অথচ সাহসী বেতারকর্মীরা তখন এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেননি যে এই ঘোষণাটির প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে। তাদের জানবার কথা নয় যে এই ঘোষণা মাত্র দুই দশকের মধ্যে হয়ে উঠবে বাংলাদেশের মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করার অন্যতম হাতিয়ার। কে ঘোষণা দিয়েছেন আগে শেখ মুজিব না মেজর জিয়া এই তুচ্ছ বিতর্কে নিজেদের ছিনভিন্ন করবে একটি জাতি।

চট্টগ্রামে যখন ঐ স্বাধীনতা ঘোষণার নাটক চলছে তখন দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সামরিক বাহিনীর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে প্রতিরোধ। জয়দেবপুর, কুমিল্লা, যশোর ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি আর্মি অফিসাররা যার যার সাধ্যমতো বিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন লড়াই। দেশের নানা এলাকায় ছড়িয়ে থাকা সিনিয়র বাঙালি আর্মি অফিসাররা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এপর্যায়ে সব সামরিক অফিসারদের একটি সভায় মিলিত হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। শেষে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানের নির্জন বাঙলোতে বসে সেই ঐতিহাসিক সভা।

দূরে চা বাগানের কুলিদের পুজার ঢাকের শব্দ আসে, দুটি পাতা আর একটি কুড়ির উপর দিয়ে বয়ে যায় রাতের বাতাস, নাম না জানা পাখি ডাকে। আর বাঙলোর ভেতরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বসেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা বাঙালি সেক্টর কমান্ডাররা। এটি স্পষ্ট হয় যে বাঙালিদের অবস্থা খুবই নাজুক। দেশের নানা অঞ্চল দ্রুত চলে যাচ্ছে পাকিস্তানি বাহিনীর দখলে। কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে বাঙালি সেনাদের দখলে যে অস্ত্র আছে এ দিয়ে পাকিস্তানি শক্তিশালী বাহিনীর সাথে টিকে থাকা অসম্ভব। তাদের দরকার আরও অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ। কিন্তু কোথা থেকে আসবে সেই অস্ত্র? স্বভাবতই প্রথম বিবেচনায় আসে প্রতিবেশী ভারত। কিন্তু ভারতের সাথে যোগাযোগটা হবে কি করে? ভারত তাদের অস্ত্র দেবে কিনা সেটি একটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে কথা বলতে হবে বাংলাদেশের সরকারের কোনো প্রতিনিধিকে? কিন্ত কোথায় বাংলাদেশের সরকার, কে তার প্রতিনিধি? পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের অভাবনীয় ভয়াবহতায় হতবিহ্বল আওয়ামী লীগের

নেতাকর্মীরা সীমান্ত অতিক্রম করে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতে। শেখ মুজিব কি ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধ বিষয়ে কোনো কথা বলে গিয়েছিলেন?

সে খবর স্পষ্ট করে জানেন না তেলিয়াপাড়ার চা বাগানে বসা বাঙালি এই সামরিক অফিসাররা। রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা অব্যহত রেখে তারা আপাতত সিদ্ধান্ত নেন একটি সম্মিলিত মুক্তিবাহিনী গঠনের, সর্বসম্মতিক্রমে যার নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় ব্রিটিশ আর্মির অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বাঙালি অফিসার কর্নেল ওসমানীকে।

দূরে তখনও শোনা যায় চা শ্রমিকদের পূজার ঢাকের শব্দ।

ছায়া যুদ্ধ থেকে যুদ্ধের ছায়ায়

বাড়ির পাশের মাঠে তাহেরের নেতৃত্বে আশরাফুন্নেসার সব ছেলেমেয়েরা যে ছায়া যুদ্ধের খেলা খেলেছে, সে যুদ্ধ এখন সশরীরে উপস্থিত তাদের সামনে। তারা সবাই প্রস্তুত। আসল যুদ্ধ মাঠের মাঝখানে যাবার জন্য তারা উদগ্রীব।

ইয়াহিয়া খান যখন সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন তখন ছাত্রলীগের একটি অংশ সিদ্ধান্ত নেয় আরও জঙ্গি হয়ে উঠবার। তাদের নেতা সিরাজুল আলম খান। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, শহরে শহরে বোমা ফাটিয়ে আতঙ্কিত করে তুলবে ইয়াহিয়া সরকারকে। ডাক পড়ে আনোয়ারের। বোমা পারদর্শী হিসেবে ছাত্রদের মধ্যে আনোয়ারের নাম ডাক। ছাত্রলীগের জঙ্গি কয়েকজন সদস্য নিয়ে আনোয়ার তৈরি করে ফেলেন 'সূর্যসেন স্কোয়াড'। মলোটভ ককটেল বানিয়ে শহরের নানা জায়গায় তা ফাটিয়ে সরকারকে আতঙ্কিত এবং বিভ্রান্ত করে তোলেন তারা।

মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলোতে আনোয়ার যখন ছাত্রলীগের সঙ্গে মিলে বোমা বানাচ্ছেন তখন আরেক ভাই সাঈদ যোগ দিয়েছেন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি নামের এক জঙ্গি দলে। এই দল তখন 'বোমবার্ড দি হেডকোয়ার্টার'—মাও সে তুং এর এই কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকার এসেম্বলি হল বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুজিব এবং ইয়াহিয়া আলোচনা শেষে যেদিনই এসেম্বলিতে বসবেন সেদিনই কয়েকজন সুইসাইড স্কোয়াডের কর্মীদেরকে দিয়ে বোমা ফাটিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে সংসদ। সাঈদ তখন ঐ সুইসাইড স্কোয়াড গঠনে ব্যস্ত। সংসদ ভবনে রেকির কাজ চালান তিনি। সংসদ ভবনের দারোয়ান, গার্ড, মালি এদের সাথে নানাভাবে ভাব জমিয়ে ভবনের খুটিনাটি জেনে নেন তিনি। কোথায় কোথায় বিস্ফোরকগুলো বসাতে হবে, সংসদ ভবনে কে কোথায় কিভাবে যাতায়াত করে, সুইসাইড স্কোয়াডের ছেলেরা কোথায় অবস্থান নেবে ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সমন্বয় করায় তখন ব্যস্ত সাঈদ। তার সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্যদের ট্রেনিং দেবার জন্যও সাঈদ ডাকেন

আনোয়ারকে। সূর্যসেন স্কোয়াডের পাশাপাশি সাঈদের সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্যদেরও ট্রেনিং দেন আনোয়ার। ধানমণ্ডির এক বাসা ভাড়া করে মজুদ করা হয় বোমা বানানোর সব বিস্ফোরক। এইসব কর্মকাণ্ডে তাদের যাবতীয় সহায়তায় আছেন তাঁদের পুরনো বামপন্থী বন্ধু বেবী ভাই, দুই হাত কব্জি থেকে কাটা এই মানুষটির তৎপরতা বামপন্থী বন্ধু মহলে সুবিদিত। তারই সূত্রে তাদের পরিচয় ঘটে আরেক কৌতূহলোদ্দীপক মানুষ মিন্টু ভাইয়ের সঙ্গে। পেশায় কন্ট্রাকটার, বিশাল ধনবান এই মানুষটি ঢাকা শহরের গুটিকয় মার্সিডিস বেঞ্চের মালিকের মধ্যে একজন। মার্সিডিজ এর পেছনে ক্যারাভ্যান লাগিয়ে তিনি চলে যান আউটিং এ। এমন ব্যাপার নেহাতই অভিনব তখন ঢাকায়। তবে বিশাল অর্থ সম্পত্তির মালিক হয়েও মিন্টু ভাই এর গোপান কাজ হচ্ছে বামপন্থী জঙ্গি দলগুলোকে সহায়তা করা। ধানমণ্ডির বাসা ভাড়া, বিস্ফোরক কেনার পয়সা সব দেন তিনি। আনোয়ার খোঁজ পান জয়পুরহাটের খঞ্জনপুরে পাকিস্তান জিওলজিক্যাল সার্ভের আড়াই হাজার পাউন্ড জিলেনাইট প্লাস্টিক বিস্ফোরক মজুদ আছে। মিন্টু ভাই, বেবী ভাইয়ের সহায়তায় ঐ জিলেনাইটগুলো দখল করবার পরিকল্পনা করেন আনোয়ার। খঞ্জনপুরে যাবার তারিখ ঠিক করা হয় ২৫ শে মার্চ।

কিন্তু সবার সব হিসাব এলোমেলো করে সেদিনই বদলে যায় বাংলাদেশের ইতিহাস। সে রাতে পাকবাহিনীর সেই তাণ্ডব যখন শুরু হয়েছে আনোয়ার তখন তার সূর্যসেন স্কোয়াডের আরও কয়েকজন ছেলেদের নিয়ে ফজলুল হক হলে। তাদের সঙ্গে কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড। সারারাত তাঁরা শোনেন প্রচণ্ড গোলাগুলি, লাগাতার বিস্ফোরণ আর থেমে থেমে মানুষের আর্তচিৎকার। আনোয়ার তার সঙ্গীদের নিয়ে গ্রেনেড হাতে অবস্থান নেন হলের ছাদে। নির্ঘুম কাটে তাদের সারারাত। ভোরের দিকে পরিস্থিতি বোঝার জন্যে হল থেকে বের হলে দেখেন চারপাশে ভূতুড়ে পরিবেশ, আশপাশে মানুষ জনের কোনো চিহ্ন নেই। আবার হলে ফিরে আসেন আনোয়ার। দূর থেকে শহীদুল্লাহ হলে প্রচণ্ড শব্দে কামানের গোলা এসে পড়তে দেখেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পর এক দল পাক সেনা তাদের হলে ঢুকবার চেষ্টা করে। ফজলুল হক হলের উর্দুভাষী দারোয়ান মিলিটারিদের নানা কথা বলে বোঝাতে সক্ষম হয় যে হলের ভেতর কেউ নেই। চলে যায় পাক সেনারা, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যেন বেঁচে যান আনোয়ার আর তার সঙ্গীরা।

সে-রাতে সাঈদ ধানমণ্ডির সেই বাসায় বিস্ফোরক পাহারা দিচ্ছেন। মাঝ রাতে গোলাগুলির শব্দে, মানুষের আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। বাইরে এসে দেখবার চেষ্টা করেন। কিছু বুঝে উঠতে পারেন না। আকাশে শুধু কামানের গোলার আলোর হলকা। ধানমণ্ডির ঐ বাড়ির মালিক পাকিস্তানপন্থী। তিনি এসে সাঈদকে হুমকি দেন সকালের মধ্যে সব বিস্ফোরক সরিয়ে না ফেললে তাকে পাক আর্মির কাছে তিনি ধরিয়ে দেবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে নিজের কাছে সবসময় একটি পিস্তল রাখেন সাঈদ। ক্ষেপে গিয়ে সে পিস্তল সাঈদ বাড়িওয়ালার মাথায় ঠেকিয়ে

বলেন, 'আর একটা কথা বলবি তো খুলি উড়াইয়া দিমু।' অনিশ্চিয়তায় সাঈদ সারারাত জেগে ভোরের অপেক্ষা করতে থাকেন। সাঈদও টের পান তাদের এসেম্বলি উড়িয়ে দেবার হিসাবে কোথাও গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

সকালে কারফিউ শিথিল হলে আনোয়ার রওনা দেন সাঈদের কাছে। দেখেন রাস্তায় পড়ে আছে লাশ, রাস্তার দুপাশে আগুনে পোড়া ঘরবাড়ি। ধ্বংসের চিহ্ন চারদিকে। কিছু দূর পর পর আর্মির ট্রাক। শহরের ঐ ভীতিকর রাস্তা পেরিয়ে আনোয়ার পৌঁছান সাঈদের কাছে। তারা সিদ্ধান্ত নেন চলে যাবেন বুড়িগঙ্গার ওপারে, ঠিক করেন তাদের বানানো বোমা এবং বোমার সরঞ্জামগুলোও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ধানমণ্ডির বিস্ফোরকগুলো নদী পার করবার জন্য এগিয়ে আসেন মিন্টু ভাই। তিনি তার মার্সিডিজের বনেটে বিস্ফোরকগুলো নিয়ে চলে যান সেনা টহলের মাঝ দিয়েই। এক সৈনিক তাকে গাড়ি থামাতে বললে উর্দুতে ধমক দেন তিনি। বিলাস বহুল গাড়ি আর অভিজাত হুমকিতে ভড়কে যায় সেই সৈনিক, ছেড়ে দেয় গাড়ি। একই ভাবে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে শহরের ভেতর দিয়েই চালের বস্তা আর লেপের ভেতর দিয়ে কিছু মজুত অস্ত্র আনোয়ারের কাছে পাচার করেন বেবী ভাই। বেবী ভাইয়ের রিকশা থামালে তিনিও পাক সেনাদের ভড়কে দেন নাটকীয়ভাবে তার কাটা দুই হাতের গল্প বলে।

বুড়িগঙ্গা পাড় হয়ে ওপারে চলে যান আনোয়ার আর সাঈদ। বুড়িগঙ্গার বুকে সেদিন অভূতপূর্ব দৃশ্য। মানুষ স্রোতের মতো নদী পার হচ্ছে। দলে দলে মানুষ পালাচ্ছে ঢাকা ছেড়ে। কেরানিগঞ্জে এক পরিচিতের বাড়িতে গুলি, বন্দুক আর বিস্ফোরকগুলো রেখে আনোয়ার এবং সাইদ রওনা দেন ময়মনসিংহের পথে। টাঙ্গাইল হয়ে পায়ে হেটে, নৌকায় চড়ে বেশ কদিন ধরে যাত্রার পর তাঁরা পৌছান শ্যামগঞ্জের কাজলায়।

আরেক ভাই বেলাল তখন নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজে। '৭১-এর মার্চে অন্যান্য জায়গার মতো নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজেও নানারকম প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছে। সে প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে যুক্ত বেলাল। ২৫ মার্চ রাত্রে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে উঠলে তোলারাম কলেজের ছাত্ররা একটা বিশাল রেলের বগি নিয়ে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রোডের মাঝে ফেলে ব্যারিকেড দেয়। সেই বগি সরানোতে আছে বেলালেরও হাত। ঐ রেল বগির কারণে সে রাতে পাকিস্তান আর্মি ঢুকতে পারেনি নারায়ণগঞ্জে। এর আগে ছাত্ররা নারায়ণগঞ্জের রাইফেল ক্লাব ভেঙ্গে সেখানকার সব রাইফেলগুলোও নিয়ে নেয় নিজেদের দখলে। তবে ২৫ মার্চ ঠেকাতে পারলেও পরদিন পাকিস্তান আর্মি ট্যাঙ্ক নিয়ে ঢোকে নারায়ণগঞ্জে। তারা ফায়ার করতে করতে, পথে পথে অগণিত মানুষকে হত্যা করতে করতে এগিয়ে যায়। ভয় পেয়ে পিছু হটে যায় সবাই। পিছু হটেন বেলালও। নানা ঘোরা পথে নারায়ণগঞ্জ থেকে বেরিয়ে তিনি চলে যান কাছের গ্রাম নিতাইগঞ্জে। দুদিন গ্রামে

লুকিয়ে থাকার পর অবস্থা বুঝবার জন্য বেলাল নিতাইগঞ্জ থেকে একটি সাইকেল নিয়ে রওনা দেন ঢাকার দিকে।

প্রথমে যান মোহাম্মদপুরে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শামীমের বাসায়। দেখেন বিরান বাড়ি, আগুনে পুড়ে কালো হয়ে আছে। শোনেন বিহারীরা পুড়িয়ে দিয়েছে বাড়িটি। মেরে ফেলেছে ওদের বাবা সলিমুল্লাহ সাহেবকেও। বহু বছর পর শামীমের দুই ভাই সাদী আর শিবলী যখন স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গীত আর নাচে নাম কুড়াচ্ছেন তখন বেলালের চোখে থেকে থেকে ভেসে ওঠে সেই পোড়া বাড়ি। বাড়িটার কাছেই তাকে দেখে এক বিহারী চিৎকার করে বলে, 'ইধার ছে ভাগ যা, আভি ইধার ছে ভাগ যা।' বেলাল দ্রুত সাইকেল নিয়ে রওনা দেন খেজুরবাগানে তার আরেক বন্ধু কাশেমের বাড়ি। কিন্তু সেখানেও চারদিকে শুনসান। বাড়ির সিঁড়িতে রক্ত, ঘরের ভেতরে কেউ নেই। বন্ধু কাশেমকে খুঁজে পান না বেলাল। যেন অচেনা এক দৈত্যপুরীতে সাইকেল চালিয়ে বেড়াচ্ছে এক উদ্‌ভ্রান্ত যুবক। জন মানব নেই, আছে রক্ত, আছে আগুন।

ঐ মৃত প্রেতনগরীর ভয়ঙ্কর রুপ দেখে দ্রুত আবার নারায়ণগঞ্জে ফিরে যান বেলাল। ঠিক করেন চলে যাবেন ময়মনসিংহ। বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকেন। দূর পাল্লার কোনো যানবাহন চলছে না। হঠাৎ ময়মনসিংহের একটি বাস পাওয়া যায়। বাসে উঠে পড়েন বেলাল। মধুপুরের কাছে আসতেই পাকিস্তানিরা বাস থামায়। বাস থামিয়ে চেক করা তখন মিলিটারিদের নৈমিত্তিক কাজ। কাউকে সন্দেহ হলে সেখানেই গুলি করে হত্যা করে তারা। বেলালদের বাস থেকেও সবাইকে নামানো হয়, লাইন করে দাঁড়ায় সবাই। বেলালের দিকে তাকিয়ে সুবেদার বলে, 'আপ কিধার যাতা হায়?' ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে বেলাল জানান তিনি ময়মনসিংহ যাচ্ছেন। বুক শুকিয়ে আসে তার। বাঁচার তাগিদ শুভবুদ্ধির যোগান দেয় মানুষকে। হঠাৎ বেলাল সুবেদারকে বলেন, 'মেরা ভাই পাকিস্তান আর্মিকা মেজর হ্যায়।' সুবেদার জানতে চায় কোথাকার মেজর? বেলাল বলেন, বেলুচ রেজিমেন্ট কা মেজর।

বেলাল তার ভাই মেজর তাহেরের পরিচয় দেন। এতে কাজ হয়। সুবেদার বেলালকে বেশ মর্যাদা দিতে থাকে। সে তাকে বাসে উঠে যেতে বলে এবং কোথাও কেউ আটকালে তার ভাই যে পাকিস্থান আর্মির মেজর সে কথা যেন বলে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়। সারা পথ আতঙ্কে থাকে বেলাল। আতঙ্ক তখন ছায়ার মতো ঢেকে রেখেছে বাংলাদেশের মানচিত্র। একসময় ময়মনসিংহ নামে বেলাল। দেখে চারদিকে নিস্তব্ধ। কিছুদিন আগে ময়মনসিংহ শহরে ঘটে গেছে বীভৎস এক হত্যালীলা। বাঙালিরা হত্যা করেছে অসংখ্য বিহারীদের। বিহারীদের নিরাপত্তা দিতে এসে পাকবাহিনী পুরো ময়মনসিংহ শহর দখল করে নিয়েছে এবং নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে বাঙালিদের। অবস্থা তখন এমন যে কোনো ছোট বিহারী শিশু যদি কোনো বাঙালির দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে পাক আর্মিকে বলে, 'উও লোক মেরা বাপকো মারা হ্যায়।' ব্যাস্ সাথে সাথে ঐ জায়গাতেই তাকে গুলি করে মেরে

ফেলছে পাকিস্তান আর্মি। ভীতির চাদর মোড়ানো ময়মনসিংহ শহর সন্তর্পণে পাড়ি দিয়ে বেলালও একসময় পৌছে যায় শ্যামগঞ্জের কাজলায়। এভাবেই মৃত্যু উপত্যকা পেরিয়ে আশরাফুন্নেসার ছেলেরা এক এক করে পৌছায় কাজলায়।

ইতোমধ্যেই কাজলার বাড়ি ভরে গেছে নানা প্রান্ত থেকে পালিয়ে আসা ছেলেমেয়েদের ভিড়ে। সেই ভিড়ে নিজের ছেলেদেরও দেখে স্বস্তি আসে আশরাফুন্নেসার।

বাহার নেত্রকোণা থেকে সবার আগেই চলে এসেছিল কাজলায়। নেত্রকোণা কলেজ থেকে সেবার ইন্টারমিডিয়েট দিয়েছেন তিনি। কাছেই মধুপুরের ইপিআর এর সৈন্যরা এর মধ্যেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে এবং বাহার তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পেয়ে গেছেন রাইফেল। চোরাগোপ্তা প্রতিরোধে ইতোমধ্যেই অংশ নিতে শুরু করেছেন তিনি। ভাইদের মধ্যে তখন কেবল বাহারের হাতেই অস্ত্র। সবচেয়ে সুদর্শন, সাহসী বাহার তখন বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া তরুণীদের মুগ্ধ চোখের সামনে রাইফেল কাঁধে নিয়ে প্রতিদিন সকালে চলে যান অপারেশনে, সন্ধ্যায় ফেরেন বীরের মতো। ঘরে ফিরে নানা বীরোচিত কাণ্ড করে নজর কাড়েন সবার। একদিন বাহার উঠানের মাঝখানের কূয়াটিতে খালি হাতে, দু হাত আর দুপায়ে দুদিকের দেয়ালে ভর রেখে নেমে যান নিচে আবার উঠে আসেন উপরে। কূয়ার মুখের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা হাততালি দিয়ে ওঠে। পিঠেপিঠে ভাই বেলাল বলে : মার্কেট তো পুরাটা তুই দখল করলি, আমাদের আর কোনো চান্স নাই।

তাহের তখনও কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টে নজরবন্দি হয়ে আছেন। তাঁদের বড় ভাই আরিফও তখন ইসলামাবাদে আর ইউসুফ চাকরিসূত্রে সৌদি আরব। এরা সবাই অচিরেই এসে যোগ দেবেন ইতিহাসের এই যজ্ঞে। আর তাহের হয়ে উঠবেন এর অন্যতম এক কুশীলব।

একটি ডাকোটা বিমান, একজন অনন্য মানুষ

তেলিয়াপাড়ার চা বাগানে বাঙালি আর্মি অফিসাররা যখন যুদ্ধের সামরিক দিকটি পর্যালোচনা করছেন তখন শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে এর রাজনৈতিক দিকটি সামাল দেবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ। খানিকটা অন্তর্মুখী, প্রচারবিমুখ এই মানুষটি পাকিস্তান বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে দীর্ঘদিন ছিলেন শেখ মুজিবের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী। জুলফিকার আলী ভুট্টো একবার তার এক সহচরকে বলেছিলেন, 'আলোচনার টেবিলে শেখ মুজিবের পেছনে ফাইল হাতে যে নটরিয়াস লোকটি চুপচাপ বসে থাকে তাকে কাবু করা খুব শক্ত, দিস তাজউদ্দীন ... আই টেল ইউ, উইল বি এ বিগ প্রবলেম, হি ইজ ভেরি থরো।'

২৫ মার্চের সন্ধ্যাতেও তিনি ছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। শেখ মুজিব তাজউদ্দীনকে বলেছিলেন ঢাকার শহরতলীতে কোথাও লুকিয়ে থাকতে যাতে সময়মতো আবার তাঁরা মিলিত হতে পারেন। ২৫ মার্চ মাঝ রাত থেকে প্রবল গোলাগুলি শুরু হলে তাজউদ্দীন আর শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পাননি। পরদিন পাকিস্তানিদের তাণ্ডবের মধ্যে আওয়ামী লীগের অন্য কোনো নেতার সঙ্গেও আর যোগাযোগ সম্ভব হয়নি তার। এরপর তরুণ সহকর্মী পরবর্তীকালের আইনজীবী আমিরুল ইসলামকে নিয়ে তাজউদ্দীন রওনা দেন ভারতের পথে। পায়ে হেঁটে, নৌকায়, গাড়িতে, কখনো ঘোড়ায় চড়ে খাল, বিল, নদী পেরিয়ে ঢাকা, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা হয়ে দুজনে পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গে।

ভারত সরকারের সীমান্তরক্ষী বাঙালি কর্মকর্তা গোলক মজুমদার একদিন শুনলেন আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা কুষ্টিয়ার মেহেরপুর এলাকায় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ বললেন তিনি সম্ভবত শেখ মুজিবর রহমান স্বয়ং। গোলক মজুমদার কলকাতা থেকে সারাদিন জার্নি করে নদিয়া জেলার টুঙ্গি সীমান্তে এসে পৌঁছলেন এই নেতাকে দেখবার জন্যে। গিয়ে দেখলেন সেখানে শেখ মুজিব নেই বরং তার সাথে দেখা হলো ময়লা গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরা, ক্লান্ত মুখের চার পাঁচ দিনের দাড়ি গোঁফ, রবারের ছেঁড়া চটি পায়ে দুজন লোক। জানতে পারলেন এদের একজনের নাম তাজউদ্দীন আহমেদ অন্যজন আমিরুল ইসলাম।

গোলক মজুমদারের সহায়তাতেই তাজউদ্দীন দেখা করেন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাজউদ্দীন সামরিক সাহায্য চান, চান গোলা বারুদ অস্ত্রশস্ত্র, চান দীর্ঘমেয়াদী একটি যুদ্ধের জন্য সাধারণ বাঙালিদের সামরিক প্রশিক্ষণ এবং সীমান্ত পার হয়ে আসা শরণার্থীদের জন্য ভারতে নিরাপদ আশ্রয়। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও বাংলাদেশের কোনো সরকার নেই তবু তাজউদ্দীন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে পরিচয় দেন।

ভারত সরকার নীতিগতভাবে বাংলাদেশকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল। তাদের দরকার ছিল বাংলাদেশের কোনো যোগ্য প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ। ইন্দিরা সবকটির ব্যাপারে বাংলাদেশকে পূর্ণ সহায়তা দেবেন বলে জানান। পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের সঙ্গে কাশ্মীরসহ অন্যান্য সমস্যাসমেত ভারতের বৈরিতা দীর্ঘদিনের। ভৌগোলিক রাজনৈতিক স্বার্থ আর মানবিক দিক বিবেচনা করে ভারত তাই অনায়াসেই দাঁড়ায় বাংলাদেশের পাশে।

তাজউদ্দীন ইন্দিরার কাছে সবুজ সংকেত পেয়ে দ্রুত ফিরে আসেন কলকাতায়। ফিরেই দুটি কাজ করা খুব জরুরি মনে করলেন তিনি, এক, দেশের মানুষের উদ্দেশে সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে একটা ভাষণ দেওয়া এবং শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে একটা অস্থায়ী সরকার গঠন করা। কলকাতায় ফিরে তার সঙ্গে দেখা হয় অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান এবং আনিসুর রহমানের সঙ্গে।

তাঁদের কাছ থেকেও শুনতে পান ঢাকার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা, জানতে পারেন ড. কামাল হোসেনের গ্রেফতারের খবর। আমিরুল ইসলাম এবং রেহমান সোবহানের সহায়তায় তাজউদ্দীন একটি বক্তৃতা তৈরি করেন, যেখানে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে দেশবাসীকে নানা রকম নির্দেশ দেন। শিলিগুড়ির এক অনিয়মিত বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার হতে থাকে সেই বক্তৃতা।

কিন্তু তাজউদ্দীন তখনও জানেন না তার সহকর্মীরা কে কোথায় আছেন। প্রাথমিক কাজের জন্য ইন্দিরা গান্ধী তাজউদ্দীনকে একটি ছোট ডাকোটা বিমান দেন। কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ঐ ছোট বিমানে চড়ে তাজউদ্দীন বেড়িয়ে পড়েন অন্য নেতাদের খোঁজে। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত বরাবর আকাশ পথে খুঁজতে বেরোন তাঁর সতীর্থদের। খুব নিচু দিয়ে চলে বিমান। রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেটের সীমান্তের কাছে মালদহ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, রূপসা, শিলচর প্রভৃতি ভারতীয় এলাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত রানওয়েগুলোতে নামে সেই বিমান। তাজউদ্দীন খোঁজ করেন বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে আওয়ামী লীগের কোনো নেতা সেখানে এসেছেন কিনা। তিনি পেয়ে যান মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, ওসমানী প্রমুখ নেতাদের। বিমানে চড়ে আকাশে আকোশে ঘুরে যুদ্ধ আক্রান্ত একটি দেশের সরকার গঠন করবার চেষ্টা করতে থাকেন শেখ মুজিবের পেছনে সবসময় ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা 'নটোরিয়াস' লোকটি।

বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আওয়ামী লীগের নেতাদের জড়ো করে তাজউদ্দীন কলকাতায় মিটিং ডাকেন। কলকাতার লর্ড সিনহা রোডের সেই মিটিংয়ে তাজউদ্দীন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তার আলাপের বিষয়টিকে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে জানান। অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া পান তিনি।

তরুণ নেতা শেখ মণি বলে উঠেন, 'আপনি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিলেন কেন? আপনাকে কে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে? এটা কি মন্ত্রী মন্ত্রী খেলার সময়?'

অপ্রস্তুত হন তাজউদ্দীন। তবে একেবারে অবাক নন। তাজউদ্দীন বেশ জানেন শেখ মণি প্রভাবশালী তরুণ নেতা, শেখ মুজিবের আত্মীয়, প্রিয়ভাজন। তিনি এও খোঁজ পেয়েছেন যে, শেখ মণি তার সহযোগী তরুণ ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাকসহ ভারতে এসে তাজউদ্দীনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না করে স্বতন্ত্রভাবে 'মুজিববাহিনী' নামে এক সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলবার উদ্যোগ নিয়েছেন। শেখ মণি আরও বলেন, এখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সবাইকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে এবং একটা বিপ্লবী পরিষদ তৈরি করতে হবে। বঙ্গবন্ধু এ রকম নির্দেশই দিয়ে গেছেন আমাকে।

বিরক্ত, মর্মহত হলেন তাজউদ্দীন কিন্তু শান্তকণ্ঠে ঐ ক্রান্তিকালে ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনার স্বার্থে একটি আইনগত

সরকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের কথা বললেন এবং সে প্রেক্ষিতে ইন্দিরার সাথে তার আলাপের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করলেন। এ নিয়ে আলাপ চলল দীর্ঘক্ষণ এবং বৈঠকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ নেতাই তাজউদ্দীনের বক্তব্যকে মেনে নিলেন। মানলেন না শুধু একজন, শেখ মণি।

অসন্তুষ্ট মণিকে পেছনে রেখে কলকাতা থেকে সেই ছোট 'ডাকোটা' বিমানে চড়েই এবার তাজউদ্দীন চলে গেলেন আগরতলায়। আগরতলায় গিয়ে তাজউদ্দীন খুঁজে পেলেন মিজান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রমুখ নেতাদের। মিটিং এ বসলেন তাদের নিয়েও। অন্যান্য নেতারা ইন্দিরার সঙ্গে তাজউদ্দীনের আলাপটিকে স্বাগত জানালেও এখানেও ব্যতিক্রম একজন। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদ। একমাত্র আওয়ামী লীগ নেতা যিনি সব সময় আচকান এবং টুপি পড়ে থাকেন।

তাঁর প্রতিবাদটি নাটকীয়। মিটিংয়ের মাঝখানে তিনি হঠাৎ বলে উঠেন, 'আমাকে তোমরা সবাই মক্কায় পাঠিয়ে দাও, আমি সেখানেই মারা যাবো। আমি মারা গেলে আমার লাশ তোমরা পাঠিয়ে দিও বাংলাদেশে।' সবাই অবাক। বোঝার চেষ্টা করছেন কি ব্যাপার! কিন্তু খন্দকার মোশতাক তেমন কিছুই বলেন না। পরে তিনি তার এক ঘনিষ্ঠ জনের মাধ্যমে জানান যে, তিনি তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রিত্ব ঘোষণায় ক্ষুব্ধ। কারণ তিনি মনে করেন সিনিয়র হিসাবে প্রধানমন্ত্রি হওয়া উচিত তারই। এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয় আবার। বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিসভায় তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে এই শর্তে খন্দকার মোশতাক তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে রাজি হন।

লক্ষ রাখা দরকার বাংলাদেশের প্রথম সরকার প্রতিষ্ঠার সেই ভ্রূণাবস্থায় বিভক্তির বীজ বপন করেছেন দুজন মানুষ—শেখ মণি এবং খন্দকার মোশতাক। এর তাৎপর্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হবে ভবিষ্যত বাংলাদেশে।

তাজউদ্দীন এগিয়ে চললেন তার পরিকল্পনা নিয়ে। সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশ নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ এবং স্বাধীনতার সনদ পাঠ অনুষ্ঠান তিনি করবেন বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে কোনো জায়গায়। বাংলাদেশে প্রায় সব অঞ্চলই তখন চলে গেছে পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে। শেষ পর্যন্ত খুঁজে সীমান্তের কাছাকাছি কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামটিকে নির্বাচন করা হলো অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে। সিদ্ধান্ত হলো ১৭ এপ্রিল হবে অনুষ্ঠান। গোপনীয়তার সাথে শপথ অনুষ্ঠানের খুটিনাটি প্রস্তুতি নিতে থাকলেন তাজউদ্দীন, আমিরুল ইসলাম প্রমুখেরা। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ আবিষ্কৃত হলো যদিও কর্নেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কিন্তু তিনি সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন, ফলে তার কোনো সামরিক পোশাক নেই। কিন্তু শপথের অনুষ্ঠানে যুদ্ধের সর্বাধিনায়কের একটা সামরিক পোশাক থাকবে না তা কেমন করে হয়? ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে খোঁজ করা হলো। কিন্তু কর্নেল ওসমানী শুকনো মানুষ তার মাপ

মতো কোনো ভারতীয় অফিসারের পোশাক পাওয়া গেলো না। শেষে অনেক রাতে কাপড় কিনে দর্জি ডেকে কর্নেল ওসমানীর সামরিক পোশাক বানানো হলো।

সূর্য উঠবার আগেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সব সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হলো বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে। কয়েকটা সাধারণ চৌকি একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে মঞ্চ। মঞ্চে তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আমহেদ, এম মনসুর আলী, এইচ এম কামরুজ্জামন, কর্নেল ওসমানী। সবার পরনে সাদা পাঞ্জাবি শুধু একজন ছাড়া, যিনি যথারীতি পরে আছেন কালো আচকান আর টুপি। তাড়াতাড়ি করে অনুষ্ঠান শুরু করা হলো ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অফ অনার প্রদান করার মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী পাঠ করলেন স্বাধীনতার সনদ।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমেদ ভাষণ দিলেন উপস্থিত সাংবাদিক এবং জনগণের উদ্দেশে। তাজউদ্দীন তাৎক্ষণিকভাবে বৈদ্যনাথতলাকে মুজিবনগর নামকরণ করলেন এবং ঐ এলাকাটিকে অস্থায়ীভাবে ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে। আমবাগানের সে অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ছাড়াও জড়ো হয়েছেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের শত শত লোক। চারদিকে আওয়াজ ওঠে 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙ্গালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো' স্লোগান। দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করে দুপুরের মধ্যেই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ সবাই ঐ জায়গা ত্যাগ করলেন। বৈদ্যনাথতলার আমবাগানের আম গাছে সেদিন কোনো আম নেই। আমবিহীন ঐ গাছ গুলো সাক্ষী হয়ে রইল একটি নতুন দেশের প্রথম সরকার ঘোষণার ঐতিহাসিক মুহূর্তটির।

ইয়াহিয়া তুমনে ইয়ে কিয়া কিয়া

কাজলায় এসে ইতোমধ্যে সাঈদ এবং আনোয়ার স্থানীয় যুবকদের সংগঠিত করতে শুরু করেছেন। চেষ্টা করছেন দেশের ভেতরে থেকে কি করে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়। ডালিয়া আর জুলিয়াকেও ভারতেশ্বরী হোমস থেকে নিয়ে আসা হয়েছে কাজলায়। আর লুৎফা চেনা অচেনা মানুষের ভিড়ে বুকের ভেতর চাপা আশঙ্কা, ভীতি আর দুশ্চিন্তা নিয়ে শিশু জয়াকে দুধ খাওয়াচ্ছেন, গামলায় বসিয়ে গোসল করাচ্ছেন। তখনও জানেন না কোথায়, কি অবস্থায় আছেন তাহের? বিশাল এক কড়াইয়ে আশরাফুনেসা ডাল রান্না করেন বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া বিশাল একদল মানুষের জন্য। তার সহকারী মতির মাকে ধমকান, 'ডালটা ঠিক মতো বাগাড় দাও, ছেলেমেয়েগুলো আর কিছু তো খেতে পারবে না, সামান্য কিছু ডাল আর ভাত, এই তো।'

জোৎস্না রাতে গোল হয়ে মাদুরে বসে লো ভলিউমে সবাই মিলে শোনেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বাজে সমর দাসের গান—'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল, রক্ত লাল ...' একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে চারদিক, ঘন হয়ে আসে সবার নিঃশ্বাস। শুরু হয় এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র। মুখে চাপা হাসি নিয়ে শোনেন সবাই :

'... লড়াইয়ের শুরুতে হেগো আরে চাপা রে চাপা, ওয়ার্ল্ড এর বেস্ট সোলজারগো কাছে এরকম লড়াই এককোরে পানি পানি, দুশমনগো হাতে কোনো যন্ত্রপাতি নাইক্যা। নিয়াজি, টিক্কা, মিঠঠার দল ঘন ঘন সেনাপতি ইয়াহিয়ার কাছে মেসেজ পাঠাইলো বাহাত্তর ঘন্টার মইধ্যে সব কুছ ঠিক কবজা কইর লেংগে। তার পর বুড়িগঙ্গা দিয়া কত পানি গেলোগা, কত যে বাহত্তর ঘন্টা শেষ হইলো তার ইয়ত্বা নাই। কিন্তুক বাংলাদেশ কন্ট্রোল হওয়া তো দূরের কথা অহন ডি কন্ট্রোল হইতে চলছে। পশ্চিম পাকিস্তান থনে মোট পাঁচ ডিভিশান সোলজার আইছিল এর মধ্যে আড়াই ডিভিশান লাপাত্তা। পনের হাজার পুলিশ আসছে, হেগাইলে আতকা মাইর খাওয়ানের পর মুক্তি বাহিনীর নাম হুনলেই হেগো খালি পাও কাঁপে। নর্দান রেঞ্জের গিলগিট স্কাউট আর লাহোর রেঞ্জের বেটাগুলি ক্যান জানি না বাংলাদেশের দেড় হাতের মধ্যে যাইতেই চায় না। রাইত হইলেই খালি কান্দে। এই চার মাস ধইরা পিআই এর প্লেনগুলি পাকিস্তানের ব্যাগ দিয়া ঢাকা ভোমা ভোমা লাশ গুলারে ঠেওয়াইতে ঠেওয়াইতে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কইরা বইছে। আর হাসপাতাল গুলাতে নো ভেকেনসি। গতরে ব্যান্ডেজ বান্ধা বেটা গুলি খালি হুইতা হুইতা চিল্লাইতেছে আরে ইয়াহিয়া তুমনে হুঁয়ে কিয়া কিয়া।'

পরিকল্পনা মতো ইতোমধ্যে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় এবং বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তারা মিলে যুদ্ধের ট্রেনিং দিচ্ছেন ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ নানা পেশার তরুণদের। হাজার হাজার তরুণ সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছেন ওপারে প্রশিক্ষন নেবার জন্য। ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে তাদের জায়গা সংকুলান দূরহ হয়ে পড়ছে। হাতে রাইফেল আর স্টেনগান নিয়ে বিশাল প্রান্তরে শত শত যুবক সমস্বরে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করছেন —'আমি শপথ করিতেছি যে, মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করার জন্যে জীবন উৎসর্গ করিব।' বলকানো ঢেউ এর মতো অগণিত মানুষের টানা স্লোগান ওঠছে, 'জ...য় বাংলা'।

কাজলার তরুণদের কাছে ঐ প্রশিক্ষণের খবর পৌছায়। বাহার আর বেলাল সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেবার জন্য ভারত যাবেন। আনোয়ার এবং সাঈদকে বললে তাঁরা বিশেষ আগ্রহ দেখান না। আনোয়ার বলেন : আরেকটু বুঝে শুনে তারপর যাবো। তাহের ভাই আমাকে লিখেছিলেন যুদ্ধের ট্রেন্ডটার দিকে লক্ষ রাখতে। শুনেছি ইন্ডিয়ায় নাকি কমিউনিস্ট ছেলেদের ট্রেনিং এ নিতে চায় না। তোমরা যাও পরে আমি খোঁজ খবর নিয়ে আসছি।

মা আশরাফুন্নেসাকে জানালে তিনি বলেন : যা, তাড়াতড়ি ভালো মতো ট্রেনিং নিয়া পাঞ্জাবিগুলারে তাড়া।

ভারতের পথে রওনা দেন বেলাল আর বাহার। যেতে যেতে দেখেন মিলিটারির তাড়া খেয়ে শত শত মানুষ ঢলের মতো এগিয়ে চলেছে সীমান্তের দিকে। প্রতিদিনই হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষ দেশ ছেড়ে তখন আশ্রয় নিচ্ছেন ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে। অন্তহীন শরণার্থীর স্রোত হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে পৌঁছাচ্ছে লাখে।

এর মধ্যে একদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবরে শোনা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চার জন বাঙালি সেনা অফিসার পালিয়েছেন। তারা পালিয়ে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে এসে পৌঁছেছেন। পালিয়ে আসা অফিসারদের নাম বলা হয় না। লুৎফা উৎফুল্ল হয়ে বলেন : আমি ঠিক জানি এই চার জনের মধ্যে একজন তাহের। আনোয়ার বলেন : ঠিকই বলেছেন ভাবী। আমরাও তাই মনে হচ্ছে।

আশরাফুন্নেসা বলেন অন্য কথা : আমারও মন বলতেছে নান্টু ঐ চার জনের মধ্যে আছে। কিন্তু তোমরা এত খুশি হইও না। বিপদও আছে। পাকিস্তান আর্মির কাছে নিশ্চয় নান্টুর গ্রামের বাড়ির ঠিকানা আছে, ওরা যখনই দেখবে নান্টু পালায়ে আসছে তখন ওরা ঠিকই কাজলায় খোঁজ করতে আসবে। ওরে না পাইলে ওর বৌ বাচ্চারে ধরেও নিয়ে যেতে পারে।

সম্বিৎ হয় সবার। তাই তো, এমন তো হতেই পারে!

আশরাফুন্নেসা লুৎফাকে বলেন : বউ মা তুমি আরও ভেতরের কোনো গ্রামে চলে যাও। এইখানে নিরাপদ না।

তাহেরের বাবার বন্ধু খাজা নেওয়াজ খান প্রত্যন্ত বুরবুরা সুনাই গ্রামে তার এক পরিচিতের বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করেন। নেত্রকোণার শেষপ্রান্তে কলমা কান্দা থানার শনির হাওড়ের মাঝখানে দ্বীপের মতো বুরবুরা সুনাই গ্রাম। শিশু জয়া আর তাহেরের দুই বোন ডালিয়া ও জুলিয়াকে নিয়ে একটা ভাঙ্গা স্যুটকেসসহ লুৎফা রওনা দেন পরদিনই। হাতে সামান্য কিছু টাকা, সুটকেসে দুটো মাত্র শাড়ি আর গ্রামের এক মহিলার কাছ থেকে ধার নেওয়া একটা বোরকা। দুর্গম পথ। প্রথমে ট্রেনে করে ঠাকুরাকোনা সেখান থেকে নৌকায় সাগরের মত উঁচু ঢেউয়ের শনির হাওর পাড়ি দিয়ে বুরবুরা সুনাই।

অন্ধকার থেকে আলোয় অথবা অন্ধকারে

কোয়েটায় নজরবন্দি হয়ে আছেন তাহের। কোর্স বন্ধ হওয়াতে এক এক করে সবাই যার যার ইউনিটে ফিরে গেছেন। সিনিয়র টেকনিক্যাল কোর্সের অফিসাররা গিয়ে উঠেছেন কোয়েটার বিলাসবহুল হোটেল 'চিলতানে'। কেবল একা সেখানে

রয়ে গেছেন তাহের। সারাদিন বসে তিনি বিভিন্ন দেশের রেডিও শোনেন। কান পেতে থাকেন কোথাও বাংলাদেশের কোনো খবর পাওয়া যায় কিনা। মনে মনে খুঁজতে থাকেন পালাবার পথ। তিনি জানেন তাকে পালাতে হবে হয় আফগানিস্তান, নয়তো ভারতের মধ্য দিয়েই। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ পুরোপুরি শুরু হয়ে গেলে ভারত বা আফগানিস্তান কি ভূমিকা নেবে, সেটি বুঝে উঠবার চেষ্টা করেন তিনি। পাশ্চিম পাকিস্তান থেকে সব খবর ভালোমত পাচ্ছেন না। এদিকে সামরিক ইন্টেলিজেন্সের লোকজন সবসময় নজর রাখছেন তাহেরের উপর।

কদিন পর তাহেরকে খারিয়ার পথে কোয়েটা এয়ারপোর্টে প্লেনে তুলে দেওয়া হয়। তাহের প্রতি মুহূর্তেই পালিয়ে যাবার সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। প্লেনে অল্প কয়জন যাত্রী। যাত্রীদের ব্যাপক তল্লাসি করা হয়। আগে ঠিক স্পষ্ট করে ভাবেননি কিন্তু প্লেনে উঠে হঠাৎ প্লেনটিকে ছিনতাইয়ের একটা সম্ভাবনার কথা ভাবতে থাকেন তাহের। প্লেনের একজন স্টুয়ার্ড বাঙালি। স্টুয়ার্ডটি কিছুক্ষণ পর এসে তাহেরের পাশে বসেন। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করেন তাঁরা। একপর্যায় তাহের নিচুস্বরে স্টুয়ার্ডকে বলেন : ককপিটে ঢুকে পাইলটকে বাধ্য করা যায় না প্লেনটাকে ইন্ডিয়া নিয়ে ল্যান্ড করাতে? যাত্রী তো অল্প কয়জন, আমরা দুজন যদি ককপিটে ঢুকি একটা কিছু কিন্তু করে ফেলা সম্ভব।

স্টুয়ার্ড বলেন : একেবারে খালি হাতে তো এসব করা যাবে না। অস্ত্র ছাড়া এমন রিস্ক নেওয়া সম্ভব?

তাহের : আপনার কিচেনে ছুড়ি আছে না? স্রেফ দুটো ছুড়ি নিয়ে আসেন দেখেন আমি কি করি।

স্টুয়ার্ডটি ককপিটের ভেতরে যান। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন তাহের। স্টুয়ার্ড আর ফেরেন না। প্লেন পৌঁছে যায় খারিয়ায়।

খারিয়ায় পৌঁছে তাহের খোঁজ পান ইতোমধ্যে আটক ফোর্টে তার ইউনিট দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ান চলে গেছে পূর্ব পাকিস্তানে। খারিয়াতে একটা আর্টিলারি রেজিমেন্টের সঙ্গে কিছুদিন রাখা হয় তাহেরকে। তাহের তার পালানোর পরিকল্পনা অব্যহত রাখেন।

খারিয়ার বাঙালি অফিসারদের সঙ্গেও আলাপ করেন তাহের। পালানোর ব্যাপারে আগ্রহও দেখায় কয়জন কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে সাহসী হয় না কেউ। একদিন বাঙালি ক্যাপ্টেন দেলোয়ার খারিয়াতে এসে উপস্থিত। তিনি ছিলেন ঢাকার ইপিআর এ। ২৫ মার্চ রাতে তাকে গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। তাহের যান তার কাছে ঢাকার পরিস্থিতি জানতে।

ক্যাপ্টেন দেলোয়ার বলেন : ঢাকার অবস্থা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না স্যার। রীতিমতো জেনোসাইড। বাঙালিরা পাল্টা আক্রমণের জন্য অর্গানাইজড হচ্ছে। উই মাস্ট জয়েন।

তাহের : আমি তো সেই প্রিপারেশনই নিচ্ছি, পালাবার পথ খুঁজছি। কেউ তো সাহস পাচ্ছে না। আমার উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে।

দেলোয়ার বলেন : আমি আছি স্যার আপনার সঙ্গে। লেটস প্লার্ন।

অনেক বুঝিয়ে ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী নামে আরেক বাঙালি অফিসারকে তারা এই পালাবার দলে আনতে সক্ষম হন। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার আর পাটোয়ারী অবিবাহিত। তাহের যদিও লুৎফাকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তিনি জানেন তার বিপদ দু রকমের। পালাতে গিয়ে যদি ধরা পড়েন তাহলে কোনো বিচারের প্রশ্ন তো আসবেই না, স্রেফ হত্যা করা হবে তাকে আর পালাবার পর বর্বর নির্যাতন নেমে আসবে দেশে আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী পরিবারের ওপর। তবু তাহের বোঝেন যে এই ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই।

তাহের ক্যাপ্টেন দেলোয়ার আর পাটোয়ারীর সঙ্গে বসে নানাভাবে পালাবার রাস্তা খুঁজতে থাকেন। খরিয়াতে আসার সপ্তাহ দুয়েক পরই হঠাৎ তাহেরকে আবার বদলি করা হয় এবোটাবাদ বেলুচ রেজিমেন্টাল সেন্টারে। তাহের বুঝতে পারেন পাকিস্তানিরা তাকে সন্দেহ করছে সবসময়। তিনি ঠিক করেন খারিয়া থেকে এবোটাবাদ যাওয়ার এই পথেই পালিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার আর পাটোয়ারীর সঙ্গে আবার বসেন তাহের। এক পর্যায়ে চূড়ান্ত করেন পরিকল্পনা।

ঠিক করেন ক্যাপ্টেন দেলোয়ার আর পাটোয়ারী এসময় রাওয়ালপিন্ডি বেড়াতে যাওয়ার নামে কয়েকদিনের ছুটি নেবেন। তাহের যাবেন বদলি হতে, বাকি দুজন ছুটি কাটাতে, এই পরিকল্পনায় একসঙ্গে রওনা দেবেন তারা। তারপর আজাদ কাশ্মীর হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যাবেন ভারত। তাহের ইতোমধ্যে ইসলামাবাদে তার বড় ভাই আরিফকে এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। আরিফ তখন সরকারের প্ল্যানিং কমিশনে কাজ করছেন। আরিফ লেখেন—'আমিও ছুটি নিয়ে দেশে ফিরবার ব্যবস্থা করছি, হয়তো ছুটি পাবো, কিন্তু তোমাদের তো ছুটি দেবে না। তোমরা পালানোর চেষ্টা করো।'

সব পরিকল্পনা শুনবার পর আরিফ নিজে উদ্যোগ নিয়ে সীমান্ত এলাকার পাঠানদের কাছ থেকে তিনটি রিভলবার কেনেন এবং তা এসে তুলে দেন ঐ তিন অফিসারের হাতে। বলেন, সঙ্গে রাখো কাজে লাগবে।

২৯ এপ্রিল বিকাল তিনটা। মেজর তাহের, ক্যাপ্টেন দেলোয়ার আর ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী তিনজনের এই দল শুরু করেন তাদের যাত্রা। সঙ্গে কিছু খাবার আর পানি। প্রথমে বাসে চড়ে তাঁরা পৌঁছান মঙ্গলা বাঁধের পাশে আজাদ কাশ্মীরের ছোট্ট শহর মীরপুরে। ক্যান্টনমেন্টের অন্যরা জানেন তাহের যাচ্ছেন বদলির ব্যবস্থা করতে আর বাকি দুজন ছুটি কাটাতে।

তাদের পরিকল্পনা মীরপুরে নেমে বিকালটা কাটাবেন এক পরিচিত বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে, তারপর সন্ধ্যা নামলে অন্ধকারে শহর ছেড়ে পাহাড়ের পথ

ধরে সীমান্ত অতিক্রম করবেন। মীরপুর থেকে সীমান্ত ত্রিশ মাইলের মতো পথ, হেঁটেই ঐ পথ পাড়ি দেবেন বলে ঠিক করেন তারা। বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারকে তাদের পরিকল্পনার কথা আগেই বলা ছিল কিন্তু মীরপুরে পৌঁছে দেখেন সেই ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে তালা ঝুলছে। জানা গেল সপরিবারে রাওয়ালপিন্ডি বেড়াতে গেছেন তারা। ভয় পেয়েছেন বোধহয়? ভাবেন তিনজন। অগত্যা বিকালটা সেই লোকের বারান্দায় বসে গল্প করে কাটান তাঁরা।

সন্ধ্যা নামে। এবার তাদের রওনা দেবার পালা। একটা ভয় কাজ করে সবার মধ্যে। অচেনা শহর। সীমান্তের দিকে যেতে হবে একটা বস্তি এলাকার ভেতর দিয়ে। কেউ যদি সন্দেহ করে বসে? প্রশ্ন করে বসে, কোথায় যাচ্ছে? কিন্তু পিছু হটবার আর কোনো উপায় নেই এখন। বস্তি পেরিয়ে যান তারা। সৌভাগ্যক্রমে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না। রাত নামে। মূল রাস্তা ছেড়ে সীমান্তের দিকে পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন তিনজন। কিছুদূর হাঁটবার পর কোথাও আর কোনো আলোর রেশ নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে, নির্জন, নিস্তব্ধ। অন্ধকারে দিক ঠাহর করে করে পাথুরে পাহাড়ের উঁচু নিচু পথ ধরে এগুতে থাকেন তারা। এলাকাটি যে এতটা পাথুরে ঠিক ধারণা ছিল না তাদের। কিন্তু এভাবে অন্ধকারে পাথুরে পাহাড়ের পথ ধরে ত্রিশ মাইল পথ হাঁটা অসম্ভব একটি ব্যাপার তা অচিরেই টের পান তারা। ভাবেন মূল রাস্তা ধরেই আরও কিছুদূর হাঁটা যাক। মূল রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে তাঁরা রাস্তার পাশে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পান। অন্ধকারে বোঝা যায় না ভালো। এগিয়ে যান তাহের। দেখেন সাইনবোর্ডটিতে তীর চিহ্ন দিয়ে সাপ্লাই ইউনিটের পথ দেখানো আছে। এই সাপ্লাই ইউনিট সীমান্ত ঘাঁটিগুলোতে খাবার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে। তাঁরা বুঝতে পারেন খুব কাছাকাছি এই ইউনিটটি রয়েছে। ক্যাপ্টেন দেলেয়ার বলেন, স্যার আর এগুলে নির্ঘাত মারা পড়বে, সামনেই সাপ্লাইয়ের লোকজন।

তাহের : তাহলে কি করা যায় ?

দেলোয়ার : ফিরে যাই চলেন।

তাহের : বল কি? এতটা পথ এসে ফিরে যাব? চল আবার পাহাড়ের পথটায় চেষ্টা করি।

পাটোয়ারী : স্যার, থার্টি মাইলস ঐ পাথুরে পাহাড়ের রাস্তায়, সিম্পলি ইম্পসিবল। তাছাড়া আশপাশেই সাপ্লাই ইউনিট। খুব রিস্কি। লেট আস গো ব্যাক। অন্যভাবে চেষ্টা করি।

তাহের বলেন : প্রবাবলি ইউ আর রাইট। আমাদের রুটটা ঠিক হয়নি। নতুন করে ভাবতে হবে।

তারা মীরপুরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। রাস্তায় একটা বাস পেয়ে যান ভাগ্যক্রমে। সে বাসে চড়ে তারা পৌঁছান লাহোর পিন্ডি গ্রান্ডট্র্যাঙ্ক রোডে। অচিরেরই আবার যোগাযোগ হবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাহের চলে যান এবোটাবাদে

আর ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী আর দেলোয়ার ফিরে যান খারিয়া ক্যান্টনমেন্টে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালাবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাদের।

তাহের তার পালাবার পরিকল্পনা অব্যহত রাখেন। কোয়েটায় পারেননি, খারিয়ায় পারেননি, এবার এবোটাবাদে এসে চেষ্টা শুরু করেন। একা এতটা পথ যাবার ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয় তাই এবোটাবাদের বাঙালি অফিসারদেরও পালাতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঙালি অফিসাররা ড্রইংরুমে চা, কফি খেতে খেতে পাকিস্তান আর্মির ওপর বিষোদগার করলেও অধিকাংশই পাকিস্তান থেকে পালাবার ব্যাপারে উৎসাহ দেখান না।

তাহের ওদিকে ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী আর দেলোয়ারের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন। রোববার ছুটির দিনে তাহের চলে যান পিন্ডিতে আর সেখানে খারিয়া থেকে আসেন ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী আর দেলোয়ার। তারা দেখা করেন ক্যাপ্টেন দেলোয়ারের বড় ভাই সাত্তার সাহেবের বাসায়। তিনিও সরকারি চাকরি করেন। তাহেরদের আলাপ শুনতে শুনতে সাত্তার সাহেবও এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে পালাবার সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনা মতো সাত্তার সাহেব তার ব্রিটিশ স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন লন্ডনে। দল ভারী করবার জন্য নানাদিকে আলাপ চালিয়ে যান তাহের।

রাওয়ালপিন্ডির জেনারেল হেডকোয়ার্টারে তখন চাকরি করেন মেজর জিয়াউদ্দীন। তাহেরের সঙ্গে আলাপের পর মেজর জিয়াউদ্দীনকেও পালিয়ে যাবার ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হন তাহের। তাহের, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী, ক্যাপ্টেন দেলোয়ার, দেলোয়ারের ভাই সাত্তার এবং মেজর জিয়াউদ্দীন, পাঁচ জনের একটি দল দাঁড়ায় এবার। শুরু হয় আবার পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা। এবার তারা ঠিক করেন শিয়ালকোটের পথে সীমান্ত অতিক্রম করবেন। মেজর জিয়াউদ্দীন জেনারেল হেডকোয়ার্টারস থেকে একটা ম্যাপ যোগাড় করেন। দিক নির্ণয়ের জন্য একটা জাপানি খেলনা কম্পাস কেনেন তাহের। সিদ্ধান্ত হয় প্রথমে তারা বাসে যাবেন শিয়ালকোট।

তাহের বলেন : কিন্তু এভাবে পাঁচ জন বাঙালি একসঙ্গে একটা বাসে যাচ্ছে এতে কি একটা সন্দেহ তৈরি হতে পারে না? কথা ঠিক—সমর্থন করেন সবাই। বাসে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ হয়।

তাহের বলেন : সবাই মিলে নিজেরাই একটা পুরোন গাড়ি কিনে ফেললে কেমন হয়? ওটা নিয়েই চলে যাব বর্ডার?

জিয়াউদ্দীন বলেন : গুড আইডিয়া, লেট আস অল কন্ট্রিবিউট।

এরপর যার যার সাধ্যমতো টাকা দিয়ে কিনে ফেলেন একটা পুরনো ভক্সওয়াগন। সিদ্ধান্ত হয় ঐ ভক্সওয়াগন চড়েই বেড়াবার নাম করে সবাই চলে যাবেন সীমান্তের কাছে। তারপর পাড়ি দেবেন সীমান্ত। পুরো ব্যাপারটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ধরা পড়লে ফায়ারিং স্কোয়াড। সর্তকতার সাথে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা।

এর মধ্যে একদিন বেলুচ রেজিমেন্টের সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ওসমান ডেকে পাঠান তাহেরকে। তাহেরকে তিনি বলেন, তোমার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আস না কেন। ঢাকায় তো নানা গন্ডগোল হচ্ছে, এখানে সে নিরাপদে থাকবে।

বাঙালি অফিসারদের পালানোর ব্যাপারটি নিয়ে আর্মিতে তখন বেশ কথা হচ্ছে। তাহের টের পান, সে যাতে পালাতে না পারেন ব্রিগেডিয়ার ওসমান সেজন্যই তাগাদা দিচ্ছেন তার স্ত্রীকে নিয়ে আসবার জন্য।

তাহের বলে : দেখি স্যার চেষ্টা করছি।

এসময় হঠাৎ করেই কাকুল মিলিটারি একাডেমীতে এসে কয়েকদিনের জন্য থাকেন জেনারেল ইয়াহিয়া, জেনারেল হামিদসহ আরও কয়েকজন জেনারেল। গুজব রটে যে শেখ মুজিবর রহমানকে কাবুলে আনা হচ্ছে আলোচনার জন্য। তেমন কিছু অবশ্য ঘটে না।

জুলাই মাস চলে আসে। উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে তাহেরের। এই সময় তাহের বাড়ি থেকে একটা চিঠি পান। ২৫ মার্চের পর প্রথম চিঠি। প্রথম বাড়ির খোঁজ পান তাহের। জানতে পারেন ছয় এপ্রিল জয়ার জন্ম হবার খবর। জানতে পান তাদের দুর্দশা আর যুদ্ধের ভয়াবহতার খবর। মন আরও বিষণ্ন, ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহেরের। তাদের প্রথম সন্তানের মুখ দেখবার জন্য মন উচাটন হয়ে ওঠে তার। তাহের সিদ্ধান্ত নেন যে করে হোক এই জুলাই মাসের মধ্যেই তাকে পালাতে হবে।

কদিন পর তাহের ব্রিগেডিয়ার ওসমানকে গিয়ে এক মিথ্যা খবর দেন। বলেন, স্যার আমি আমার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি। তেইশে জুলাই আমার স্ত্রী করাচিতে আসছে। আমি তাকে রিসিভ করতে যেতে চাই।

ব্রিগেডিয়ার ওসমান খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেন : ভেরি গুড। তৎক্ষণাৎ তাহেরকে দশ দিনের ছুটি দিয়ে দেন তিনি। তাহের স্থির করে ফেলেন এই দশ দিনের মধ্যেই তাকে পালাতে হবে পাকিস্তান থেকে।

তেইশ তারিখেই তাহের এবোটাবাদ থেকে রওনা দিয়ে বিকেলে পৌঁছান পিন্ডি। সেখানে মেজর জিয়াউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে তাহের দেখা করেন ব্রিগেডিয়ার খলিলের সঙ্গে। ব্রিগেডিয়ার খলিল সামান্য কয়জন বাঙালি অফিসারদের একজন যিনি ব্রিগেডিয়ারের মতো আর্মির ঐ উঁচু র‍্যাঙ্কে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। তার অবস্থানের কারণে সে সময় তার পক্ষে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা ছিল দুষ্কর কিন্তু জুনিয়র অফিসারদের পালিয়ে যাবার ব্যাপারে তিনি সহায়তা করছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খলিল তাহেরকে বলেন, কাছাকাছি তোরখান সীমান্ত দিয়ে পার হলে তোমরা সহজে কাবুল পৌঁছাতে পারবে।

ব্রিগেডিয়ার খলিল আরও বলেন, তাদের গাইড হিসেবে তিনি একজন পাঠান ন্যাপ কর্মীকে সঙ্গে দিয়ে দেবেন। তাছাড়া কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসে

সাত্তার সাহেবের একজন পরিচিত লোক ছিলেন, তিনি তাদের নির্বিঘ্নে ভারত হয়ে বাংলাদেশ চলে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেও জানান।

এ পরিকল্পনায় জিয়াউদ্দীন বেশ উৎফুল্ল হলেও তাহের বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন না। বিশেষ করে একজন পাঠান গাইডকে বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না তার।

তাহের ব্রিগেডিয়ার খলিলকে বলেন : আমরা বরং আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী অগ্রসর হই। শিয়ালকোট সীমান্তটা জিয়াউদ্দীনের ভালো চেনা আছে। ওদিকে যদি ফেইল করি তাহলে কাবুলের পথে চেষ্টা করব আবার।

ব্রিগেডিয়ার খলিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাহের এবং জিয়াউদ্দীন বেরিয়ে পড়েন শহরে। তাহের এবং জিয়াউদ্দীন সে রাতে একবার পিন্ডি ক্লাব, একবার পিন্ডি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে হৈ হৈ করে বেড়ান। তাদের মনে গোপন উত্তেজনা। তারা জানেন এটাই পাকিস্তানে তাদের শেষ রাত, কাল ভোরেই সীমান্ত পাড়ি দেবেন তারা। অনেক রাতে পিন্ডি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এসে উপস্থিত হন ক্যাপ্টেন দেলোয়ার এবং আর তার ভাই সাত্তার। তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ হয় তাহের এবং জিয়াউদ্দীনের। ক্যাপ্টেন দেলোয়ার এবং তার ভাই সাত্তার কাবুল হয়ে পালানোর পথটিকেই উপযুক্ত মনে করেন। বিস্তারিত আলাপের পর সিদ্ধান্ত হয় ক্যাপ্টেন দেলোয়ার এবং তার ভাই কাবুলের পথেই যাবেন আর তাহেররা যাবেন শিয়ালকোটের পথে।

মধ্যরাত পেরিয়ে তারা দুজন ফিরে আসেন জিয়াউদ্দীনের কোয়ার্টারে। এসে দেখেন জিয়াউদ্দীনের রুমে ঘুমিয়ে আছেন আরেক বাঙালি ক্যাপ্টেন মুজিব। অন্য শহর থেকে রোববারের ছুটির দিনে সাধারণত এমন অনেক অফিসার চলে আসেন জিয়াউদ্দীনের বাসায়। ক্যাপ্টেন মুজিবকে দেখে বেশ বিরক্ত দুজন, বাঙালি হলেও মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানি ঘেঁষা। তাকে সব কিছু খুলেও বলা যাবে না। পরদিন ভোরে পালাবেন তারা অথচ এই মুহূর্তে সে এসে হাজির। মুজিবকে তারা আর ঘুম থেকে তোলেন না। পাশের ঘরে চুপচাপ শুয়ে পড়েন দুজন। ঘুম আসে না কারোরই। তন্দ্রার মধ্যে কাটে খানিকটা সময়।

অনেক ভোরে তাহের উঠে যান, ডেকে তোলেন জিয়াউদ্দীনকে। সঙ্গে কিছু নেবার উপায় নেই। যদিও তারা গাড়িতে যাবেন অনেকটা পথ কিন্তু সীমান্তের কাছে গিয়ে তাদের বন বাদাড়, খানাখন্দের মধ্যে দিয়েই হেটে যেতে হবে অনেক মাইল। কোনো বোঝা বওয়া তখন সম্ভব নয়। সঙ্গে টাকা রইল প্রয়োজনে ভারত থেকে কিনে নেবেন। তবে এবোটাবাদ থেকে একটা জিনিস কিছুতেই ফেলে আসতে মন চায় না তাহেরের। লন্ডন থেকে লুৎফার জন্য কেনা শখের সেই কার্ডিগেন দুটো যা লুৎফা সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি, বলেছে তাকে নিয়ে যেতে। ঘর থেকে বেরুবার সময় কার্ডিগেন দুটো একটা ব্যাগে ভরে নেন তাহের আর সঙ্গে নেন আরিফ ভাইয়ের দেওয়া পিস্তলটি।

ঘরে ক্যাপ্টেন মুজিবকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়েন তাহের আর জিয়াউদ্দীন। বাইরে পার্ক করা তাদের সদ্য কেনা পুরনো ভক্সওয়াগনটি। ড্রাইভিং সিটে তাহের। একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটছে। শাঁ শাঁ করে এগিয়ে চলে গাড়ি। ভক্সওয়াগনটি পুরনো হলেও চলছে বেশ ভালো। সকালে নাস্তা কিছু খাওয়া হয়নি। গুজরাওয়ালার কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে রাস্তার পাশে একটা দোকান থেকে চা বিস্কুট খেয়ে নেন তারা। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে কি বলবেন, গাড়িতে যেতে যেতে তার একটা গল্পও বানিয়ে রাখে দুজন। ঠিক হয় জিয়াউদ্দীন বলবেন তিনি যাচ্ছেন লাহোরে ছুটি কাটাতে আর তাহের বলবে, তিনি যাচ্ছেন লাহোর থেকে পি আই এর নাইট কোচ ধরে করাচি গিয়ে আর স্ত্রীকে আনতে।

ইতোমধ্যে তাদের আরেক সঙ্গী ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী খারিয়া থেকে বদলি হয়েছেন ঝিলমে। তাহের এবং জিয়াউদ্দীন ঠিক করেন শিয়ালকোট যাবার পথে ঝিলম থেকে তুলে নেবেন পাটোয়ারীকে। কিন্তু সেদিন যে ওরা পাটোয়ারীর ওখানে যাচ্ছেন সে খবর পৌঁছাতে পারেননি আগে। সেদিন রোববার সকাল। তাহের এবং জিয়াউদ্দীন ঝিলমে পাটোয়ারীর ওখানে পৌঁছে দেখেন ছুটির দিনে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের নিয়ে গল্প করছেন পাটোয়ারী। মুস্কিলে পড়ে যান, কি করে এখন পাটোয়ারীকে ওখান থেকে তুলে আনা যাবে? তাহের শেষে ওদের মধ্যে গিয়ে বলেন : তোমরা কিছু মনে করো না, আমরা একটা নতুন গাড়ি কিনেছি, পাটোয়ারীকে ওটা একটু দেখাতে চাই। একটা রাউন্ড ঘুরিয়েই ওকে আবার পৌঁছে দিয়ে যাবো তোমাদের কাছে।

পাটোয়ারী গাড়িতে উঠতেই তাহের বলেন : আমরা কিন্তু আর ফিরছি না। আমরা এখন শিয়ালকোটের পথে, ওখান থেকে বর্ডার ক্রস করব।

পাটোয়ারী বলেন : অই? ঠিক আছে কিন্তু আমার একটু ব্যাংকে যেতে হবে। হাজার পাঁচেক টাকা আছে ওগুলো তুলে নেই।

জিয়াউদ্দীন : আজকে তুমি টাকা তুলবে কি করে, আজ তো রোববার, সব বন্ধ।

পাটোয়ারী : ও ড্যাম। এতগুলো টাকা?

তাহের : বাদ দাও। আমাদের কাছে টাকা আছে বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব।

এভাবেই একেবারে খালি হাতে বন্ধুদের আড্ডা থেকে উঠে এসে পাটোয়ারী যোগ দেন সীমান্ত অতিক্রমের অভিযানে। দুপুর নাগাদ তারা পৌঁছান শিয়ালকোট সীমান্তের কাছাকাছি। তারা জানেন যে এ এলাকায় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়ান এবং একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। ওখান থেকে রাস্তা ছেড়ে পায়ে হেঁটে মাইল দশেক পুবে হাঁটলে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকে যেতে পারবেন ভারতীয় অঞ্চলে। দুই দিকে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গভীর রাতে

এই পথটুকু অতিক্রম করবেন তাঁরা। শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্টে তখন আছেন মেজর মঞ্জুর। তারা ঠিক করেন দিনের বাকিটা সময় মেজর মঞ্জুরের ওখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর রওনা দেবেন সীমান্তের দিকে। জিয়াউদ্দীন, তাহের আর পাটোয়ারীকে দেখে খুবই খুশি হন মঞ্জুর। মঞ্জুরের স্ত্রী তাদের আপ্যায়ণ করেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করেন তারা। এক পর্যায়ে তাহের মঞ্জুরকে জানান তাদের পুরো পরিকল্পনার কথা। বলেন, ইন ফ্যাক্ট, আজ রাতেই আমরা বর্ডার ক্রস করছি। তাহের মঞ্জুরকে বলেন, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

মঞ্জুরের ঘরে তখন তিন বছরের একটি মেয়ে আর মাস কয়েকের একটি ছেলে।

মঞ্জুর বলেন : এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো নিয়ে কি করে এতবড় একটা রিস্ক নেই।

এসময় মঞ্জুরের স্ত্রী ঘুরে এসে দাঁড়ান : এখানেও কি কম রিস্ক? আপনারা সত্যি সত্যি যাচ্ছেন? আমি যাবো আপনাদের সঙ্গে।

মঞ্জুর : রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দশ মাইল হাঁটতে হবে। এই বাচ্চাগুলো নিয়ে সেটা সম্ভব?

মঞ্জুরের স্ত্রী : খুব সম্ভব। আমি পারব। তুমি না যাও আমি ওনাদের সঙ্গে চলে যাবো।

মঞ্জুর তার স্ত্রীকে শান্ত হতে বলেন। অন্যদের বলেন : যেতেই যদি হয় তাহলে তোমরা যে রুটের কথা বলছ তার চেয়েও সহজ একটা রুট আছে।

মঞ্জুর ঘর থেকে একটা ম্যাপ নিয়ে আসেন। দেখান তাঁরা যদি শিয়ালকোট—জাফরওয়ালার সীমান্ত রাস্তা দিয়ে এগোন তাহলে একটা জায়গায় পৌঁছাবেন যেখান থেকে ভারতের সীমান্ত খুবই কাছে। ম্যাপে জায়গাটি দেখান মঞ্জুর। বলেন ওখান দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেওয়া সহজ হবে। তাহের, জিয়াউদ্দিন সে পথেই যাবেন বলে ঠিক করেন। কিন্তু মঞ্জুর তখনও মনস্থির করতে পারেননি আদৌ যাবেন কিনা। আলাপে আলাপে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত তখন আটটা। তাহের অধৈর্য হয় উঠেন, বলেন, নষ্ট করার সময় আমাদের হতে নাই। রাত নটার আগে বেরুতেই হবে। তুমি স্পষ্ট বলে দাও যাবে কি যাবে না?

মঞ্জুরের স্ত্রী তখন বলে উঠেন : অবশ্যই যাবে। আমরা সবাই যাবো।

মঞ্জুর খানিকটা দ্বিধান্বিত থাকলেও তার স্ত্রীর উদ্দীপনা এবং সাহসের কছে পরাজিত হন। যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তড়িঘড়ি করে সবাই কিছু খেয়ে নেন। সঙ্গে করে বেশি কিছু নেবার সুযোগ নেই। তারা শুধু বাচ্চার কিছু পোশাক আর খাবার সঙ্গে নিয়ে নেন। বেরুতে যাবেন এমন সময় সমস্যা বাঁধে মঞ্জুরের ব্যাটম্যান আলমগীর খানকে নিয়ে। আলমগীর বাঙালি কিন্তু তাকে এর আগে এসব নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। জানলে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে বুঝতে পারছিলেন না তারা। কিন্তু না বলে উপায় নেই। শেষে সবার সামনে তাকে পালাবার ব্যাপারটি

বলা হয়। সব কিছু শুনে আলমগীরও তাদের সঙ্গে সীমান্ত পাড়ি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আলমগীরকে বলা হয় তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিতে। এবার ছুটিতে বাড়ি গিয়ে আলমগীরের বিয়ে করার কথা , হবু বউয়ের জন্য কটা শাড়ি কিনেছেন তিনি, তাড়াতাড়ি সেগুলো একটা ব্যাগে ভরে নেন আলমগীর আর সঙ্গে নেন একটা ছুড়ি।

রাত পৌনে নয়টায় কোনো রকম চাপাচাপি করে সবাই উঠে যান ভক্সওয়াগানে। গাড়ি রওনা দেয়। গাড়িতে উঠবার আগে মিসেস মঞ্জুর বাচ্চা দুটাকে শান্ত রাখবার জন্য ঘুমের ঔষধ খাইয়ে নেন। যাতে কোনো সন্দেহ না জাগে সেজন্য মিসেস মঞ্জুর নিজে পড়ে নেন একটি বোরকা। গাড়ি চলছে শিয়ালকোট থেকে জাফরওয়ালার পথে। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। একটু আধটু বৃষ্টিও হচ্ছে। হেড লাইটে ভেজা পথ। পালাবার জন্য উপযুক্ত সময়। শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্ট পার হয়েই একটা এমপি চেক পোস্ট অতিক্রম করতে হবে তাদের। ভাব দেখান যেন তারা সেখানকারই বাসিন্দা, জাফরওয়ালে যাচ্ছেন বেড়াতে। সন্দেহ এড়াবার জন্য বেশ কিছু পাঞ্জাবি শব্দও রপ্ত করে নেন তাহের। তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছে বলে চেকপোস্টের মিলিটারি পুলিশ রাস্তায় না দাঁড়িয়ে চেকপোস্টের ভেতরে বসে আছেন। পুলিশেরা ওদের গাড়িকে দাঁড়াতে না বলে ভেতর থেকেই হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন, 'যাও যাও।' গাড়ির সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

শিয়ালকোট জাফরওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় এসে তারা পৌঁছান রাত পৌনে দশটার দিকে। রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে রাখেন। এখান দিয়েই পায়ে হেঁটে সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে সবার। তখনও টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে, অন্ধকার চারদিকে। সবাই নীরব, কেউ নামছেন না গাড়ি থেকে। চাইলে এখনও শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যেতে পারেন। সিদ্ধান্তের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সবাই। একটা লরি হেড লাইটের তীব্র আলো ফেলে দ্রুত পেরিয়ে যায় তাদের গাড়ি। তাহের সবাইকে তাড়া দেন : এভাবে এখানে বেশিক্ষণ বসে থাকা ঠিক না, আমাদের এখনই নেমে পড়া উচিত। এক এক করে সবাই গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকারে মাঠের পথে হাঁটতে শুরু করেন। সদ্যকেনা ভক্সওয়াগন পড়ে থাকে রাস্তার পাশে।

শিয়ালকোট জায়গাটা বেশ নিচু। ভালো ধান হয় বলে এ অঞ্চলের খ্যাতি আছে। ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়েই হাঁটতে শুরু করেন তারা। মাঠ কাদায় ভরা। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর রাতের অন্ধকারে সবাই দিক হারিয়ে ফেলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিক বুঝবার জন্য ধ্রুবতারাটিও দেখা যাচ্ছে না। এসময় আসবার আগে কেনা জাপানি খেলনা কম্পাসটি বেশ কাজে দেয়। মঞ্জুর বলেন উত্তর দিকে মাইল তিনেক হাঁটলেই ঢুকে পড়া যাবে ভারতীয় সীমান্তে। সবার আগে তাহের। তার এক হাতে কম্পাস, অন্য হাতে রিভলবার। একটু পরে সহসা মঞ্জুরের ছোট বাচ্চাটি কেঁদে ওঠে। ভয় পেয়ে যান সবাই। মঞ্জুরের স্ত্রী মুখ চেপে ধরবার চেষ্টা

করে। এসময় প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়ে একটি। বাজের প্রকট শব্দে ভয় পেয়ে চুপ হয়ে যায় শিশুটি। আর কাঁদে না। কিছুদূর যাবার পর আরেক বিপত্তি ঘটে। মিসেস মঞ্জুরের একটি ক্যানভাসের জুতা এমনভাবে কাদার ভেতর ঢুকে যায় যে সেটাকে আর তুলে আনা সম্ভব হয় না। খালিপায়ে ঐ মাঠে হাঁটা নেহাতই অসম্ভব। শেষে মঞ্জুর কাঁধে তুলে নেন স্ত্রীকে। একটা বাচ্চাকে কোলে নেন তাহের আরেকটিকে ব্যাটম্যান আলমগীর। কিন্তু একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে কাধে নিয়ে ঐ কাদায় দীর্ঘক্ষণ হাটা দুরূহ ব্যাপার। এক পর্যায়ে তাহের বলেন : ভাবী ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমার কাঁধে চলে আসুন, মঞ্জুরকে একটু রিলিফ দেই।

ঐ দুর্যোগে মাইন্ড করবার কোনো পরিস্থিতি নেই। বাচ্চাটিকে মঞ্জুরের কোলে দিয়ে আহত সহযোদ্ধাকে বয়ে নেওয়ার কমন্ডো কায়দায় তাহের কাঁধে তুলে নেন মিসেস মঞ্জুরকে। তাহেরের কাঁধে ছিল সেই ব্যাগ যাতে গোপনে নিয়ে আসা লুৎফার প্রিয় কার্ডিগেন দুটো। কিন্তু মিসেস মঞ্জুরকে কাঁধে নিয়ে ঐ ব্যাগ বহন করা হয়ে ওঠে দুষ্কর। তাহের ব্যাগটিকে ফেলে দিতে বাধ্য হন। অক্সফোর্ড থেকে কেনা সোনালি স্মৃতিময় কার্ডিগেন পড়ে থাকে শিয়ালকোট সীমান্তের অন্ধকার ধানক্ষেতে।

পাকিস্তানি দুটি ঘাটির মাঝখান দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করছেন তারা। ঘণ্টা খানেক হাঁটবার পর তাহের বলেন, মনে হচ্ছে বর্ডার ক্রস করে গেছি। মঞ্জুর বলেন, না, এখনও পাকিস্তান এরিয়ার মধ্যেই আছি, আমাদের আরও ডান দিকে হাঁটতে হবে। মঞ্জুর কাজের সুত্রে এ এলাকায় আগেও এসেছেন, ফলে তার কথা মেনে সবাই ডানদিকে হাঁটতে শুরু করেন। আরও ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর হঠাৎ আবিষ্কার করেন তারা একটি পাকিস্তানি সীমান্ত ঘাটির কাছে চলে এসেছেন। সবাইকে ঝোপের আড়ালে বসিয়ে রেখে, তাহের এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে এলাকাটি দেখে আসেন। তিনি দূরে সীমান্ত ঘাঁটির আলো দেখতে পান, কাছাকাছি একটা সীমান্ত খুঁটিও দেখা যায়। এই খুঁটি পেরিয়েই তাদের আস্তে আস্তে ঢুকে পড়তে হবে ভারতীয় এলাকায়। ঝোপ থেকে বেরিয়ে সবাই হাঁটতে শুবু করেন আবার। এবার পথ শুকনো হওয়াতে মিসেস মঞ্জুর নিজেই হাঁটতে শুরু করেন। বাচ্চা দুটোকে অদলবদল করে কোলে নেন মঞ্জুর, জিয়াউদ্দীন, পাটোয়ারী, আলমগীর। বহু বছর পর একদিন আবার এমনি স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে মঞ্জুর চট্টগ্রামের জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াবেন এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর। ধরা পড়বেন মঞ্জুর এবং হত্যা করা হবে তাকে। সে এক ভিন্ন প্রেক্ষাপট।

কিন্তু এখন তারা সীমান্ত খুঁটি পেরিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছেন ভারতীয় এলাকায়। ঝুঁকি আছে তখনও। যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারেন সীমান্ত টহলকারীদের হাতে। ঐ অঞ্চলের মানুষেরা ক্ষেতে কাজ করবার জন্য মাঠের মধ্যেই ছোট ছোট ঘর বানিয়ে রাতে থাকেন, তাদের সামনেও পড়ে যেতে পারেন। তারা নিঃশব্দে একগ্র চিত্তে লাইন ধরে সোজা এগিয়ে যেতে থাকেন

উত্তরের দিকে। রাত দুটার দিকে তারা একটা শুকনো খালের পাড়ে এসে উপস্থিত হন। খালের ভেতর নেমে টর্চ জ্বালিয়ে আবার হাতের ম্যাপটিকে দেখে নেন তাহের। টের পান ঠিক পথেই এসেছেন। পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় মাইল তিনেক ভারতীয় এলাকার ভেতরে ঢুকে গেছেন তারা। বেশ কিছুটা দূরে দেখতে পান ভারতের দেবীগড়ের সীমান্ত ঘাঁটি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন সবাই। মিসেস মঞ্জুর তার ঘুমন্ত বাচ্চা দুটোকে শুইয়ে দেন একটা গাছের নিচে। ক্লান্তিতে অন্যরাও বসে পড়েন। সকাল হলেই তারা যোগাযোগ করবেন দেবীগড় সীমান্ত ঘাঁটির সঙ্গে। এক অচেনা গাছের নিচে সবাই অধীর আগ্রহে বসে থাকেন ভোরের আলো ফুটবার আশায়।

একটি ঘোর লাগা পতঙ্গের মতো তাহের যেন ছুটে চলেছেন আলোর শিখার দিকে, তার জন্য নির্দিষ্ট ভবিতব্যের দিকে।

রাতের কড়া নাড়া

একদিন অনেক রাতে কাজলার বাড়িতে কড়া নাড়ার শব্দ। আশরাফুন্নেসা দরজা খুলে দেখলেন অন্ধকারে কাঁধে স্টেনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন যুবক। একে একে ঘুম থেকে উঠে অন্যরাও—সাইদ, আনোয়ার, তাহেরের বাবা। মুক্তিযোদ্ধা দুইজন জানান তারা ভারত থেকে এসেছেন। ময়মনসিংহের সীমান্তের ১১ নং সেক্টরের অধিনায়কের দ্বায়িত্ব নিয়েছেন মেজর তাহের। তিনি তাদের পাঠিয়েছেন সবাইকে ভারতে নিয়ে যাবার জন্য।

মনে মনে এমন একটা সংবাদের জন্য পরিবারের সবাই অপেক্ষা করছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারে পাকিস্তান থেকে বাঙালি অফিসারের পালানোর খবর শুনবার পর থেকেই। সবার ঘুম ভাঙা চোখ কিন্তু মনে প্রশান্তি। তবে তাহেরের বাবা, মা কাজলা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইলেন না। আশরাফুন্নেসা বললেন : বিপদ যাই হোক আমি এই ভিটা ছেড়ে যাব না। সাঈদ তুই লুৎফাকে নিয়ে চলে যা ইন্ডিয়ায়।

ঠিক হলো সাঈদ এবং লুৎফার ভাই সাব্বির লুৎফাকে বুরবুরা সোনাই গ্রাম থেকে নিয়ে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করবেন। আর আনোয়ার ইউসুফ ভায়ের স্ত্রীকে তাদের নানা বাড়ি কটিয়াদির পিরগাও গ্রামে রেখে তারপর রওনা দেবেন ভারতে। ইউসুফ ভাইয়ের কোনো খবর তখনও তারা কেউ জানেন না।

ওদিকে বুরবুরা সোনাই গ্রামেও আরও একটি রাত নামে। সেখানে আত্মগোপন করে আছেন লুৎফা। যেমন করে কাজলায় সেভাবেই একদিন গভীর রাতে লুৎফার ঘরে কড়া নাড়ার শব্দ। তখন পুরো দেশের মানুষ যে যেখানে আছেন সবাই আধো ঘুমের ভেতর রাত কাটান। সবাই সর্বক্ষণ যে কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত। লুৎফা উঠে দেখেন তার ঘরের উঠানে দেবর সাঈদ আর ছোট ভাই সাব্বির চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে। ভেতরে গিয়ে বসেন

তারা। ঘুম ঘুম চোখে তাদের কাছ থেকেই লুৎফা প্রথমে জানতে পারেন তাহেরের ময়মনসিংয়ের সীমান্ত এলাকা ভারতের তুরায় আসবার খবর।

কথামতো তারা সীমান্ত পাড়ি দেবার আয়োজন করেন। সাঈদ, সাব্বির মিলে লুৎফা আর তাহেরের বোন ডালিয়া আর জুলিয়া ওরফে ডলি, জলিকে তুরায় পৌঁছে দিয়ে আসবার প্রস্তুতি নেন। নৌকা ভাড়া করা হয়। যাবার দিন গ্রামের মহিলার কাছ থেকে ধার করা বোরকাটি পড়ে নেন লুৎফা। ডলি আর জলি গায়ে পড়ে নেয় ছেঁড়া, ফাটা দুটো জামা যাতে তাদের দেখায় দরিদ্র ঘরের মেয়েদের মতোই। সঙ্গে তিন মাসের শিশু জয়া। রওনা দেন সাগরের মতো বিশাল ঢেউয়ের সেই শনির হাওর পাড়ি দিতে। হাতে অল্প কিছু টাকা আর সাথে নেওয়া চিড়া আর গুড়। দিনের বেলা তখন নৌকা বাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ কারণ হাওরের কিনারে নিয়মিত পাহারায় দাঁড়ানো পাকিস্তানিদের দেশীয় দোসর রাজাকাররা। মাঝি নৌকা বান রাতে রাতে। লুৎফা ছইয়ের ভিতর। ডলি আর জলি বসেন গলুইয়ের সামনে। তারা শাপলা নিয়ে খেলে। সাইদ আর সাব্বির শুয়ে পড়েন পাটাতনের নিচে।

দ্বিতীয়দিন রাতের অন্ধকারে নদীর কিনারা থেকে রাজাকাররা নৌকা থামিয়ে চিৎকার করে ডাকে : নৌকায় কেডা, যায় কই?

মাঝি নৌকা থেকে মিথ্যা জবাব দেয় : সোবহানের বউ যাইবো নিশানদিয়া গ্রামে।

হাওরের বিরাট বিরাট ঢেউয়ে নৌকায় পানি উঠে যায়। অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে পাটাতনের নিচ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে পালা করে পানি সেচেন সাব্বির আর সাঈদ। এভাবে তিনরাত চলার পর শেষ হয়ে যায় তাদের হাতের চিড়া আর মুড়ি। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে জলি আর ডলি। মাঝি কাছের গ্রামে মাঝরাতে এক পরিচিতের বাড়ির কাছে নৌকা ভেড়ান। ভয় পেয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েন বাড়ির লোক। দরিদ্র গৃহস্ত। বাড়িতে খাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অতিথিকে খালি মুখে বিদায় করেন না তারা। ঘরে চাল ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। ভাত রান্না হয়। ঘরে পাওয়া যায় ঝোলা গুড়। অভুক্ত পেটে গভীর রাতে ঝোলা গুড় দিয়ে মাখানো ঐ ভাতই সবার কাছে মনে হয় অমৃত। দ্রুত কিছু মুখে দিয়ে আবার রওনা দেন তারা। ভোর হবার আগে যতটা পথ এগোন যায় ততই লাভ।

ছপ ছপ ছপ ছপ বৈঠা বায় মাঝি। রাতের অন্ধকারে হাওরের বিশাল ঢেউ কেমন ভীতিকর মনে হয় লুৎফার কাছে। নৌকায় নিস্তব্ধ কয়েকটি প্রাণী। হঠাৎ হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে কেঁদে ওঠে জয়া। তন্দ্রা ভেঙ্গে চমকে ওঠেন লুৎফা। মনে হয় যেন অন্তহীন পথ পাড়ি দিচ্ছেন। ছইয়ের ভেতর মাদুরে ঘুমে কাদা হয়ে আছে ডলি, জলি। সঙ্গে করে আনা খাওয়ার পানি শেষ হয়ে যায় একসময়। বাচ্চাকে বার্লি খাওয়াবেন তার জন্য পরিষ্কার কোনো পানি নেই আর। শেষে হাওরের পানিতে বার্লি গুলিয়ে জয়াকে খাওয়াতে থাকেন লুৎফা। লুৎফার মনে হয় এই নৌকাতেই বুঝি মারা যাবে মেয়েটা। ক্লান্তি, আতঙ্ক চারপাশ থেকে চেপে

থাকে লুৎফাকে। মাঝে মাঝে নিচুস্বরে জিজ্ঞাসা করে : সাঈদ, সাব্বির তোমরা ঠিক আছ তো? পাটাতনের নিচ থেকে ওরা জবাব দেয় : আপনি চিন্তা কইরেন না, আমরা ঠিক আছি।

রাতে রাতে নৌকা বেয়ে পাঁচদিন পর অবশেষে তারা পৌছান তুরা বর্ডারে।

নৌকা মেঘালয়ের কাছে পৌঁছালে লুৎফা দেখেন তখনও শত শত মানুষ মালপত্র ঘটি বাটি নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছেন। চলছে শরণার্থীদের স্রোত। সীমান্ত থেকে তুরা ক্যাম্প অনেক পথ। জানতে পারেন পাহাড়ি ঢলে রাস্তা বন্ধ ফলে সেদিন আর তুরা ক্যাম্পে যাওয়া হবে না। কাছেই কালাচান নামে এক ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশ থেকে যে আসছেন তারই আশ্রয় আর খাবার ব্যবস্থা করছেন। লুৎফারাও ঐ কালাচানের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। দুদিন সেখানে থেকে আবার রওনা দেন তুরার পথে। পাহাড়ি আঁকা বাঁকা পথ, দূরে ঝর্ণা। মেঘ নেমে আসছে মাথার উপর। জীপে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। লংরা নামে একটি জায়গায় ভারতীয় আর্মির ক্যাম্পে অফিসাররা তাদের রাতে থাকবার ব্যবস্থা করেন। বহুদিন পর একটা নরম বিছানায় শোয় সবাই। তুরা তখনও আরও দূরের পথ। পরদিন রওনা দেন আবার। সারাদিন জীপে যেতে যেতে আবার সন্ধ্যা নামলে তুরার কাছাকাছি এক মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে রাত কাটান তারা। পরদিন ভোরে রওনা দিয়ে তিনদিন টানা যাত্রা শেষে দুপুরের দিকে তুরায় পৌছান ঐ ছোট্ট দল। তাদের থাকবার জন্য টানানো হয়েছে একটা বড় তাঁবু। দীর্ঘযাত্রায় সবাই ক্লান্ত, তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়েন বিশ্রামের জন্য। খোঁজ পান সেদিন বিকালেই আসবেন তাহের। অধীর আগ্রহে থাকেন লুৎফা। তাঁবুর ভেতর গা এলিয়ে দিতেই অজান্তে ঘুমে ঢলে পড়েন সবাই।

বিকেলের দিকে বিকট শব্দে ধুলো উড়িয়ে একটি জীপ এসে থামে লুৎফাদের তাঁবুর কাছে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন সবাই। লুৎফা দেখেন জীপ থেকে নামছে তাহের। দীর্ঘদিন পর তাহেরকে দেখছেন লুৎফা। আগের মতোই আত্মবিশ্বাসী কিন্তু চোখে মুখে পরিশ্রমের ছাপ। তাহেরের হাতে একটা গলফ স্টিক। তাহের প্রথমেই ছুটে এসে কোলে তুলে নিতে চান জয়াকে।

গলফ স্টিকটা পাশে রেখে বলেন : দেখি দেখি কই মেয়েটাকে দাও একটু কোলে নিই।

কিন্তু জয়া তাহেরকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তাহের বলেন : এই বোকা মেয়ে আমি তো তোর বাবা!

একটু কোলে নিয়েই আবার জয়াকে ফিরিয়ে দেন লুৎফার কোলে। তাঁবুর ভেতর ঢুকে সবার সঙ্গে আলাপ শুরু করেন তাহের। কত দিনের জমে থাকা গল্প। গল্প শেষ হয় না তাদের। লুৎফা শোনান কাজলা থেকে তুরা পৌছানোর দীর্ঘযাত্রার কাহিনী। তাহের শোনান তার পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার নাটকীয় গল্প।

তাহের বলেন : ১১ নাম্বার সেক্টরের দায়িত্ব নিয়েছি। যুদ্ধটা আসলে অন্য ট্রাকে চলে যাচ্ছে, চেষ্টা করছি এর গতিটা পাল্টানো যায় কিনা।

ডলি, জলি, জয়া ঘুমিয়ে পড়ে একসময়। অজানা প্রান্তরের এক তাঁবুতে রাত জেগে থাকেন তাহের আর লুৎফা। যেন এক বেদুঈন দম্পতি। ছুটে চলেছেন প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। ধু ধু মরুর বুকে যেন তাদের চকিত অভিসার।

পরদিন সকালে বি এস ক্যাম্পে দুই রুমের টিনের একটি ঘরের ব্যবস্থা করা হয় লুৎফাদের জন্য। ঐ ঘরটি কিছুদিন আগেও ব্যবহার হতো গরুর গোয়াল হিসেবে। এছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই, ঐ গোয়াল ঘরই পরিষ্কার করে প্রস্তুত করা হয় তাদের থাকার ঘর হিসেবে।

তাহের লুৎফাকে বলেন : যুদ্ধের মধ্যে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করো না।

লুৎফা বলেন : শরণার্থী শিবিরে যা দেখে এসেছি এতো তার চেয়ে হাজার গুণ ভালো।

লুৎফাদের তুরার মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে রেখে তাহের আবার রওনা দেন ১১ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার মহেন্দ্রগঞ্জে।

সেক্টর ১১

পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে রুদ্ধশ্বাস এক পলায়নপর্ব অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছে তাহের প্রথম দেখা করেন মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ওসমানীর সাথে। বাঙালি সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে মেজর তাহের অন্যতম একজন। দেশে যে সিনিয়র অফিসাররা ছিলেন তাদের বিভিন্ন সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাহের এসে পৌঁছালে ওসমানী বলেন : বিফোর ইউ স্টার্ট, সব সেক্টর গুলো ঘুরে দেখো এবং এখানকার সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করো। দেন ইউ মাস্ট টেক কমান্ড অফ এ সেক্টর।

একটি জীপ নিয়ে ধুলা উড়িয়ে কাছাকাছি সেক্টরগুলো ঘুরে দেখতে শুরু করেন তাহের। ক্যাম্পে ক্যাম্পে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেবার জন্য বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসা উদ্দীপ্ত তরুণদের লম্বা লাইন দেখে আপ্লুত হন তাহের। কথা বলেন অপেক্ষমাণ তরুণদের সঙ্গে, মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে, বাংলাদেশী এবং ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে। বুঝে নেবার চেষ্টা করেন যুদ্ধের সাম্প্রতিক অবস্থা।

সেক্টর কমান্ডারদের মিটিংয়ে তাহের তুলে ধরেন তার পর্যবেক্ষণ। তাহের বলেন : আমি যা অবজার্ভ করলাম তাতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দিক থেকে তিন ধরনের স্ট্রিমে যুদ্ধটা হচ্ছে। প্রথমত, আপনারা ইন্ডিয়ান আর্মির হেল্প নিয়ে রেগুলার ব্রিগেড তৈরি করার চেষ্টা করছেন আন্ডার কে ফোর্স, জেড ফোর্স অ্যান্ড সো অন, এর ভেতর স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা পেশার তরুণরা যোগ দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত,

এই ফোর্সগুলোর বাইরে নানা জায়গায় বেশ কিছু স্পন্টেনিয়াস ওয়ার লর্ডস সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, এরা অনেকটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আমি কাদের সিদ্দিকীর নাম শুনেছি। তৃতীয়ত, আরেকটি স্ট্রিমের কথা জানলাম, যেখানে ছাত্রলীগের কিছু নেতা, মুজিববাহিনী নামে একটা স্বতন্ত্রবাহিনী তৈরি করেছে। তারা খুব একটা একটিভ না হলেও, ইন্ডিয়ার শেল্টারেই তারা পৃথকভাবে ট্রেনিং নিচ্ছে।

এখন ইফ ইউ আসক মি, আমার কিছু ক্লিয়ার প্রপোজাল আছে। আমি মনে করি রেগুলার ব্রিগেড তৈরি করার দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে উই আর ওয়েস্টিং আওয়ার টাইম। আমাদের সাধারণ কৃষক, ছাত্র এদের আরও বেশি বেশি ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা দরকার। পাকিস্তান আর্মির মতো একটা অ্যাডভান্সড আর্মির সঙ্গে গেরিলা ওয়ার ফেয়ার ছাড়া আর কোনোভাবে আমরা পারব না। আমি হিসাব করে দেখেছি সাত আট মাসের মধ্যে কৃষক, ছাত্রদের নিয়ে প্রায় ২০ ডিভিশনের একটা বিরাট গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা যায়। এতে করে ইন্ডিয়ান আর্মির ওপর আমাদের ডিপেন্ডেন্সিও কমবে। আমি এটাও স্ট্রংলি ফিল করি যে আমাদের সেক্টর কমান্ডারদের হেডকোয়ার্টারগুলো ইন্ডিয়ার মাটি থেকে সরিয়ে যতটা সম্ভব বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে যাওয়া দরকার। ফাইনালি আই অলসো ফিল দ্যাট উই স্যুড হ্যাভ মোর কনসার্ন উইথ দি স্পন্টেনিয়স ওয়ার লর্ডস।

অকৃতদার, পাকানো গোঁফ, পাপা টাইগার নামে পরিচিত ওসমানী মনোযোগ দিয়ে তাহেরের কথা শোনেন এবং বলেন : ওয়েল তাহের আই অ্যাপ্রেশিয়েট ইউর আইডিয়াস বাট আই মাস্ট সে দ্যাট আই ডিসএগ্রি উইথ ইউ। আমি মনে করি আমাদের রেগুলার ব্রিগেড তৈরি করার দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। উই ক্যান নট জাস্ট ডিপেন্ড অন গেরিলাস। আর এখনই বাংলাদেশের ভেতরে হেডকোয়ার্টার করারও কোনো পরিস্থিতি নাই।

এখানে আবির্ভূত হন শেখ মুজিবের পক্ষে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়া মেজর জিয়া, যিনি তখন জেড ফোর্সের অধিনায়ক। তিনি মিটিংয়ে ওসমানীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন : বাট আই থিঙ্ক তাহের হ্যাজ এ পয়েন্ট।

ওসমানী রেগে যান। বলেন : নো দি পয়েন্ট ইজ ইনভ্যালিড। আমরা একটা রেগুলার আর্মির সাথে যুদ্ধ করছি, এখানে আমাদের আগে রেগুলার ব্রিগেড এক্সপান্ড করতে হবে।

জিয়া বাদে অন্যান্য সেক্টর কমান্ডাররা ওসমানীকেই সমর্থন করেন।

তাহের বলেন : ওয়েল ইন দ্যাট কেস, এ্যাজ ইউ প্রোপোজড আমাকে একটা সেক্টরের দায়িত্ব দিন, দেখি আমি কি করতে পারি।

তাহের ১১ নং সেক্টরের দায়িত্ব নিতে চান। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠা এই ১১ নম্বর সেক্টর ভৌগোলিক এবং সামরিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর বলে মনে করেন তাহের। মেঘালয়ের সীমান্ত

বর্তী কামালপুর পাকিস্তানিদের সবচাইতে শক্তিশালী সীমান্ত ঘাঁটি। তাহের হিসাব করে দেখেন কামালপুর ঘাঁটিকে যদি ধ্বংস করা যায় আর মুক্তিযুদ্ধে যদি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে জয় হয় তাহলে এই ১১ নম্বর সেক্টর থেকেই বকশিগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল হয়ে সবার আগে ঢাকা পৌছানো সম্ভব। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটির দায়িত্বে তখনও রয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং। দ্রুত এই সেক্টরটি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে চান তাহের। ওসমানী তাহেরকে ১১ নং সেক্টরের কমান্ডার নিয়োগ করেন।

ময়মমনসিংহ সীমান্তবর্তী কিছু এলাকা মেজর জিয়ার দায়িত্বে থাকলেও তাহের আসবার পর জিয়াকে ওসমানী সে অঞ্চল থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে দেন তেলঢালা অঞ্চলে। সেখানে মেজর জিয়াকে নিয়মিত আরকটি ব্রিগেড তৈরি করতে বলেন ওসমানী।

তাহের জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন পৃথকভাবে। বলেন : থ্যাঙ্কু স্যার ফর সাপোর্টিং মি।

জিয়া বলেন : তাহের আই ডোন্ট থিংক পাপা টাইগার ইজ গোয়িং টু লিসেন টু ইউ। জাস্ট গো এহেড ইউথ ইউর প্লানস।

তাহের : আই অ্যাম ডেফিনিটলি গোয়িং টু ডু ইট।

সতীর্থ সামরিক অফিসারদের মধ্যে একমাত্র মেজর জিয়া তাহেরের মতামতকে সমর্থন করেন বলে তার প্রতি একটা দুর্বলতা তৈরি হয় তাহেরের। অবশ্য এই দুর্বলতার রন্ধ্রপথেই অজান্তে ঢুকে যায় এক ক্রুর সরীসৃপ।

গলফস্টিক হাতে সেনানায়ক

দায়িত্ব পেয়ে তাহের সিদ্ধান্ত নেন অন্যরা যাই করুক, তিনি তার নিজের মতো করে ১১ নম্বর সেক্টরটি গড়ে তুলবেন। সাইলেন্সারবিহীন সশব্দ জি—ফাইভ একটি জীপ নিয়ে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ছুটে বেড়ান তাহের। ঐ জীপটি যেন তার সাক্ষর, অনেক দূর থেকে মানুষ টের পান মেজর তাহের যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে তার হাতে সবসময় একটি গলফ স্টিক। এটি কোনো গলফ খেলার মাঠ নয় কিন্তু তবুও নিচের দিকে বাঁকানো লম্বা ঐ লাঠিটি নিয়ে সর্বক্ষণ ঘোরেন তাহের। কে জানে ঐ লাঠির মধ্য দিয়ে তিনি তার আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয় আর আশাকে প্রসারিত করে রাখেন কিনা?

তাহের ইতোমধ্যে বদলে গেছেন অনেক। তার সেই কেতাদূরস্ত ভাব আর নেই, ভালো শার্ট আর চকচকে জুতার দিকে যার ছিল আকর্ষণ তিনি এখন একটা মলিন শার্ট, প্যান্ট আর একটা ছেড়া কেডস পরে ঘুরে বেড়ান নানা কাম্পে। যান মহেন্দ্রগঞ্জ, মানকার চর, ডালু। পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথ, চারপাশে ঘন জঙ্গল, গভীর খাদ আর গাছে গাছে তুলার মতো ঝুলে থাকা মেঘ। কখনো কখনো জীপ

থামিয়ে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা কলকল ঝরনার দৃশ্য দেখেন। নয়নাভিরাম মেঘালয়ের ক্যাম্পে ক্যাম্পে তখন যুদ্ধের নেশা লাগা তরুণদের ভীড়।

বিভিন্ন ইয়ুথ ক্যাম্পে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে ছেলেরা, প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে তারা অস্থির। ক্যাম্পে গেলেই ছেলেরা ঘিরে ধরেন তাহেরকে, সবার একই প্রশ্ন আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? যেন অপেক্ষা করছে কখন তাদের জীবন দেবার ডাক আসে।

পরিকল্পনামতো নিজের সেক্টরটিকে সাজাতে শুরু করেন তাহের। প্রথমত সেক্টরের হেডকোয়ার্টারটিকে তিনি নিয়ে যান যতটা সম্ভব সীমান্তের কাছে। তাহের তার হেডকোয়ার্টার বসান পাকিস্তানিদের কামালপুর ঘাটির মাত্র ৮০০ গজের মধ্যে। মাঝখানে শুধু কয়েকটি ট্রেঞ্চ। শত্রু ঘাটির এত কাছে অন্য আর কোনো সেক্টরের হেডকোয়ার্টার তখন নেই। যেমন বাঙালিরা তেমনি পাকিস্তানিরাও জানেন যে কামালপুরের পতন ঘটলে পাকিস্তানিদেরও পতন ঘটবে দ্রুত।

তাহের তার মূল ভাবনায় ফিরে আসতে চান। অন্তত তার সেক্টরের যুদ্ধকে তিনি পরিণত করতে চান একটি জনযুদ্ধে। নিয়মিত বাহিনীর ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যত দ্রুত সম্ভব আরও বেশি সংখ্যক সাধারণ মানুষদের তিনি যোদ্ধায় পরিণত করতে চান। সেইসঙ্গে যোদ্ধা এবং জনগণের মধ্যে গড়ে তুলতে চান আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এমনকি নিয়মিত বাহিনীর ভেতরেও সিপাই এবং অফিসারদের মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে চান তিনি। সর্বপরি তিনি ক্রমশ অগ্রসর হতে চান তার গোপন অভিপ্রায় দিকে, যার জন্য তার প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধকে তিনি ক্রমশ ধাবিত করতে চান সমাজতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে। সেজন্য এই যুদ্ধের একটা রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করাও খুব জরুরি মনে করেন তিনি।

একটি মহাযজ্ঞের সংকল্প নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন তাহের। প্রথমত তিনি ঘুচিয়ে দিতে চান সেক্টর কমান্ডার এবং যোদ্ধার দূরত্ব। ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ঘুরে আপনজনের মতো তিনি মিশে যেতে থাকেন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। তাদের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করেন, রাত কাটান, গল্প করেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার ভাবনার কথা জানান তাদের। বলেন : মনে রেখো মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে গণ মানুষের যুদ্ধ, রাজা রাজরাদের যুদ্ধ না। এটা কোনো কনভেনশনাল ওয়ার না, এই যুদ্ধ হচ্ছে একটা জাতির স্বাধীনতার যুদ্ধ। নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা হাতিয়ার তুলে নেবার সুযোগ পায় তাদের মতো ভাগ্যবান আর ইতিহাসে নেই। নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবে। তোমরা তো জীবিকার জন্য অস্ত্র তুলে নাওনি, নিয়েছ দেশ প্রেমে। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় এবং আমি নিশ্চিত যে হবে একদিন আর তা হবে তোমাদের জন্য, সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য না।

তাহের যুদ্ধের মধ্যে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করবার ওপর গুরুত্ব দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভাত খেতে খেতে বলেন : যেখানে অপারেশন চালাবে তার চারপাশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করবে। তোমাদের আচরণ দিয়ে তাদের মন জয় করতে হবে। যেহেতু তোমরা গেরিলা আক্রমণ করতে যাচ্ছ স্থানীয় লোকজনের সহায়তা ছাড়া তোমরা কিছু করতে পারবে না। মনে রাখবে যে জায়গায় যাচ্ছ সে জায়গাটা সবচেয়ে ভালো চেনে স্থানীয় মানুষ। সুতরাং আক্রমণ পরিকল্পনাটা তাদের সাথে মিলেই করতে হবে, শত্রুর অবস্থান তারাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে। দেখবে এমন নিখুঁত পরিকল্পনা তারা বলে দিচ্ছে যা হয়তো সেনাবাহিনীর কোনো জেনারেলও বলতে পারবে না। একটা মুক্তিযুদ্ধের সাথে নিয়মিত যুদ্ধের তফাতটা এখানেই।

যার যার অস্ত্রের উপর হাত রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাহেরের কথা শোনেন মুক্তিযোদ্ধারা। এক কোম্পানি কমান্ডার বলেন, সরিষাবাড়িতে যে অপারেশনটা করলাম স্যার, গ্রামের মানুষের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই তা সম্ভব হতো না। কৃষকরাই স্যার তাদের লাকরি ঘরে, গোয়াল ঘরে আমাদের লুকিয়ে রেখেছে।

তাহের : তবে আমি খোঁজ পেয়েছি কোনো কোনো মুক্তিযোদ্ধা কৃষকদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার খাসি আর মুরগি খেয়ে চলে আসে। মনে রাখবে এভাবে গেরিলা যুদ্ধ হয় না। কৃষকের কাছে যে সহযোগিতা তুমি পাবে তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা করবে। যদি কোনো কৃষকের গোয়ালে রাত কাটাও তাহলে সকালে গোবরটা পরিষ্কার করে দিও। যেদিন অপারেশন থাকবে না সেদিন তোমার আশ্রয়দাতাকে একটা ডিপ ল্যাট্রিন তৈরি করে দাও, তাদের সঙ্গে ধান কাটো, ক্ষেত নিড়াও। এভাবেই তুমি তাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে।

ক্যাম্পে ক্যাম্পে এ মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে বেড়ান তাহের। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের গতিও বাড়িয়ে দেন। তাহের যখন ১১ নম্বর সেক্টরে যোগ দিয়েছেন তখন সেখানে নিয়মিত বাহিনীর যোদ্ধা হাজার তিনেক আর সাধারণ মানুষদের নিয়ে গড়া অনিয়মিত জনযোদ্ধার সংখ্যা হাজার দশেক। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জনযোদ্ধার সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন দ্বিগুণ। শুধু কৃষকদের নিয়েই তাহের গড়ে তোলেন একটি বিশেষ প্লাটুন।

গেরিলা আক্রমণের সংখ্যা এবং তীব্রতাও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেন তিনি। বিশেষ কৌশল হিসেবে কৃষক, ছাত্রদের নিয়ে গড়া জনযোদ্ধাদের সাথে নিয়মিত সেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের মিলিয়ে তাহের তৈরি করেন মিশ্র দল। কৃষক, ছাত্রদের আছে স্বতঃস্ফূর্ততা আর সেনাসদস্যদের আছে অভিজ্ঞতা। এ দুইয়ের সমন্বয়ে শক্তিশালী গেরিলা কোম্পানি তৈরি করেন তিনি এবং অপারেশনে পাঠিয়ে দেন দেশের ভেতর। অপারেশনে যাবার আগে মেঘালয়ের আকাশ ছুঁয়ে থাকা পাহাড়ের উপত্যকায় দাঁড়ান মুক্তিযোদ্ধা দল। তাহের তার গলফ স্টিক হাতে সবার সামনে

এসে দাঁড়ান। বলেন : মনে রাখবে যুদ্ধক্ষেত্রে হয়তো তোমাদের মৃত্যু হবে, লাশ পড়ে থাকবে সেখানেই। তুমি যে দেশের জন্য প্রাণ দিলে সে খবর হয়তো কেউ জানবে না কোনোদিন কিন্তু এটাই হচ্ছে যুদ্ধের বাস্তবতা। মনে রেখো তোমরা এই আত্মত্যাগ করবে বলেই একটা নতুন দেশের জন্ম হবে।

তাহেরের বক্তৃতা ছাপিয়ে শোনা যায় সন্ধ্যার ঘরে ফেরা পাহাড়ি পাখিদের কলরব।

পাশাপাশি তাহের তার দ্বিতীয় লক্ষ্য, যোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য নিতে থাকেন নানা পদক্ষেপ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পাঠ থেকে তাহের জানেন সেখানে যোদ্ধাদের শিক্ষা দিতেন রাজনৈতিক নেতারা। গেরিলা যুদ্ধের অভিধানে যাদের বলা হয় পলিটিক্যাল কমিশার। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তেমন কেউ নেই। তাহের তাই তার সেক্টরের সব কোম্পানি এবং প্লাটুনগুলোতে বেছে বেছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছেলেদেরকে নিয়োগ দেবার চেষ্টা করতে থাকেন। তার সব প্লাটুন কিংবা কোম্পানিতে অন্তত একজন করে ছেলে তিনি নিয়োগ দেন যিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। মূলত বাম রাজনীতি এবং বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে। প্রতিটি প্লাটুনে সামরিক ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করেন তিনি। অস্ত্র চালানোর নানা ট্রেনিং-এর পাশাপাশি প্রতিটি যোদ্ধা ইউনিটে একজনকে তিনি দায়িত্ব দেন রাজনৈতিক ক্লাস নেবার জন্য। সেই রাজনৈতিক প্রশিক্ষক মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্ববিপ্লব, বাংলাদেশের জনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম বিষয়ে দীক্ষা দিতে থাকেন।

এভাবেই আর সবগুলি সেক্টরের চাইতে স্বতন্ত্র একটি ধারায় এগিয়ে যেতে থাকে ১১ নম্বর সেক্টর।

ব্রাদার্স প্লাটুন

বাহার আর বেলাল হালুয়াঘাট সীমান্ত পেরিয়ে যখন ভারতে গেছেন তাহের তখনও পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেননি। তুরারই এক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা চলে যান সীমান্তবর্তী শিববাড়ি এলাকায়। সেখানে দুজনে মিলে গড়ে তোলেন শতাধিক সৈন্যের এক কোম্পানি। শিববাড়ির একটি ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে শুরু হয় বেলালের নেতৃত্বে সফল অপারেশন। সাহসী, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে বাহার আর বেলালের নাম তখন চারদিকে। একটি অপারেশন ব্যর্থও হয় তাদের। ভুল একটি সিদ্ধান্তের কারণে এক অপারেশনে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন তার কোম্পানির ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান বেলাল আর বাহার। তারা হয়ে উঠেন আরও এক ধাপ অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

একদিন শিববাড়িতে তাদের কমান্ডার ভারতীয় ক্যাপ্টেন মুরালি বেলাল, বাহারকে এসে বলেন : ডু ইউ নো ইয়োর ব্রাদার হ্যাজ কাম?

বেলাল জিজ্ঞাসা করে : হুইচ ব্রাদার ইউ আর টকিং এবাউট?

ক্যাপ্টেন মুরালি বলেন : ইয়োর ব্রাদার, মেজর তাহের। ডু ইউ নো হয়াট হি ইজ নাও?

বেলাল : হোয়াট?

মুরালি : হি ইজ নাউ দি সেক্টর কমান্ডার অব ইলেভেন সেক্টর।

আনন্দে বুক ভরে উঠে দুই ভাই এর। তারা জানতে পারেন তাহের আছেন মহেন্দ্রগঞ্জে। সামনের অপারেশন শেষ করেই যাবেন তাহেরের সাথে দেখা করতে সিদ্ধান্ত নেন তারা।

ওদিকে তাহেরের মহেন্দ্রগঞ্জে আসবার খোঁজ পেয়ে আনোয়ারও কাজলা থেকে রওনা দেন ভারতে। ইউসুফ ভাই এর স্ত্রীকে তাদের গ্রামের বাড়িতে রেখে আনোয়ার হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়েই প্রথমে উঠেন ভারতের বাগমারা শরণার্থী শিবিরে। সেখানে শুনতে পান কাছাকাছি শিববাড়ি ক্যাম্পে আছেন বেলাল আর বাহার। খুঁজতে খুঁজতে ক্যাম্পে চলে যান আনোয়ার। দূর থেকে দেখেন বেলাল আর বাহার তাঁবুর বাইরে বসে আপন মনে পরিষ্কার করছে তাদের এসএলআর। আনোয়াকে লক্ষ করেননি তারা। অস্ত্র হাতে দুই ভাইকে অবাক চোখে দেখেন আনোয়ার। তার মনে হয় তার কৈশোর পেরোনো ভাই দুটি অল্প দিনের ব্যবধানে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। যেন কত বিশাল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে তারা।

আনোয়ার বলেন : তাহের ভাই তো সেক্টর কমান্ডার তোমরা যাবা না দেখা করতে?

বেলাল বলে : হ্যাঁ, আমরা তো খোঁজ পাইছি আগেই, তাহের ভাই মহেন্দ্রগঞ্জ আছে। আমাদের দুই জনেরই জরুরি একটা অপারেশন আছে সামনে, ঐটা শেষ কাইরাই যাবো।

আনোয়ার : আমি আগে তুরায় ভাবীদের ওখানে যাচ্ছি।

বেলাল, বাহারকে পেছনে রেখে পায়ে হেঁটে, বাসে, জীপে নানা পথ ঘুরে আনোয়ার শেষে পৌঁছান তুরায় গোয়াল ঘরকে বদলে নেওয়া সেই দুটি ঘরের ছোট্ট বাসায়, যা তখন লুৎফা, ডলি, জলিদের আশ্রয়। লুৎফার মুখেই আনোয়ার শোনেন তাহেরের পাকিস্তান পালানোর গল্প।

পরদিন সকালে আবার শোনা যায় সাইল্যান্সারবিহীন সেই জীপের শব্দ। জলি দৌড়ে এসে বলে : ঐ যে ভাইজান আসে।

আনোয়ার তাহেরকে দেখবার জন্য রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়ান। বহুদিন পর তাহেরকে দেখে বুকটা ভরে ওঠে আনোয়ারের। একটু রোগা হয়েছেন কিন্তু তার সপ্রতিভ ভাব কমেনি একটুও। তাহেরের হাতে সেই গলফ স্টিক। তাহেরকে আলিঙ্গন করেন আনোয়ার। আনোয়ার তার ভাই তো বটেই দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধুও। পাকিস্তান থেকে দুজনের মধ্যে চিঠি চালাচালি হয়েছে নিয়মিত। আনোয়ারের কাছ থেকে বাবা-মায়ের খোজ নেন তাহের। তার সঙ্গে

দেখা হয় সাঈদেরও। সবার সাথে বসে দুপুরের খাবার খান তাহের। গল্প করেন নানা অপারেশনের। তারা খাবার খেতে খেতেই দেখেন দূরে পাহাড়ের ঢালে দুটো লাশ কবর দেওয়া হচ্ছে।

লুৎফা বলেন : প্রায়ই দেখি এমন ডেডবডি আসে।

তাহের বলেন : এ দুজন গতকালের এক অপারেশনে মারা গেছে। এদের চিনি আমি। জামালপুরের ছেলে। খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড। এক ট্রেঞ্চে বসে ফাইট করছিল। বলেছিলাম দুজনকে একই ট্রেঞ্চে না থাকতে। কিন্তু কথা শুনল না। বলে, মরলে দুজন একই সঙ্গে মরব। ওদের ট্রেঞ্চেই শেলটা পড়লো।

খেতে খেতে তাহের আনোয়ার আর সাঈদকে বলেন : আমি কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। তোমাদের আরও অ্যাকটিভ রোলে দেখতে চেয়েছিলাম আমি। কত আগে তোমাদের গেরিলা ট্রেনিং দিয়েছি। যুদ্ধে তো তোমাদেরই লিড করার কথা। আমাদের মূল মিশনটা তো ভুলে গেলে চলবে না। সে টার্গেটেই গ্র্যাজুয়েলি কাজ করতে হবে আমাদের। সাঈদ তুমি ইমিডিয়েটলি একটা কোম্পানি দাঁড় করাও। নেমে পড় ফুল ফ্লেজেডলি। আর আনোয়ার তুমি যাবে আমার সঙ্গে মহেন্দ্রগঞ্জ। ব্যাগ এ্যান্ড ব্যাগেজ চলো। আজ থেকে তুমি আমার সেক্টরের স্টাফ অফিসার। তুমি মহেন্দ্রগঞ্জেই থাকবে।

আনোয়ার : ভাইজান আমরা ওয়েট করছিলাম আপনার জন্য। আমরা জানতাম আপনি একদিন জয়েন করবেন যুদ্ধে, তারপর আপনার সাথে মিলে সব পরিকল্পনা করব।

তাহের : যাহোক এখন থেকে কাজ শুরু করা যাক। আর বাই দা ওয়ে, এখন থেকে আমি তোমার ভাই না, আমি তোমার কমান্ডার। তুমি আমার সেক্টরের একজন যোদ্ধা। নো মোর ভাইজান। অন্যদের মতো তুমিও আমাকে স্যার ডাকবে।

খাওয়ার পর তাহের আবার রওনা দেন মহেন্দ্রগঞ্জের দিকে। রণাঙ্গনেই বিচিত্র সংসার লুৎফার। অল্প সময়ের জন্য তাহেরকে কাছে পান তিনি। সে সময়টুকু জুড়ে থাকে যুদ্ধ, মৃত্যু, জয় আর পরাজয়ের কথা। জয়াকে কোলে নিয়ে ধুলা উড়িয়ে দূরে চলে যাওয়া জীপের দিকে তাকিয়ে থাকেন লুৎফা। যেন পেছনে শাহজাদী আর উদ্বিগ্ন বেগমকে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে ধেয়ে চলেছেন বাদশা।

জীপে যেতে যেতে তাহের আনোয়ারকে বলেন : শোন, আমি নিজেই যুদ্ধে যোগ দিতে দেরি করে ফেলেছি। সময় আমাদের হাতে খুব বেশি নাই। এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে ক্রমশ আমাদের আরও বেশি বেশি করে ইন্ডিয়ান আর্মির উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যেতে হবে। আমাদেরকে দ্রুত এই যুদ্ধ নিয়ে আসতে হবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এখানে নানা স্তরের মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে যোগ

দেওয়ার যে উদ্দীপনা দেখছি পৃথিবীর ইতিহাসে তুমি এমনটা খুঁজে পাবে না। ভিয়েতনাম, কিউবাতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার পেছনে ছিল ব্যাপক রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রস্তুতি। আমাদের তো তেমন কোন প্রস্তুতিই ছিলো না।

আনোয়ার : কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা পুরো জাতি একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি অথচ আমাদের সামনে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেই। রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা কোনো নেতা পাচ্ছি না।

তাহের : এক্সাক্টলি। শুধু তাই না, সামরিকভাবে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের অধিকংশেরই তেমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নাই। সুতরাং এই যুদ্ধের রাজনৈতিক ডাইমেনশনটা মিসিং হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের এই পলিটিক্যাল টার্নিংটা ধীরে ধীরে আমাদের ঘটাতে হবে। যেভাবে প্ল্যান করেছিলাম আমরা সেইভাবে এই আর্মস স্ট্রাগলটাতে সোসালিস্ট ডাইমেনশনটা আনতে হবে। আমি আমার সেক্টরে সব কোম্পনিগুলোতে পলিটিক্যাল কমিশার অ্যাপয়েন্ট করেছি। এ ব্যাপারগুলো তোমাকে দেখাশোনা করতে হবে। যুদ্ধ যদি লিঙ্গার করে তাহলে হয়তো আমরা অন্য সেক্টরগুলোকেও আস্তে আস্তে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারব।

সাইলেন্সারবিহীন জীপ সশব্দে আঁকাবাকা পাহাড়ি পথ বেয়ে এগিয়ে যায়। উত্তেজিত তাহের গলা চড়িয়েই কথা বলতে থাকেন আনোয়ারের সঙ্গে : পাশাপাশি আমাদের গেরিলা যুদ্ধকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে। আমি সেক্টর কমান্ডারস মিটিংয়ে গেরিলা ওয়ার ফেয়ারের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছি কিন্তু এরা তাতে ইন্টারেস্টেড না, তারা রেগুলার ব্রিগেড তৈরিতে ব্যস্ত। তাছাড়া গেরিলা ওয়ার ফেয়ারের ওপর আমার মতো এদের কারো এতো থিওরিট্যাল এবং প্রাকটিক্যাল ট্রেনিংও নাই। আমি তো ইলেভেন সেক্টরে আমার স্ট্রাটেজিতে যুদ্ধ চালাচ্ছি। গেরিলা যোদ্ধাদের তৈরি করার মধ্য দিয়েই আস্তে আস্তে এই যুদ্ধটাকে আমাদের রেগুলার মিলিটারি ওয়ার থেকে পিপলস ওয়ারে পরিণত করতে হবে। এ রকম যুদ্ধে একপর্যায়ে একটা গেরিলা বাহিনী নিজেই ক্রমশ একটা নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত হয়। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধটাকে আমরা কিন্তু পৃথিবীতে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে দাড় করাতে পারি। স্রেফ সাধারণ মানুষের শক্তির ওপর ভর করে যে একটা যুদ্ধ জয় করা যায় সেটা আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি।

সেই থেকে আনোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তাহেরের সর্বক্ষণিক সঙ্গী। তার হাতে বিভিন্ন যুদ্ধ ম্যাপ আর কাঁধে একটি চাইনিজ সাবমেশিনগান। রাত জেগে তাহের কোনো রেইড কিম্বা অ্যাম্বুসের পরিকল্পনা করছেন, ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ঘুরে ট্রেনিং পর্যবেক্ষণ করছেন, আনোয়ার আছেন পাশে। বিশেষ করে যোদ্ধাদের পলিটিক্যাল ক্লাসগুলোর ওপর নজর রাখছেন আনোয়ার।

ওদিকে সাঈদ নেমে পড়েছেন তার নেতৃত্বাধীন নতুন একটি কোম্পানি তৈরিতে।

কিছুদিন পর শিববাড়ি থেকে বেলাল এবং বাহারও চলে আসেন মহেন্দ্রগঞ্জ। তাহেরের সাথে দেখা হতেই সরাসরি দুই ভাইকে জিজ্ঞাসা করেন তাহের : কি শিখেছো এ পর্যন্ত, বলো?

বেলাল এবং বাহার দুইজনই উত্তেজিত কারণ তারা এক্সপ্লোসিভ এর ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সে কথা তারা বেশ উদ্দীপনার সাথে বলেন তাহেরকে।

তাহের জিজ্ঞাসা করেন : এক্সপ্লোসিভ তৈরিতে তোমরা কোনো ফর্মুলা ইউজ করো?

বেলাল বলেন : আমরা থ্রি বাই থারটি টু ইউজ করি।

তাহের : এখানেই তো ভুল। ঐ ফর্মুলায় গেলে তো এক্সপ্লোসিভ তৈরিতে খরচ অনেক বেশি হবে।

বেলাল : এটাই তো আমাদের শিখাইছে এইখানে।

তাহের বলেন : আরে এদের তো এক্সপ্লোসিভের অভাব নাই। কিন্তু মুক্তিবাহিনী সবসময় এত এক্সপ্লোসিভ কোথায় পাবে। এই ফর্মুলায় এক্সপ্লোসিভ বানালে আমার সব এক্সপ্লোসিভ তো দুই দিনেই শেষ হয়ে যাবে। অলটারনেটিভ ফর্মুলাটা ইউজ করবে।

তাহের বেলাল, বাহারকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন সবার সাথে। বলেন : এরা হচ্ছে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট তোমাদের তো এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট নেই, এরা তোমাদেরকে সবকিছু শিখিয়ে দেবে।

১১ নম্বর সেক্টরে এভাবেই এক এক করে যোগ দেন আনোয়ার, সাঈদ, বেলাল, বাহার। এদের সবার কাছে তাহের আর সেজ ভাইজান নয়, কমান্ডার, স্যার। আরও কিছুদিন পর সৌদি আরব থেকে পালিয়ে বড় ভাই আবু ইউসুফও লন্ডন হয়ে চলে আসেন ভারতে। যোদ্ধা হিসেবে তিনিও যোগ দেন ১১ নম্বর সেক্টরেই। একমাত্র বড়ভাই আরিফ ছাড়া তাহেরের সবকটি ভাই তখন যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহেরের অধীনস্থ যোদ্ধা। লোকে বলে ব্রাদার্স প্লাটুন।

আরিফ ইতোমধ্যে পাকিস্তান থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন কাজলায়। দায়িত্ব নিয়েছেন মা, বাবার দেখাশোনার।

একদিন স্বশব্দ জীপ নিয়ে তাহের যখন তুরায় হাজির, কিশোরী বোন ডলি তখন এসে বলে : সেজ ভাইজান আমিও যুদ্ধে যেতে চাই।

তাহের : ভেরি গুড। তুমি আর বাদ থাকবে কেন? কিন্তু এই পোশাক পরে তো যুদ্ধ করা যাবে না। দিস ইস নট এ প্রপার অ্যাটায়ার টু বি এ ফ্রিডম ফাইটার। দাঁড়াও দেখি তোমার কি ব্যবস্থা করা যায়।

ডলির পরনে তখন পুরনো মলিন ফ্রক। বুরবুরা সোনাই থেকে আসবার সময় তারা বেছে বেছে পুরনো ফ্রকগুলিই নিয়ে এসেছে যাতে তাদের দরিদ্র ঘরের মেয়ের মতোই দেখায়, নৌকায় যাতে ধরা না পড়ে যায়।

সমাধান একটি পাওয়া যায়। সৌদি আরব থেকে আসবার সময় ইউসুফ যখন লন্ডন হয়ে আসছেন তখন তাহেরের বোন শেলী ইউসুফের হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন প্রচুর কাপড়চোপড় আর ওষুধ পত্র। লন্ডনে থাকলেও এভাবেই মুক্তিযুদ্ধে কোনো একভাবে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ নেন শেলী। শেলীর পাঠানো সেই কাপড়ের স্তূপ থেকে একটা ট্রাউজার আর টি-শার্ট তুলে নেয় ডলি। দেখা যায় দুটোই বেশ বড়। ঘরে বসে কাঁচি দিয়ে কেটে আর সুই সুতোয় সেলাই করে সেই টি-শার্ট আর ট্রাউজার নিজের মাপমতো করে নেয় ডলি। লুৎফাকে বলে : ভাবী আমাকে একজোড়া কেডস্ কিনে দেন।

পাশের বাজার থেকে ডলিকে একজোড়া কেডস কিনে দেন লুৎফা।

কিছুদিন পর তাহেরের জীপ আসবার শব্দ শুনে ট্রাউজার, টি-শার্ট আর কেডস্ পরে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ডলি। তাহের ডলিকে দেখে বলেন : ইনি কে? আমি তো চিনতেই পাচ্ছি না। নাউ ইউ লুক লাইক এ ফ্রিডম ফাইটার, এখন আপনাকে দিয়ে যুদ্ধ হবে।

ছোটবোনদের আপনি করে ডাকবার অভ্যাসিটি তাহের কখনোই ছাড়েননি।

মহেন্দ্রগঞ্জ যাবার সময় তাহের জীপে তুলে নেন ডলিকে। ক্যাম্পে গিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন : আমাদের তো অনেক গেরিলা আছে, এ হচ্ছে তোমাদের নতুন গেরিলি।

ভাইদের সঙ্গে এবার তার সেক্টরে যোদ্ধা হিসেবে যোগ দেয় তাহেরের বোনও। ভাইদের মতো ডলির ওপরও নির্দেশ থাকে তাহেরকে ভাইজান ডাকা যাবে না, ডাকতে হবে স্যার।

তাহের প্রায়ই ডলিকে নিয়ে রেকি করতে যান। ডলিকে চিনিয়ে দেন সব ক্যাম্পগুলো। একদিন দূরের একটি ক্যাম্প থেকে একটি তথ্য আনবার জন্য ডলিকে একা একা পাঠাবে তাহের। বলেন : এই যে ফিফটি সিসি মোটরসাইকেলটা দেখছেন, আপনি এই মোটরসাইকেলটা চালিয়ে ঐ ক্যাম্পে যাবেন।

ডলি বলে : আমিতো কোনোদিন মোটরসাইকেল চালাইনি।

তাহের : আপনি তো সাইকেল চালিয়েছেন। বসেন, বসলেই হয়ে যাবে।

তাহেরের সাহস আর উৎসাহে ডলি মোটরসাইকেলে বসে কয়েকবার চেষ্টা করতেই চালানো শিখে যায়। পরবর্তীতে ঐ মোটরসাইকেল চালিয়ে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে খবর আদান প্রদানের কাজ করতে থাকে তাহেরের মহিলা গেরিলি ডলি।

ডলি আবদার করে : আমাকে রাইফেল চালানো শেখান।

তাহের বলে : শিখাব, কিছুদিনের মধ্যেই।

ইতোমধ্যে মহেন্দ্রগঞ্জে আসেন আওয়ামীলীগের নেতা সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শওকত আলী। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা এবং সংসদ সদস্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে কলকাতায় থাকলেও বেশ কিছু নেতা নিজে আগ্রহী হয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং হাতে তুলে নেন অস্ত্র। শওকত আলী তেমনি একজন। তিনি ১১ নম্বর সেক্টরে গিয়ে তাহেরকে অনুরোধ করেন তাকে অস্ত্র চালানো শেখাতে। শওকত আলী এবং ডলি এই দুই অসম বয়সী যোদ্ধার অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেন তাহের। ডলি এবং ব্যারিস্টার শওকত দুজনে মিলে এক এক করে চালানো শেখে সাব মেশিনগান, ভারী এমএমজি, গ্রেনেড।

তাহেরের সব অপারেশনে সঙ্গে আছেন আনোয়ার। একদিন রাতে খবর এলো হাতিভাঙ্গা এলাকায় সবুজপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটির পতন ঘটেছে। পাকিস্তানিরা নির্বিচারে হত্যা চালাচ্ছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। সারাদিন বেশ কয়েকটা সাব সেক্টর ঘুরে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরেছেন তাহের। কিন্তু খবর শোনার পর তাহের আনোয়ারকে বলেন, দেরি করা যাবে না, রাতের মধ্যেই অপারেশন চালাতে হবে।

অপারেশন টিম ঠিক করে ফেলতে বলেন আনোয়ারকে। দ্রুত দলকে প্রস্তুত করে ফেলেন আনোয়ার। তাহের কোনো বিশ্রাম না নিয়ে শেষ রাতের দিকেই রওনা দেন। সাথে আনোয়ার এবং আরও সহযোদ্ধারা। প্রায় মাইল দশেক পথ হাঁটেন তারা। তাহেরের হাতে গল্ফ স্টিক। তার পাশে আনোয়ার চলেন যথারীতি একটি চায়না এসএমজি কাঁধে নিয়ে। লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি এসে দলের প্রধান অংশটাকে একটি নদীর ধারে রেখে ছোট একটি স্কাউট টিম নিয়ে এগিয়ে যান তাহের। তাদের আসার খবরে গ্রামের চাষীরা এগিয়ে আসেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাহের জেনে নেন পাকিস্তানিদের অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা নদীর ধারে যে স্কুল ঘরটিতে ঘাঁটি গেড়েছিল পাকিস্তানিরা সেটি দখল করে নিয়েছে। গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে একজন চাষী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। জলমগ্ন ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘরবাড়ির আড়ালে আড়ালে ঐ চাষী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন তাদের। আনোয়ারের মনে হঠাৎ সন্দেহ হয় এই লোকটি আবার পাকিস্তানিদের চর না তো? তাদের আবার কোনো ফাঁদে ফেলছে না তো? তাহেরকে কথাটা বলেন আনোয়ার।

তাহের বলেন : শোন আনোয়ার তোমাকে আগেও বলেছি, মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে, তা না হলে আমরা একটুও আগাতে পারব না।

চাষী গাইড শত্রু অবস্থানের খুব কাছে তাদের নিয়ে আসেন। চারদিকের ঘরবাড়ি তখনও পুড়ছে। তাহের আড়াল থেকে লক্ষ করেন পাকিস্তানিরা লুটের মাল নিয়ে লঞ্চে উঠছে। নদীর ধারে যে অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের রেখে আসা হয়েছে লঞ্চটা সে পথেই যাবে। এতকাছে শত্রু সৈন্যদের দেখে হাত নিশপিশ করতে থাকে দলের ছেলেদের। কিন্তু তাহের বলেন এখন কিছুতেই গুলি করা যাবে না। লঞ্চটা কিছুদূর এগিয়ে গেলে পেছন থেকে গুলি করতে হবে যাতে করে লঞ্চটা আরও দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং সামনের মুক্তিযোদ্ধাদের

ফাঁদে পড়বে। এসময় সেই চাষী গাইড তাহেরকে একটি ঝোপের কাছে নিয়ে গিয়ে কতকগুলো গুলি আর গ্রেনেড দেখান।

চাষী বলেন : মিলিটারিরা আতকা যখন আক্রমণ করছে মুক্তিযোদ্ধারা দৌড়াইয়া আরেক জাগায় লুকাইছে, যাওনের সময় এই গুলিগুলা সঙ্গে নেওনের টাইম পায় নাই। আমি ভাবলাম, এইগুলি তো নিব গা পাকিস্তানিরা, তাই এই জঙ্গলে লুকায় রাখছি।

তাহের আনোয়ারকে বলেন : দেখলে তো। মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। এজন্যই আমি সবসময় বলি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছাড়া এ যুদ্ধে আমরা জিততে পারব না।

অবশ্য মানুষকে বিশ্বাস করার এই মন্ত্র যে সবসময় অব্যর্থ হবে না তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য তাহেরকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকটা বছর।

পাক সেনাদের লঞ্চটা এগিয়ে যায়। পেছন থেকে তখন ফায়ার শুরু করেন তাহেরের দল। লঞ্চটা দ্রুত এগিয়ে যায় সামনে এবং যথারীতি গিয়ে পড়ে সেখানে অপেক্ষমাণ মুক্তিযোদ্ধাদের হতে। অনেক পাক সেনা হতাহত হয় সেদিন, মুক্তিযোদ্ধারা দখল করেন সেই লঞ্চ।

কখনো কখনো সবকটি ভাইই একসাথে যোগ দেন কোনো অপারেশনে। তেমনি একদিনের ঘটনা। ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনেই সাঈদ ইতোমধ্যে তৈরি করে ফেলেছেন তার কোম্পানি। তাহের একবার সাঈদকে বলেন ধানুয়া কামালপুরের একটা ডিফেন্স রক্ষা করবার জন্যে তার কোম্পানি নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার কোম্পানির অধিকাংশ ছেলেরাই পরপর কয়েকদিন অপারেশন করে ক্লান্ত। তারা বিশ্রাম নিতে চান। কিন্তু ব্যাপারটা জরুরি, যেতে হবেই। অনেক রাত। সাঈদ বলেন : যারা যারা অপারেশনে যাইতে চাও ক্যাম্পের বাইরে আইসা লাইন দিয়া দাঁড়াও।

ভাই বাহার সবার আগে এসে দাঁড়ান। আনোয়ার সাধারণত সম্মুখযুদ্ধে যান না কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতি বুঝে আনোয়ারও এসে দাঁড়ান লাইনে। সাঈদ গুণে দেখেন মোট বিশ জন। বিশ জনকে নিয়েই ধানুয়া কামালপুরের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন সাঈদ। যাবার আগে শেষ বারের মতো সবাইকে গুনতে গিয়ে দেখেন এবার দলে একুশ জন। আবারও গোনেন, তখনও একুশ জন। ব্যাপার কি ভেবে পান না সাঈদ। অন্ধকারে সবাইকে ভালোমতো চেনাও যায় না। তৃতীয় বার গুনতে গিয়ে দেখেন লাইনের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন বেলাল। কোন ফাঁকে আনোয়ার, বাহারের পর বেলালও এসে যোগ দিয়েছেন সেই দলে টের পাননি সাঈদ।

ব্রাদার্স প্লাটুন রওনা দেয় অপারেশনে।

একদিন জীপে আনোয়ারকে নিয়ে তেলঢালায় যান তাহের।

তাহের : চলো তোমাকে মেজর জিয়ার কাছে নিয়ে যাই, জিয়ার নাম শুনেছো তো?

আনোয়ার বলেন : হ্যাঁ, শুনেছি। রেডিওতে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি।

তাহের : তেলঢালাতে তার ব্রিগেড আছে। ওসমানীর কথামতো তিনি রেগুলার ব্রিগেড তৈরি করছেন। তবে সেক্টর কমান্ডার মিটিংয়ে আমি যে গেরিলা ওয়ার ফেয়ারের ব্যাপারে বলেছিলাম, হি ওয়াজ দি ওনলি ওয়ান হু সাপোর্টেট মি। সে জন্য তার সাথে যোগাযোগটা রাখি। তাকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করি যাতে তার সেক্টরেও গেরিলা ফাইটারের সংখ্যা বাড়ান। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা যুদ্ধের যে পলিটিক্যাল টার্নিংয়ের কথা বলছি, এটাকে একটা পিপলস সোসালিস্ট ওয়ারের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি, সেটা তো শুধু আমাদের সেক্টরে করলে হবে না। অন্যান্য সেক্টরে, ব্রিগেডে ছড়িয়ে দিতে হবে। মেজর জিয়াকে রিলেটিভলি ওপেন মনে হয়, তার এই ব্রিগেডকে হয়তো ইন কোর্স অব টাইম আমরা সাথে পেতে পারি।

তেলাঢালা ব্রিগেড কমান্ডারের অফিসে জীপ থামে তাদের। আনোয়ার দেখেন চারদিকে খুব ছিমছাম সাজানো, গোছানো। তাবুর ভেতর কার্পেট। সেক্টর এগারোর হেডকোয়ার্টারে কার্পেট ছেড়ে দূরের কথা ঠিকমতো বসবার ব্যবস্থাও নাই। তাঁবুর ভেতর থেকে মাঝারি উচ্চতার হালকা পাতলা এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ান আনোয়ারের সামনে। তাহের আনোয়ারকে বলেন : মিট মেজর জিয়া।

জিয়াকে বলেন : দিস ইজ মাই ব্রাদার আনোয়ার। আমার সেক্টরের কাজ করছে।

জিয়া হাত মেলান আনোয়ারের সঙ্গে।

জিয়া বলেন, তোমাদের ব্রাদার্স প্লাটুনের খবর আমি পেয়েছি। তোমরা সব ভাই একসাথে অপারেশনে যাও সে খোঁজও পেয়েছি। বাট দিস ইজ নট রাইট। ইউ স্যুড নট মুভ টুগেদার। তাহের তোমার এই ভাইটাকে বরং আমার ব্রিগেডে দিয়ে দাও।

তাহের হেসে বলেন : ও তো এখন আমার স্টাফ অফিসার। সেক্টরের ইম্পর্টেন্ট লোক, ওকে ছাড়া যাবে না।

তাঁবুতে বসে জিয়ার সাথে আলাপ করেন তাহের। বলেন : আমি কিন্তু স্যার আমার হেডকোয়ার্টার একেবারে বর্ডারের কাছে নিয়ে গেছি। আমি ভেতরে ঢুকে যেতে চাই। আপনার হেডকোয়ার্টারও মুভ করা উচিত। চলেন বাংলাদেশের ভেতরে চলে যাই। সিএনসি তো এগ্রি করবেন না। আপনি তো ব্রিগেড কমান্ডার,

আপনি চাইলে সিএনসিকে ডিফাই করতে পারেন। আপনি ইনডিপেনডেন্ট। আপনি এগিয়ে আসলে আমিও একটা সাপোর্ট পেতে পারি।

জিয়া : তাহের তোমার মতো এতগুলো ভাই থাকলে আমিও অনেক সাহসী হতে পারতাম।

তাহের : প্রয়োজন হলে আমার ভাইদের আমি পাঠাবো আপনার এখানে কিন্তু চলেন আমরা গেরিলা ওয়ার ফেয়ারটাকে আরও স্ট্রেন্থেন করি। এত বড় একটা রেগুলার ব্রিগেড বানিয়ে কোনো লাভ নেই স্যার।

জিয়া : প্রবাবলি ইউ আর রাইট। বাট লেট আস ওয়েট এ্যান্ড সি।

কিছুক্ষন আলাপ সেরে ফিরতি পথে রওনা দেন তারা। জীপে বসে তাহের বলেন : মেজর জিয়ার এই এক সমস্যা, তাকে কিছু বললেই বলে লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি। লোকটা আমাকেও সাপোর্ট করেন আবার ওসমানীর সঙ্গেও ডিফার করেন না। সব দরজাই খোলা রাখেন।

আনোয়ার : ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে কার্পেট-টার্পেট সাজিয়ে বেশ রাজসিক হালে আছেন মনে হয়।

তাহের : রিয়েল ওয়ার ফিল্ড থেকে এত দূরে থাকলেই এসব বিলাসতা করার সুযোগ হয়। আই হোপ হি আন্ডারস্টান্ডস দি সিচুয়েশন।

সূত্রপাত ঘটে তাহের আর জিয়ার বিশ্বাস, অবিশ্বাসের জটাজালে জড়ানো এক জটিল সম্পর্কের।

যুদ্ধসম্রাট

তাহের কৌশল হিসেবে সিদ্ধান্ত নেন দেশের ভেতরে থেকে যে সব যোদ্ধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধ করছেন তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। রৌমারীতে সুবেদার আফতাব, টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকী, ভালুকায় সৈনিক আফসার। এরা এক এক জন স্থানীয় যুদ্ধসম্রাট।

সুবেদার আফতাব রৌমারি থানার কোদালকাঠি এলাকার ভেতরে থেকে খুবই সফলভাবে যুদ্ধ করছেন। অনেকগুলো চর নিয়ে গড়া রৌমারীর বিশাল এলাকা যুদ্ধের প্রায় পুরো সময়টাই মুক্ত রেখেছেন আফতাব। জেনারেল ওসমানী আফতাবকে বলেছেন বিদ্রোহী কারণ ওসমানী এবং জিয়া বেশ অনেকবার আফতাবকে ভারতে ডেকে পাঠালেও তিনি যাননি। বলে পাঠিয়েছেন যে, তাদের সাহায্য ছাড়া তিনি নিজেই বাংলাদেশের মাটিতে বসে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। তাহের আফতাবের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেন। তার সাথে দেখা করবার পরিকল্পনা করেন। সীমান্ত থেকে কোদালকাঠি যাওয়ার পথ দুর্গম। তারপরও একদিন তাহের আঠারো মাইল পথ হেঁটে কোদালকাঠি পৌঁছান শুধু ঐ আফতাবের সাথে দেখা করতে। পৌঁছে দেখা হয় বিশালদেহী, পরনে লুঙ্গি, গায়ে ডোরাকাটা স্পোর্টর্স গেঞ্জি, মাথায় বার্মিজদের মতো রুমাল বাঁধা সুবেদার আফতাবের সঙ্গে। তার

আগে পিছে রাইফেলধারী দেহরক্ষী। আফতাব একজন অফিসারকে দেশের মাটির ভেতরে তার ঐ যুদ্ধ ক্যাম্পে দেখে অবাক।

সারারাত সুবেদার আফতাবের সাথে কথা হয় তাহেরের। আফতাব বলেন : আমি স্যার কিছুতেই ভারতের মাটিতে কোনো ক্যাম্প তৈরি করব না, যুদ্ধ করব দেশের ভিতরে বসেই।

আফতাবের দেশপ্রেম, সাহস আর দৃঢ়তা মুগ্ধ করে তাহেরকে। সুবেদার আফতাবকে তাহের বলেন : রৌমারীকে আমাদের মুক্ত রাখতেই হবে, আমরা বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর থেকে সরিয়ে আনব রৌমারীতে।

চওড়া কাঁধ, লম্বা কোকড়ানো চুলের নির্ভীক আফতাব তাহেরকে বলেন : স্যার পাকিস্তানিরা শুধু সুবেদার আফতাবের লাশের উপর দিয়াই রৌমারিতে ঢুকতে পারবে।

তাহের : তোমার তো অস্ত্র কম। দেখি তোমার জন্য অস্ত্র যোগার করতে পারি কিনা।

আফতাব বলেন : আমি স্যার ইন্ডিয়ার অস্ত্র চাই না। পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়াই দেখি কতক্ষণ যুদ্ধ চালাইতে পারি।

তাহের : তোমার জন্য সেই ব্যবস্থাই করব।

টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর সাথেও যোগাযোগ হয় তাহেরের। কাদের সিদ্দিকী সীমান্ত পেরিয়ে প্রায়ই মহেন্দ্রগঞ্জ চলে আসেন তাহেরের সঙ্গে দেখা করতে। তাকে অস্ত্রসহ সবরকম সহযোগিতা দেন তাহের। একবার বিবিসির সাংবাদিকরা আসেন ১১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধের নানা ফুটেজ সংগ্রহ করতে। তখন সেখানে ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। তাহের বিবিসির সাংবাদিককে বলেন : আমার না বরং এই ছেলেটির সাক্ষাৎকার আর কাজকর্মের ছবি আপনারা তোলেন।

শ্মশ্রুমণ্ডিত কাদের তখন বাঘা কাদের নামে পরিচিত। মাথায় কাউবয়দের মতো টুপি পড়ে থাকেন কাদের সিদ্দিকী। থাকেন খালি পায়ে। কাদের প্রতিজ্ঞা করেছেন দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পায়ে জুতা, সেন্ডেল কিছুই পরবেন না। বিবিসি কাদের সিদ্দিকীর ছবি তোলে এবং তা প্রচারিত হওয়ার পর কাদের সিদ্দিকীর নাম ছড়িয়ে যায় দেশে, বিদেশে।

এমনি আরেক স্থানীয় যুদ্ধসম্রাট ময়মনসিংহের ভালুকার সৈনিক আফসার। তিনি নিজেকে মেজর ঘোষণা করে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে রক্ষা করে যাচ্ছেন ভালুকাকে। তাহের তার সাথেও যোগাযোগ করেন এবং সব রকম সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেন।

দেশের সীমানার ভেতরই স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠা এইসব চারণ বীরদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাহের নিজেও জারিত হতে থাকেন নানা মাত্রায়। আকৈশোর তাহের করোটিতে বয়ে বেড়িয়েছেন যুদ্ধনেশা। সেই স্বপ্নে দেখা যুদ্ধের ভেতর স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতো ছুটে বেড়ান তাহের।

রণাঙ্গনের রাত, দিন

কোনো কোনো দিন রাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধরা বসায় গানের আসর। দল বেধে গায়—'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে ...।' তাহেরও যোগ দেন তাদের সঙ্গে। কোনোদিন যোদ্ধারা তাকে বলে, স্যার আপনার পাকিস্তান পালানোর গল্পটা বলেন। চারপাশে ঘিরে থাকা উদ্দীপ্ত গেরিলাদের মধ্যে বসে তাহের শোনান তার এবোটাবাদ থেকে দেবীগড় আসবার গল্প। আবু তাহের অচিরেই হয়ে ওঠেন সাধারণ যোদ্ধা, সিপাইদের প্রিয় নাম।

যুদ্ধক্ষেত্রে তাহেরের পরিচয় হয় সাংবাদিক যোদ্ধা হারুন হাবীবের সঙ্গে। হারুন হাবীব রণাঙ্গনের বিভিন্ন খবর পাঠিয়ে সরবরাহ করেন জয় বাংলা পত্রিকা কিংবা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অফিসে। তাহের তাকে ডেকে বলেন : শুধু খবর পাঠালে তো হবে না, ছবিও পাঠাতে হবে।

তাহের তার নিজের ইয়াসিকা ক্যামেরাটি একদিন হারুন হাবীবের হাতে তুলে দিয়ে বলেন : ক্যামেরাটা আমার খুব প্রিয়, মুক্তিযুদ্ধের ছবি তোলার জন্য তোমাকে দিচ্ছি, রিপোর্টের সঙ্গে ছবিও পাঠাবে।

হারুন বলেন : এখানে তো ছবি প্রিন্ট করা একটা বড় সমস্যা। এত দূর থেকে তুরা যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো পথ নেই। সে তো অনেক দূর।

তাহের বললেন : কাছে কোনো স্টুডিও নেই?

হারুন : কাছাকাছি যেটা আছে সেটা বাংলাদেশের বর্ডারের ভেতরে।

তাহের : একটা প্লাটুন নিয়ে দেশের ভেতরে চলে যাও না কেন, গেরিলা কায়দায় স্টুডিও দখল করে নেগেটিভ প্রিন্ট করে নিয়ে আস। আরে গেরিলা জার্নালিস্টের কাজই তো হবে এই।

যতক্ষণ জেগে থাকছেন, নানা মানুষকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন তাহের। অল্প কয়ঘণ্টা শুধু ঘুমান তাহের, জেগে থাকেন অনেক রাত। তাঁবুর ভেতর হাতল ঘোরানো টেলিফোনের পাশে উদ্বিগ্ন বসে তাহের অপেক্ষা করেন জগন্নাথ কিংবা বাহাদুরাবাদ ঘাটে পাঠানো কোম্পনির অপারেশনের খবর শুনবার জন্য। রাত জেগে গল্প করেন হারুন হাবীব, আবু ইউসুফ, আনোয়ারসহ অন্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে। তাঁবুর খুটিতে ঝোলে হারিকেন। সেখানে অসংখ্য পতঙ্গের ভিড়। অবিরাম ডাকে ঝিঁ ঝিঁ পোকা। দূরে শোনা যায় গোলাগুলির শব্দ।

হারুন হাবীবকে জিজ্ঞাসা করেন তাহের : জার্নালিস্ট বলো খবরাখবর কি? যুদ্ধের অবস্থা কি বুঝতে পারছো?

হারুন : পাকিস্তানিরা তো নানা জায়গায় মার খাচ্ছে। তবে ইন্টারন্যাশনাল রিঅ্যাকশনটা শেষ পর্যন্ত কি হবে বুঝতে পারছি না।

তাহের : ক্যাপিটালিস্ট আর ইসলামিস্টরা আমাদের সাহায্য করবে না সেটা স্পষ্ট। ইন্ডিয়া ডেফিনিটলি আমাদের পাশে থাকবে, হয়তো অল আউট ওয়ারে যাবে। কিন্তু আমি মনে করি সেটা ঠিক হবে না। গত সেক্টর কমান্ডারদের মিটিং এ

আমি বলে এসেছি ইন্ডিয়া আমাদের টোটাল সাপোর্ট দিচ্ছে ফাইন, উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল। ওরা সরাসরি লড়লে অবশ্যই আমরা দ্রুত স্বাধীনতা পাব, পাকিস্তানিরা পালাতে বাধ্য হবে কিন্তু আই এম সিওর আমাদের জাতীয় মুক্তি বাধাগ্রস্ত হবে। এই যুদ্ধটাকে আমরা একটা সোসালিস্ট বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে পারি। সেজন্য আমাদের মানুষ, পলিটিক্যাল লিডারশিপ, ফিল্ড কমান্ডার সবারই আরও সময় দরকার। অন্তত কয়েক বছর। পাকিস্তানিরা এখনই পালিয়ে গেলে একটা অসমাপ্ত বিপ্লব হবে মাত্র। আমরা স্বাধীনতা পাব কিন্তু জাতীয় বিপ্লব শেষ হবে না।

এক সহযোদ্ধা বলেন : কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে আরও কত লক্ষ মানুষ মারা যাবে সেটা কি আমরা ভাবব না? আমাদের স্বাধীনতার জন্য এ যুদ্ধ দরকার ছিল কিন্তু যত তাড়াতাড়ি এই যুদ্ধ শেষ হয় সেটাই কি ভালো না?

তাহের বলেন : আপাতভাবে ভালো মনে হতে পারে কিন্তু এটাও মনে রাখবে এই যুদ্ধে আমাদের ঘরবাড়ি, দালান কোঠা, ব্রিজ কালভার্ট, স্কুল-কলেজ এগুলোই শুধু পুড়ছে না। পুড়ছে আমাদের বিশ্বাস, চেতনা। পুড়ে পুড়ে আমরা খাঁটি হচ্ছি। আমরা নিশ্চয় অনেক অনেক হারাচ্ছি। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অর্জন করে যাচ্ছি আরও অনেক বেশি। এই অর্জনটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যত এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যাবেন তত খাঁটি বিপ্লবী হয়ে উঠবেন। দেখছো না ভিয়েতনামে, কত বছর ধরে যুদ্ধ করতে করতে পুরো জাতিটাই একটা বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয়েছে? আমেরিকার মতো এত বিশাল ক্ষমতাবানরাও হিমসিম খাচ্ছে সেখানে।

ইউসুফ : আমিও মনে করি বাংলাদেশের যুদ্ধটা ভিয়েতনামের যুদ্ধের মতো হয়ে উঠতে পারে। এ যুদ্ধ ব্যাপক একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এই সাবকন্টিনেন্টে। কিন্তু নানা কন্সপিরেসি হচ্ছে, একটা হাফ হর্টেট রেভ্যুলেশনই হবে বলে মনে হচ্ছে।

আরেক সহযোদ্ধা বলেন : শেখ মুজিব থাকলে হয়তো অনেক ভালো হতো।

তাহের : তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে হয়তো ভালো হতো। যদিও তার কথা স্মরণ করেই মানুষ যুদ্ধ করছে। শেখ মুজিব তো এখন সাধারণ মানুষের কাছে এক পৌরাণিক চরিত্রের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছেন। হো চি মিনের মতো, ক্যাস্ট্রোর মতো যুদ্ধের অভিজ্ঞতাটা থাকলে হয়তো তার নিজের জন্যও ভালো হতো।

তোমরা তো লক্ষ করেছো আমি খুব প্ল্যান ওয়াইজ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পলিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশনটা আনবার চেষ্টা করছি। তাদের লেফট পলিটিক্সে টিচিং দিচ্ছি। এজন্যই তো সময় দরকার আমাদের। আমাদের বামপন্থীরা তো যুদ্ধ নিয়ে নানা ধোঁয়াটে অবস্থায় আছে। মস্কোপন্থীরা অবশ্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমার সেক্টরেই অনেক ছেলে আছে। কিন্তু চীনাপন্থীরা তো শুনি মুক্তিযুদ্ধটাকেই রিজেক্ট করেছে।

আনোয়ার : বিশেষ করে আবদুল হকের দলের লোকেরা বলছেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যেমন পাকিস্তানি বুর্জুয়াদের প্রতিনিধি, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা বাঙালি উঠতি বুর্জুয়াদের প্রতিনিধি। তারা নাকি বলছে এই যুদ্ধ আসেল 'দুই কুকুরের লড়াই'। তারা অনেক জায়গায় পাকবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী দু দলের সাথেই যুদ্ধ করছে।

তাহের : এসব সিলি বুকিস এনালাইসিস! আমার মনে হয় না এরা পিপলের পালস বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে কিম্বা বুঝলেও তার কোনো মূল্য দেয়।

ইউসুফ : অবস্থা আরও ঘোলাটে হচ্ছে কারণ পাক আর্মি বাঙালিদের দিয়েই তাদের সাপোর্টে রাজাকার, আল বদর বাহিনী তৈরি করেছে। ঐ জামায়াত ইসলামের ছেলেরা মিলে এসব বাহিনী তৈরিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পাশাপাশি সামান্য কিছু টাকা পয়সা পাবার আশায় অনেক গরিব কৃষকও রাজাকারে নাম লেখাচ্ছে। আবার পাকিস্তান সাপোর্ট করে এমন সব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মেম্বারদের নিয়ে ওরা তৈরি করছে শান্তি কমিটি। এই স্টুপিডগুলো নাকি শান্তি আনতে চায়। এই দালালগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক ডিসটার্বিং এলিমেন্ট।

তাহের : আসলে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা যেভাবে ওদের চোরাগোপ্তা আক্রমণ করছে তাতে ওরা ঠিকই টের পেয়েছে যে ওদের রেগুলার আর্মি দিয়ে এই যুদ্ধে ওরা বেশিদিন টিকবে না। বাঙালিদের ভেতরেই ওদের দোসর দরকার।

আরেক সহযোদ্ধা : ওদিকে তো ইন্ডিয়ান ইন্টিলিজেন্সের তত্ত্বাবধায়নে দেরাদুনে মুজিববাহিনীর ট্রেনিং হচ্ছে। ওটাও একটা বিভক্তি তৈরি করছে। ইন্ডিয়ানরা কেন যে ওদের আলাদা করে এভাবে টেনিং দিচ্ছে বুঝতে পাছি না।

ইউসুফ : ঐ যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, ওয়ান স্যুড নট পুট অল ওয়ান'স এগস ইন ওয়ান বাস্কেট, ইন্ডিয়ানরা সেটাই ফলো করছে। দেশ স্বাধীন হলে, শেখ মুজিব ফিরে এলে, হাওয়া কোনো দিকে যায় সেটা তো বলা মুস্কিল। সুতরাং ওরা শেখ মুজিবের ক্লোজ এই সব ছাত্রনেতাদেরও হাতে রাখছে।

তাহের : আমাদের কেয়ারফুলি এসব নজর রাখতে হবে। আচ্ছা তোমরা কেউ কি সিরাজ শিকদারের খবর জানো?

আনোয়ার : শুনেছি তিনি বরিশালের পেয়ারাবাগানে যুদ্ধ করছেন। কোনো সেক্টরের আন্ডারে তিনি নেই। নিজের দল নিয়েই পেয়ারাবাগানকে মুক্ত করে রেখেছেন। তার দলের নাম রেখেছেন 'সর্বহারা পার্টি'।

তাহের : সে তো দেশের আরেক প্রান্তে তা না হলে যোগাযোগ করতাম তার সঙ্গে।

হারিকেনের আলোয় তারা যখন গল্প করছেন দূর থেকে তখনও থেমে থেমে আসছে ভারী বিস্ফোরণ আর গুলির শব্দ। ভয় পেয়ে পাশের পাহাড় থেকে ডাকছে অনেকগুলো কুকুর। হঠাৎ বেজে ওঠে হাতল ঘোরানো টেলিফোন। তাহের উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন ধরেন। মুখে হাসি ফুটে ওঠে তার। খোঁজ পান বাহাদুরাবাদ ঘাট

অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। রাতেই সে রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দেন হারুন হাবীব। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে লোকে শোনে মুক্তিযোদ্ধাদের আর একটি বিজয়ের গল্প।

অপারেশন চিলমারী

রৌমারীর সুবেদার আফতাবকে অস্ত্র যোগার করে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাহের। ভারতীয় অস্ত্র নয়, শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করতে চান আফতাব। তাহেরও তার সঙ্গে একমত। রৌমারী তারই সেক্টরের অধীনে একটি এলাকা। রৌমারীর যোদ্ধাদের অস্ত্র যোগান দিতে পাকিস্তানিদের দখলে থাকা চিলমারী আক্রমণের পরিকল্পনা করেন তাহের। চিলমারির কয়েক মাইল দক্ষিণেই মিলেছে তিস্তা আর ব্রহ্মপুত্র। পাকিস্তানিরা রৌমারীর খুব কাছে চিলমারী বন্দর থেকে গানবোটে প্রায়ই আক্রমণ করে রৌমারীর মুক্ত অঞ্চল। চিলমারী একাধারে নৌ এবং স্থল বন্দর। জমজমাট বন্দর চিলমারী তখন গুলি আর মেশিনগানের আওয়াজে প্রকম্পিত। কোনো বিরহীর কণ্ঠে তার প্রেমিকের জন্য তখন আর গান নেই—'হাঁকাও গাড়ি বন্ধু চিলমারীর বন্দরে...'

ঠিক হয় চিলমারী হবে ১১ নম্বর সেক্টরের প্রথম বড় অভিযান। চিলমারীকে দখল করতে পারলে রৌমারীর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আর কোনো ঝুঁকি থাকে না। তাহের এও খোঁজ পেয়েছেন চিলমারীতে এক বিশাল রাজাকার বাহিনী গড়ে তুলেছে মুসলিম লীগের কুখ্যাত নেতা আবুল কাশেম। ধ্বংস করতে হবে এই রাজাকারদেরও।

তাহেরের নির্দেশে ওয়ারেন্ট অফিসার সফিক উল্লাহ স্থানীয় গ্রামের লোকজন নিয়ে দ্রুত তৈরি করে ফেলেন চিলমারীর একটি ম্যাপ। চিহ্নিত করেন পাকিস্তানিদের অবস্থান এবং তাদের শক্তি। তারা খোঁজ পান পাকিস্তানিরা চিলমারীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্টে ছড়িয়ে পজিশন নিয়ে আছে। তারা আছে ওয়াপদা ভবন, জোড়গাছ, রাজভিটা, থানাহাটপুর স্টেশন, বলবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন এবং পুল স্টেশন রেলওয়ে ব্রিজে। এসব জায়গায় পাকিস্তানিদের সহযোগী আছে আবুল কাশেমের রাজাকার বাহিনী। প্রধান প্রধান রাজাকার নেতাদের নামও তারা খুঁজে বের করেন। জানতে পায় আবুল কাশেম ছাড়াও নেতৃত্বে আছে ওয়ালী আহমদ আর পাছু মিয়া।

তাহের তার সেক্টরের বেশ কয়েকজন কোম্পানি কমান্ডারদের নিয়ে অপারেশন পরিকল্পনায় বসেন। তাহের বলেন : পাক আর্মিরা যেসব জায়গায় পজিশন নিয়েছে সেসব জায়গায় একসাথে এটাক করতে হবে। ওদের এমনভাবে ব্যস্ত রাখতে হবে যেন এক পজিশনের পাক সেনা অন্য পজিশনের পাক সেনাকে সাহায্য করতে না পারে। পাশাপাশি চিলমারীর বোথ রেল এবং রোড

কানেকশনকে ডেস্ট্রয় করে দিতে হবে। আর এই পুরো অপারেশনটা করতে হবে শত্রুদের অজ্ঞাতে এবং অতর্কিতে।

বেশ কয়েকদিন ধরে এলাকাগুলো রেকি করেন তারা। তারপর চূড়ান্ত আক্রমণ। সড়ক এবং রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার দায়িত্ব দেওয়া হয় মাহাবুব এলাহি রঞ্জু এবং খায়রুল আলম নজরুলের কোম্পানিকে। আক্রমণের একদিন আগে গোপনে অতি সন্তর্পণে তারা দিয়ে পৌঁছান উলিপুর এবং চিলমারীর মাঝামাঝি ঘুঘুমারীর চরে।

তাহের বলেন : তোমরা ওখানে গিয়ে জাস্ট ওয়েট করবে। মূল অ্যাটাক শুরু হবার আগে কিচ্ছু করবে না। মেইন অ্যাটাক ওপেন হলেই শুধু তেমারা তোমাদের অপারেশনে যাবে।

মূল আক্রমণকারী দলের কামান্ডার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল কাশেম চাঁদ আর তার সঙ্গে আছেন নায়েক সুবেদার মান্নান। তারা গিয়ে অবস্থান নেন চিলমারী বন্দরের মাত্র দুই মাইল দক্ষিণে গাজির চরে। গাজির চরকেই আক্রমণকারী বাহিনীর মূল ঘাঁটি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। তেমন উন্নত অস্ত্র নেই তাদের হাতে। থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, কিছু পুরনো স্টেনগান আর হ্যান্ড গ্রেনেড। সুবেদার মান্নানের উপর দায়িত্ব চিলমারীর ওয়াপদা ভবনকে ধ্বংস করার আর কমান্ডার চাঁদের দায়িত্ব ছোট ছোট দল নিয়ে জোরগাছা, রাজভিটা, থানাহাট পুলিশ স্টেশন, ব্রিজ এই সব জায়গা গুলোতে সরাসরি আক্রমণ করা।

রাতের অন্ধকারে অনেকগুলো নৌকা নিয়ে ধীরে প্রায় তিন মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেন আবুল কাশেম চাঁদ আর নায়েক সুবেদার মান্নানের দল। পুরো দলটি চিলমারী বন্দরের খুব কাছে গাজির চরে গিয়ে মূল আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। চিলমারী বন্দর থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে গাজির চরের পেছনে জালিয়ার চর। সেখানে গিয়ে পজিশন নেন তাহের। জালিয়ার চর হয় তার কমান্ডিং হেডকোয়ার্টার। ব্যাক আপ সাপোর্ট হিসেবে তাহের সঙ্গে নেন তার সেক্টরের সবেধন নীলমণি চারটি দূরপাল্লার কামান। গভীর রাতে কামানগুলো নিয়ে তাহের তার সঙ্গের দলটিসহ গিয়ে উঠেন সেই চরে। নৌকা থেকে কামানগুলো নামানো হয়। চারপাশে ধু ধু বালুচর। অন্ধকারে ঐ বালুর ওপর দিয়ে গলদঘর্ম হয়ে ভারী কামানগুলো টেনে টেনে তারা নিয়ে যান চরের অন্যপ্রান্তে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। মাঝরাত। জালিয়ার চরে গ্রাউন্ড সিট বিছিয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নেন তাহের। ওয়ারলেসে খবর আসে, গাজির চর, ঘুঘুমারির চরসহ সবদিকে তার দলের লোকেরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তারা পজিশন নিয়ে বসে আছেন চূড়ান্ত আক্রমণের মুহূর্তের জন্যে। রাত সাড়ে তিনটার দিকে ওয়ারলেসে তাহেরকে জানানো হয় আর কিছুক্ষণ পরেই তার বাহিনী শত্রুসেনার ওপর আক্রমণ চালাবে। চরের বালিতে পায়চারী করেন তাহের। দূর আকাশে আজ অনেক তারা। নানা ভাবনায় আচ্ছন্ন তাহের। ১১ নম্বর সেক্টরের পক্ষ থেকে

প্রথম বড় একটি অপারেশন শুরু হতে যাচ্ছে। অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ নেই, নেহাতই অল্পবয়স্ক ছেলে সবাই, এদের কেউই প্রায় নিয়মিত বাহিনীর নয়, সামান্য কয়েক দিনের প্রশিক্ষণ সবার। তবু সবার মধ্যে দুর্দম সাহস আর যুদ্ধ করবার আকাঙ্ক্ষা।

ওয়ারেন্ট অফিসার সফিক উল্লাহ তখন ঘুঘুমারির চরে। তাদের দলে আছে বছর তেরোর এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। মূল আক্রমণের জন্য তারা চরের এক সুবিধাজনক জায়গায় রওনা দেবার সময় বয়স কম বলে সেই কিশোরকে রেখে যান পেছনে। সফিক উল্লাহ এবং তার সঙ্গীরা নৌকায় উঠলে রাতের অন্ধকার ভেদ করে নাটকীয়ভাবে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয় সে কিশোর : আমারে নিবেন না ক্যান, আমারে যুদ্ধ করতে দিবেন না ক্যান? দ্যাশ কি আপনার একার?

কিন্তু তাকে ফেলে সফিক উল্লাহ নৌকা এগিয়ে যেতে নিলে কিশোরটি দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রহ্মপুত্রে। সাঁতার কাটতে থাকে নৌকার পাশে পাশে। যুদ্ধে সে যাবেই। কিশোরের প্রবল উদ্দীপনায় পরাজিত হয় সবাই, নৌকায় তুলে নেন তাকে।

ভোর চারটার দিকে সুবেদার মান্নান তার কাছে সরবরাহ করা রকেট লাঞ্চার নিয়ে প্রথম আঘাত করেন ওয়াপদা ভবনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে গাজির চর থেকে আবুল কাশেম চাঁদের দলও মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণ, গ্রেনেড হামলা শুরু করেন পাকবাহিনীর ছাউনিতে, ঘাঁটিগুলোতে। তাহেরও তখন জালিয়ার চর থেকে ছুড়ে দেন দূরপাল্লার কামানের গোলা। সেগুলো গিয়ে পড়ে শত্রু সেনার গানবোটে। কামানের গোলা, মেশিনগান, গ্রেনেড আর ছোট অস্ত্রের আওয়াজে চিলমারীর রাতের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে ভাঙে। ভয় ছিল তাহেরের এই অনভিজ্ঞ তরুণ যোদ্ধাদের কেউ যদি অতি উত্তেজনায় একবার সময়ের আগে অস্ত্র চালিয়ে ফেলে তাহলে পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটে না।

ঠিক যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল অপারেশন এগোয় সেভাবেই। মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত চতুর্মুখী আক্রমণে মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পাকবাহিনী। সকাল ছয়টার মধ্যেই গোরগাছা, রাজভিটা পুলিশ স্টেশন এবং ব্রিজের অবস্থানগুলো থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা সরে যায়। নিহত হয় প্রচুর পাক সৈন্য। মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেন সেসব জায়গা। মূল আক্রমণ হবার পর নির্দেশ মাফিক অন্য দলটি সাফল্যের সঙ্গে মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয় রেল লাইন, ভেঙ্গে দেয় সড়ক। রাস্তা উড়িয়ে দেবার সময় পাক সৈন্য বোঝাই একটি ট্রাককেও উড়িয়ে দেয় তারা। রেল এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে আশে পাশের কোনো পাক ঘাঁটি থেকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা তাদের জন্য হয়ে পড়ে অসম্ভব।

শত্রুদের অনেকগুলো ঘাঁটি দখল হলেও তাদের প্রধান ঘাটি ওয়াপদা ভবনটি মুক্তিযোদ্ধারা তখনও দখল করতে পারে না। ওয়াপদা ভবনের আশপাশে রয়েছে কংক্রিটের বাঙ্কার। বাঙ্কারগুলোতে আশ্রয় নেয় সব পাক সেনারা। শত্রুরা

আত্মসমর্পণ না করাতে এবং পুরোপুরি সব জায়গা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে না আসাতে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। তারা পিছু না হটে যার যার অবস্থান থেকে ঐ ওয়াপদা ভবন এলাকাটিকে আঘাত করতে থাকেন। ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা অন্যান্য এলাকায় পাকবাহিনীদের ফেলে যাওয়া বেশ কিছু অস্ত্রও উদ্ধার করে ফেলে।

গাজির চর থেকে আবুল কাশেম চাঁদ তাহেরকে জানান তার আরও কিছু অস্ত্র দরকার। খবর পেয়েই তাহের তার ছোট স্পিডবোডটি নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে জালিয়ার চর থেকে চলে যান গাজির চরে। পথে স্কোয়াডন লিডার হামিদউল্লার দলটির কাছে জানতে পারেন যে আবুল কাশেম চাঁদকে দেবার মতো বাড়তি কোনো অস্ত্র মজুদ নেই। তাহের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন তার ছোট্ট নিজস্ব ডিফেন্স বাহিনী নিয়ে চিলমারী থানা আক্রমণ করে অস্ত্র সংগ্রহ করবেন। থানার দিকে এগোতে গিয়ে তাহের লক্ষ করে সারারাতের যুদ্ধের তাণ্ডবে গ্রামের মানুষ তখনও দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে ভয়ে। ছুটতে ছুটতে কেউ কেউ চিৎকার করে বলছে জয় বাংলা।

তাহের থানার খুব কাছাকাছি যখন পৌছে গেছেন তখন দেখেন রাস্তার উপর ফেলে যাওয়া গরুর গাড়িতে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। পাকিস্তানি মর্টার শেলের আঘাতে ভেঙ্গে গেছে তার হাত, বুকের স্তন উড়ে গেছে। একটা ছোট বাচ্চা মায়ের রক্ত মাখামাখি করে বসে কাঁদছে শাড়ি ধরে। তাহের দ্রুত মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে যখন পৌছান তখনও গোলাগুলি হচ্ছে প্রচণ্ড। ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি হাসপাতালের দেওয়াল ফুটো করে দিচ্ছে। হাসপাতালের মধ্যে একজন সন্ত্রস্ত ডাক্তারকে পাওয়া যায়। তাহের মেয়েটিকে ঐ ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে আবার এগিয়ে যান থানার দিকে। বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর খুব কাছে সঙ্গের এলএমজিটি স্থাপন করেন। তারপর অতর্কিতে শত্রুর উপর এক নাগাড়ে গুলি শুরু করলে মুহূর্তে প্রচুর পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায় ভয়ে। তাহেরের দখলে চলে আসে থানা। দ্রুত থানার গোলা বারুদ, অস্ত্র তারা নিয়ে নেন নিজেদের দখলে।

ওদিকে আবুল কাশেম চাঁদ কোম্পানির যোদ্ধারা চিলমারীর কুখ্যাত রাজাকার পাছু মিয়াকে ধরে ফেলেন। পাছু মিয়াকে নিয়ে তারা রওনা হন রৌমারীর দিকে। পথে বক পাম্বার চরে পৌছালে এক বিশাল বেদে বহর তাদের রাস্তা আগলে দাঁড়ায়। তারা বলে পাছু মিয়াকে তাদের কাছে সর্পদ্দ করতে হবে।

কেন? জানতে চান চাঁদ।

তারা বলেন : আমরা তারে শাস্তি দিতে চাই।

জানা যায় এই পাছু মিয়াই বেদেদের ঘরের মেয়েদের ধরে নিয়ে দিয়ে এসেছে পাক আর্মিদের ক্যাম্পে। সফিক উল্লাহ বেদেদের বলেন পাছু মিয়াকে নেওয়া হবে সেক্টর কমান্ডারের কাছে এবং সেখানে তার বিচার হবে। কিন্তু বেদেরা

নাছড়বান্দা, ক্ষুদ্ধ। তারা বলেন : আপনারা যাই করেন, আমাদের মনের ঝালটা মিটাইতে দেন।

পরে তাদের কথামতো পাছু মিয়াকে হাত বেঁধে একজায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয় এবং বেদে দলের সবাই সারিবদ্ধভাবে এক এক করে এসে তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়।

পাছু মিয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় রৌমারী। অন্যদিকে সুবেদার মান্নান চিলমারীর আরেক রাজাকার নেতা ওয়ালী আহমদকেও রৌমারীতে নিয়ে আসেন। উপস্থিত জনতা এবং সেক্টর কমান্ডার তাহেরের সামনে পাছু মিয়া আর ওয়ালী আহমদকে হাজির করা হয়। তাহের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন : আপনারাই বলেন এদের কি বিচার হওয়া উচিত?

উপস্থিত জনতা তাদের যাবতীয় অপরাধের বিবরণ দিয়ে বলেন, এদের দুজনের একমাত্র শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড। তাহের তা অনুমোদন করেন। সবার সামনে পাঁছুমিয়া এবং ওয়ালি আহমেদকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনটি সফল হওয়াতে তাহেরের আত্ম বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়।

অপারেশনে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে গিয়ে তার গলফ স্টিক নিয়ে দাঁড়ান তাহের। বলেন : একটা সফল অপারেশন চালানোর জন্য তোমাদের জানাই অভিনন্দন। আমরা চিলমারী বন্দর আক্রমণ করেছিলাম হঠাৎ আঘাত করে যতবেশি সম্ভব শত্রু সেনা শেষ করা, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া এবং অস্ত্র আর গোলাবারুদ দখল করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি মনে করি সবকটি দিক দিয়েই সফল হয়েছে চিলমারীর অপারেশন। আর্মি ট্রেনিংএর সময় অনেক যুদ্ধের ইতিহাস আমাকে পড়তে হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল চিলমারীর এই অপারেশনের সাথে হয়তো তুলনা করা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর ইংলিশ চ্যানেল দখলের ঘটনার। তবে সেখানে ছিল সুশিক্ষিত কয়েক ডিভিশন সৈন্য আর স্পেশাল ফোর্স। আর চিলমারীতে আমরা যুদ্ধ করেছি তোমাদের মতো সপ্তাহ দুয়েকের ট্রেনিং নেওয়া গ্রামের কৃষক আর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রদের নিয়ে। এ আমাদের এক বিরাট অর্জন। এভাবেই এক এক করে আমরা ঘায়েল করব শত্রুসেনার প্রতিটা ঘাঁটি।

দখল করা অস্ত্র তাহের পৌছে দেন সুবেদার আফতাবের কাছে।

চোরা স্রোত

যুদ্ধের গতিপথ একটু একটু করে পাল্টাচ্ছে। প্রাথমিক হতচকিত ভাবটি ইতোমধ্যে কাটিয়ে উঠেছে বাঙালিরা। যেমন চিলমারীতে তেমনি দেশের নানা প্রান্তে তারা রুখে দিচ্ছে পাকবাহিনীকে। বাংলাদেশের পাশে আছে ভারত, সোভিয়েত

ইউনিয়ন। এতে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে পাকিস্তানিদের। সাথে সাথে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে তাদের মদদ দাতা আমেরিকারও। পাকিস্তানকে কিছুতেই দ্বিখণ্ডিত হতে দিতে চায় না তারা। তারা জানে এতে করে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে নেবে এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব। সেটা হবে তাদের ভূ-রাজনীতির চরম পরাজয়। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকা তাদের তৎপরতা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। এ ব্যাপারে নাটাই ঘোড়ান আমেরিকার নাটের গুরু পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্যের গতি বাড়িয়ে দেন তিনি। জাহাজে, বিমানে আমেরিকা থেকে অবিরাম অস্ত্র আসতে থাকে পাকবাহিনীর হতে। পাশাপাশি তিনি শুরু করেন কূটনৈতিক তৎপরতাও। দাবার চাল চালেন তিনি। কৌশল হিসেবে তিনি আঁতাত শুরু করেন সোভিয়েতের শত্রু চীনের সঙ্গে। আর রাজনীতির অংকের হিসেব মতো সোভিয়েত যেহেতু দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের পাশে চীন ইতোমধ্যেই নিয়েছে পাকিস্তানের পক্ষ। আলোচনা করে এই সমঝোতা পোক্ত করবার লক্ষে গোপনে পাকিস্তান হয়ে কিসিঞ্জার চলে যান চীন।

আরও একটি তৎপরতা চালান কিসিঞ্জার। তিনি খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন, ঘরের শত্রু বিভীষণকে, যাকে দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরেও একটা বিভক্তি তৈরি করা যায়। পেয়ে যান একজনকে, খন্দকার মোশতাক, যিনি টুপি এবং আচকান পড়ে থাকেন, যিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি বলে মক্কায় চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিসিঞ্জারের প্রতিনিধিরা কলকাতায় বেশ কয়বার গোপনে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে দেখা করেন। আরও দুজন তখন খন্দকার মোশতাকের সঙ্গী, মাহবুবুল আলম চাষী এবং তাহের উদ্দীন ঠাকুর। লোকে বলে মোশতাকত্রয়ী। মাহবুবুল আলম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন, দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন আমেরিকায় পাকিস্তান দূতাবাসে। তখন থেকেই আমেরিকার রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চট্টগ্রামে পটিয়ায় তার নিজের গ্রামে চলে যান। গ্রাম উন্নয়ন করবেন বলে চাষী পদবি নেন। তাহের উদ্দীন ঠাকুর, কেউ কেউ ঠাট্টা করে যাকে ডাকেন মুসলমান ঠাকুর, তখন তথ্য মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত। কিসিঞ্জারের প্রতিনিধিরা চোরাগোপ্তা এই তিনজনের সঙ্গে আলোচনা করেন যুদ্ধ থামিয়ে দিয়ে কনফেডারেশন জাতীয় কিছু একটা করে অখণ্ড পাকিস্তানের অধীনে একটা রাজনৈতিক সমঝোতা করার সম্ভাবনা নিয়ে।

কলকাতায় প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার মিটিংয়ে এসময় খন্দকার মোশতাক হঠাৎ নতুন একটি ধুঁয়া তোলেন। বলেন আমাদের এখন পাকিস্তানে বন্দি শেখ মুজিবের মুক্তির আন্দোলন করতে হবে। তিনি বলেন, 'হয় স্বাধীনতা নয় মুজিবের মুক্তি কিন্তু দুটো এক সাথে পাওয়া যাবে না।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিউইয়র্কে গিয়ে তিনি এব্যাপারে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। নিউইয়র্কে যাবার জন্য মোশতাকের ব্যগ্রতা, হঠাৎ স্বাধীনতার বদলে মুজিবের মুক্তি নিয়ে উদ্বিগ্নতা এসবের মধ্যে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন দুরভিসন্ধির ইঙ্গিত

পান। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন গোপনে আমেরিকানদের সঙ্গে মোশতাকের মিটিংয়ের খবর। তাজউদ্দীনের আশঙ্কা হয় যে আমেরিকায় গিয়েই মোশতাক হয়তো বলে বসবেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে আপস মীমাংসা করে আমরা আসলে মুজিবের মুক্তি চাই। তাজউদ্দীন মোশতাকের নিউইয়র্ক যাত্রা স্থগিত করে দেন। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন মোশতাক। অচিরেই তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে বদলা নেবেন তিনি।

আমেরিকার এইসব গোপন এবং প্রকাশ্য তৎপরতায় ভারতও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। ওদিকে ভারতে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীর স্রোত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর লক্ষ ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কোটির ঘরে। বাংলাদেশের মাটিতে রাইফেল আর বেয়োনেট উঁচিয়ে যতদিন একটা পাকিস্তানি সৈন্য থাকবে ততদিন কোনো শরণার্থী ফিরে যাবে না সে দেশের মাটিতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।এই বিশাল শরণার্থীর দায়িত্ব নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে ভারতের জন্য। পরিস্থিতি মোকাবেলার নানা উপায়ে নিয়ে এগুতে থাকে তারা। নিজেদের অবস্থা দৃঢ় করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক মৈত্রী চুক্তি করে ভারত। মুক্তিযুদ্ধকে আরও সমন্বিত করতে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে বিভিন্ন দলের সদস্য নিয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গড়তে অনুরোধ করে। কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিংহ, মস্কোপন্থী ন্যাপের মোজাফফর আহমেদ, কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর, ন্যাপের ভাসানী প্রমুখদের নিয়ে গঠন করা হয় 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি'।

পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও তখন জনমত গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে। চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান রণাঙ্গন ঘুরে ঘুরে ছবি তুলে ঐ যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই নির্মাণ করেছেন অসাধারণ ছবি 'স্টপ জেনোসাইড।' সে ছবি সারা বিশ্বে ছড়ায় বাংলাদেশর যুদ্ধের বীভৎসতার কথা, বাঙালিদের প্রতিরোধের কথাও। সে সময়ের দুনিয়া কাঁপানো পপ স্টার জর্জ হ্যারিসন আর সেতার শিল্পীর রবিশংকর আয়োজন করেন 'বাংলাদেশ কনসার্ট'। বিশ্বব্যাপী মানুষ প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশের গণহত্যার। আর দখলদার বাহিনীকে হতোদ্যম এবং যুদ্ধ পরিশ্রান্ত করবার কাজ অবিরাম করে যায় মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধ বাঁক নিতে থাকে।

হি ইজ এ ভলকানো

যে আশঙ্কা আশরাফুন্নেসা করেছিলেন অনেক আগেই ঠিক তাই ঘটে একদিন। একই দিনে পাকিস্তান আর্মি হানা দেয় ঈশ্বরগঞ্জে লুৎফার বাবা, মার বাড়ি আর কাজলায় তাহেরের বাবা, মার বাড়ি। পাকবাহিনীর সঙ্গে কয়জন রাজাকার দোসর।

বাবা খুরসেদুদ্দিনকে লুৎফার ছবি দেখিয়ে তারা বলে : ইয়ে তাসভির কেয়া আপকি লাড়কি কি হ্যায়?

খুরসেদুদ্দিন : হ্যাঁ।

আর্মির এক সিপাই : উও কেয়া মেজর তাহের কা বিবি হ্যায়?

খুরসেদুদ্দিন : হাঁ।

সিপাই : তো বাতাও আপকা লাড়কি কাহা হ্যায়?

খুরসেদুদ্দিন বলেন : আমার সাথে যোগাযোগ নাই। শুনেছি ঢাকায় আছে। কোথায় আছে তাও জানি না।

এক রাজাকার কমান্ডার পাক সিপাইকে অনুবাদ করে দেয় লুৎফার বাবার উত্তরগুলো।

লুৎফার বাবা মা ছোট বোনকে ধরে নিয়ে যায় আর্মি। বন্দি করে রাখে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে।

একইভাবে কাজলায় পাকবাহিনীর একদল সৈন্য ঘিরে ফেলে তাহেরদের বাড়ি। তাদের সঙ্গেও রাজাকার সদস্য, যারা তাহেরের বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে এসেছে। বাড়িতে তাহেরের বাবা মা এবং বড় ভাই আরিফ, তার স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে আছেন।

সৈন্যরা বাড়ি ঘেরাও করে রুক্ষ, ক্ষুব্ধভাবে জানতে চায় : কাহা হ্যায় মেজর তাহের অউর উসকো বিবি ?

তাহেরের মা আশরাফুন্নেসা একটুও বিচলিত হন না। বরং উল্টো সৈন্যদের ওপর ক্ষেপে গিয়ে বাংলা উর্দু মিশিয়ে বলতে থাকেন : আমার ছেলে, ছেলের বউ কাঁহা হ্যায় সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই তারা কোথায়? আমার ছেলে গভর্নমেন্টের নোকরী করে, গভর্নমেন্টের দায়িত্ব আমাকে জানানো তারা কোথায় আছে। আমি তোমাদের বড় অফিসারের কাছে চিঠি লিখব, তার কাছে জানতে চাইবো আমার ছেলে কাহা হ্যায়।

এক পাক সেনা বলেন : আগার নেহি বলিয়েগা তো আপলোগোকে আরেস্ট কারেঙ্গা।

আশরাফুন্নেসা বলেন : করো এরেস্ট, কোনো অসুবিধা নাই।

আর্মি অফিসার তাহেরের বাবা মা, বড় ভাই আরিফ আর তার পরিবারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ময়মনসিংহের সেই একই সার্কিট হাউজে, যেখানে ইতোমধ্যেই বন্দি করে আনা হয়েছে লুৎফার বাবা মাকে। দুই পরিবারকে রাখা হয় সার্কিট হাউজের ভিন্ন দুই তালায়। এক পরিবার জানেন না আরেক পরিবারের খবর। ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে মৃত্যুর প্রহর গোনে নাজুক দুই পরিবার। মৃত্যু তখন নেহাতই তুচ্ছ একটি ব্যাপার।

সে সময় ময়মনসিংহের মার্শাল ল অ্যাডমিনসট্রেটর বেলুচ রেজিমেন্টের জেনারেল কাদের খান। একদিন জেনারেল কাদের খান তাহেরের বড় ভাই আরিফকে ডেকে পাঠান। সন্ত্রস্ত আরিফ ঢোকেন মার্শাল ল অ্যাডমিনিসটেটর ঘরে। আরিফকে অবাক করে দিয়ে কাদের খান বেশ শান্তকণ্ঠে বলেন, বয়ঠিয়ে।

তারপর জেনারেল বলতে থাকেন : মিস্টার আরিফ, তাহের আমার আন্ডারে ট্রেনিং করেছে, তাহেরকে আমি খুব ভালো জানি, সে অত্যন্ত মেধাবী একজন অফিসার। হি ইজ এ ভলকানো, এ হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রফেশনাল। তাহের যে পালিয়ে এসেছে এবং নিজেদের দেশ রক্ষার যুদ্ধে যোগ দিয়েছে এতে আমি বিশেষ অপরাধ দেখি না। তাহের যা করেছে আমিও হয়ত তাই করতাম ওর জায়গায় থাকলে। আপনাকে একটা সত্য কথা বলি, আপনাদের পরিবার এবং তাহেরের শ্বশুরের পরিবার সবাইকে মেরে ফেলার ওর্ডার আছে আমার কাছে। কিন্তু আমি সেটা করছি না। কিন্তু এর বদলে আপনাকে দুটো কাজ করেতে হবে। আপনাকে ইমিডিয়েটলি করাচিতে আপনার কাজের ক্ষেত্রে চলে যেতে হবে আর আপনার বাবা মা এবং তাহেরের শ্বশুর-শাশুড়িকে বলতে হবে যে তারা যেন কোনোভাবেই তাহেরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না রাখে। তা না হলে আমাকে খুবই আনপ্লিজেন্ট একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় দুটি পরিবার। তাহেরের বাবা মাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাজলায়, আর লুৎফার বাবা মাকে ঈশ্বরগঞ্জে। আরিফকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিমানে তুলে পাঠিয়ে দেয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে।

ঘাঁটি কামালপুর

তাহের এসবের কিছুই জানেন না। তিনি তখন তার সেক্টরের সবচাইতে জটিল অপারেশনটির পরিকল্পনায় ব্যস্ত। কামালপুর অপারেশন। জামালপুর জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম কামালপুর। পাশেই ধানুয়া কামালপুর, উঠানিপাড়া, হাসিরগাও, পশ্চিম কামালপুর, পালবাড়ি, ব্রাহ্মণপাড়া, মাঝিরচর আর বালুরগ্রাম। সেখানেই ঘাঁটি করেছে পাক সেনা। ভারত সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের দেড় মাইল ভেতরে সেই ঘাঁটি। থানা সদর বক্সিগঞ্জ থেকে কামালপুরের দূরত্ব চার কিলোমিটারের মতো। সীমান্ত থেকে শেরপুর ময়মনসিংহ সড়কটি এই ঘাঁটির কাছ দিয়েই অতিক্রম করেছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ এই ঘাঁটিটি পাকিস্তানিরা বানিয়েছে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে। বাঙ্কারগুলোর দেওয়াল পর্যায়ক্রমে মাটি, টিন, লোহার বিম, সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে শক্তভাবে তৈরি। প্রতিটি বাঙ্কার দৃঢ় ছাদ দিয়ে ঢাকা। এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে চলাচলের জন্য রয়েছে সুড়ঙ্গ। ক্যাম্পের পেছনের অংশ ছাড়া বাকি তিন দিকে কাঁটা তারের বেড়া। বেড়ার বাইরেই পাতা আছে মাইন।

কামালপুরের বিপরীতে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের মহেন্দ্রগঞ্জ। সেখানেই তাহেরের ১১ নম্বর সেক্টর কমান্ডারের সদর দপ্তর।

মুক্তিযোদ্ধারা বেশ কয়েকবার এই কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করেও ব্যর্থ হয়েছেন দখল করতে। সবচেয়ে বড় আক্রমণটি চালানো হয় জুলাই মাসের শেষের দিকে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে। তাহের তখনও এই সেক্টরের দায়িত্ব নেননি। মেজর জিয়া তেল ঢালা যাওয়ার কিছু আগে এই অপারেশন চালান। তার সঙ্গে ছিলেন মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন হাফিজ আর ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন কৌতূহলোদ্দীপক এক যোদ্ধা। যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে লড়ছিলেন তিনি, মাঝপথে পক্ষ ত্যাগ করে যোগ দেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। ছিলেন অসম সাহসী। কামালপুর যুদ্ধের রেকি করতে গিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন একেবারে পাকিস্তান আর্মির বাঙ্কারের ভেতরে এবং সেখানে গিয়ে রীতিমতো মল্ল যুদ্ধে নেমে পড়েছিলেন দুজন সৈনিকের সঙ্গে। তার সহমুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে পাক সেনা দুজনকে হত্যা করে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

তাহের আসবার আগে জুলাইয়ের ৩১ তারিখ মেজর জিয়ার নেতৃত্ব শুরু হয় কামালপুর আক্রমণের প্রথম প্রচেষ্টা। অনেকগুলো কোম্পানির এক বিশাল মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী যোগ দেয় সে অপারেশনে। কথা ছিল ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের বাহিনীটি সবার সামনে থাকবে এবং তাদের সহযোগিতায় থাকবে অন্য কোম্পানিগুলো এবং সবার পেছন থেকে কাভার দেবে ভারতীয় আর্টিলারি বাহিনী। সেদিন প্রচণ্ড ঝড় বাদল। ভোর রাতে ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে শুরু হয় অপারেশন। কিন্তু কিছু তরুণ মুক্তিযোদ্ধার অনভিজ্ঞতা, অন্ধকার ঝড়ো রাত আর বিভিন্ন কোম্পানি এবং ভারতীয় ডিফেন্সয়ের সঙ্গে যোগাযোগের ভুল বোঝাবুঝির জন্য এক পর্যায়ে অপারেশনটি ভীষণ একটি বিশৃঙ্খলায় পর্যবেশিত হয়। অপারেশন শুরু হবার কিছুক্ষণ পর ভুল করে ভারতীয় কাভারের ডিফেন্স আর্টিলারি গোলাবর্ষণ করলে সেটি গিয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উপরই। বেশ অনেক মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন সবাই। কিন্তু ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং সালাউদ্দিন দৃঢ় মনবল নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন একেবারে শত্রু পক্ষের বেস্টনির মধ্যে চলে যান। সেই ঝড় বাদলের রাতে অন্ধকারের মধ্যে তার হ্যান্ড মাইক দিয়ে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন চিৎকার করে উর্দুতে পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বলতে থাকেন। খুব ভালো উর্দু জানতেন সালাউদ্দিন। চারপাশে তখন চলছে মেশিনগানের তুমুল গুলিবর্ষণ। হঠাৎ একটি গুলি বিদ্ধ করে সালাউদ্দিনকে। মাইক হাতেই অন্ধকারে ঢলে পড়েন সালাউদ্দিন। তার লাশ পাকিস্তানি সেনা বাঙ্কারের এত কাছে পড়ে থাকে যে তার সহযোদ্ধারা সেটি আনতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পাকসেনারা সালাউদ্দিনের লাশ টেনে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পের ভেতরে। নানা

বিশৃঙ্খলায় ব্যর্থ হয় সেই কামালপুর অপারেশন। জেনারেল ওসমানী ক্ষুব্ধ হন জিয়াউর রাহমানের ওপর। তাকে তেলঢালায় সরিয়ে ফেলার এও এক কারণ।

তাহের ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব নেওয়ার পর ঐ কামালপুর হয়ে দাঁড়ায় তার অন্যতম টার্গেট। ইতোমধ্যে চিলমারী অপারেশনের সাফল্য আত্মবিশ্বাস দিয়েছে তাকে। ছোটখাটো অন্যান্য অপারেশন চালিয়ে গেলেও তাহেরের মাথায় তখন কামালপুর। কামালপুর ঘাঁটিকে দখল করবার নানা পরিকল্পনা করতে থাকেন তিনি। কামালপুরের আগের অপারেশনগুলো পর্যলোচনা করে তাহের দেখেন যখনই কামালপুর ঘাঁটি আক্রমণ করা হয় এবং কামালপুর কিছুটা দুর্বল অবস্থায় পড়ে তখনই কাছের বক্সিগঞ্জ থানা থেকে ১২০ মিলিমিটার মার্টারের গোলাবর্ষণ হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা পাক বাঙ্কারের খুব কাছে চলে গেলেও ঘাঁটিটি দখল করতে পারেননি কারণ সেই মর্টারের শেলগুলো এসে পড়েছে তাদের উপরে। ওদিকে বাঙ্কারগুলো অত্যন্ত মজবুতভাবে ঢাকা থাকার কারণে পাকিস্তানিরা থাকে নিরাপদ।

তাহের বুঝতে পারেন যে, পাকিস্তানিদের শক্তিশালি ঘাঁটি আক্রমণ করে বিশেষ সুবিধা হবে না বরং শত্রুকে কৌশলে প্রলুব্ধ করে তার ঘাঁটি থেকে বের করে আনতে হবে নির্ধারিত স্থানে এবং তারপর নিঃশেস করতে হবে তাদের। কামালপুর শত্রু ঘাঁটি থেকে ৫০০ গজ পশ্চিমে ধানুয়া কামালপুর গ্রাম, দক্ষিণ পশ্চিমে এবং দক্ষিণে হাসির গ্রাম এবং উঠানের পাড়া। ধানুয়া কামালপুর, হাসির গ্রাম আর উঠানের পাড়া এই গ্রামের সারি এবং কামালপুরের মাঝে বিস্তৃর্ণ এক খোলা জলা মাঠ। তাহের ভাবেন কোনোভাবে শত্রুকে এই জলা মাঠে বের করে আনতে পারলে উদ্দেশ্য সফল হবে। এই জলামাঠই হবে তাদের মরণ ফাঁদ। সেই পরিকল্পনাতেই তাহের ধানুয়া কামালপুর আর হাসির গ্রামে তৈরি করেন নকল ট্রেঞ্চ। যেহেতু কামালপুর আক্রান্ত হলে বক্সিগঞ্জ থেকে পাকিস্তানি সেনারা কামালপুরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সে কারণে কামালপুর বক্সিগঞ্জের রাস্তাটিতে এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন বসানোর ব্যবস্থা করা হয়।

তার নিজের সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা, অফিসার, আশপাশের গ্রামবাসী আর পাশাপাশি জিয়াউর রহমানের ব্রিগেড থেকে একটি কোম্পানি মহেন্দ্রগঞ্জে নিয়ে এসে আগস্ট মাসের শুরুর দিকে তাহের এক আক্রমণ চালান কামালপুরে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাইনের আঘতে পাকিস্তানি সেনাবহনকারী গাড়ি এবং তাদের কিছু সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই কামালপুর এবং বক্সিগঞ্জ দুই জায়গা থেকেই পাক সেনাদের অত্যন্ত শক্তিশালী আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। পিছু হঠতে বাধ্য হন তাহের এবং তার দল। তাহেরের নেতৃত্বে কামালপুর দখলের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

একরকম জেদ চেপে যায় তাহেরের। দখল করতেই হবে কামালপুরকে। তাহের চূড়ান্তভাবে কামালপুর ঘাঁটিকে ধ্বংস করার মানসিকতা নিয়ে ব্যাপক

পরিকল্পনা করতে থাকেন। তার সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানি গুলোকে প্রস্তুত করেন তিনি, বিশেষভাবে প্রস্তুত করেন শুধু কৃষকদের নিয়ে তৈরি কোম্পানিটিকে। সিদ্ধান্ত নেন এবার ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকেও ব্যাপক সহযোগিতা নেবেন। ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারের সঙ্গে এনিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন তিনি। সিদ্ধান্ত হয় যে ভারতীয় গুর্খা রেজিমেন্ট, মারাঠা রেজিমেন্ট এবং গার্ড রেজিমেন্ট এই তিন রেজিমেন্ট থেকে সহযোগিতা দেওয়া হবে তাহেরকে। তাহের থাকবেন কামালপুর অপারেশনের মূল দায়িত্বে আর ভারতীয়রা থাকবে তার কাভারে। অপারেশনের দিন ঠিক করা হয় ১৪ নভেম্বর। ঐদিন তাহেরের জন্ম দিন। সহযোদ্ধারা শপথ করেন তাহেরের জন্মদিন তারা উদ্‌যাপন করবেন কামালপুরে।

চূড়ান্ত আক্রমণের সব রকম প্রস্তুতি চলে। কয়েকবার রেকি অ্যাটাক, মক অ্যাটাক করা হয়। তাহের আবারও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'কামালপুর ইজ দি গেটওয়ে টু ঢাকা।' সিদ্ধান্ত হয় কামালপুর পতনের পর মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যাবে ঢাকার দিকে। আর তাহের ভারতীয় সৈন্যের প্যারাসুট ট্রুপার দলের সঙ্গে প্যারাসুট ড্রপিং করবেন টাঙ্গাইলে। সেখানে মিলিত হবেন কাদের সিদ্দিকীর কাদের বাহিনীর সঙ্গে। ইতোমধ্যে কামালপুর দখল করা ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা এসে মিলিত হবে তাহের এবং কাদের বাহিনী সঙ্গে। তারপর ১১ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা, কাদের বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে এগিয়ে যাবে ঢাকার দিকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ২৫টা কোম্পানি, ভারতীয়দের তিনটা রেজিমেন্ট নিয়ে টোটাল ওফেন্সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তাহের।

ওদিকে তুরার পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট ঘরটিতে শিশু জয়া আর ননদ জুলিয়াকে নিয়ে দিন কাটান লুৎফা। জুলিয়াসহ তাহেরের বাকি ভাইরা সব যুদ্ধক্ষেত্রে। বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নয়নাভিরাম ঝরনা দেখেন লুৎফা, দেখেন ঝরনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া গৌহাটির রাস্তার দূরপাল্লার বাস, ট্রাক। পথ চেয়ে থাকেন তাহেরের জীপটিকে দেখবার আশায়। মাঝে মাঝে তার ভাই সাব্বির, দেবর সাঈদ রাইফেল কাঁধে এসে দল বেঁধে লুৎফার ঘরে খাওয়া দাওয়া করে যান। লুৎফা তুরায় বসেই নিয়মিত খবর পান যুদ্ধের। খবর পান কটা বাঙ্কার দখল হচ্ছে, কজন ছেলে মারা যাচ্ছে। তাহের আর ঘন ঘন আসতে পারেন না তখন। বেড়ে গেছে অপারেশনের মাত্রা।

মাঝে মাঝে তাহের এলে লুৎফা মহেন্দ্রগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যেতে চান। তাহের প্রতিশ্রুতি দেন নিয়ে যাবেন অচিরেই। নভেম্বরের বারো তারিখ তাহের এসে উপস্থিত। লুৎফাকে বলেন : আগামী ১৪ নভেম্বর, আমার জন্মদিনে চূড়ান্ত ভাবে আক্রমণ করব কামালপুরকে। ঐ মুক্ত কামালপুরে তোমাকে নিয়ে যাবো, কামালপুর ঘাঁটিতে তুমি বাংলাদেশের পতাকা উড়াবে।

জয়াকে কোলে নিয়ে আদর করেন তাহের, লুৎফার সঙ্গে বসে ভাত খান। যাবার সময় বলেন, ১৪ তারিখ তোমার জন্য জীপ আসবে, রেডি থেকো, আর

এই দেখ লন্ডনে তুমি আমাকে যে আংটিটা কিনে দিয়েছিলে, ওটা পরে নিয়েছি। ওটা আমার গুড লাক সাইন। কামালপুর এবার দখল হবেই।

মুক্ত কামালপুরে তাহেরকে জন্মদিনের উপহার দেবে বলে লুৎফা কাছের বাজার থেকে কেনেন একটি ফুলতোলা রুমাল। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কেনেন অনেকগুলো চকলেট।

শীত পড়েছে চারদিকে। ১৪ নভেম্বরের কুয়াশার রাতে শুরু হবে আক্রমণ।

পায়ের চিহ্ন

কামালপুরের পাকিস্তানি ঘাঁটির সীমান্ত বরাবর বান রোড। এই বান রোডই বিভক্ত করেছে পাকবাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধাদের। বান রোডের খানিকটা পেছনেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম বাঙ্কার। সেখানে সামনের দিকে লে. মান্নান আর সেকেন্ড লে. মিজান আছেন তাদের কোম্পানি নিয়ে। তারাই মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রবর্তী বাহিনী। তার পেছনেই আরেক সারি বাঙ্কার। সেখানে মিডিয়াম গান নিয়ে আরেক দল মুক্তিযোদ্ধা। তাদের আরও পেছনে আছেন হেভি গান নিয়ে আরেক দল মুক্তিযোদ্ধা। কামালপুরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। আর একদম পেছনে সেক্টর কমান্ডার তাহেরের বাঙ্কার। সেক্টর কমান্ডার তাহেরের পাশের বাঙ্কারে ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার। ক্লেয়ার তাহেরকে সহায়তা দানকারী ভারতীয় বাহিনীর প্রধান। সেক্টর কমান্ডারের কমান্ড পোস্টটি একটি আম বাগানের মধ্যে। সবার পেছনে অপেক্ষা করছে ভারতীয় আর্টিলারি বাহিনীর কভারিংয়ের ট্রুপগুলো।

ভোর রাতে শুরু হবে অপারেশন। আগে আগে রাতের খাওয়া খেয়ে নিয়েছেন সবাই। মুক্তিযোদ্ধারা পরাটায় চিনি দিয়ে রোল বানিয়ে গুঁজে নিয়েছেন লুঙ্গিতে কিংবা প্যান্টের পকেটে। ঠিক করেছেন সকালে এই দিয়েই কামালপুরে নাস্তা করবেন তারা। সেদিনের অপারেশনে যোদ্ধা হিসেবে উপস্থিত তাহেরের প্রায় পুরো পরিবার। বেলাল এবং বাহার, বিশেষ করে বাহার সবসময় সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ পজিশনগুলোতে থাকতে আগ্রহী। তারা দুই ভাই, তাদের স্কাউট টিম নিয়ে আছেন তাহেরের বাঙ্কারে তার পারসোনাল সিকিউরিটির দায়িত্বে। তাহেরের অন্য ভাই সাঈদ তার কোম্পানি নিয়ে প্রস্তুত আছেন মিডিয়াম রেঞ্জে। বড় ভাই আবু ইউসুফ আছেন তার পেছনে। সেদিন এক বিপত্তি ঘটে আনোয়ারের। সকালের দিকে হঠাৎ ভেঙ্গে যায় তার চশমা। চোখে ভালো দেখতে পারছিলেন না তিনি। ফলে তাহের আনোয়ারকে সরাসরি অপারেশনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেননি। আনোয়ার এবং বোন ডালিয়া দুজনেই সেক্টর কমান্ডার তাহেরের বাঙ্কারের কাছাকাছি, যুদ্ধক্ষেত্রের খানিকটা বাইরে দুটো ফ্লাস্কে পানি আর চা নিয়ে বসে আছে। তাদের হাতে ওয়াকিটকি। প্রয়োজনমতো সেক্টর কামন্ডারকে চা, পানি সরবারহ করা তাদের দায়িত্ব।

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এমএমজি, এলএমজি, সেলফ লোডিং রাইফেল। কারো কাছে টু ইঞ্চি মর্টার। সবাই পজিশন নিয়েছেন। তাহের প্রতিটি কোম্পানি কামান্ডার আর ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে ওয়াকিটকিতে কথা বলে নেন। তাদের অবস্থান, প্রস্তুতি সব নিশ্চিত হয়ে নেন। সেদিনকার অপারেশনে তাহেরের কোড থাকে কর্তা। সেদিন সবাই তাকে সম্বোধন করেন কর্তা বলে। শীতের গভীর রাতের অন্ধকারে মিশে ছায়ার মতো বসে আছেন মরণকামড় দিতে প্রস্তুত দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধার দল। তাদের নেতা তাহের, সেদিনের কর্তা।

রাত দেড়টার দিকে তাহের ফায়ারের অর্ডার দেন। একসাথে ওপেন হয় ফায়ার। পেছন থেকে চলতে থাকে অবিরাম শেল ড্রপিং। ১৯টা ফিল্ড গান একসাথে কাজ করে। একই সাথে কাজ করে এমএমজি, হেভি মেশিনগান। তিনটা রেঞ্জ থেকে একই সঙ্গে চলে তুমুল ফায়ার। বিকট শব্দে আর আগুনের হলকায় ছেয়ে যায় কামালপুর, ধানুয়া কামালপুর, উঠানিপাড়া, হাসিরগাঁওয়ের রাতের আকাশ, বাতাস। ওয়াকিটকিতে কেবল শোনা যাচ্ছে কোম্পানি কামান্ডারদের একের পর এক চিৎকার ফায়ার ... ফায়ার। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা বলে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

একেবারে সামনে বাঙ্কারের যোদ্ধারা ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বান রোড পার হয়ে সামনে এগুতে থাকেন। ওয়াকিটকিতে সে খবর তারা জানান সেক্টর কমান্ডার কর্তাকে। সেকেন্ড লে. মিজানের কোম্পানিটি সবার সামনে। তারা এগুতে এগুতে পাকবাহিনীর প্রথম বাঙ্কারটির খুব কাছে চলে আসেন। মিজান ওয়াকিটকিতে তাহেরকে জানান, কর্তা, আমরা ওদের একটা বাঙ্কারের খুব কাছাকাছি চলে গেছি।

ইতোমধ্যে বাঙ্কার থেকে বেরুনোর পরপরই নিহত হয়েছেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। মিজানের পেছনে পেছনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাঙ্কারের কোম্পানি গুলোও এগিয়ে যেতে থাকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে। প্রবল এবং আচমকা গুলিবর্ষণে হতবিহ্বল পাকিস্তান ঘাঁটির সেনারা। মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পান যে পাক সেনারা কেউ কেউ বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আশপাশের আখক্ষেতে ঢুকে যাচ্ছে। মিজান ওয়াকিটকিতে জানান যে, পাকিস্তানিরা এখন প্রথম বাঙ্কার ছেড়ে চলে গেছে পেছনের বাঙ্কারে। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে দূর গ্রামের মানুষেরা সব ঘুম থেকে জেগে বসে আছেন।

গাঢ় অন্ধকারে আশপাশে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না বলে তাহের নির্দেশ দেন রেড ফায়ারের। রেড ফায়ার করা করা হলে চকিতে উজ্জ্বল আলোয় ভরে ওঠে চারদিক। খানিকটা সময়ের জন্য আশপাশের সবকিছু হয়ে ওঠে স্পষ্ট। দেখা যায় অনেক পাকিস্তানি সেনাই বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আশপাশের ক্ষেতগুলোতে লুকাবার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে ওদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙ্গে

পড়েছে। ওয়াকিটকিতে ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারের সাথে উৎফুল্ল কণ্ঠে কথা বলেন : তাহের : ভেরি শর্টলি উই আর গোয়িং টু ক্যাপচার দি পাক ক্যাম্প।

গোলাবর্ষণ চলছে অবিরাম। এ অপারেশনে আছেন সাংবাদিক হারুন হাবীবও। পজিশন নিয়েছেন বেশ কিছুটা পেছনে। তার হাতে স্টেনগান এবং সঙ্গে একটি টেপ রেকর্ডারও। বিভিন্ন রণাঙ্গনে ঘুরেছেন তিনি কিন্তু তার মনে হয় এমন প্রবল গোলাবৃষ্টি তিনি গত কয়েক মাসে দেখেননি। দুপক্ষের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণকে ছাপিয়ে এক পর্যয়ে উড়ে আসতে থাকে ভারী কামানের গোলা। প্রচণ্ড শব্দে একটার পর একটা গোলা ফাটতে থাকে তাদের ট্রেঞ্চের আশপাশে। হঠাৎ হারুন হাবীবের মনে হয় এই ধ্বংস আর মৃত্যুর আবহ তৈরি করা শব্দরাজির রেকর্ড করে রাখা যাক। টেপরেকর্ডারটি অন করে মাটিতে রেখে দেন তিনি। রেকর্ড হতে থাকে এক ঐতিহাসিক রণাঙ্গনের শব্দরাজি।

যুদ্ধে, যুদ্ধে রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে আসে।

সেকেন্ড লে. মিজান ওয়াকিটকিতে বলেন : কর্তা, আমরা পাক বাঙ্কারের একেবারে কাছে চলে এসেছি। একটু পরেই এখন আমরা বাঙ্কারে সরাসরি চার্জ করতে যাচ্ছি।

এইটুকু বলার পর অনেকক্ষণ মিজানের আর কোনো কথা শোনা যায় না। উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তাহের। ওয়াকিটকিতে বারবার চিৎকার করে : মিজান তুমি কোথায় ... কোথায় তুমি?

কিন্তু মিজানের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তাহের খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে মিজানের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে তাহের বলেন : লেটস্ মুভ। আই মাস্ট গো ক্লোজার।

পেছনের কমান্ডিং বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন তাহের। ভারী মর্টার আর শেল চারদিকে। ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ওয়াকিটকিতে চেঁচিয়ে বলেন : হোয়াট আর ইউ ডুয়িং কর্তা? ইউ ক্যান্ট মুভ ফ্রম ইয়োর প্লেস।

তাহের বলেন : আই মাস্ট ফাইন্ড লে. মিজান, মাই ফ্রন্ট লাইন ফাইটার।

তাহের কমান্ড পোস্ট ছেড়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। তার পারসোনাল সিকিউরিটিতে থাকা দুই ভাই বেলাল আর বাহারের স্কাউট টিমটিও এগিয়ে চলে সামনে। মিড রেঞ্জ বরাবর আসেন তাহের। সেখানে ভাই সাঈদ অবস্থান করছেন তার কোম্পানি নিয়ে। সাঈদ বলেন : আপনি আর সামনে যাইয়েন না। মিজান আগেও এরকম কয়েকবার কমিউনিকেশন মিস করছে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু তাহের কথা শোনেন না, এগিয়ে যেতে থাকেন ফ্রন্ট লাইনের দিকে। তিনি প্রথম সারির বাঙ্কারগুলো অতিক্রম করে যান, অতিক্রম করেন বানরোড। একটু এগিয়েই পেয়ে যান মিজানকে। তাহের বলেন : তুমি তো চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে।

ওয়াকিটকির যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন মিজান। তাহের বেলাল বাহারকে বলেন তাদের কোম্পানি নিয়ে সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে যেতে। দিগন্তে ভোরের আলো ফুটছে। তাহেরের হাতে কোনো আর্মস নেই। তার হাতে সর্বক্ষণিক সঙ্গী সেই গলফ স্টিক। তার আশে পাশে তার পারসোনাল সিকিউরিটির যোদ্ধাদের কারো কাছ থেকে প্রয়োজনে অস্ত্র নেবেন তাহের ব্যবস্থা তেমনই।

তাহের যখন এগোচ্ছেন পাশের আখক্ষেত থেকে এবং পেছনের বাঙ্কারগুলো থেকে তুমুল গুলিবর্ষণ হচ্ছে তখন। শত্রু সীমানার ভেতর ঢুকে গেছেন তাহের। একটা প্রবল উত্তেজনা তাকে ভর করে। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে তাহের হঠাৎ তার হাতের গল্ফ স্টিকটি ফেলে দিয়ে পাশে অবস্থান নেওয়া বেলালের কোম্পনির একজন যোদ্ধার কাছ থেকে চাইনিজ এসএমজিটি হাতে তুলে নিয়ে ফায়ার করতে শুরু করেন। বেলাল, বাহারকেও বলেন, তিনি যে রেঞ্জে ফায়ার করছেন ঠিক সে একই রেঞ্জে তারাও যেন ফায়ার করতে থাকে। বেড়ে যায় গোলাগুলির তীব্রতা। তাহেরকে এগিয়ে আসতে দেখে পেছন পেছন ভারতের মেজর এস আর সিংও একটা জীপে রিকুয়ারলেস রাইফেল নিয়ে এগিয়ে এসে খানিকটা দূরে অপেক্ষা করতে থাকেন। তাহের ইশারায় বেলালকে বলেন : এস আর সিংকে গিয়ে বলো আরও একটু সামনে এগিয়ে আসতে একটু পরেই আমি পাকিস্তানি বাঙ্কারে হিট করব আর এজন্য আমার রিকুয়ারলেস রাইফেল দরকার।

তাহের জানেন পাকিস্তানি বাঙ্কারের যে কংক্রিট সেগুলো শুধু রিকুয়ারলেস রাইফেল দিয়ে আঘাত করলেই ভেদ করা সম্ভব। এগিয়ে আসেন মেজর সিং। তাহের তার কাছে থেকে রিকুয়ারলেস রাইফেল হাতে নিয়ে এগিয়ে যান এবং সরাসরি বাঙ্কারে গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। পেছনের কমান্ডিং পজিশন ছেড়ে সেক্টর কমান্ডার তখন যুদ্ধের মধ্যবিন্দুতে। বেলাল, বাহার খানিকটা পেছনে একটা আম গাছের আড়ালে। তারা দেখতে পান পাকিস্তানিরা সামনের বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে পেছনের বাঙ্কারে। অনেকে ঢুকে যাচ্ছে পাশের আখক্ষেতে। বোঝা যাচ্ছে নিশ্চিতভাবে পিছু হটছে তারা। বেলাল, বাহার এবং তাহের এগোতে এগোতে পাকিস্তানি বাহিনীদের প্রথম বাঙ্কারটি দখল করে ফেলেন। উত্তেজিত বাহার ওয়াকিটকিতে সবাইকে জানিয়ে দেন তাদের প্রথম বাঙ্কার দখলের খবর। পাকিস্তান বাহিনীরা রিইনফোর্সমেন্টের জন্য ওদিকে বক্সিগঞ্জ থেকে সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তাদের ঠেকিয়ে দেয় বক্সিবাজার সড়কে পজিশান নিয়ে থাকা মারাঠা রেজিমেন্টের অ্যামবুশ। যোগাযোগের পথ ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে কামালপুর বক্সিবাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে সেখান থেকে সাহায্য পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায় পাকিস্তানিদের।

সকাল প্রায় সাতটা তখন। কামালপুরের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেছে মুক্তিবাহিনী। তারা এগোচ্ছেন প্রচুর পাকবাহিনী এমনকি মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ

ডিঙিয়ে। ভয়াবহ গোলাগুলির মধ্যে পড়ে একই সাথে পাকবাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধা উভয়ই নিহত হচ্ছে একের পর এক। দখল করে নেওয়া বাঙ্কারের সামনে উঁচু একটা ঢিবির মতো জায়গা দেখা যায়। ঢিপিটা বানানো হয়েছে বাঙ্কারের প্রতিরক্ষার জন্য। সেই উঁচু জায়গায় গিয়ে বসেন তাহের। উত্তেজনা, আত্মবিশ্বাস তার মধ্যে। আবার তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন তার সেই গলাফ স্টিক। এক মুক্তিযোদ্ধা হঠাৎ দৌড়ে এসে পাকিস্তানিদের বাঙ্কার থেকে দখল করা একটি মেশিনগানের গুলির চেইন মালার মতো করে পরিয়ে দেয় তাহেরকে, বলে—শুভ জন্মদিন কর্তা।

সেদিন ১৪ই নভেম্বরের ভোর। তাহের মুচকি হেসে বলেন : জলদি পজিশনে ফিরে যাও।

পাকিস্তানিরা পাশের আখ ক্ষেতে লুকিয়ে অবিরাম ফায়ার করছে। তাহের উঁচু ঢিবিতে বসে তার গলফ স্টিক দিয়ে মিজান, বেলাল, বাহারের কোম্পানিকে নির্দেশনা দেন কোনো কোনো দিকে ফায়ার করতে হবে। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি জায়গায় তখন বসে আছেন তাহের। সামনে আরও ৭/৮ টি বাঙ্কার। সে বাঙ্কার গুলোও অচিরেই দখল করার পরিকল্পনায় দ্রুত পদক্ষেপ নিতে থাকেন তাহের।

চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে পেছনে আছেন আনোয়ার আর ডালিয়া। ওয়াকিটকিতে তারা শুনছেন একের পর এক বাঙ্কার দখলের খবর। উত্তেজনায় কাঁপেন তারা। হঠাৎ বিকট একটা আওয়াজ শুনতে পান আনোয়ার, ডালিয়া। আনোয়ারের মনে হয় হয়তো কোনো শেল ড্রপ হয়েছে কিংবা বার্স্ট হয়েছে এন্টিপারসোনাল মাইন। চায়ের ফ্লাস্ক ফেলে দুজনই দৌড় দেন সামনের দিকে।

উঁচু ঢিপিতে বসে থাকা তাহের নামতে উদ্যত হবার মুহূর্তেই সেখানে বস্তুত একটি শেল ড্রপ হয়। তাহেরের সবচেয়ে কাছে ছিলেন বেলাল আর বাহার। তারা তখন তার পারসোনাল সিকিউরিটির দায়িত্বে। তারা হঠাৎ দেখেন উঁচু ঢিপি থেকে ঢলে পড়ছেন তাহের। ওয়াকিটকিতে ধরা পড়ে পাশের আখক্ষেতে পাকিস্তানি সেনারা উল্লাস করে বলছে 'ইয়া আলি'। কমান্ডার ধরনের কাউকে ঘায়েল করা গেছে বুঝতে পেরেছে তারা, তাতেই তাদের উল্লাস।

তাহেরকে ঢলে পড়তে দেখে দৌড়ে ছুটে যান বেলাল। ভালোমতো লক্ষ করে দেখতে পান তাহেরের একটা পা থেতলে দুভাগ হয়ে ঝুলছে। মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন তিনি। উত্তেজনায় ওয়াকিটকিতে হঠাৎ বলে বসেন : কর্তা মারা গেছেন, কামান্ডার হেজ বিন কিলড।

একথা ওয়াকিটকিতে প্রচার হওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে সব ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। ধুন্ধুমার রণাঙ্গনের মধ্যে সহসা নেমে আসে গাঢ় নিস্তব্ধতা। সবাই হতভম্ব, স্তম্ভিত। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না কেউ।

কয়েক মুহূর্ত এভাবে কাটবার পর বাহার তার এলএমজি থেকে আখক্ষেত লক্ষ করে আবার শুরু করেন ফায়ার। বেলালকে বলেন, তাড়াতাড়ি কর্তাকে

পেছনে নিয়ে যাও। ইতোমধ্যে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা রাইফেল ফেলে দৌড়ে গিয়ে পাশের একটি বাড়ির বাঁশের তৈরি বেড়ার দরজা খুলে নিয়ে আসেন। বেড়াটিকে স্টেচার বানিয়ে তার উপর তাহেরকে শুইয়ে দৌড়ে তাকে নিয়ে যেতে থাকেন ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে। তাহেরের পা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে প্রচণ্ড। একজন মুক্তিযোদ্ধা তার শার্ট খুলে দুভাগ হয়ে যাওয়া তাহেরের পাটিকে বেঁধে দেন।

বেশ খানিকটা দুরে তাদের হেডকোয়ার্টার। বেলাল ঐ বেড়ার স্ট্রেচারের এক প্রান্ত ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবে, যে কোনো সময় হয়তো ভেঙ্গে পড়তে পারে বেড়াটি। হঠাৎ তার মনে হয় এস আর সিং এর জীপটির কথা। অনেকটা পেছনে আছেন সিং। আরেক সহযোদ্ধার হাতে স্টেচারটি দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তিনি ছুটে যান জীপটির কাছে। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। ওদিকে পেছনে আখক্ষেত লক্ষ করে ফায়ার করে চলেছেন বাহার।

ওয়াকিটকিতে শুনে পেছন থেকে ছুটে এসেছেন আনোয়ার আর ডলি। বেড়ার স্ট্রেচারে বহন করে নেওয়া তাহেরের পাশে পাশে দৌড়াতে থাকেন তারা। আতংকে তাকিয়ে থাকেন ছিন্ন ভিন্ন বাম পাটির দিকে। পা পেঁচিয়ে রাখা শার্টটি ভিজে রক্ত চুইয়ে পড়ছে মাটিতে। স্ট্রেচার বহন করা প্রতিটি যোদ্ধার চোখে পানি। আনোয়ারকে দেখে পানি খেতে চান তাহের। আনোয়ার তার কাঁধে রাখা ব্যাগ থেকে বোতল বের করে তার মুখের সামনে ধরলে তাহের বোতলটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেন : আমার হাত দুটা তো এখনও ঠিক আছে।

ওয়াকিটকিতে খবর পেয়ে টেপরেকর্ডার বন্ধ করে ছুটে আসে সাংবাদিক হারুন হাবীব। তিনিও হাত লাগান স্টেচারে। জ্ঞান হারাননি তাহের, রক্তে মাটি ভিজে যাচ্ছে। ঐ অবস্থায় মুখটা ঘুরিয়ে সামান্য হেসে হারুন হাবীবকে বলেন : জার্নালিস্ট আমি বলিনি ওরা কখনো আমার মাথায় আঘাত করতে পারবে না। এই দেখো পায়ে লাগিয়েছে। মাই হেড ইজ স্টিল হাই, গো ফাইট দি এনিমি, ওকুপাই কামালপুর বিওপি।

ইতোমধ্যে বেলাল এস আর সিং এর জীপটি নিয়ে আসেন। দ্রুত জীপে উঠানো হয় তাহেরকে। জীপে উঠেই তাহের বেলালকে বলেন, ওয়াকিটকিটা আমার মুখের সামনে ধরো। বেলাল ওয়াকিটকিটা মুখের সামনে ধরলে রক্তাক্ত, শায়িত তাহের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে বলতে থাকেন—আমার কিছুই হয়নি, তোমরা ফ্রন্টে ফিরে যাও, যুদ্ধ চালিয়ে যাও ... কামালপুর মুক্ত করতে হবে মনে রেখো। আমি মরব না, খুব দ্রুত চলে আসছি তোমাদের কাছে। পাকিস্তানিদেরকে তোমাদের হারাতেই হবে। আমি যেন ফিরে এসে দেখি কামালপুর দখল হয়েছে আর ঢাকার রাস্তা পরিষ্কার।

ওয়াকিটকি রেখে আনোয়ারকে বলেন : তাড়াতাড়ি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করো।

ইত্যোমধ্যে আরও ভারতীয় অফিসাররা ছুটে আসেন। ছুটে আসেন সেদিনের অপারেশনের মেডিকেল টিমের প্রধান ডা. দীপঙ্কর রায়। জীপে উঠেই তিনি দ্রুত তাহেরের ফাস্ট এইড এর ব্যবস্থা করেন। সর্বোচ্চ তৎপরতায় দ্রুততম সময়ে ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হেলিকপ্টার আসবে তুরায়। কামালপুর থেকে তুরায় যেতে হবে আগে, দূরত্ব প্রায় ১৮ মাইল। জীপ ছুটে চলে তুরার দিকে। পাহাড়ি পথ, তাহেরের রক্তক্ষরণ হচ্ছে প্রচণ্ড। কিন্তু শক্ত মনোবল তাহেরের। জীপের ভেতরে অনবরত কথা বলে চলেন তিনি।

ওদিকে তাহেরের আহত হওয়ার সংবাদে কামালপুর যুদ্ধক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যায়। কমান্ডার নেই যুদ্ধক্ষেত্রে, মনোবল হারিয়ে ফেলেন সবাই। অনেকেই অস্ত্র ফেলে পিছু হঠতে থাকেন। পাকবাহিনীর এলোপাতাড়ি গুলিতে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা মারা যান এর মধ্যে। কিছু মুক্তিযোদ্ধা তখনও ফায়ার চালিয়ে যান। নেতৃত্বের অভাবে পুরো অপারেশনটিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কয়েকজন ভারতীয় অফিসার এসে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধ ততক্ষণে চলে গেছে পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে। পাক সেনার গুলিতে নিহত হন তিন জন ভারতীয় অফিসার। তার পরেও মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষে ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার এসে বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা হয়তো আরও কিছুক্ষণ ফাইট দিতে পারবে কিন্তু সেক্টর কমান্ডারের অনুপস্থিতিতে এই অপারেশন চালিয়ে যাওয়া হবে বোকামি।

একটা নিশ্চিত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হয় কামালপুর থেকে।

প্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা

লুৎফা তখনও চকলেট আর রুমাল নিয়ে অপেক্ষা করছেন তুরায়। অপেক্ষা করছেন কখন জীপ আসবে তাকে নিতে, তিনি যাবেন কামালপুরে পতাকা উড়াতে। আর সবাই মিলে হৈ চৈ করে পালন করবেন তাহেরের জন্মদিন। কিন্তু সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়ে যায় তবুও কোনো খবর আসে না। সারাদিন কিছু মুখে দেননি তিনি। জুলিয়াকে নিয়ে খেতে বসেন। খাওয়া শেষ করে উঠতেই দেখেন তার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন ভারতীয় বি এস এফ তুরার অধিনায়ক কর্নেল রঙ্গলাল এবং ক্যাপ্টেন মুরালি। আগেও মাঝে সাঝে এসে দেখা করেছেন তারা কিন্তু এই অসময় তাদেরকে দেখে খানিকটা অবাক হন লুৎফা। কর্নেল রঙ্গলাল এসে বিছানায় বসেন এবং লুৎফাকেও বসতে বলেন।

রঙ্গলাল বলেন : আপনি তো জানেন যে যুদ্ধের সময় কত কিছু হয়, মানুষ আহত হয়, মানুষ মারা যায়। যুদ্ধ ব্যাপারটাই এরকম।

লুৎফা বলেন : আমার হ্যাজবেন্ড আর্মি অফিসার আমি জানি যুদ্ধে কি হয়, আমাকে বলেন কি হয়েছে।

লুৎফা একটা দুঃসংবাদ শুনবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। ক্যাপ্টেন মুরালি বলেন : মেজর তাহেরের পায়ে একটা গুলি লেগেছে, তেমন কিছু না।

লুৎফা আরও ভয়ংকর কোনো সংবাদ শুনবেন ভেবেছিলেন। মৃত্যু তখন প্রতিদিনের আটপৌরে ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করেন : কোথায় এখন তাহের?

ক্যাপ্টেন মুরালি বলেন : তাকে জীপে করে কামালপুর থেকে আনা হচ্ছে, এখান থেকে হেলিকপ্টারে নিয়ে যাওয়া হবে গৌহাটিতে।

কিছুক্ষণ পর আকাশ কাঁপিয়ে একটা হেলিকপ্টার নামে। তার কিছু পর চলে আসে তাহেরের জীপ। তাহেরকে সরাসরি ওঠানো হয় হেলিকপ্টারে। কর্নেল রঙ্গলাল এসে লুৎফাকে বলেন : হেলিকপ্টার এখনই রওনা দেবে গৌহাটির উদ্দেশে, আপনি এক নজর তাকে দেখে যেতে পারেন। আপনাকে আমরা পরে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

লুৎফা গিয়ে ওঠেন হেলিকপ্টারে। হেলিকপ্টারের পাখার শব্দে চারদিকে প্রকম্পিত। ভেতরে গিয়ে দেখেন, বুক পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা তাহেরের। একটা স্যালাইন চলছে। চোখ বন্ধ।

ডাক্তার দীপঙ্কর বলেন : উনাকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। এখন ঘুমাচ্ছেন।

স্তব্ধ হয়ে থাকেন লুৎফা। তিনি তখনও জানেন না আঘাতের মাত্রাটা কতটুকু। জানেন না অনেক বছর পর আরেকবার তাকে এমনি চড়তে হবে হেলিকপ্টারে। সেদিনও এভাবে হেলিকপ্টারে ভেতর শুয়ে থাকবেন তাহের। প্রাণহীন।

গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে জেনারেলদের জন্য সংরক্ষিত সবচেয়ে ভালো কেবিনটিতে রাখা হয় তাহেরকে। ভারতীয় ডাক্তাররা অত্যন্ত দ্রুততায় তার চিকিৎসার শুরু করে দেন।

পরদিন আনোয়ার একটি জীপ নিয়ে লুৎফাকে সহ তুরা থেকে রওনা দেন গৌহাটি সামরিক হাসপাতালের দিকে। শিশু জয়া, ডালিয়া, জুলিয়া তুরাতে থাকে ডা. হাই-এর স্ত্রীর হেফাজতে। সেই ডাক্তার হাই চট্টগ্রামে যার ঘরে হয়েছিল তাহের এবং সিরাজ শিকদারের বৈঠক, বিপ্লবের পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ। ডাক্তার হাই তখন মেজর জিয়ার জেড ফোর্স এর চিফ মেডিকেল অফিসার হিসাবে কাজ করছেন।

কর্নেল রঙ্গলাল আনোয়ারকে বলেন : আপনি মিসেস তাহেরকে পুরো ব্যাপারটি ভালোভাবে বলে রাখুন। ডাক্তাররা বলেছেন, মেজর তাহেরের পা কিছুতেই রাখা যাবে না, এমনকি তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। উনাকে মানসিকভাবে তৈরি রাখা দরকার।

তুরা থেকে গৌহাটি প্রায় আড়াই শ মাইলের পথ। ভোরে রওনা দেন লুৎফা এবং আনোয়ার। লম্বা পথে মনে মনে আনোয়ার অনেকবার লুৎফাকে বলতে চেষ্টা করেন তাহেরের পুরো ব্যাপারটি কিন্তু কিছুতেই সাহস করে উঠতে পারেন না। দুজনে একরকম চুপচাপ পাড়ি দেন পুরো পথ। সন্ধ্যায় গিয়ে তারা পৌঁছান গৌহাটিতে। হাসপাতালে পৌঁছে আনোয়ার জানতে পারেন যে, তাহেরকে এমারজেন্সিতে রাখা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তার বাম পাটি হাঁটুর কাছ থেকে কেটে ফেলা হয়েছে।

আনোয়ার লুৎফাকে তাহেরের কেবিনে ঢুকবার আগে বলেন : ভাবী খুব সাহসী থাকতে হবে। একদম কোনোরকম চিৎকার, কান্নাকাটি করবেন না।

লুৎফা আনোয়ারকে বলে : তুমি এভাবে বলছ কেন?

আনোয়ার যে কথাটি তুরা থেকে গৌহাটির এই আড়াই শ মাইল পথ বলতে পারেনি, কেবিনে ঢুকবার ঠিক আগ মুহূর্তে সেটি তিনি বলেন লুৎফাকে : ভাবী, ভাইজানের অবস্থা খুব সিরিয়াস। তার একটা পা কেটে ফেলা হয়েছে। আবারও বলছি কোনো রকম চিৎকার কান্নাকাটি করবেন না।

লুৎফা ঠিক কি করবেন, বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। ভূতগ্রস্তের মতো কেবিনে ঢোকেন। লুৎফাকে দেখে তাহের খুব উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে থাকেন : ডক্টর আমার উয়াইফ এসেছে, ভাই এসেছে। ওরা সারাদিন জার্নি করেছে, ওদের একটু এন্টারটেইন করেন, একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

লুৎফা তাহেরের বিছানার কাছে গিয়ে বসেন। বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন তাহের। তিনি লুৎফার হাতটা জড়িয়ে ধরেন। লুৎফা লক্ষ করে তাহেরের হাতে লন্ডন থেকে কিনে দেওয়া সেই আংটিটি। এক হাতে লুৎফার হাত ধরে আরেক হাতে তাহের তার শরীর ঢেকে রাখা চাদরটিকে সরিয়ে ফেলে। বলে : দেখো, দেখো আমার কি হয়েছে, আমার একটা পা নাই।

লুৎফা কিছু বলবার আগে তাহের নিজেই তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন : চিন্তা করো না। নকল পা লাগিয়ে আমি ঠিকই হাঁটতে পারব।

লুৎফা প্রাণপণে সংযত করবার চেষ্টা করেন নিজেকে। আনোয়ারের কথাগুলো মনে বাজে তার : কান্নাকাটি, চিৎকার করা যাবে না। কেমন যেন ঘোরের ভেতর বলতে থাকেন : অসুবিধা কি তোমার আরেকটা পা তো আছে, তোমার লাইফটা তো আছে ...।

লুৎফা কি বলছে নিজেই যেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। একজন ডাক্তার এসে বলেন : রোগীর কাছে তো বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। এখনও তার ইনটেনসিভ পিরিয়ড চলছে আপনারা কেবিন থেকে বাইরে যান।

তাহেরের মুঠোতে তখনও লুৎফার হাত। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে যান লুৎফা। কেবিন থেকে বেরিয়েই লুৎফা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। বুক

ফেটে কান্না আসে তার। করিডোরের একটি চেয়ারে ধুপ করে বসে পড়ে হু হু করে কাঁদতে থাকেন তিনি।

গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে ডাক্তারদের একটি কোয়াটারে লুৎফা এবং আনোয়ারের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সকালে আনোয়ার এবং লুৎফা চলে যান হাসপাতালে। প্রচুর রক্ত দিতে হয় তাহেরকে, ব্যাগের পর ব্যাগ। দুদিন পর পর ড্রেসিং করেন নার্সরা। পায়ের হাড় বেরিয়ে গেছে, সেগুলোকে নানাভাবে সাইজ করা হয়। ড্রেসিংয়ের সময় আশপাশের অন্য রোগীরা ব্যাথায় চিৎকার করে, কিন্তু তাহের মুখে টু শব্দটি নেই। বরং তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের ড্রেসিং দেখেন তিনি। লুৎফা তাহেরকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে বিভিন্ন বেডে, ওয়ার্ডে ঘুরিয়ে বেড়ান। বিভিন্ন রোগীদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন তাহের, তাদের সাহস যোগান।

নিজের কাটা পা'র দিকে তাকিয়ে লুৎফাকে বলেন : আমার পা দুটোর চূড়ান্ত ব্যবহার হয়েছে, কি বলো? দূরন্ত বেগে ছুটে চলা এক অশ্বারোহী থমকে গেছেন হঠাৎ। আকস্মিক এই গতিহীনতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি।

আনোয়ারের কাছ থেকে নিয়মিত সেক্টরের খোঁজ নেন তাহের। যুদ্ধের কোথায় কি হচ্ছে উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চান। একদিন আনোয়ারকে ডেকে বলেন, কাগজ কলম নিয়ে আস, চিঠি লিখব মুক্তিযোদ্ধাদের। গৌহাটি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তাহের বলেন আর আনোয়ার লিখে নেন সেই চিঠি :

প্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা,

'বর্তমানে আমি অনেক ভালো। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও বেশ সময় লাগবে। কামালপুরে কিছুক্ষণের জন্যে যা দেখেছি তা অপূর্ব। তোমরা সম্মুখযুদ্ধে যে রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছো তা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল। কামালপুরের যুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও রণকৌশলের স্বাক্ষর। তোমরা নিয়মিত বাহিনীকেও হারিয়ে দিয়েছো। যতদিন না আবার আমি তোমাদের মাঝে ফিরে আসি, আশা করি সংগ্রাম চালিয়ে যাবে সাফল্যের পথে।'

এরপর তাহের শত্রু চিহ্নিত করা, গুপ্তঘাঁটি গড়ে তোলা বিষয়ে নানা কৌশলের পরামর্শ দেন মুক্তিযোদ্ধাদের। জানান নানা গেরিলা যুদ্ধের নীতির কথা। চিঠিতে তিনি আবার সব মুক্তিযোদ্ধাকে স্মরণ করিয়ে দেন সাধারণ জনগণকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের সঙ্গে শ্রদ্ধা, ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্বের কথা। তাদের জানান যুদ্ধে দলীয় এবং ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার গুরুত্বের কথা।

লেখেন, 'ভুলে যেও না, তোমরা একটা পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে নেমেছো। বাংলাদেশ তোমাদের জন্যে গর্বিত, মনে রাখবে বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব তোমাদের।

জয় বাংলা
মেজর আবু তাহের'

যদিও কামালপুর যুদ্ধে হারতে হারতেও জিতে গেছে পাকবাহিনী, কিন্তু দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নভেম্বর থেকেই পাকিস্তান সেনারা ক্লান্ত। এক হাজার মাইল দূরের এক দেশে এসে যুদ্ধে নেমেছে তারা। এদেশের আবহাওয়া চেনে না, মানুষ চেনে না, পথঘাট চেনে না। উপরন্তু কোনো নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয় তারা যুদ্ধে নেমেছে পুরো একটা জাতির বিরুদ্ধে যেখানে সবাই এক একজন সৈনিক। কাকে রেখে কার দিকে বন্দুক তাক করবে তারা ? পাকবাহিনীর ভেতরে ইতোমধ্যে দানা বেধেছে বিভ্রান্তি, অবসাদ।

এসময় পশ্চিমা নানা পত্র পত্রিকা পাকিস্তান আর্মিকে নেহাতই শক্তিহীন, জড়বুদ্ধি, অর্বাচীন হিসেবে অভিহিত করতে থাকে। পাকিস্তানে বসে ভুট্টো চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন ইয়াহিয়ার ওপর। ইয়াহিয়াকে বলেন, দ্রুত কোনো কড়া ব্যবস্থা না নিলে জনগণ আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।

নানারকম চাপে পড়ে এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন জম্মু-কাশ্মীরের আশপাশে একযোগে ভারতের সাতটি বিমানক্ষেত্রে বোমা নিক্ষেপ করতে। ৩রা ডিসেম্বর, সূর্যাস্তের কিছু আগে আক্রমণটি চালায় পাকবাহিনী। পূর্বাঞ্চলে ভারত পাকিস্তানি সেনার ওপর আঘাত হেনেছে আক্রমণের এই তাদের অজুহাত। তাদের হিসাবটা এমন যে একটা চূড়ান্ত কিছু বাঁধিয়ে দেওয়া যাক, তাতে করে নিশ্চয় মিত্র চীন আর আমেরিকা এগিয়ে আসবে সাহায্য নিয়ে, এ সুযোগে জম্মু কাশ্মীরের কিছু অংশ দখল করেও নেওয়া যাবে, পৃথিবীর দৃষ্টি ফেরানো যাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আর মুক্তিযোদ্ধদের কাছে পরাজয়ের গ্লানিও থাকবে না।

এই আক্রমণ যখন চলছে ইন্দিরা গান্ধী তখন কলকাতায় একটি সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। খবর পেয়েই সভা ছেড়ে তিনি চলে যান দিল্লি। জরুরি সভা ডাকেন তার মন্ত্রী, পরামর্শদাতাদের সঙ্গে। বাংলাদেশকে এতদিন তারা পেছন থেকে সবরকম সহায়তা দিয়ে আসছিলেন। পাকিস্তানের এই সরাসরি আক্রমণের প্রেক্ষিতে এবার সব দ্বিধা ঝেড়ে তারা মঞ্চের সামনে চলে আসবার সিদ্ধান্ত নেন।

এবার প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি ঘোষণা করে দেয় ভারত। তৈরি হয় ভারত বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড। নেতৃত্বে থাকেন ভারতীয় জেনারেল মানেক শ। যৌথভাবে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাতে থাকেন ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা।

বন্ধু হেনরি কিসিঞ্জার এগিয়ে আসেন পাকিস্তানকে সাহায্য করতে। তিনি আমেরিকার প্রশাসনকে এই যুদ্ধে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখবার জন্য উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এরকম একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে গড়িমসি করেন আমেরিকার কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য। চীনারাও বিশেষ এগিয়ে আসে না।

তারা তখন তাদের অভ্যন্তরীণ এক অভ্যুত্থান সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। ৭১-এর সেপ্টেম্বরের দিকে চীনের ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাও সে তুং এর বিরুদ্ধে ক্যু করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তারা পালাতে গেলে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। এসব জটিলতায় পাকিস্তানের দিকে নজর দেবার সময় নেই তাদের। তাছাড়া চীনা নেতৃত্ব পাকিস্তানিদের উপর খানিকটা ক্ষেপেও আছেন তখন কারণ তারা খোঁজ পেয়েছেন পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের চীনাপন্থী কিছু নেতাদেরও হত্যা করেছে। ফলে পাকিস্তানের হিসাব মেলে না। ভারতকে আক্রমণ করার পর আমেরিকা এবং চীনের কাছে পাকিস্তান যে সহযোগিতা আশা করছিল সেটা তাৎখনিকভাবে তারা পায় না। সেই সাথে পরিশ্রান্ত পাকিস্তানি সেনারা বৈরী পরিবেশ আর অতর্কিত আক্রমণে তখন পর্যুদস্ত। তারা পিছু হটতে শুরু করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলে আসে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের অধিবেশন ডাকেন মহাসচিব বার্মার উথান্ট। অধিবেশনে আমেরিকা এই যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে, সোভিয়েত দায়ী করে পাকিস্তানকে। আমেরিকা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিলে সোভিয়েত তাতে ভেটো দেয়। আবার সোভিয়েত রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দিলে চীন তাতে দেয় ভেটো। এই পাল্টাপাল্টি ভেটো চলতে থাকে জাতিসংঘ অধিবেশনে। ভুট্টো ক্ষেপে গিয়ে সবার সামনে অধিবেশনের কাগজপত্র ছিঁড়ে ওয়াক আউট করেন। জন্ম হয় নাটকীয় এক পরিস্থিতির।

জাতিসংঘে যখন বিতর্ক চলছে বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তখন হয়ে উঠেছে তীব্র থেকে তীব্রতর। ঢাকার আকাশ জুড়ে উড়তে শুরু করেছে ভারতীয় বিমান। পাকিস্তানের পক্ষে শুধু তার নিজের শক্তিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয়ে পড়ে দুরূহ। সীমান্ত অঞ্চলগুলো থেকে পিছু হটে তারা রওনা দেয় ঢাকার দিকে।

কিসিঞ্জার অবশ্য গোপনে বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে অব্যহত রাখেন তার পাঁয়তারা। সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখেন তিনি, যাতে প্রয়োজনে সেখান থেকে বিমান আক্রমণ করা যেতে পারে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নও তাদের যুদ্ধজাহাজ তৈরি রাখে ভারত সাগরে। একটা প্রলয়ংকরী যুদ্ধের আভাস। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন যার যার স্বার্থ মোতাবেক অবস্থান নিয়েছে বাংলাদেশের যুদ্ধ বিষয়ে। একটা আশঙ্কা চারদিকে, বাংলাদেশকে ঘিরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে কি?

কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী যুদ্ধের উপর ক্রমশ হারাতে থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ। এক পর্যায়ে যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেয় ভারত বাংলাদেশ যৌথবাহিনী। পতন ঘটে সিলেট শহরেরও। যে কোনো বিদেশি সাহায্য আসবার আগে ভারত বাংলাদেশ যৌথবাহিনী সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে মনোবল ভেঙ্গে দিতে চায় পাকিস্ত

ানিদের। ঢাকা শহরের প্রায় সব এলাকায় তীব্র হয়ে ওঠে গেরিলা আক্রমণ। এই ডামাডোলের মধ্যে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে একটা বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। ডা. মালেককে তিনি নিযুক্ত করেন বাংলাদেশের গভর্নর। দায়িত্ব পেয়ে ড. মালেক ঢাকার গভর্নর হাউজে যেদিন মিটিংয়ে বসেন সেদিন ঐ মিটিংয়ের মাঝখানে গভর্নর হাউজে বোমাবর্ষণ করে ভারতীয় বিমান মিগ—২১। ভীত মালেক গভর্নর হাউজে বসেই পদত্যাগপত্র লেখেন এবং পালিয়ে হোটেল ইন্টারকনে আশ্রয় নেন। বুঝতে আর কারো বাকি থাকে না যে যুদ্ধ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এক পর্যায়ে জেনারেল রাও ফরমান আলী আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠান ইয়াহিয়াকে। ইয়াহিয়া প্রত্যাখ্যান করেন সে প্রস্তাব। বলেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। তার বিশ্বাস যুদ্ধে তিনি জিতবেন। তিনি রাও ফরমান আলীকে ভরসা দেন যে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর আসছে এবং অচিরেই চীনের সাহায্যও চলে আসবে।

কিন্তু বাংলাদেশকে ঘিরে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার ঝুঁকি নিতে আমেরিকা, চীন কেউই আর উদ্যোগী হয় না। এপর্যায়ে ভারতীয় বিমান ঢাকা এয়ারপোর্ট, চিটাগাং এবং মংলা সমুদ্রবন্দরও ধ্বংস করে দেয় যাতে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যেতে না পারে। নয় মাসের যুদ্ধের শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে তখন।

উটপাখির মতো বালুতে মাথা গুঁজে থাকবার দিন ফুরায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। যুদ্ধে জিতবার যে আর কোনো সম্ভাবনা নেই তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের কাছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই এক এক করে শত্রুমুক্ত হতে থাকে বাংলাদেশের নানা অঞ্চল। এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া আত্মসমর্পণকে অনুমোদন করেন। দিন ঠিক হয় ১৬ ডিসেম্বর। পাক সেনারা দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা তাদের ক্যাম্প ছেড়ে জড়ো হতে থাকে ঢাকায়। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। পাকবাহিনী তাদের শেষ তৎপরতা চালায়। তড়িঘড়ি মেরামত করে এয়ারপোর্ট এবং সম্ভাব্য সবকিছু ঢাকা থেকে চালান করতে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানে। চালান করে বিপুল মালামাল, অস্ত্র, যুদ্ধ বিমান সবকিছু। পুড়িয়ে দেয় বাংলাদেশের স্টেট ব্যাংকের সবকটি টাকা।

আর ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ মাটি দিয়ে লেপা কিম্ভুত কয়েকটি মাইক্রোবাস বের হয় ঢাকার পথে। মাইক্রোবাসগুলো বেছে বেছে গিয়ে দাঁড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক, কয়েকজন ডাক্তার, কিছু বুদ্ধিজীবীর বাসায়। একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায় চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. আলীমের বাসার সামনে। গাড়ি থেকে কিছু ছেলে নামে এবং ডা. আলীমকে তাদের মাইক্রোবাসে আসতে বলে। তার স্ত্রী শ্যামলী নাসরীনকে বলে—কাজ হলেই ডাক্তার সাহেবকে ফেরত পাঠানো হবে। ডা. আলীমের নিচতলায় আশ্রয় নিয়েছেন পাকিস্তানিদের দোসর মাওলানা মান্নান। শ্যামলী ছুটে যান তার কাছে। মাওলানা বলেন, চিন্তা নাই ওরা আমার পরিচিত। শ্যামলী দেখেন ডা. আলীমকে নিয়ে মাটি লেপা মাইক্রোবাসটি চলে যাচ্ছে তাদের

বাড়ির গেট ছেড়ে। এভাবেই ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ সেই মাটিলেপা মাইক্রোবাস আরও কয়জন বুদ্ধিজীবীকে তাদের ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে রওনা দেয় অজানায়।

যেমন হিসাব করেছিল তাহের ঠিক তেমনটিই ঘটে। ১১ নং সেক্টরের ভারতীয় ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ারই জামালপুর, টাঙ্গাইল হয়ে তার সঙ্গী সাথী নিয়ে ঢাকায় ঢোকেন প্রথম। যেমনটি পরিকল্পনা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই ভারতীয় প্যারাট্রুপার টাঙ্গাইলের মধুপুরে প্যারাস্যুট ড্রপ করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় যুদ্ধবীর কাদের সিদ্দিকী। সবই হচ্ছে যা হবার কথা ছিল, কেবল নেই তাহের। গৌহাটির হাসপাতালে দিন গুনছেন তিনি। তাহের নেই কিন্তু ক্লেয়ারের সঙ্গে আছে তার ভাই সহযোদ্ধা আবু ইউসুফ।

১৬ ডিসেম্বর। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তখন আত্মসমর্পণের আয়োজন চলছে। এর আগে মাউন্টেন ব্রিগেডের কয়েকজন অফিসারের সাথে আবু ইউসুফ গেছেন পাকিস্তান বাহিনীর ১৪তম ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারে, নিয়াজীর সদর দপ্তরে। বাইরে রাখা নিয়াজীর স্টাফ কার। আবু ইউসুফ হঠাৎ গভীর এক ক্ষোভ থেকে খুলে নেন নিয়াজীর গাড়ির পতাকা। যে পতাকা এতদিন দর্পভরে উড়ত পাকবাহিনী প্রধান নিয়াজীর গাড়িতে তখন তা ইউসুফের হাতের মুঠোয়। একটা ঐতিহাসিক দলিলের মতো সেটি আজীবন আগলে রাখেন ইউসুফ।

তাহেরের অন্য যোদ্ধা ভাইরাও ততক্ষণে রওনা দিয়েছেন স্বাধীন দেশের মাটি স্পর্শ করতে। বেলাল, বাহার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে রওনা দেন কাজলার দিকে। সাঈদ চড়ে বসেন সাংবাদিক হারুন হাবীবের মোটরসাইকেলে পেছনে। তাদের মোটরসাইকেল সাঁই সাঁই করে জামালপুর হয়ে রওনা দেন ঢাকার পথে, বুকে তাদের বিজয়ের অদ্ভুত অনুভব। আনোয়ার তখন তাহেরের সঙ্গে গৌহাটির হাসপাতালে।

পাকবাহিনী অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজী রেসকোর্স মাঠের মাঝখানে রাখা টেবিলটির সামনের চেয়ারে বসেন, বসেন যৌথ কমান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরাও। মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ওসমানী তখন সিলেটে। তাকে খবর পাঠনো নিয়ে নানা জটিলতা দেখা দেয়। তাছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান মানেক শ নেই, সেখানে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী প্রধান ওসমানী থাকা প্রোটকলসম্মত কিনা সে প্রশ্নও ওঠে। আর তাদের কাছে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের এই ঐতিহাসিক সুযোগটিও বা ভারতীয় বাহিনী হাতছাড়া করবে কেন? ফলে ওসমানী ১৬ ডিসেম্বরের রেসকোর্সে অনুপস্থিত। বদলে কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে আসেন মুক্তিবাহিনীর সহ অধিনায়ক এ কে খন্দকার।

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে জেনারেল নিয়াজী তার কোমরে রাখা রিভলবারটি অরোরার হাতে সমর্পণ করেন। শীতের বিকেল। সন্ধ্যা নামছে। শেষ হয়ে আসছে একটি জনপদের ইতিহাসের বীভৎস অধ্যায়। উন্মুক্ত হচ্ছে নতুন দৃশ্যপট। টেবিলের কাছে দাঁড়ানো ভাগ্যবানরা দেখেন সেই ক্রান্তির মুহূর্তটি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এম আর আখতার মুকুল পড়েন তার শেষ চরমপত্র :

কি পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাষ। আইজ থাইকা বঙ্গাল মূলুকে মছুয়গো রাজত্ব শেষ। ... আট হাজার আস্টশ চুরাশি দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে মুছলমান মুছলমান ভাই ভাই কইয়া করাচি লাহুর পিন্ডির মছুয়া মহারাজরা বঙ্গাল মূলুকে যে রাজত্ব কায়েম করছিল আইজ তার খতমে তারাবি হইয়া গেল।

ঢাকার পথে পথে উৎফুল্ল মানুষ জড়িয়ে ধরেন ভারতীয় বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা বিজয়ীদের। শরণার্থী শিবিরে শিবিরে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েন রেডিওর সামনে। শুধু শ্যামলী চৌধুরী ভিড়ের মধ্যে খোঁজেন তার প্রিয় মুখ ডা. আলীমকে। মাত্র দুদিন আগে সেই মাটি লেপা মাইক্রোবাস সেই যে তাকে নিয়ে গেছে, ফেরেননি তিনি আর। বিজয়ের এই আশ্চর্য মুহূর্ত স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে নেবেন বলে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন তাকে। ডা. আলীমকে অচিরেই পাওয়া যাবে হাত, চোখ বাঁধা অবস্থায় রায়ের বাজার বধ্যভূমির কাদায় গুলিবিদ্ধ পড়ে আছেন আরও অগণিত স্বনামধন্য শিক্ষক, সাংবাদিক, পেশাজীবীদের লাশের পাশে। চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে মাটিলেপা মাইক্রোবাস এক এক করে দেশের মেধাবী মানুষকে চোখ বেঁধে এনে দাঁড় করিয়েছে এই বধ্যভূমিতে।

সেদিন রাতে সবচেয়ে আনন্দ আর সবচেয়ে বেদনার এক অভূতপূর্ব মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ঘুমাতে যায় একটি বিহ্বল জাতি।

বিষণ্ন বিজয়

দেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে তাহের তখন গৌহাটির হাসপাতালে। সাথে লুৎফা আর আনোয়ার। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই ১৬ ডিসেম্বর রেডিওতে নিয়াজীর আত্মসমর্পণের বিবরণী শোনেন তাহের। রেডিওতে মানুষের উল্লাসধ্বনি। কিন্তু তাহেরকে দেখায় বিষণ্ন।

লুৎফা বলেন : তুমি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে থাকতে পারলে না বলে মন খারাপ করছো?

তাহের বলেন : তা না। মন খারাপ অন্য কারণে। যুদ্ধটা আসলে হাতছাড়া হয়ে গেল। ঠিক স্বাভাবিক বিজয় হলো না আমাদের। একটা নতুন দেশের জন্ম হলো ঠিকই কিন্তু হলো অনেকটা ফোরসেপ ডেলিভারির মতো, অন্যের সাহায্য নিয়ে।

আনোয়ারকে বলেন তাহের : আমাদের কাজ কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে গেল আনোয়ার। ভেবেছিলাম যুদ্ধটা আরেকটু প্রলম্বিত হবে, ভিয়েতনামের মতো আমরা কমিউনিস্ট ওয়ারের দিকে যাবো। সেটা হলো না। জানি না, স্বাধীন দেশ কোনো দিকে যাবে। আমাদের যুদ্ধ কিন্তু শেষ হলো না আনোয়ার।

শূন্য সিংহাসন

ব্রিটিশরা এশিয়া আফ্রিকার কত কত দেশ শাসন করেছে এবং যাবার আগে তৈরি করে দিয়ে গেছে নিজেদের মতো মানচিত্র। একই কাজ তারা করেছে ভারতেও। কিন্তু ইতিহসে এই প্রথম একটি দেশ তাদের বেধে দেওয়া মানচিত্রকে অস্বীকার করল। খটকার মানচিত্র ছিঁড়ে দেখা দিল নতুন নামে দেশ, বাংলাদেশ।

নতুন দেশ হলো কিন্তু তখনও সে দেশের কোনো অভিভাবক নেই, প্রশাসন নেই। কিছু ভারতীয় উপদেষ্টা এবং কয়েকজন বাংলাদেশী আমলা মিলে ১৬ ডিসেম্বরের পর এই নতুন দেশের প্রশাসন চালু করবার প্রাথমিক কাজগুলো শুরু করলেন। তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন আরও কিছুদিন পর, ২২ ডিসেম্বর। প্রথম যেদিন একটা নতুন দেশের দাপ্তরিক কাজকর্ম শুরু হলো সেদিন রোববার। তখনকার হিসাব মতো সেটা ছুটির দিন। কিন্তু এত দাম দিয়ে কেনা একটা দেশ একটু নাড়া চাড়া করে দেখবার জন্য ছুটির দিন আর কাজের দিনের হিসাব করলে কি আর চলে? তাজউদ্দীন তার পরিষদ নিয়ে শুরু করলেন এই নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার যাত্রা। নানা জন নানা আসনে বসল বটে কিন্তু সিংহাসনটা রইল খালি। সিংহাসনের মানুষটি তখনও বন্দি। সবাই অপেক্ষা করছেন তার জন্য।

২৫ মার্চ গ্রেফতারের পর শেখ মুজিবকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। পাক সামরিক ওয়ারলেসে খবর আসে 'পাখি এখন খাঁচায়।' এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে রাওয়ালপিন্ডি থেকে এক শ পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে লায়ালপুর জেলে, সেখান থেকে মিয়ানওয়ালী জেলে। বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হয় তাকে। কোনো পত্র, পত্রিকা পড়বার, রেডিও শুনবার, টেলিভিশন দেখবার সুযোগ দেওয়া হয় না তাকে। কারাগারের কক্ষের ছোট্ট ভেন্টিলেটরের গরাদে আকাশ দেখে কাটে তার দিন আর রাত। বিচার হয় শেখ মুজিবের। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাকে। কারাগারের ভেতর কবর খুড়তে দেখেন তিনি। কিন্তু পাকিস্তানের আত্মসমর্পণে উল্টে যায় সব হিসাব। ১৬ ডিসেম্বরের শীতের রাতে ঘুমাতে যাবার জন্য মিয়ানওয়ালী জেলের কম্বলে শেখ মুজিব যখন জড়াচ্ছেন তার শরীর তখনও তিনি জানেন তার নামে যুদ্ধ করে একটি নতুন দেশের জন্ম দিয়েছে তারই দেশের মানুষ। আরও সপ্তাহখানেক পর জানানো হয় তাঁকে। জেল থেকে মুক্তি পান তিনি। নয় মাস বন্দি জীবন কাটিয়ে পাকিস্তান থেকে লন্ডন, দিল্লি হয়ে ঢাকার পথে রওনা দেন শেখ মুজিব।

একটি রুপালি কমেট বিমানে ১০ জানুয়ারি দুপুর শেখ মুজিব অবতরণ করেন ঢাকায়। বিমানবন্দরের চারদিকে টান টান উত্তেজনা সেদিন। বিমান রানওয়েতে নামলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গার্ড দলকে পেরিয়ে হাজার হাজার মানুষ ঘিরে ফেলে বিমানটিকে। বিমানের দরজা খুলে দাঁড়ান শেখ মুজিব। রোগা হয়েছেন

তিনি, তার ব্যাকব্রাশ করা চুল অবিন্যস্ত। দশ মিনিটের মতো চেষ্টা করেও বিমান থেকে নামতে পারছিলেন না তিনি। প্লেনের সিঁড়ি থেকে নামবার আগেই তাকে মালা পড়াবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। মানুষের ভিড় ঠেলে বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স মাঠে আসতে আড়াই ঘণ্টার মতো সময় লেগে যায় তার। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি। কবিগুরুও কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে। ... আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে।' আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মুজিব।

বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ তাকিয়ে আছে এই একটি মানুষের দিকে। কিন্তু শেখ মুজিব তখন নয় মাসের ঘুম থেকে ওঠা এক রিপভ্যান উইংকেল যিনি জানেন না তার ঘুমন্ত অবস্থায় বদলে গেছে তার দেশ।

রিপভ্যান উইংক্যোল

শেখ মুজিব যখন জেলের চার দেয়ালে বন্দি তখন এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে পুরো বাংলাদেশ। এমন আশ্চর্য সময় আর কখনো আসেনি এদেশের মানুষের জীবনে। যে আকাশ পথে তিনি বিমানে চড়ে দেশে ফিরলেন, সে আকাশ পথেই তখন এক এক ফিরে যাচ্ছে অগণিত শকুন। বাংলাদেশের আকাশ গত নয় মাস ধরে ছেয়ে রেখেছিল এইসব শকুন। তারা লোলুপ চোখে চেয়ে থেকেছে নদীতে ভেসে যাওয়া কিংবা বাড়ির উঠানে স্তূপকৃত হয়ে থাকা লাশের দিকে। এই নরহত্যার উৎসবের সাক্ষী হয়ে এখন তারা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে অন্য আকাশে।

ওদিকে মাটিতে বেঁচে থাকা, পালিয়ে বেড়ানো লক্ষ মানুষ ফিরছে তাদের বাস্তু ভিটায়। বিরান বাস্তু ভিটায় তারা খুঁজে পাচ্ছে মানুষের কংকাল। খেলনা ভেবে মাথার খুলিকে হাতে তুলে নিচ্ছে শিশু।

একটা রণক্লান্ত জাতি, বিধ্বস্ত দেশ আর নিঃস্ব সরকারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন শেখ মুজিব। লন্ডনে যাত্রা বিরতির সময় তার পূর্ব পরিচিত বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বী পাকিস্তানি সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকার্নহেসকে মুজিব বলেন, 'দেশে ফিরে আমি আগে সবকটা জেলা ঘুরতে চাই। বাংলাদেশের সবকটা মানুষের মুখ আমি দেখতে চাই আগে।'

যদি পারতেন তাহলে হয়তো পুষিয়ে নিতে পারতেন তার নয় মাসের সুপ্তিকাল। কিন্তু সে সুযোগ তার আর হয়নি। তার সামনে সমস্যার পাহাড়। উঁচু পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে কতিপয় শেরপা অপেক্ষা করছে পাহাড় ডিঙ্গানোর জন্য, তিনি তাদের নেতা। তাকে সেই ফুরসত কেউ দেয়নি আর।

দেশের হাজার, হাজার মাইলের প্রায় সব রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, রেল লাইন ক্ষত বিক্ষত, কি করে দ্রুত এগুলোকে চালু করা যায়?

চলে যাবার আগে পাকিস্তানিরা হিসাব-নিকাশ, প্রশাসন কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি। ভেঙ্গে পড়েছে পুরো প্রশাসন ব্যবস্থা, কি করে আবার গড়ে তোলা যাবে একটি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র?

কল কারখানা প্রায় সব বন্ধ, কি করে চালু করা যাবে সেসব?

পাকিস্তানিরা যাবার সময় পুড়িয়ে দিয়ে গেছে সব ব্যাংক। কানাকড়ি বৈদেশিক মুদ্রা নেই, নদী, সমুদ্রবন্দর সব ধ্বংসপ্রাপ্ত, আমদানি-রপ্তানির সুযোগ নেই, কোথা থেকে আসবে দেশ গড়ার অর্থ?

ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল যে প্রায় এক কোটি শরণার্থী তারা সব ফিরে আসছে, তাদের ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন, কি করে পুনর্বাসন করা যাবে তাদের?

হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার হাতে অস্ত্র, এমনকি রাজাকার, আল বদরদের হাতে অস্ত্র, কি করে এ অস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়া যাবে তাদের কাছ থেকে, কি করে নিশ্চিত করা যাবে যে অস্ত্রধারীরা বিপথগামী হবে না?

যে সব মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে লড়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, যেসব শিল্পী সাহিত্যিক যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাদেরকে কি করে সঠিক মর্যাদা দেওয়া যাবে, পুরস্কৃত করা যাবে?

যুদ্ধের সময় যে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের সহায়তা করেছে, দালালী করেছে তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

বাংলাদেশে তখনও অনেক ভারতীয় সৈন্য রয়ে গেছে, তাদের সহযোগিতায় দেশ গভীর কৃতজ্ঞ কিন্তু একটা ভিনদেশী সেনাবাহিনী কতদিন দেশের মাটিতে থাকবে?

পাকিস্তানি প্রায় এক লাখ যুদ্ধবন্দি রয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে?

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বলে আর কিছু নেই। এই সুযোগে শুরু হয়েছে অবাধ চোরাচালান, কি করে তা বন্ধ করা যাবে?

যুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকার পরিচালিত হয়েছে তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে, সে নেতৃত্ব মানেননি শীর্ষ কিছু ছাত্র নেতা। স্বাধীনতার পরও অব্যাহত রয়ে গেছে সেই বৈরিতা। কি করে অতিক্রম করা যাবে এই কোন্দল?

পৃথিবীর বহু দেশ তখনও স্বীকৃতি দেয়নি বাংলাদেশকে, কি করে সেই স্বীকৃতি আদায় করা যাবে? পুজিবাদী আমেরিকা আর সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রাখা যাবে কি করে?

অগণিত প্রশ্ন। এর প্রত্যেকটির উত্তর খুঁজে পেতে হবে শেখ মুজিবকে। একটা নতুন স্বাধীন দেশ, অভূতপূর্ব অনুভূতি মানুষের আর আকাশচুম্বী আশা।

ক্রাচ হাতে কর্নেল

নতুন দেশ গোছানোর কাজ যখন শুরু হয়েছে তাহের তখনও হাসপাতালের বিছানায়। কাটা পায়ের স্কিন গ্রাফটিং করবার জন্য তাহেরকে গৌহাটি থেকে পুনায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শিশু জয়াকে নিয়ে লুৎফাকে ময়মনসিংহে আপাতত চলে যেতে বলেন তাহের। আনোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে তাহের যান পুনায়। যুদ্ধাহত স্বামীকে পেছনে রেখে লুৎফা রওনা দেন স্বাধীন দেশে। পুনায় দীর্ঘদিন চলে তাহেরের চিকিৎসা। একজন আহত সেক্টর কমান্ডারকে সম্মান জানাতে একদিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চলে আসেন হাসপাতালে, কুশল বিনিময় করেন তাহেরের সঙ্গে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন তাহের।

'৭২-এর এপ্রিলে একটি পাবিহীন তাহের ক্রাচে ভর করে ফেরেন বাংলাদেশে। ছেড়ে গিয়েছিলেন রণাঙ্গন ফেরেন একটি মুক্ত স্বাধীন দেশে। জীবিত যোদ্ধাদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরউত্তম' এ ভূষিত করা হয় তাঁকে। তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে করা হয় কর্নেল। তাঁকে দেওয়া হয় আর্মির অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল পদ। লুৎফাকে নিয়ে তার জন্য বরাদ্দ ক্যান্টনমেন্টের বাসায় গিয়ে উঠেন তাহের।

একজন যুদ্ধাহত মানুষকে নিয়ে শুরু হয় লুৎফার সংসার। বছর আড়াইয়ের সংসার তার কেটেছে ঝড় ঝাপটা আর চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যেই। লন্ডনের সময়টুকু বাদ দিলে একটু স্থির হবার সময় হয়ে উঠেনি তার। এবার কি হবে?

তাহেরের মস্তিষ্কে তখনও কেবলই অসমাপ্ত যুদ্ধের কথা। লুৎফাকে বলেন, স্বাধীনতাটা যেভাবে আসবে ভেবেছিলাম সেভাবে আসেনি কিন্তু তাই বলে তো আর বসে থাকলে চলবে না। নেমে পড়তে হবে কাজে। দেখি গভর্নমেন্ট কিভাবে ফাংশন করে, দেশটা কোনোদিকে যায়।

একদিন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা এলেন তাহেরের কাছে, বললেন : স্যার, আমরা যারা যুদ্ধে পঙ্গু হয়েছি, তারা সবাই মিলে একটা সংগঠন করতে চাচ্ছি, আপনি হবেন তার প্রধান।

ক্ষেপে যান তাহের : পঙ্গু? কে পঙ্গু? দুটো পা যার আছে, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারব আমি। ওসব পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ভেতর আমি নাই।

শেখ মুজিব তাহেরকে ডাকেন একদিন। খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেন তাহের। লুৎফাকে বলেন : উনার উপর পুরো দেশ তাকিয়ে আছে। আর্মিকে পুরো ঢেলে সাজানো দরকার। আমার প্ল্যানটা উনাকে বলব। বঙ্গবন্ধু যদি একটু সাপোর্ট দেন তাতেই অনেক কিছু করে ফেলা যায়।

এমনিতে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটলেও বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহের পড়ে নেন ভারত থেকে আনা একটি কৃত্রিম পা। লুৎফাকে সঙ্গে করে কৃত্রিম পায়ে ভর দিয়ে তাহের চলে যান শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে। তাহের তাঁর যুদ্ধের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন শেখ মুজিবকে। বলেন : জনগণ এবং আর্মির লোকেরা মুক্তিযুদ্ধে

একসাথে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ শেষে তাদের বিচ্ছিন্ন করাটা ঠিক হবে না। আমি মনে করি সেনাবাহিনীকে রিফর্ম করা দরকার। সিপাই আর অফিসারদের মধ্যে যে দাসসুলভ সম্পর্ক আছে তার অবসান ঘটানো দরকার। তাছাড়া আমাদের মতো একটা দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা শুধু শুধু ব্যারাকে বসে থাকবে এটা তো ঠিক না। দেশের এখন কত কাজ, দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সেনাবাহিনীর সদস্যদের পুরোপুরি যোগ দেওয়া উচিত। আর্মি নিয়ে আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে, আমি সেগুলো আপনাকে লিখে জানাতে চাই।

শেখ মুজিব মনোযোগের সঙ্গে শোনেন তাহেরের কথা। বলেন : অবশ্যই। তুমি লিখে আমাকে পাঠাও। তারপর একদিন সময় নিয়ে আস। এনিয়ে বিস্তারিত কথা হবে তোমার সঙ্গে। আর তোমার পায়েরও তো আরও চিকিৎসা দরকার। আমি যখন বিদেশে যাবো তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে যাবা।

উদ্দীপনা নিয়ে ঘরে ফিরে তাহের বসে পড়ে তার কাঙ্ক্ষিত সেনাবাহিনীর রূপরেখার খসড়া তৈরিতে। মাথায় তখন তার দেশ গড়ার নানা পরিকল্পনা।

একদিন বাড়ির ড্রইং রুমে বসে আছেন তাহের। এক অধীনস্ত অফিসার এসে বলেন : স্যার একটা উপহার এনেছি আপনার জন্য। জানলা দিয়ে দেখেন।

তাহের জানলা দিয়ে দেখে একটি গাড়ি।

অফিসারটি বলেন : মার্সিডিজ স্যার, শিল্পপতি আদমজী ব্যবহার করত। ওটা আমি আপনার জন্য রেখে দিয়েছি।

স্তম্ভিত হয়ে যান তাহের : কি বলতে চাও?

অফিসারটি : জী স্যার, কতজন কতকিছু সব নিচ্ছে। আদমজী তো পালিয়ে গেছে।

উত্তেজনায় ক্রাচে ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যান তাহের। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠেন : হাউ ডেয়ার ইউ? গেট আউট ফ্রম মাই হাউজ।

মর্মাহত তাহের ঘরে গিয়ে লুৎফাকে বলেন : কেবল স্বাধীন হলো একটা দেশ, কিভাবে লুটপাট শুরু হয়ে গেছে দেখ, এমনকি আর্মির মধ্যেও। আমি এক্সাক্টলি এই কারণেই বলেছিলাম যুদ্ধটা দীর্ঘায়িত হওয়ার দরকার ছিল। এমন একটা স্বাধীনতার জন্য মানুষ তো রেডিই হয়ে ওঠেনি। ভাবটা যেন এমন যে দেশটা যেহেতু এখন আমার, যেহেতু পাকিস্তানিরা এখন আর মাথার উপর ডাণ্ডা ঘোরাচ্ছে না, সুতরাং যা যেখানে পাবো তা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেব। যুদ্ধের ভেতর সব মানুষের মধ্যে যদি রেভুলেশনের স্পিরিটটা তৈরি করা যেত তাহলে এসব হতো না। একটা স্টেটের জন্ম হলো বলেই যে বিজয় হয়ে গেল তা তো না। আমি এই আশঙ্কাটাই করছিলাম।

ক্ষুব্ধ তাহের উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের মিটিংয়ে লুট পাটের প্রসঙ্গটি তোলেন। বলেন : ক্যান্টনমেন্টের বাইরে কি হচ্ছে সেটাতে আমাদের কন্ট্রোল নাই কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে তো আমরা এসব এলাউ করতে পারি না।

অ্যাডজুটেন্ড জেনারেল হিসেবে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে দিস মাস্ট বি স্টপড ইমিডিয়েটলি। আর ইতোমধ্যে যারা এসব অবৈধ সম্পদ নিয়েছেন তাদেরও তা ফেরত দিতে হবে। আমি সবাইকে আর একবার সুযোগ দিতে চাই। সেনাবাহিনীর সামনে অনেক কাজ। এই পাপের বোঝা নিয়ে তারা কি করে দেশ গড়ার কাজ করবে? তাদের আমি আরেকবার পরিশুদ্ধ হবার সুযোগ দিতে চাই।

তাহেরের ডাকে কাজ হয়। প্রচুর লুট করা সম্পদ জড়ো হয় ক্যান্টনমেন্টের মাঠে। জনসমক্ষে তাহের সেই সব লুণ্ঠিত মাল পুড়িয়ে ফেলেন। কিন্তু তাহের একা আর কতটা পাপ পোড়াবেন? দেশের আনাচে কানাচে ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ক্ষয়।

বিষবৃক্ষ

গণভবনে বসেন শেখ মুজিব। ওখানে সর্বক্ষণ দলীয় লোকজন, আবেদন নিবেদনকারীদের ভিড়। কেউ তাকে ফুলের মালা পড়িয়ে দিচ্ছেন, পা ধরে ছালাম করছেন, কেউ গলা ধরে উচ্চস্বরে কাঁদছেন। শেখ মুজিবও তাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। এরই মধ্যে তিনি মন্ত্রীর সাথে কথা বলছেন, আমলাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। শেখ মুজিব দেশবাসীকে বললেন ধৈর্য ধরতে হবে, তিন বছর তিনি কিছু দিতে পারবেন না।

কিন্তু শেখ মুজিবের সিংহাসনের চারপাশে যেমন ফুলের বাগান তেমনি জন্ম নিয়েছে গোপন বিষবৃক্ষ।

এক এক করে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে নতুন সরকার।

ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে দ্রুততম সময়ে তৈরি হয়ে যায় নতুন দেশের একটি সংবিধান।

ড. কুদরত—ই—খুদার নেতৃত্বে তৈরি হয় অনন্য শিক্ষা নীতি।

আশার সঞ্চার হয় যেন। কিন্তু ফুল যা ফোটে তার চেয়ে অনেক বেশি গজাতে থাকে বিষ বৃক্ষের পাতা।

মাওলানা ভাসানী প্রস্তাব দেন, আসুন যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এমন সব দল নিয়ে একটা সরকার গঠন করি। আওয়ামী লীগের সরকার নয়, জাতীয় সরকার। ন্যাপের মোজাফফর আহমদও সমর্থন করেন এ প্রস্তাব।

পাল্টা যুক্তিও দাঁড়ায়। জনগণ ১৯৭০রের ভোটে নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট দিয়েছিল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে। সে সরকার পাকিস্তানিরা গঠন করতে দেয়নি। যুদ্ধের সময় যে প্রবাসী বাংলাদেশী সরকার বিবিধ কর্মকাণ্ড চালিয়েছে সে সরকার আওয়ামী লীগেরই। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে স্বভাবতই সরকার গঠন করবে আওয়ামী লীগ।

কিন্তু এই নয় মাসে হিসেব ওলটপালট হয়ে গেছে সব। লোকে বলে, এতবড় যে যুদ্ধজয় এতো শুধু একা আওয়ামী লীগের অবদান নয়। বরং লোকে যাদের ভোট দিয়েছিল তাদের অনেকেই এই নয় মাস ছিলেন রণক্ষেত্র থেকে, নেতৃত্ব থেকে নিরাপদ দূরত্বে। প্রশ্ন তোলেন অনেকে, একটা নতুন দেশগড়ার কঠিন এই যজ্ঞে দলমত নির্বিশেষে কেন সব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না? কেন অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না সেইসব মানুষদের যারা কাগজের নৌকায় চড়ে পাড়ি দিয়েছে আগুনের নদী?

কোনো প্রশ্ন ধোপে টেকে না। সরকার এককভাবে গঠন করে আওয়ামী লীগ। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দলের সদস্য নিয়ে যে পরামর্শক কমিটি করা হয়ছিল বাতিল করা হয় তাও।

বঞ্চনার বীজ রোপিত হয়।

রাইফেল কাঁধে মনকাডা পাহাড়ের গভীর অরণ্যে ক্যাস্ট্রোর সাথে যারা যুদ্ধ করেছেন তারাই পরবর্তীতে গ্রহণ করেছেন কিউবার শাসন ভার, ভিয়েতনামের চরাচরের কাদায় যে ভিয়েতকং গেরিলারা চালিয়েছে আমেরিকা, স্বাধীন দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন তারাই। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনের দায়িত্ব নেন যারা তাদের অনেকের পাঞ্জাবিতেই কাদা লাগেনি একটুও।

কথামতো তৈরি হয় ত্রান কমিটি। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ কোটি, উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসিত করার দায়িত্ব তাদের। কিন্তু যাদের হাত দিয়ে সেই ত্রান প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় তাদের অনেকের হাতেই কোনোদিন ওঠেনি গ্রেনেড, রাইফেল। মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে সামিল হয়ে যে আঙুল একবার ট্রিগার টেপে সে আঙ্গুল একটা অঙ্গীকারে বাধা পড়ে যায়। কিন্তু ত্রাণের অর্থ এসে পড়ে অনেক অঙ্গীকারবিহীন হাতে। বিপন্ন মানুষের কাছে যা পৌছে সারা বিশ্বের মানুষের ভালোবাসার স্পর্শ লাগা বিপুল অর্থ, সম্পদ আঙ্গুল ফসকে পৌছাতে থাকে তাদের নিজস্ব ঝোলায়। শুধু দলীয় লোক নয়, স্থানীয় বিত্তবানদের হাতে গিয়ে পড়ে যত ত্রাণের সম্পদ। গোপনে, প্রকাশ্যে শুরু হয় লুট। ঝরনার মতো বইছে ত্রাণের বহর কিন্তু কোন গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে সব। খবর আসে ক্ষিপ্ত মানুষ হত্যা করছে ত্রাণ কমিটির কর্মকর্তাদের। শীতে শোনা যায় কোনো দূর দেশ থেকে কম্বল এসেছে আট কোটি। দেশে তখন মানুষই সাড়ে সাত কোটি। দেশের প্রত্যেকটি মানুষের গা ঢেকে যাবার কথা সেই শীতে। তবু গ্রামে গঞ্জের মানুষ শীতে কাঁপে। একে অন্যের কাছে জানতে চায়, আমার কম্বলটা কোথায়? মওকা পেয়ে মার্কিন মন্ত্রী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বলেন 'তলাবিহীন ঝুড়ি'।

মানুষের আশার পাহাড়ে একটু একটু করে ধস নামে।

আদর্শহীনতা ভর করে প্রশাসনেও। যে আমলা কিছুদিন আগেও ছিলেন শত্রুর সঙ্গে, সহযোগিতা করে গেছেন পাকিস্তান সরকারকে, লোক না পেয়ে শেষ

পর্যন্ত সে রকম অনেক মানুষকেই বসাতে হয় প্রশাসনের দায়িত্বে। দলীয় বিবেচনাতেও যুদ্ধমাঠের বাইরের অনেক ব্যক্তিকে দেওয়া হয় নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ। কিউবার নেতা ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে দেখা হলে শেখ মুজিবকে তিনি বলেন, 'যারা যুদ্ধে গেছে তাদেরই প্রশাসনে বসাও, ওরা অদক্ষ হতে পারে কিন্তু ওদের মন ঠিক পথে আছে।'

পরামর্শে কাজ হয় না, বেপথু মনের মানুষদের হাতেই থাকে প্রশাসন। দুর্বল প্রসাশনের সুযোগে কালোবাজারী, মজুদদারী আর চোরাচালানের এক স্বর্গে পরিণত হয় বাংলাদেশ। বড় বড় ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটতে থাকে অহর্নিশ। বড় বড় সরকারি কেনা কাটার কমিশন নিয়ে রাতারাতি বড় লোক হয়ে যেতে থাকে কিছু মানুষ। শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করা হলেও তারা খসার মতো খসে পড়তে থাকে এক একটি শিল্প। কেবলই লোকসান। প্রায়ই শোনা যায় পাটের কারখানায় আর গুদামে আগুন লেগেছে। গুদামে আগুন লাগানো হয়ে দাঁড়ায় লোকসান ধামাচাপা দেবার কৌশল। উশৃঙ্খল, বেপরোয়া মনোভাব দেখা দেয় দলীয় এবং সরকারি লোকদের আচরণে। মনে হয় যেন কোনো জাতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে নয় একটা নির্বাচনে জিতে দেশ শাসনের ভার নিয়েছে সরকার। ধসে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা। স্কুল, কলেজের পরীক্ষায় শুরু হয় নকলের অভূতপূর্ব মহোৎসব।

তার ছিঁড়তে থাকে একটু একটু।

স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত হয় পরিকল্পনা কমিশন। তারা যাবতীয় শোষণের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রস্তাব করেন একটি সমাজতন্ত্রিক ধারার অর্থনীতির। রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় শিল্প কারখানার। দেশবাসীকে কৃচ্ছতা সাধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ধনীদের আহ্বান জানান হয় সব রকম বিলাস ব্যাসন পরিত্যাগের। মন্ত্রী, সাংসদদের শহরে না থেকে গ্রামে গিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, ছাত্রদের স্বেচ্ছাশ্রমের সুপারিশ রাখা হয়। তবে এ সুপারিশ যারা বাস্তবায়ন করবেন সেই আমলা আর রাজনীতিবিদরা পরিকল্পনা কমিশনের এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন, ওসব হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড পড়া অধ্যাপকদের তাত্ত্বিক ভাবনা, এসব বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনার পরী উড়ে যায় পড়ে থাকে কল্পনা।

ঘোষণা মতো পাকিস্তানিদের সাথে যোগসাজশ করা দালালদের বিচার শুরু হয় ঠিকই কিন্তু জটিলতা দেখা দেয় এ বিচার প্রক্রিয়ায়। দেশ জুড়ে হাজার হাজার রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের ধরবার জন্য, বিচার করবার জন্য অত বিচারক, অত পুলিশ কোথায়? একই বাড়িতে ছেলে মুক্তিযোদ্ধা তো বাবা রাজাকার। ছেলে কি করে বাবার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায়? অনেক দালাল আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের এককালীন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আত্মীয়। তাদের নানা কৌশলে বিচার থেকে মুক্ত করে আনতে সচেষ্ট থাকেন আওয়ামী লীগেরই কর্মীরা।

উল্টোটাও ঘটে, দালাল আইনের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শত্রুদের হেনেস্তা শুরু করেন অনেক রাজনৈতিক নেতা। অনেক ধার্মিক ধরনের লোক ছিলেন পাকিস্তানপন্থী, তাদের গ্রেফতার করা শুরু হয় বলে লোকে ভাবে এ বুঝি ভারতের চাল। জটিলতা সামাল দিতে না পেরে বিশেষ গুরুতর কিছু অপরাধকারী দালাল বাদে বাকিদের ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীনতাবিরোধী আর ঘাতকেরা সুযোগ পেয়ে যান দ্বিতীয়বার জন্ম নেবার।

মুক্তিযোদ্ধাদের নানা সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু কে মুক্তিযোদ্ধা সেটা নির্ণয়ই হয়ে উঠে কঠিন। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের দেওয়া হয় মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা। স্বজন প্রীতি আর দুর্নীতিতে রাতারাতি তৈরি হয়ে যায় অসংখ্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা।

সৃষ্টি হয় মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধার দ্বন্দ্ব।

ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালেও শেখ মুজিব দৃঢ়তায় সাথে বলেন, স্বাধীন দেশ থেকে অন্য দেশের সৈন্যকে সরে যেতে হবে দ্রুত। কথামতো প্রথম স্বাধীনতা দিবস আসবার আগেই বাংলাদেশ থেকে চলে যায় ভারতীয় সৈন্যরা। কিন্তু যাবার আগে এদেশের মানুষের মনে জাগিয়ে দিয়ে যায় নানারকম ক্ষোভ। অভিযোগ ওঠে যাবার সময় ভারতীয় সেনারা অবৈধভাবে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বিশাল অস্ত্র ভান্ডার, বিবিধ সম্পদ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে লেখেন : "ঢাকায় এতসব জিনিস পাওয়া যায়, এসব তো আগে দেখেনি ভারতীয়রা। রিফ্রেজারেটর, টিভি, টু ইন ওয়ান, কার্পেট, টিনের খাবার, এইসব ভর্তি হতে লাগল ভারতীয় সৈন্যদের ট্রাকে।'

লুটের জন্য কোনো কোনো ভারতীয় অফিসারের সে দেশে কোর্ট মার্শালও হয়। প্রতিবাদ ওঠে মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে। ভারতের সঙ্গে শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্পর্কে দেখা দেয় তিক্ততা। স্বাধীনতার পর পর চা স্টলে, ঘরে ঘরে পাশাপাশি ঝুলতো শেখ মুজিব আর ইন্দিরার ছবি।

বন্ধুত্বের এই মায়া দ্রুত পর্যবেশিত হয় বৈরিতায়।

হাঁটু গেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে কাদের সিদ্দিকী আর তার দল, মুজিববাহিনীর ছেলেরা শেখ মুজিবের কাছে অস্ত্র সমর্পন করে ঠিকই কিন্তু এর বাইরেও রয়ে যায় হাজার হাজার অস্ত্র। স্বাধীন দেশের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য তরুণ, তাদের হাতে গ্রেনেড, অটোমেটিক রাইফেল, লাইট মেশিন গান, রকেট লাঞ্চার। বলা হয় অস্ত্র জমা দিলে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীতে। কিন্তু নেহাত মিলিশিয়া বাহিনীতে একটা চাকরির জন্য তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। তারা যেন আরও বড় কোনো কাজ, বড় কোনো দায়িত্ব প্রত্যাশা করে। একটি

আদর্শের সংগ্রামে যারা জয়ী হয়েছে আরেকটি আদর্শের সংগ্রামে নিয়োজিত হতে উদ্গ্রীব তারা। একটা চাকরির বিনিময়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হাতছাড়া করতে আগ্রহী হয় না অনেকেই। ফলে দেশের আনাচে-কানাচে চোরাগোপ্তা রয়ে যায় অগণিত অস্ত্র। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসতে থাকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির খবর। সব দোষ পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। শহরে ছিনতাই, লোকে বলে, এ মুক্তিযোদ্ধার কাজ। ছিনতাইকারী সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয় অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে। অথচ যুদ্ধের দিনগুলিতে শত ভীতির মধ্যেও মুক্তিবাহিনীর একটি ছেলেকে আশ্রয় দিতে পারলে কৃতার্থ হতো মানুষ। সন্ধ্যা হলে গ্রামগুলো যেন হয়ে উঠত ভিয়েতনামের প্রান্তর। হঠাৎ কোথা থেকে এক এক করে ছেলেরা এসে জড়ো হতো। কারো গায়ে গেঞ্জি ফুলপ্যান্ট, কারো লুঙ্গি, হাওয়াই শার্ট, পিঠে থ্রি নট থ্রি রাইফেল। আধো আঁধারে হেঁটে যেত তারা যেন দেবদূত। শংকা কেটে গেছে মানুষের। অথচ স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে উল্টো শঙ্কিত হয়ে পড়ে মানুষ।

শিশুর হাতের গ্যাস বেলুনের মতো সব কেমন যেন হাত ফসকে চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে। চারদিকে কেবলই স্বপ্নভাঙ্গার আওয়াজ। তবু টলটলায়মান মানুষ তাকিয়ে থাকে শেখ মুজিবের দিকে, আশায় বুক বাঁধে, তিনিই আনবেন মুক্তি। কবি নির্মলেন্দু গুণ লেখেন—

> মুজিব মানে আর কিছু না মুজিব মানে মুক্তি—
> পিতার সঙ্গে সন্তানের না লেখা প্রেম চুক্তি

কিন্তু সে প্রেম ফিকে হয়ে আসছে দ্রুত।

স্বপ্নের কারখানা

যুদ্ধের পর অনেকটাই বদলে গেছেন তাহের। তার শরীর আর মনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া যুদ্ধের ঝড় বদলে দিয়েছে তাকে। বদল শুধু ভেতরে নয়, অবয়বে, আচরণেও। ভাবনায় বিপ্লবী হলেও তাহের পোশাকে আসাকে সবসময় কেতাদুরস্ত। ফ্যাশনসচেতন বলে অফিসারদের মধ্যে তার একটা পরিচিতিও আছে। দামী জুতা ছিল তার ফ্যাশন, মদ্যপানও চলত হামেশাই। কিন্তু যুদ্ধের পর বদলে গেছে সেসব। পাই নেই জুতা আর পড়বেন কি? ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি অফিসে যান, খট খট শব্দ তুলে পায়চারী করেন ঘরময়। ইউনিফর্মের বাইরে তখন তার অতি সাধারণ দুতিনটি শার্ট। মদ ছেড়ে দিয়েছেন একদম। সিগারেট না ছাড়লেও আগে তার ব্রান্ড ছিল বিদেশি এখন ধরেছেন দেশি স্টার। একটা কৃচ্ছতার প্রবণতা দেখা দেয় তার মধ্যে। লুৎফাকে বলেন তাহের : এখন থেকে বছরে দুটোর বেশি শাড়ি কিন্তু পাবে না। সামনে অনেক কাজ আমাদের।

স্মিত হাসে লুৎফা : বলতে হবে না তোমাকে। আমার শখের কার্ডিগেন দু'টা তো ফেলেই এসেছো জঙ্গলে।

চারপাশের স্বপ্নভাঙ্গার আওয়াজ তাহের টের পাচ্ছেন ঠিক। তবু আশায় বুক বাঁধছেন। শুধু সেনাবাহিনী নয় পুরো দেশ নিয়ে তাহেরের স্বপ্নগুলোর কথা শেখ মুজিবকে জানাবার ইচ্ছা থাকলেও সে সুযোগ আর হয়ে ওঠে না তাহেরের। সীমাহীন ব্যস্ত তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। একজন সেক্টর কমান্ডারের স্বপ্নের কথা শুনবার সময় তার নেই।

কিন্তু নতুন দেশ নিয়ে তাহেরের মনে তখন স্বপ্নের কারখানা। তাহের সিদ্ধান্ত নেন তার ভাবনাগুলো লিখে ফেলবেন, ছাপাবেন। লোকে জানুক, কে জানে হয়তো শেখ মুজিবেরও চোখে পড়বে। সারাদিনের কাজের শেষে রাতে ফিরে কখনো নিজে লিখতে বসেন তিনি, কখনো ডিকটেশন দেন লুৎফাকে। তার স্বপ্নের বাংলাদেশ নিয়ে একটি লেখা লিখে তাহের ছাপিয়ে দেন জনপ্রিয় পত্রিকা বিচিত্রায়। সোনার বাংলার এক রোমন্টিক ছবি আঁকেন তাহের :

"আমি একটি সোনার বাংলার চিত্র দেখেছি। এ চিত্র কল্পনায় কেটেছে আমার বহু বিনিদ্র রাত। এ ছবি আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে, উত্তেজিত করেছে। এর কল্পনায় বারবার আমার মনে হয়েছে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমি এক অসীম শক্তির অধিকারী। এই ছবিই আমাকে সাহস যুগিয়েছিল পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে আমি জনগণের সাথে একাত্ম হয়েছি। বাংলার মানুষের নিবিড় সংস্পর্শে এসে আমি দেখেছি তাদের উদ্যম, কষ্টসহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা আর দেশপ্রেম। আমি জেনেছি বাংলার এই অশিক্ষিত, প্রতারিত জনগণই হচ্ছে প্রকৃত প্রগতিশীল। তারাই বাংলার সুপ্ত শক্তি। বাংলার এই জনগণকে আমি আমার চিত্রকল্পনায় অংশীদার করতে চাই। আমি চাই তারা গভীরভাবে এই চিত্র উপলব্ধি করুক। রোমাঞ্চিত হোক, উত্তেজিত হোক। তাদের শক্তির পূর্ণ প্রকাশের মাধ্যমে ইতিহাসের জাদুঘরে বন্দি ধন ধান্যে পুষ্পেভরা সোনার বাংলাকে মুক্ত করুক ...।"

তাহেরের সোনার বাংলার ভিত্তি হচ্ছে নদী। তাহের লেখেন নদী আমাদের প্রাণ অথচ ক্রমাগত অবহেলা আর বিরুদ্ধাচরণে সেই নদীর চঞ্চল প্রবাহ আজ স্তিমিত। তাহের এমন একটি সোনার বাংলার কল্পনা করেন যেখানে এই নদীর দুপাশে বিস্তীর্ণ, উঁচু বাঁধ। সে বাঁধের উপর দিয়ে চলে গেছে মসৃন সোজা সড়ক, রেলপথ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন। বাঁধের উভয় পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রাম। সেখানে নির্ধারিত দূরত্বে একই নকশার অনেক বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে এক একটি জনপদ। প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গণ আর চারদিকে ফুল। বাড়ির পেছনে রকমারী সবজির সমারোহ। আছে খোলা মাঠ। বিকেল বেলা বুড়োরা এই মাঠের চারপাশে বসে গল্প করে। ছেলে মেয়েরা মেতে ওঠে নানা খেলায়। সকালবেলা সামনের সোজা সড়ক থেকে বাসের হর্ন

শোনা যায়। হৈ চৈ করে ছেলে মেয়েরা যায় স্কুলে। এ জনপদে সন্ধ্যার পর নেমে আসে না বিভীষিকা। রাস্তায় বিজলী বাতি জ্বলে ওঠে। প্রতি গ্রামে আছে একটা মিলন কেন্দ্র। সন্ধ্যায় বয়স্করা সেখানে যায়। সারাদিনের কাজ পর্যালোচনা করে। আগামী দিনের পরিকল্পনা করে। সেখানে বসে তারা টেলিভিশন দেখে। জনপদের নানা অগ্রগতির খবর পায় টেলিভিশনে, নেতার নির্দেশ পায়। এ জনপদের বাঁধের দুপাশে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত। বর্ষায় স্লুইস গেট দিয়ে বন্যার পানি ফসলের ক্ষেতগুলোকে করে প্লাবিত,আবৃত করে পলিমাটিতে। এখানে স্বল্পকালীন স্বার্থে নদীর স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করার কোনো অপচেষ্টা নেই। প্রকৃতির সঙ্গে অপূর্ব সমঝোতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা এই জনপদ যেন প্রকৃতিরই আরেকটি প্রকাশ। এ জনপদের বাঁধের উপরই রয়েছে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চিত্রশালা, নাট্যশালা, হাসপাতাল, শিল্প কারখানা, বিমানবন্দর। নদীর পাশে গড়ে উঠা এই জনপদের সুস্থ মানুষেরা হাসে, গান গায়।

এই স্বপেন্ন জনপদ কি গড়া সম্ভব? তাহের লেখেন অবশ্যই সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন বিপ্লবী জনগণ। প্রয়োজন একটি বিপ্লবী জাতীয় পরিকল্পনার। বৈদেশিক সাহায্য, টাকা আর টেন্ডারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা নয়। একটা আদর্শগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পরিকল্পনা।

তাহের বছরকে দুটো ভাগে ভাগ করবার পরামর্শ দেন। বর্ষা আর শীত। বর্ষায় হবে পরিকল্পনা প্রনয়ন, পর্যালোচনা হবে আগের বছরের ভুলভ্রান্তির। আর শীতকালে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োগ করা হবে শ্রমশক্তি। সারাদেশে তখন হবে কর্মশিবির। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কর্মক্ষম সবাই ঐ কর্মশিবিরে যোগ দেবে। স্কুল কলেজ এ সময় বন্ধ থাকবে। ধনী গরিব সবাই একসঙ্গে কাজ করবে এই কর্মশিবিরে। আর্মি, বিডিআর, পুলিশও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে এখানে কাজ করবে। এতে তাঁদেরও আত্মশুদ্ধি হবে। তারা পরিণত হবে জনগণের বাহিনীতে।

যুদ্ধের আগে সিরাজ শিকদারের সঙ্গে মিলে তাহেরের বিপ্লবের পরিকল্পনা নষ্ট হয়েছিল অঙ্কুরেই। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের বিপুল সাধারণ মানুষের শক্তি, স্বপ্ন, সম্ভাবনার সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে নতুনভাবে জারিত হয়েছেন তাহের। তার স্বপ্নের দেশ গড়বার সুযোগ এসেছে হাতের মুঠোয়। তবে সে মুহূর্তে খানিকটা দ্বিধান্বিত তাহের। তাহের ভাবেন তিনি কি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর থেকে, সেনাবাহিনীর মধ্যেই তার মেধা, শ্রম নিয়েজিত করবেন নাকি এ কাঠামো থেকে বেরিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বিপ্লবী রাজনীতিতে?

তাহের ভাবেন এই নতুন রাষ্ট্রটি এখনও একটা ফরমেটিভ, নির্মীয়মান অবস্থায় আছে। তিনি পুরোপুরি এর ওপর আস্থা হারান না। আরও একটু পর্যবেক্ষণে থাকতে চান। সিদ্ধান্ত নেন তার নিজের কাজের যে ক্ষেত্র সেনাবাহিনী, সেখানে থেকেই আপাতত তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবেন এবং সেখান থেকেই

ক্রমশ জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখবার চেষ্টা করবেন। শেখ মুজিবের ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ, তাহের তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে যাবেন।

গরুর দড়ি

আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তখন শেখ মুজিবের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি তাজউদ্দীন আহমদ। যুদ্ধের নয়টি মাস দেশজুড়ে মানুষকে যিনি ভুলিয়ে রেখেছিলেন শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি। কিন্তু স্বাধীনতার পর তার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে শেখ মুজিবের। স্বাধীন দেশে শেখ মুজিব যেদিন ফিরলেন, বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নামলে তাকে প্রথম জড়িয়ে ধরেন তাজউদ্দীন। লক্ষ মানুষের ঢল ঠেলে মুজিব বাড়িতে পৌঁছালে তাজউদ্দীন তাকে বিশ্রামের জন্য বাড়িতে রেখে ফিরে যান। বলেন আসবেন পরদিন সকালে। কিন্তু বাড়ি ফেরে না যুবরাজরা। শেখ মণি এবং তার সঙ্গী তরুণেরা সে রাতে শেখ মুজিবের ঘরে রুদ্ধদ্বার আলাপ করেন দীর্ঘক্ষণ। প্রথম রাতেই সেই তরুণদের কাছে শেখ মুজিব নেন দেশের নানা পাঠ। পাঠের অন্তর্ভুক্ত বিষয় তাজউদ্দীনও। শেখ মণিসহ তার সঙ্গীরা যুদ্ধের পুরোটা সময় বিরোধিতা করেছেন তাজউদ্দীনের। তাজউদ্দীন তাদের কাছে ক্ষমতালোভী একজন মানুষ যিনি স্বতোপ্রণোদিত হয়ে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এইসব কথার ধোঁয়ায় শেখ মুজিবের কান ভারী করেন তারা। বিড়াল মারা হয় প্রথম রাতেই। এর পরিণতি হয় সুদূর প্রসারী। পরদিন ভোরে তাজউদ্দীন দেখা করতে গেলে শেখ মুজিব থাকেন শীতল।

অতি উৎসাহে তাজউদ্দীন বলেন : মুজিব ভাই, ছেলেপেলেদের হাতে প্রচুর অস্ত্র, এগুলো ওদের হাত থেকে সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

মুজিব বলেন : ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, আমি বললেই ওরা অস্ত্র সব জমা দিয়ে দিবে।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন তাজউদ্দীন।

তাজউদ্দীন উদগ্রীব হয়ে থাকেন কবে শেখ মুজিব তাকে ডাকবেন নয় মাস রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে তার ছুটে বেড়াবার অভিজ্ঞতা শুনতে। কিন্তু সে ডাক আর আসে না।

সাহায্যের জন্য বাংলাদেশকে তখন হাত প্রসারিত করতে হচ্ছে চারদিকে। সবচাইতে ধনবান দেশ আমেরিকা এবং তার সহযোগী বিশ্ব ব্যাংকের দিকেও। কিন্তু তাজউদ্দীন বললেন না খেয়ে থাকব তবু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নেব না। সবি তো গেছে এই অহংকারটুকুও বিসর্জন দিতে হবে আমাদের?

কিন্তু নিঃস্বের অহংকারের জোর আর কতক্ষণ? ওয়ার্ল্ডব্যাংকের প্রধান ম্যাকনামারা একদিন বাংলাদেশে আসেন সাহায্যের ঝুলি নিয়ে। তাজউদ্দীন একটু

যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেন। বলেন বিমানবন্দরে আমি তাকে রিসিভ করতে যাবো না। অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়মমাফিক তারই যাওয়ার কথা। শেখ মুজিব অনুরোধ করেন কিন্তু তাজউদ্দীন যাবেন না। শেখ মুজিব বলেন, তাহলে কি আমি যাবো?

না আপনিও যাবেন না : বলেন তাজউদ্দীন।

শেষে ম্যাকনামারাকে রিসিভ করতে যান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।

ম্যাকনামারার ব্যাপারে তার এই অস্বাভাবিক আচরণ শুরু হয়েছে আরও আগেই। ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে তাজউদ্দীন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন। সে অনুষ্ঠানে আছেন ম্যকনামারাও। ভারত সরকার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বসার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে তাজউদ্দীনকে বসতে হয় ম্যাকনামারার পাশে। সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো চলছে। তাজউদ্দীন এবং ম্যাকনামারা পাশাপাশি বসে আছেন। কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানে সৌজন্যবশত হলেও তাজউদ্দীন একটি কথাও বলেননি ম্যাকনামারার সঙ্গে। যেন এক অভিমানী বালক।

কিন্তু বাংলাদেশে যখন এসে পড়েছেন ম্যাকনামারা, তখন অর্থমন্ত্রী হিসেবে শেষ পর্যন্ত তাকে তার সঙ্গে বৈঠকে বসতেই হয়। লাঞ্চে বসেন তার সঙ্গে। সাথে প্লানিং কমিশনের অন্যতম সদস্য নুরুল ইসলাম। সেখানে প্রায় পরাবাস্তব এক নাটকের অবতারণা করেন তাজউদ্দীন।

ম্যাকনামারা : মিস্টার মিনিস্টার আমাকে বলুন বাংলাদেশের কোথায় কি ধরনের সাহায্য দরকার।

তাজউদ্দীন : মিস্টার ম্যাকনামারা আমাদের যা দরকার তা আপনি দিতে পারবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।

ম্যাকনামারা : মিস্টার মিনিস্টার আপনি বলুন আমরা চেষ্টা করব দিতে।

তাজউদ্দীন : মিস্টার ম্যাকনামারা আমার এখন অনেক গরু দরকার। যুদ্ধের সময় তো কৃষকদের সব গরু হারিয়ে গেছে। এখানে ওখানে চলে গেছে, মরে গেছে। পাকিস্তান যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে চাষীরা এদিক সেদিক পালিয়ে গেছে। সে সময়ই গরু সব হারিয়ে গেছে তাদের। এখন যুদ্ধ শেষ, চাষী ফিরেছে কিন্তু গরু নাই, তাই চাষ করবে কিভাবে? তাই এখন আমাদের প্রথম দরকার গরু।

ম্যাকনামারা অপ্রস্তুত। কি বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

তাজউদ্দীন বলেন : আরও কথা আছে। গরুর পাশপাশি আমাদের অনেক দড়িও দরকার। আমাদের সব দড়ি তো পাকিস্তানিরা নষ্ট করে ফেলেছে, পুড়িয়ে ফেলেছে। এখন শুধু গরু পেলে তো হবে না, গরুকে বাঁধতেও হবে। গরু আর দড়ি খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন। তা না হলে সামনের মৌসুমে জমিতে চাষ হবে না।

অস্বস্থিতে নুরুল ইসলাম জানালা দিয়ে আকাশ দেখেন, এদিক ওদিক তাকান। শেষে বলেন : আমাদের এর পাশাপাশি আরও অন্যান্য প্রয়োজনও অবশ্য আছে।

মিটিং শেষে তাজউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করেন নুরুল ইসলাম : আপনি এমন কেন করলেন?

তাজইদ্দীন ক্ষেপে যান : কেন ভুল কি বলেছি? গরু ছাড়া কি চাষ হবে? ... আরে ঐ লোকটা তো আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারি ছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংশ করতে চেয়েছে আমেরিকা। আমাদের স্যাবোটাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছে আমাদের ধ্বংস করে দিতে। ওদের সাহায্য ছাড়া চলা কি আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব? হয়তো কষ্ট হবে কিন্তু আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি না?

কঠিন মানুষ তাজউদ্দীন।

কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হতো যদি তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটত তাজউদ্দীনের। সরকারের ভেতর তাজউদ্দীনই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ভাবনার দিকে। কদাচিৎ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দেখা সাক্ষাত হলেও পরস্পরের ভাবনা সমবায় করবার সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি তাদের।

দু দিকে জ্বালানো মোমবাতি

ইংল্যান্ডের গার্ডিয়ান পত্রিকা স্বাধীনতার মাস কয়েকের মাথায় লেখে 'ধ্বংসের মুখে বাংলাদেশ'।

তাজউদ্দীন যতই আস্ফালন করুন শেখ মুজিব টের পান বাংলাদেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাকে দু হাত বাড়াতে হবে চারদিকে। খোলা রাখতে হবে সব কটা জানালা যাতে বিশ্বের যত শক্তিমান, সম্পদশালী দেশগুলোর হাওয়া আসে। পরাশক্তির একটি রাশিয়া, তাকে নিয়ে শেখ মুজিবের দুশ্চিন্তা কম। রাশিয়া মুক্তিযুদ্ধে সব সময় পাশেই ছিল বাংলাদেশের। স্বাধীনতার পরপরই শেখ মুজিবকে তাদের দেশে নিমন্ত্রণ করে রুশ সরকার। রুশরা ঐ নতুন দেশটি রাখতে চায় তাদের ছাতার তলে। ব্রেজনেভ তার ঘন জোড়া ভুরু স্থির রেখে খোলা হাতে সই করেন একাধিক চুক্তি। বাংলাদেশ পেয়ে যায় তাদের অগঠিত বিমানবাহিনীর প্রথম বিমান আর হেলিকপ্টার, দলে দলে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা পড়বার সুযোগ পায় কিয়েভ, তাসখন্দ আর মস্কোতে। আর কাঁটা বাছার মতো করে একটি একটি করে জলমাইন তুলে দিয়ে রুশ নাবিকরা অকেজো চট্টগ্রাম বন্দরকে মসৃণ করে দিলে রাঁজহাসের মতো আসতে থাকে দেশ-বিদেশের জাহাজ।

শেখ মুজিব আমেরিকাকে টানবার জন্যও তৎপর হন। তিনি বলেন, সন্দেহ নেই আমেরিকা বিরোধিতা করেছে মুক্তিযুদ্ধের। কিন্তু আমেরিকার মতো

পরাক্রমশালী দেশটিকে উপেক্ষা করবার শক্তি আছে কি বাংলাদেশের? উপেক্ষা করে লাভ আছে কি? শেখ মুজিব তাই আমেরিকার দিকেও হাত বাড়ান। দেখা করেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন আর কিসিঞ্জারের সঙ্গে, যারা ঘোর বিরোধিতা করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার। কিন্তু দেশের মাঠ, ফসল সব নিশ্চিহ্ন, খাদ্য সাহায্য দিতে পারে কেবল আমেরিকাই। দেশ বাঁচাতে শত্রুরও দ্বারস্থ হতে হয় শেখ মুজিবকে। মোটা চশমার নিচে কিসিঞ্জারের চোখ হাসে। শেখ মুজিবের আমন্ত্রণে ঢাকা আসেন কিসিঞ্জার। মাত্র ১৯ ঘণ্টার জন্য। কিসিঞ্জার আসবার ঠিক আগে আগে পদত্যাগ করতে হয় তাজউদ্দীনকে। ম্যাকনামারার সঙ্গে তাজউদ্দীন যেমন করেছিলেন তেমন কোনো নাটকের অবতারণা যেন না হয় তার ব্যবস্থা করা হয় আগে ভাগেই। কিসিঞ্জার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে যান ঢাকা থেকে।

আর সম্পদ আছে তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোতে। খোঁজ পাওয়া যায়, সে দেশগুলো মিলিত হবে পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে। বাংলাদেশের কি উচিত সে সম্মেলনে যোগ দেওয়া? বাংলাদেশ কোনো ধর্মভিত্তিক দেশ নয়, সে কেন যাবে ইসলামী সম্মেলনে? তাছাড়া এ সম্মেলন হবে কিনা পরাজিত পাকিস্তানে। এ সম্মেলনে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের জন্য হয়তো সমীচীন নয়। কিন্তু শেখ মুজিব তখন মরিয়া। এই সম্মেলনকে একটা সুযোগ হিসেবে দেখতে চান মুজিব। এখানে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। আটকে পড়া বাঙালি এবং বিহারীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো, যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাঠানো, সম্পদের হিস্যা, সর্বোপরি স্বীকৃতি। সবকিছুর একটা সমাধান হতে পারে। তাছাড়া সেখানে জড়ো হবে ধনবান সব আরব দেশগুলোর প্রধান। তাদের সঙ্গেও প্রয়োজন বন্ধুত্ব। ফলে শেখ মুজিব লাহোরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কাজ হয় তাতে। স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক। মিসরের রাষ্ট্রনায়ক আনোয়ার সাদাত, আলজেরিয়ার কিংবদন্তি নেতা হোয়ারী বুমেদীন আসেন ঢাকায়। আসেন ভুট্টোও। অবশ্য বাংলাদেশ নিয়ে ভুট্টোর প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা লুকানো থাকে না। বিচিত্র রঙের শার্ট, মাথায় ক্যাপ পড়ে হালকা চালে বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান ভুট্টো, যেন পিকনিকে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ পেয়ে যায় জাতিসংঘের সদস্যপদ। জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন শেখ মুজিব।

ব্যক্তিত্বের ক্যারিশমাকে সম্বল করে, মোমবাতির ডান বাম দুদিকেই জ্বালিয়ে বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে চলেন শেখ মুজিব।

লাঙ্গল ব্রিগেড

অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের পদ থেকে তাহেরকে বদলি করা হয় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের পুরো ব্রিগেডের দায়িত্ব দিয়ে। খুশিই হন তাহের। লুৎফাকে বলেন

: ভালোই হলো, নিজের মতো করে একটা ব্রিগেড তৈরি করা যাবে। যে ধরনের আর্মির কথা আমি বলছি তার একটা মডেল করে আমি দেখাতে পারব।

কুমিল্লা ব্রিগেডের দায়িত্বে তখন ব্রিগেডিয়ার জিয়া। জিয়াকে পদোন্নতি দিয়ে করা হয় মেজর জেনারেল এবং তাকে উপ সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়ে বদলি করা হয় ঢাকায়। মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ্ শুরু থেকেই পালন করছেন সেনা প্রধানের দায়িত্ব।

তাহের দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য চলে যান কুমিল্লায়। জিয়ার কোয়ার্টারের লনে বিকালে বসে আড্ডা দেন। যুদ্ধের সময় তেলঢালা ক্যাম্পে বসে এমন আড্ডা দেবার স্মৃতি মনে পড়ে তাদের। এসব আড্ডায় অধিকাংশ সময় তাহের বক্তা, জিয়া শ্রোতা। জিয়া স্বল্পবাক এবং সাবধানী। অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, নিজের মতো সহজে জানান না। তাহের বলেন : স্যার, ঢাকায় যাচ্ছেন, ওখানে থিংকস আর গেটিং কম্প্লিকেটেড। দি লাইন বিটুউন পলিটিকস অ্যান্ড আর্মি ইজ গেটিং ব্লার্ড। অনেক আর্মি অফিসাররাই এজিটেটেড কারেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে।

জিয়া মাথা নাড়েন : ইয়েস আই নো।

তাহের বলেন : আমার কথা হচ্ছে শুধু এজিটেটেড হলে তো হবে না। পুরো পলিটিকসের ডিনামিক্সটা বুঝতে হবে। আমি মনে করি, আর্মি শুড প্লে এ রোল ইন নেশন বিল্ডিং। কিন্তু সেটা একটা প্রপার আইডিওলজি দিয়ে গাইডেড হতে হবে। একটা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের আর্মিটা ফর্ম হয়েছে, সেই স্পিরিটটা রাখতে হবে। এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, সিরিয়া, ঈজিপ্টে আর্মি কি একটা ন্যাশনালিস্ট রোল প্লে করছে না? আমি স্যার কুমিল্লায় কিছু জিনিস এক্সপেরিমেন্ট করব। আমি হোপ ইউ উইল সাপোর্ট মি এন্ড ইউ ডিড ডিউরিং ওয়ার।

জিয়া : শুরু করো অ্যান্ড কিপ ইন টাচ উইথ মী।

জিয়া আর তাহের যখন গল্প করছেন, তখন তাহেরের মেয়ে জয়া আর জিয়ার ছেলে কোকো দুজন ছোটাছুটি করে খেলে লনে। আর ঘরের ভেতর কথা বলেন লুৎফা আর খালেদা। সাদামাটা গৃহিণী খালেদা লুৎফার সঙ্গে আলাপ করেন সংসারের নানা টুকিটাকি নিয়ে। ঢাকায় কোথায় জিনিস সস্তা পাওয়া যায় খোঁজ খবর নেন। সোয়ারী ঘাট থেকে কিনলে মাছ একটু কম দাম পড়ে কিনা জানতে চান। লুৎফার তখন জানবার কথা নয় যে একদিন এই গৃহবধূকে নিতে হবে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার ভার। তাহেরেরও জানার কথা নয় এই দুই পরিবারের যোগাযোগের এই নিরপদ্রুপ আবহ ক্রমশ ধাবিত হবে এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে।

জিয়া চলে গেলে তাহের পুরো ব্রিগেডের দায়িত্ব নেন এবং খোল নালচে পালটে ফেলেন ব্রিগেডের। তাহেরের মনে 'পিপলস আর্মির' যে ধারণা রয়েছে তার পরীক্ষায় নেমে পড়েন তিনি।

পুরো ব্রিগেডকে ফল ইন করিয়ে তিনি বলেন : ক্যান্টনমেন্টে বসে শুধু পিটি, প্যারেড আর ভলিবল, ফুটবল খেললে চলবে না, মানুষের ভেতরে গিয়ে, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে হবে।

তিনি দায়িত্ব ভাগ করে দেন। ব্রিগেডের এডুকেশন কোরকে নির্দেশ দেন গ্রামে গিয়ে প্রাইমারি স্কুল আর বয়স্ক শিক্ষার অনানুষ্ঠানিক স্কুল খুলতে। তিনি বলেন এডুকেশন কোরের সিপাই, অফিসাররা দিনে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের পড়াবে, রাতে পড়াবে বুড়োদের। মেডিকেল কোরকে তিনি বলেন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা জ্ঞান দিতে। উৎসাহে সৈনিকরা মিলে সব নেমে পড়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশের গ্রামে।

অন্য সিপাইদের তাহের লাগিয়ে দেন ক্যান্টনমেন্টের আশপাশের পতিত জমিগুলোতে চাষ করতে। কাছেই কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা বার্ড। সেখান থেকে চাষাবাদ বিষয়ে নানা বই যোগাড় করা হয়। তাহের সব অফিসারদেরও বাধ্য করেন সকালে ক্ষেতে কাজ করতে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তাহেরের অধীনে কাজ করছেন মেজর ডালিম, জিয়াউদ্দীন প্রমুখেরা। তারা সবাই তখন সৈনিক কৃষক। লাঙ্গল কোদাল নিয়ে অন্যদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েন এক পাহীন ব্রিগেড কমান্ডার তাহেরও। ক্যান্টনমেন্টের আশপাশে লাগানো হয় প্রচুর আনারস, লেবু গাছ, সেইসঙ্গে শাল আর সেগুন গাছ। সবার মধ্যেই বেশ একটা উদ্দীপনা দেখা দেয়। সেবার ময়নামতির পাহাড়ি ঢালুতে আড়াই লাখ আনারস আবাদ করেন ব্রিগেডের সৈনিকরা। আনারস বিক্রি করে ক্যান্টনমেন্টের আয়ও হয় প্রচুর। তাহের তার ব্রিডেগের প্রতীক করেন লাঙ্গল।

তাহের লুৎফাকে বলেন : যুদ্ধের সময় অফিসার, সিপাইরা কি দুর্দান্তভাবে মিশে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে। আর যুদ্ধের পর তারা যেন হয়ে গেছে দুই পৃথিবীর বাসিন্দা। আমি এই দূরত্বটা ঘুচিয়ে দিতে চাই।

লুৎফাও সক্রিয়ভাবে লেগে পড়েন তাহেরের এই নতুন উদ্যোগে। আশপাশের গ্রামের যেসব মেয়েরা যুদ্ধের সময় ধর্ষিতা হয়েছেন, যাদের স্বামী মারা গেছেন তাদের জন্য ক্যান্টনমেন্টের বাইরে তাঁবু টেনে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লুৎফা এদের জন্য নানা রকম কাজের ব্যবস্থা করেন। তাদের সেলাই শেখানো হয়, শেখানো হয় নানা কুটির শিল্প। ঐ মেয়েদের বানানো কাপড় এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়েই উদ্বোধন হয় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের পাশের খাদি দোকানগুলো, যা দাঁড়িয়ে আছে আজো।

তাহের সিপাই আর অফিসারদের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবারও নানা উদ্যোগ নেন। অফিসারদের নিজস্ব ক্লাব থাকলেও সিপাইদের বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না তখন। তাহের সিপাই আর অফিসারদের পরিবার মিলিয়ে যৌথ পিকনিকের ব্যবস্থা করেন। সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এমনটি আর ঘটেনি আগে

কখনো। সিপাইদের স্ত্রীদের জন্য করা হয় ক্লাবের ব্যবস্থা। সেখানে সিপাইদের স্ত্রীদের পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেন লুৎফাসহ অন্য অফিসারদের স্ত্রীরা। সিপাই, অফিসার মিলে আয়োজন করেন বিচিত্রা অনুষ্ঠান।

কুমিল্লা ব্রিগেডে ভিন্নতর এক আবহ। বিকেলের শেষ আলোয় সিপাইরা ফুটবল খেলে, দেখা যায় মাঠের মধ্যে ক্র্যাচ নিয়েই লাফিয়ে লাফিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এক খেলোয়াড়। যুদ্ধাহত অভিনব এক ব্রিগেড কমান্ডার।

সন্ধ্যায় অফিসারদের জন্য তাহের চালু করেন পলিটিক্যাল ক্লাস। কখনো ডিনারের আগে, কখনো পরে জুনিয়র অফিসারদের নিয়ে বসেন তাহের। ক্রাচটি দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে তাহের তাদের উদ্দেশে বলেন : আমাদের আর্মির হিস্ট্রিটাকে তোমাদের ক্রিটিক্যালি দেখতে হবে। পাকিস্তান আর্মি যাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল এরা তো সব ব্রিটিশ আর্মিরই লোকজন। ব্রিটিশদের চাকরি করত, পরে পাকিস্তান হওয়াতে তারাই হয়েছে পাকিস্তান আর্মি। ব্রিটিশ আর্মিতে যে ইন্ডিয়ানরা চাকরি করত, হোয়াট ওয়াজ দেওয়ার রোল? ওরা ছিল একটা ভাড়াটে বাহিনী। লোকাল আপরাইজিংগুলোকে ঠেকানোর জন্য এই আর্মি ব্যবহার করা হতো। ঐ বাহিনীকেই তারা লেলিয়ে দিয়েছিল সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে, টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে, বাহাদুর শাহ জাফরের বিরুদ্ধে। ইন্ডিয়ান সোলজার, অফিসাররা তাদের দেশের মানুষের বিদ্রোহগুলোর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। এরা ছিল স্রেফ ব্রিটিশদের তাবেদার, ঠেঙ্গারে বাহিনী। একমাত্র মিউটিনির সময় প্রথম ব্রিটিশদের টনক নড়ে। ওরা তখন সাবধান হয়ে যায় সিপাই আর অফিসার রিক্রুট করার ব্যাপার। বেছে বেছে শুধু গুর্খা, শিখ আর পাঞ্জাবিদের রিক্রুট করতে থাকে, কারণ তারা ছিল ব্রিটিশদের মোস্ট ট্রাস্টেট। পাকিস্তান আর্মি তো ঐ ধরনের ব্রিটিশ ভাড়াটে বাহিনীরই কন্টিনিউশন। তাদের মাইন্ড সেটটাও তো তাই, শুধু কারো না কারো তাবেদারী করা আর ঠেঙ্গানো।

কিন্তু আমরা বাংলাদেশ আর্মি তো গড়ে তুলেছি একটা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আমরা কেন ঐ লেগাসি ক্যারি করব? আর্মি এদেশের মানুষ দিয়েই তৈরি কিন্তু এই অর্গানাইজেশনটাকে সমাজের সবরকম কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা আছে সবসময়। আর্মির লোকের সাথে সাধারণ মানুষের মেলামেশার কোনো সুযোগ নাই। এতে করে একটা এলিটিস্ট মানসিকতা তৈরি হয়। যেন আর্মির কাজ হচ্ছে দেশের মানুষের উপর খবরদারী করা। এটা একটা তাবেদার আর্মির এজেন্ডা হতে পারে। বাংলাদেশের আর্মির মাইন্ড সেটটা এমন হবে কেন, যার জন্ম হয়েছে একটা জনযুদ্ধের মধ্যে। আমাদের আর্মিকে হতে হবে পিপলস আর্মি।'

তাহেরের নির্দেশে নতুন ধরনের আর্মির এই মডেলে কাজ করলেও সবাই যে তার সঙ্গে একমত হন তা নয়। গুটিকয় তরুণ অফিসার অনুপ্রাণিত হন তার মন্ত্রে। এর মধ্যে অন্যতম মেজর জিয়াউদ্দীন, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় সুন্দরবন

এলাকায় যুদ্ধ করে জন্ম দিয়েছেন কিংবদন্তির। জিয়াউদ্দীন প্রায়শই পৃথকভাবে এসে দেখা করেন তাহেরের সঙ্গে। বলেন; আমি স্যার আছি আপনার সঙ্গে।

ঢাকায় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তাহেরের কাজকর্ম নিয়ে শুরু হয়ে যায় নানা কানাঘুষা। ব্রিগেড কমান্ডারদের মিটিং এ টিটকারী দিয়ে একজন বলেন : কুমিল্লায় লাঙ্গল ব্রিগেড চালু করে তাহের তো সবাইকে কমিউনিস্ট বানাচ্ছে।

আনারসের চোখ

তাহের ক্যান্টনমেন্টের ভেতর যতই লাখ লাখ আনারসের চোখ ফুটিয়ে রাখুন না কেন, বাংলাদেশের নানা প্রান্তের মানুষের চোখে তখন সংকট আর দ্বিধার কুয়াশা। স্বাধীনতার পর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের যে জটিল, বিচিত্র প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে অতিক্রম করা হয়ে উঠেছে দুরূহ।

দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কখনো কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে, কখনো ঢাকায় নিয়মিত তাহেরের সঙ্গে আলাপ চলে ভাই ইউসুফ, আনোয়ারের সঙ্গে, সেখানে মাঝে মাঝে যোগ দেন তার পাকিস্তান পালানোর সঙ্গী কর্নেল জিয়াউদ্দীন। আর্মির ভেতরকার অবস্থা নিয়ে কথা হয়।

জিয়াউদ্দীন বলেন : আই থিংক শেখ মুজিব রিয়েলি মেইড এ মিসটেক বাই নট মেকিং জিয়া দি চিফ।

তাহের : ওসমানী ডাজ নট লাইক হিম। যুদ্ধের সময় তুমিও তো দেখেছ কিভাবে বেশ কবার তাদের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয়েছে নানা পয়েন্টে।

জিয়াউদ্দীন : শফিউল্লাহ তার ব্যাচমেট হলেও তো সার্ভিস ওয়াইজ জিয়ার জুনিয়র। আই অ্যাম সিওর জিয়া ডিড নট টেক দিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইজিলি।

তাহের : অবশ্য জিয়া এমন একজন মানুষ, যিনি নাইদার হিয়ার নট দেওয়ার। বগুড়ায় বাড়ি হলেও বাবার চাকরিসূত্রে হি ওয়াজ ব্রট আপ ইন করাচি। সারা জীবন পশ্চিম পাকিস্তানে থাকলেও বাঙালি হওয়ার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাকে অবিশ্বাস করেছে আবার সবসময় দেশে থাকেন না, ভালো বাংলা বলতে পারেন না বলে বাঙালিদের সাথেও তার ঘনিষ্ঠতা কম।

জিয়াউদ্দীন : উনি কিন্তু ফার্স্ট টাইম আর্মিতে চান্স পান নাই।

ইউসুফ : তাই নাকি?

তাহের : হ্যাঁ, ওয়েট অনেক কম ছিল। তাকে বলা হয়েছিল তিন মাসের মধ্যে অপটিমাম ওয়েট করতে পারলে নেওয়া হবে। তারপর তো তার মা খুব করে খাইয়ে ওজন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উনি কিন্তু খুব ভালো হকি প্লেয়ার ছিলেন। যাই হোক, আই এগ্রি উইথ ইউ যে জেনারেল শফিউল্লাহকে তার বস বানিয়ে মুজিব একটা পটেলশিয়াল ক্রাইসিস আর্মির ভেতর তৈরি করেছেন।

জিয়াউদ্দীন : আর শেখ মুজিবের নেক্সট মিসটেক হচ্ছে রক্ষীবাহিনী তৈরি করা।

ইউসুফ : অবশ্য আওয়ামী লীগের ছয় দফাতে এমন একটা জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করার কথা আগেই ছিল। তাছাড়া ছেলেরা যেভাবে সব অস্ত্র নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম একটা প্যারা মিলিটারি ট্রুপ বানিয়ে এদেরকে কন্ট্রোলে রাখার জন্য হয়তো এটা করেছেন।

জিয়াউদ্দীন : কিন্তু যে প্রসেসে করা হচ্ছে এটা তো খুব প্রবলেম্যাটিক। শুরুতেই কাদেরিয়া আর মুজিববাহিনীর এদের নেওয়া হলো পিলখানায়। বিডিআরের সাথে মার্জ করার কথা হলো। বিডিয়ারের লোকেরা এটা মানবে কেন? ট্রেইনড আর্মির লোকরা কেন দুমাস স্টেনগান চালানো এসব কৃষক, শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে যাবে? কি প্রচণ্ড গণ্ডগোলটা হলো। শেখ মুজিব ওখানে না গেলে সিপাইরা তো রক্ষীবাহিনীর চিফ ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানকে পিটিয়েই শেষ করে দিত।

তাহের : তাছাড়া যেভাবে এক্সপান্ড করা হচ্ছে রক্ষীবাহিনীকে তাতে আর্মির ভেতর কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন তৈরি হবে।

জিয়াউদ্দীন : এক্সাক্টলি। অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে রক্ষীবাহিনীর স্ট্রেংথ ৮ হাজার থেকে ২৫ হাজার করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর জন্য নানা নতুন সব অস্ত্র আসছে। অনেকেই মনে করছে রক্ষীবাহিনীকে আর্মির বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। মুজিববাহিনীকে ট্রেইন করেছে যে জেনারেল ওবান, তাকে করা হয়েছে রক্ষীবাহিনীর ট্রেইনার। রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারদের ইন্ডিয়ায় নিয়ে ট্রেইনিং দেওয়া হচ্ছে। তাদের ইউনিফর্মও ইন্ডিয়ার আর্মির মতো জলপাই রঙের। এসব কিসের আলামত? ইন্দিরা গান্ধী এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি করেছেন। কি আছে ঐ চুক্তিতে তা তো ভালোমতো আমরা জানিও না। রক্ষীবাহিনীর মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়া আমাদের ওপর তাদের একটা কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করছে কিনা কে জানে?

ইউসুফ : যদিও অবশ্য বলা হচ্ছে রক্ষীবাহিনীর মূল কাজ বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, কালোবাজারি, ছিনতাই দমন। কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই কাউকে গ্রেফতার করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে তাদের।

জিয়াউদ্দীন : সেটাই তো ডেঞ্জারাস। তাদের কাজ বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হলেও তাদের টার্গেট তো দেখছি যারা আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করছে তারা। কোনো গ্রামে রক্ষীবাহিনী তাঁবু ফেললে আতংক ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

তাহের : আমি তো শুনছি রক্ষীবাহিনী মেইনলি ধরছে লেফট পার্টির ছেলেদের। পার্টিকুলারলি সিরাজ শিকদারের দলের লোকদের। সিরাজ শিকদারের কি খবর আনোয়ার?

আনোয়ার : এখন তো আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় থ্রেট সিরাজ শিকদার। সিরাজ শিকদার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ হিসেবে দেখছেন। উনি এ ব্যাপারেও তার ঐ প্রধান দ্বন্দ্ব এবং অপ্রধান দ্বন্দ্বের তত্ত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ইন্ডিয়া আমাদের যুদ্ধে হেল্প করার পর এখন পলিটিক্যালি, ইকোনমিক্যালি আমাদের ওপর ডমিনেট করতে চাচ্ছে। তার মতে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের দ্বন্দ্বই হচ্ছে এখন দেশের প্রধান দ্বন্দ্ব।

জিয়াউদ্দীন বলেন : আই থিঙ্ক হি ইজ রাইট।

আনোয়ার : তারা স্বাধীন বাংলাদেশেও আর্মস স্ট্রাগল চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার গেরিলা গ্রুপ দেশের নানা অঞ্চলে থানা, পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে, অস্ত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

তাহের : কিন্তু আমি মনে করি না দিস ইজ দি রাইট ওয়ে টু প্রটেষ্ট শেখ মুজিব রাইট নাও। সিরাজ শিকদারের সঙ্গে তো আমি কাজ করেছি। তার মধ্যে একটা রেডিক্যালিজম আছে। কিন্তু আই অ্যাম নট শিওর এটা এখন রাইট ওয়ে কিনা।

ইউসুফ : মাওলানা ভাসানীও তো দাঁড়িয়েছেন মুজিবের বিরুদ্ধে। 'হক কথা' তে উনি দেদারেস মুজিবের ক্রিটিসিজম করছেন! অবশ্য জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে উনি যে ভুখা মিছিল করলেন সেটাকে অনেকেই জাস্টিফাইড মনে করছেন। দেশে একটা অপোজিশন তো থাকতে হবে। ইন্ডিয়ার এগেইন্সস্টে ভাসানীও খুব সোচ্চার। সেদিন বক্তৃতায় বললেন, 'না খাইয়া থাকমু তবু ইন্ডিয়ার ভিক্ষার চাল খামু না। কলা গাছের রস দিয়া কাপড় সাফ করমু তবু ইন্ডিয়ার পচা সাবান দিমু না।' শেখ মুজিব রিকোয়েস্ট করলেন তবু তো তিনি তার হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙলেন না, উল্টা হরতাল ডাকলেন।

তাহের : ভাসানী নিঃসন্দেহে একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর কিন্তু তাকে সবসময় আমার ধর্ম এবং অতিবামের একটা বিপজ্জনক মিশ্রণ মনে হয়।

জিয়াউদ্দীন : সেদিক থেকে এনায়েতুল্লাহ খানের 'হলি ডে'তেও যে লেখাগুলো ছাপ হচ্ছে সেগুলো অনেক থটফুল। সেদিন মোহাম্মদ তোয়াহার একটি লেখা পড়লাম। তিনি শেখ মুজিবের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেন তার পক্ষে দেশের কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব না।

তাহের : কিন্তু এই চীনাপন্থীদের বুকিশ এনালাইসিসে আমি সবসময় কনভিন্সড না। দেখেন আব্দুল হক তো এখনও দলের নাম রেখেছেন 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি'। উনি তো বাংলাদেশকেই মেনে নেননি। এটা অ্যাবসার্ড না? আসলে করেন্ট গভর্নমেন্ট, কারেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনকে যেভাবে এরা কাউন্টার করছে আমার কিন্তু কোনোটাকেই রাইট মনে হচ্ছে না।

ইউসুফ : বামদের মধ্যে শেখ মুজিবের একটা কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম করতে পারত মস্কোপন্থীরা। বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি আর ন্যাপ মোজাফ্ফর তো একরকম বিলীনই হয়ে গেছে আওয়ামী লীগের মধ্যে। তারা বলেছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একই সাথে তারা ঐক্য এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল। কিন্ত আওয়ামী লীগের সাথে তাদের যতটা ইউনিটি দেখছি, স্ট্রাগল তো দেখছি না।

জিয়াউদ্দীন : সেজন্যই বলছি যে একটা প্লাটফর্ম থাকা দরকার যেখান থেকে এই গভর্নমেন্টকে ক্রিটিসাইজ করা যায়। হলি ডে একটা প্লাটফর্ম দিয়েছে। আমি তো ভাবছি আমি একটা আর্টিকেল লিখব। তাহের আই নীড ইওর হেল্প ইন দিস রিগার্ড।

তাহের : আমিও মনে করি লেখা উচিত। লেট আস টক এবাউট ইট মোর ইন ডেপথ।

পরিস্থিতি এমনই নাজুক যে দেশের সবচাইতে সুশৃঙ্খল সংগঠন সেনাবাহিনীর দুই অফিসার তখন প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী নিবন্ধ লিখবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

হিডেন প্রাইজ

নিবন্ধ লেখাকে কেন্দ্র করে তাহেরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে কর্নেল জিয়াউদ্দীনের। তাহের বরাবরের মতো জিয়াউদ্দীনের ক্ষোভ এবং উত্তেজনাকে ধাবিত করতে চান দিন বদলের রাজনীতিতে এবং অবশ্যই তা সাম্যবাদী আদর্শে। তাহের তাকে নানাবিধ মার্ক্সবাদী বই সরবরাহ করেন পড়বার জন্য। তাহেরের সূত্রে জিয়াউদ্দীনের কমিউনিজম পাঠ চলতে থাকে শনৈ শনৈ বেগে। প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন জিয়াউদ্দীন।

এসময় তাহের লুৎফাকে একদিন বলেন : জিয়াউদ্দীন এতো বেশি বিপ্লবী হয়ে উঠেছে যে ওকে সামাল দেওয়া মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে।

তাহেরের সঙ্গে পরামর্শ করেই ইংরেজিতে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন কর্নেল জিয়াউদ্দীন এবং তা হলি ডে পত্রিকাতে ছাপা হয় 'হিডেন প্রাইজ' নামে। জিয়াউদ্দীন লেখেন—

"এদেশের মানুষের জন্য স্বাধীনতা আজ মস্তবড় এক পীড়নে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখুন উদ্দেশ্যহীন, গতিহীন, প্রাণহীন মুখগুলো জীবনের যান্ত্রিকতায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সাধারণত নবীন স্বাধীন একটা দেশে কি ঘটে? নতুন উদ্যম আর স্পৃহা নিয়ে জনগণ শূন্য অবস্থা থেকেই তাদের দেশ গড়ে তোলে। জীবন তখন তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় এবং ভয়হীন চিত্তেই তারা

তার মুখোমুখি হয়। কিন্তু বাংলাদেশে আজ ঘটছে তার উল্টোটা। সমগ্র বাংলাদেশ যেন আজ ভিক্ষায় নেমেছে। তার কণ্ঠে কান্না। কেউ কেউ না বুঝেই চিৎকার করছে। দারিদ্র্যের জোয়ারে হারিয়ে যেতে বসেছে সবাই।' লেখাটিতে ভারতের সঙ্গে চুক্তি বিষয়েও বিস্তর ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি এবং শেষে লেখেন : 'আমরা তাকে ছাড়াই যুদ্ধ করেছি এবং জয়ী হয়েছি। প্রয়োজনে আবার যুদ্ধ করব।'

স্পষ্টতই শেখ মুজিবকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে। একজন কর্তব্যরত আর্মি অফিসারের জন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নিয়ে এরকম মন্তব্য করা গুরুতর ধৃষ্টতা। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি তখন অন্যরকম। এ যেন ভয়ানক কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এমনকি শেখ মুজিবও ব্যাপারটিকে এতটা গুরত্বের সঙ্গে নেন না। তিনি কর্নেল জিয়াউদ্দীনকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ক্ষমা চাইতে। জিয়াউদ্দীন ক্ষমা না চেয়ে পদত্যাগ করেন আর্মি থেকে।

তাহেরকে এসে বলেন : নাউ আই এম এ ফ্রি বার্ড। পুরো দেশটাকে একবার ঘুরে দেখতে চাই।

কেতাদুরস্ত কর্নেল জিয়াউদ্দীন কাঁধে এক ঝোলা ব্যাগ নিয়ে ঢাকা রেল স্টেশনে গিয়ে উঠে পড়েন দূর পাল্লার এক ট্রেনের থার্ডক্লাস বগিতে। স্টেশনে তাকে বিদায় দেন তাহের এবং আনোয়ার। বেশ কিছুদিন পর তাহেরকে চিঠি লিখে জিয়াউদ্দীন জানান—'আমি সীমানা অতিক্রম করেছি।' তারপর একদিন তাহের জানতে পারেন জিয়াউদ্দীন সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টিতে।

কোনো কোনো দিন বিকালে তাহের লুৎফাকে নিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে চলে যান দূরে ময়না মতির পাহাড়ে। শিশু জয়া আর লুৎফকে নিয়ে বসেন ঘাসের উপর। হাওয়া বয় চারদিক। কণ্ঠে বিষণ্নতা নিয়ে তাহের বলেন : জিয়াউদ্দীন চাকরিটা ছেড়েই দিল। ওর সঙ্গে পাকিস্তান পালানোর সেই এক্সাইটিং রাতটার কথা মনে পড়ে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল। সিনসিয়ারলি যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সব কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। আমিও কতদিন আর্মিতে থাকতে পারি বুঝতে পারছি না।

উঠে দাঁড়ান তাহের। ক্রাচটা হতে নিয়ে অন্যমনস্ক হেঁটে যান সামনের টিলাটার দিকে। উঠবার চেষ্টা করেন উপরে। পেছন থেকে লুৎফা বলেন : আর উঠার চেষ্টা করো না কিন্তু।

এক দৌড়ে যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন তাহের, ক্রাচে ভর দিয়ে সেখানে সামান্য কয় ধাপ উঠতে পারেন শুধু। ফিরে আসেন, কোলে তুলে নেন জয়াকে। বলেন : বুঝলে লুৎফা পেইন্টার ভ্যানগগ প্রেমিকার জন্য তার একটা কান কেটে ফেলেছিল, আমি তো দেশের জন্য একটা পা'ই কেটে ফেললাম।

নতুন জ্বালামুখ

বাঙালির একটি রাষ্ট্র হয়েছে, এবার দাবি একটি বৈষম্যহীন সমাজের। আকাঙ্ক্ষা সমাজতন্ত্রের। শেখ মুজিব এবং তার সরকার সমাজতন্ত্রকে দেশের চার মূলনীতির একটি হিসেবে ঘোষণা করলেও মানুষ তার নমুনা দেখতে পাচ্ছে না। গোপনে সিরাজ শিকদার সহিংস, জঙ্গি প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের দাবি তুলে যাচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশে, ছোট জনপদে সমাজতন্ত্রের নিরীক্ষা করছেন তাহের। কিন্তু এবার শেখ মুজিবের নিজের দলের ভেতরেই সমাজতন্ত্রের তীব্র দাবি নিয়ে দেখা দেয় এক নতুন জ্বালামুখ। দাবি ওঠে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ভেতর থেকেই।

ছাত্রলীগের নেতা সিরাজুল আলম খান শেখ মুজিবকে গিয়ে বলেন : আপনি কিন্তু চার পায়ার টেবিলের কথা বলে এখন বানাচ্ছেন এক পায়ার টেবিল। বলেছিলেন জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রের কথা, এখন শুধু বাঙালি, বাঙালি বলছেন। জাতীয়তাবাদের এক পায়ার টেবিল হচ্ছে। দেশকে বাঁচাতে হলে সংসদ, মন্ত্রিসভা বাতিল করে, নতুন একটা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশে আনতে হবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।

শেখ মুজিব উত্তেজিত তরুণ নেতার কথা শোনেন।

শেখ মুজিবের কাছে যান তার ভাগনে, তরুণ যুবনেতা, অনেকটা তারই কৃষকায় সংস্করণ শেখ মণি।

শেখ মণি বলেন : ওদের কথায় কান দেবেন না। ওসব বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আসলে প্রতিবিপ্লবী চিন্তা ভাবনা। আমরা দেশে প্রতিষ্ঠা করব নতুন মতবাদ, যার নাম হবে 'মুজিববাদ'। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, প্রাচ্যের সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার মিশ্রণে তৈরি এই হবে মুজিববাদ।

শেখ মুজিব তরুণ এই যুবনেতার কথাও শোনেন।

সিরাজুল আলম খান তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদকে সামনে রেখে এক সম্মেলন ডাকেন পল্টন ময়দানে। তার সঙ্গে আছেন আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, শরীফ নুরুল আম্বিয়া প্রমুখ ছাত্রনেতারা।

অন্যদিকে শেখ মণি তার মুজিববাদের মতবাদকে সামনে রেখে ঐ একই দিনে আরেকটি সম্মেলন ডাকেন রেসকোর্স ময়দানে। তার সঙ্গে আছেন ছাত্রনেতা নুরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ।

দুটি সম্মেলনেরই প্রধান অতিথি হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় শেখ মুজিবের। দুদলই চায় শেখ মুজিব তাদের সঙ্গে থাকুন। চারদিকে টান টান উত্তেজনা। শেখ মুজিব কোনো সভায় যাবেন?

সিরাজুর আলম খানের সভাতে স্লোগান 'বিপ্লব বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব' 'সংগ্রাম সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রাম।' তারা অপেক্ষা করেন শেখ মুজিবের জন্য।

শেখ মণির সভাতে স্লোগান 'বিশ্বে এলা নতুন বাদ, মুজিববাদ মুজিববাদ।' তারাও অপেক্ষা করেন শেখ মুজিবের জন্য।

শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত যান শেখ মণির সভাতেই।

স্পষ্ট হয়ে উঠে শেখ মুজিবের সমর্থক ছাত্র, যুব সংগঠনের ভাঙ্গন।

শেখ মুজিবের কাছে প্রত্যাখাত হয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীরা। এই সম্মেলনের কিছুদিন পরেই আসম আবদুর রব এক ভাষণে বললেন, মুজিব সরকার পাকিস্তানিদের চেয়েও অত্যাচারী হয়ে উঠেছে।

জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বিরোধী দল। নাম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় দলের কমিটি। এ দলের প্রথম সারির নেতা আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ আর আর্মি থেকে অব্যাহতি পাওয়া সেক্টর কমান্ডার আবদুল জালিল। কিন্তু দলের মূল চিন্তক সিরাজুল আলম খান। দলে তার নাম উহ্য থাকে। তিনি বরাবরই নিজেকে আড়াল করে রাখেন রহস্যে।

জাসদের নামে শহরে ছাড়া হয় লিফলেট, যাতে লেখা—'প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তির অধিকারী বাঙালি জাতি আজ এক মহা অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন, বিপ্লবী চেতনা আজ সুপ্ত আগ্নেগিরির মতো স্তব্ধপ্রায়।' এই স্তব্ধ অগ্নিগিরির জ্বালামুখ হিসেবে দেখা দেয় জাসদ।

আওয়ামী লীগের লড়াকু এবং জঙ্গি একটি অংশ বেরিয়েই জন্ম দেয় জাসদ। ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে তারা। সাধারণভাবে লোকে জাসদকে আওয়ামী লীগবিরোধী একটি দল হিসেবে বিবেচনা করে। জাসদের মধ্যে মানুষ স্বাধীনতার পর তাদের হারাতে বসা স্বপ্ন খুঁজে পেতে থাকে। মশাল তাদের প্রতীক। হাজার হাজার তরুণ যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছিল তাদের আকৃষ্ট করে জাসদ। দল হিসেবে জাসদ অতিদ্রুত বাড়তে থাকে। জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ডাক চমক সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে। আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে মানুষ বিবেচনা করতে শুরু করে জাসদকে। কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও আকৃষ্ট হন জাসদের ব্যাপারে। জাসদের দলীয় পত্রিকা 'গণকণ্ঠে'র দায়িত্ব নেন স্বনামধন্য কবি আল মাহমুদ। জাসদে যোগ দেন লেখক আহমদ ছফা। এছাড়াও নানা কারণে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত, শেখ মুজিব বিরোধী, ভারতবিদ্বেষী মানুষেরা এসে ভিড় করেন জাসদে।

জাসদের এই উত্থানকে অনেকে সন্দেহের চোখেও দেখেন। এককালের মুজিব অনুসারী হঠাৎ এমন মুজিববিরোধী হওয়ার কারণ কি? জাসদ কি কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ? তারা কি সি আই এর দালাল? এদের এসব কি নেহাত রোমন্টিকতা উদ্ভুত বামপন্থী ঝোঁক?

নানা প্রশ্ন ঘিরে থাকে জাসদকে।

আওয়ামী লীগ জাসদকে স্বাধীনতা, উন্নয়নের শত্রু ঘোষণা করে।

ব্যাংক ডাকাতির বিভ্রম আর একটি বিয়ের অনুষ্ঠান

শেখ মুজিব তাঁর বিরোধিতাকে প্রাথমিকভাবে অনেকটা উদারভাবে গ্রহণ করেন। পত্রিকায় যে তাঁর বিরুদ্ধে লিখছে, রাস্তায় যে তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে তিনি তাদের ডেকে পাঠান। ধমকের সুরে বলেন, কি চাস তোরা আমাকে বল।

যেন স্নেহময় পিতা শাসন করছেন তাঁর দুরন্ত সন্তানকে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত ধাঁচের শাসন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় সংকট নিরসনে বিশেষ কার্যকরী হয় না। এমনকি তার নিজের সন্তানের ওপর ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি।

তাঁর বড় ছেলে শেখ কামাল ছাত্ররাজনীতিতে বরাবর সক্রিয় ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। খেলাধুলা, সঙ্গীতে আগ্রহী সুবোধ ছেলে হিসেবেই পরিচিতি ছিল তাঁর। কিন্তু স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের নানা কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন তিনি। বিশেষ করে আওয়ামী বিরোধীদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায় তাকে।

আওয়ামী লীগের অন্যতম হুমকি তখন সিরাজ শিকদার। ২৬ মার্চের স্বাধীনতা দিবসে সিরাজ শিকদরের দল সারা ঢাকা শহরে শেখ মুজিববিরোধী পোস্টার, লিফলেট ছাড়ে। তারা ঘোষণা দেয় ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসেও তারা নাশকতামূলক কাজ করবে। বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। ১৫ ডিসেম্বর গভীর রাতে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সার্জেন্ট কিবরিয়া তার দল নিয়ে সাদা পোশাকে একটি টয়োটা গাড়িতে করে বের হন শহর টহল দিতে। তাদের চোখ বিশেষভাবে খুঁজছে সিরাজ শিকদার এবং তার দলের কাউকে। ঐদিন গভীর রাতে একই সময় শেখ কামালও তার সঙ্গী সাথী নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে করে বের শহর প্রদক্ষিণে। তাদের হতে স্টেনগান। তারাও খুঁজছেন সিরাজ শিকদারকে।

গভীর রাতে এক দল আরেক দলের মুখোমুখি হন বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে। একদল জানেন না অন্য দলের খবর। দুদলই একে অপরকে ভাবে বুঝি এরা সিরাজ শিকদারের দল। গোলাগুলি শুরু হয় দু পক্ষের মধ্যে। গুলি লাগে শেখ কামালের শরীরে। রক্তাক্ত অবস্থায় কামাল গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করে বলতে থাকেন : আমি শেখ কামাল।

দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। খুবই ভয় পেয়ে যান সার্জেন্ট কিবরিয়া। প্রধানমন্ত্রীর ছেলের গায়ে গুলি লাগার পরিণতি কি হবে ভেবে আতঙ্কিত তিনি। এদিকে পরদিন বাইরে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যে শেখ কামাল ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন। শেখ মুজিবের দলের নানা বদনামের সঙ্গে যুক্ত হয় পারিবারিক বদনামও।

হতবিহ্বল সার্জেন্ট কিবরিয়া যান শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমা চাইতে। শেখ মুজিব সার্জেন্ট কিবরিয়াকে বলেন : তোমার ভয় পাওয়ার তো কিছু নাই। তুমি ঠিক কাজটাই করেছো। শেখ মুজিব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন কামালের উপর। রাগ করে তিনি দুদিন কামালকে দেখতেও যান না হাসপাতালে। বলেন : মরতে দাও কামালকে।

পরে ক্ষুব্ধ মুজিব কামালকে বলেন : মোনেম খানের পোলার মতো হইস না। তার আগে আমারে গুলি কইরা মার। কপালে আঙ্গুল দিয়ে দেখান তিনি।

সে সময়কার আরেকটি ছোট্ট সামাজিক ঘটনাও দেশের রাজনীতিতে ফেলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। একটি বিয়ের অনুষ্ঠান। রেডক্রসের চেয়ারম্যান প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার এক আত্মীয়ের বিয়ে। আওয়ামী লীগের নানা নেতাকর্মীরা উপস্থিত। উপস্থিত অনেক সামরিক অফিসারও। বিয়েতে আমন্ত্রিত শেখ মুজিবের পরিবারের ঘনিষ্ঠ মেজর ডালিম। ডালিম আর আকর্ষণীয়া স্ত্রী নিম্মিকে নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে গাজী গোলাম মোস্তফারই ছোট ভাই নিম্মিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে। গাজীর ছেলে নিম্মির প্রবাসী ভাইয়ের লম্বা চুল নিয়ে ঠাট্টা মসকারা করে, চুল ধরে টানে। ক্ষেপে যান ডালিম। তিনি চর মারেন গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের গালে। ক্ষুব্ধ, মারমুখী বাদানুবাদ হয় ডালিম আর গাজী গোলাম মোস্তফার ভাই এবং ছেলের সঙ্গে। গাজীর ভাইয়ের সমর্থনে বেশ কিছু গুণ্ডা এসময় যোগ দেয় বিতর্কে। এক পর্যায়ে তারা ডালিম আর নিম্মিকে জোর করে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে থাকেন অন্যত্র। এ খবর পেয়ে ডালিমের বন্ধু মেজর নুর, মেজর হুদা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্রাক বোঝাই সৈন্য নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার নয়া পল্টনের বাড়ি তছনছ করে। পরে কিডন্যাপ করা ডালিম এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় শেখ মুজিবের কাছে। শেখ মুজিবের কাছে ডালিমের নামে মারামারি, হাতাহাতি করার অভিযোগ তোলেন তারা। ক্ষুব্ধ হন ডালিম। পাল্টা অভিযোগ করেন তার স্ত্রীকে অপমান করার। চিৎকার করে তিনি শেখ মুজিবকে বলেন : আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি তখন আপনার ঐ গুণ্ডারা কোথায় ছিল?

শেখ মুজিব আপাতত দুদলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান। পরবর্তীতে মেজর ডালিম, নুর, হুদাসহ আরও যারা এ ঘটনায় যুক্ত ছিলেন তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে আর্মি থেকে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

চাকরিচ্যুতির নোটিস পাওয়া এই অফিসাররা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। ডালিম আহত হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে, নুর ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানীর এডিসি, বাকিরাও নানা সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। এ সিদ্ধান্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া তরুণ এই আর্মি অফিসারদের আহত করে প্রচণ্ড। একে তারা ব্যক্তিগত অপমান বলে

বিবেচনা করেন। বিশেষ করে মেজর ডালিম ছিলেন শেখ মুজিবের পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। শেখ মুজিবের স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসাকে ডালিম মা বলেই ডাকতেন।

ব্যাপারটি একেবারে কাকতালীয় নয় যে, পরবর্তীতে শেখ মুজিবের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের খবর দেশবাসী প্রথম শুনবে মেজর ডালিমেরই কণ্ঠে।

খড়ির গণ্ডির বাইরে

নবগঠিত জাসদের অন্যতম নেতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জলিল একদিন দেখা করেন তাহেরের সঙ্গে। যুদ্ধের পর পর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল মেজর জলিলকে, যিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার। বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে। সে বিচারের দায়িত্ব পড়েছিল কর্নেল তাহেরের ওপর। তাহের তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল। সেটা ছিল অভিনব এক বিচার। এক সেক্টর কমান্ডার বিচার করছেন আরেক সেক্টর কমান্ডারের। যদিও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছিল মেজর জলিলের নামে কিন্তু তাহের খোঁজ পেয়েছিলেন যে স্বাধীনতার পর ঐ অঞ্চলে কিছু ভারতীয় সৈন্য যখন বাংলাদেশের সম্পদ লুটে নিচ্ছিল খুব সোচ্চারভাবে তাতে বাধা দিয়েছেন জলিল। ঐ সময় তার এরকম ভারত বিরোধিতাকে সরকারের ভেতরে অপছন্দ করেছেন অনেকেই। মিত্র ভারতের বড় অফিসাররাও নাখোস হয়েছেন। জলিলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য খুলনা জেলে আটক সেখানকার প্রাক্তন সরকারি এক কর্মকর্তাকে আনা হয়েছিল। এই কর্মকর্তা যুদ্ধের পুরোটা সময় সহায়তা করে গেছেন পাকিস্তানিদের। সাক্ষ্য দিতে এলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেন তাহের। বলেন : দিস ইজ অ্যাবসার্ড। মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডারের বিরুদ্ধে একজন যুদ্ধবিরোধী সাক্ষী দিতে পারে না। গেট আউট।

কোন অভিযোগ শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় না জলিলের বিরুদ্ধে। তাকে বেকসুর খালাস দেন তাহের। মুক্ত জলিল অফিসার্স মেসে বসে আড্ডা দেন তাহেরের সঙ্গে। প্রাক্তন আসামি আর বিচারক একসাথে বসেন চা খেতে। তখনই জলিল তাহেরকে জানিয়েছিলেন তিনি চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে রাজনীতি শুরু করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই জলিল যোগ দেন দেশের প্রথম বিরোধী দল জাসদে। ইতোমধ্যে তাহেরের আরেক সহকর্মী কর্নেল জিয়াউদ্দীন যোগ দিয়েছেন সর্বহারা পার্টিতে।

তাহেরের সঙ্গে দেখা করে জলিল তার জাসদে যোগ দেওয়ার প্রেক্ষাপট তাকে জানান। তাহেরকে বলেন : স্যার, আপনিও চলে আসেন। আর্মিতে থেকে কি লাভ? বড়জোর জেনারেল হবেন।

তাহের বলেন : জলিল, হাউ ফার ডু ইউ নো অ্যাবাওট মি? সময় বলবে সব। আই স্টিল ওয়ান্ট টু ট্রাই উইদিন দিস সিস্টেম। আমি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ওপর পুরো আস্থা হারাইনি। আরও কিছুদিন দেখতে চাই।

এসময় শেখ মুজিব তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর নুরুল ইসলামকে নিয়ে লন্ডনে তাঁর গলব্লাডার পাথর অপারেশন করতে যাবার প্রস্তুতি নেন। ক্যান্টনমেন্টে গুজব শোনা যায়, শেখ মুজিব যখন লন্ডন থাকবেন তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে একটি অভ্যুত্থান হতে পারে।

তাহের মনে করেন, এটি শেখ মুজিবকে জানানো তাঁর দায়িত্ব। বিশেষ চেষ্টা চরিত্র করে বিদেশে যাবার আগে শেখ মুজিবের সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেন তাহের। শেখ মুজিবকে তাহের বলেন : খুব উঁচু লেবেলে একটা কন্সপিরেসি হচ্ছে আপনি কিন্তু সাবধান থাকবেন।

তাহেরকে হতাশ করে শেখ মুজিব বলেন : যাও তোমার জায়গায় কাজ করো, এসব তোমাকে ভাবতে হবে না।

কিছুদিন পর লন্ডন থেকে তাহেরের নামে শেখ মুজিবের বিশেষ বার্তা আসে। তাহেরকে জানানো হয় যে শেখ মুজিব তাঁকে পায়ের উন্নত চিকিৎসা জন্য দ্রুত লন্ডনে যেতে বলেছেন।

তাহের মোটেও উৎসাহ দেখান না। লুৎফাকে বলেন : উনাকে বললাম আর্মির ভেতরের কন্সপিরেসির কথা উনি বিশ্বাস করলেন না। বঙ্গবন্ধু আসলে সিচুয়েশনটা বুঝতেই পারছেন না। নানা চাটুকাররা ঘিরে রেখেছে তাকে। সঠিক পরিস্থিতি বুঝতে দিচ্ছে না। এখন আমার এখানে থাকা দরকার। পরিস্থিতি ওয়াচ করা দরকার। আর্মি রিফর্মের একটা প্ল্যান উনাকে দিলাম কিন্তু সেটা নিয়ে কথা বলার সময়ও হলো না উনার। লন্ডনে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নাই।

শেখ মুজিবকে তিনি লিখে পাঠালেন : 'ব্যক্তিগত কারণে আমি এখন লন্ডন যেতে পারছি না। আমার চিকিৎসার জন্য যে টাকা খরচ হবে সেটা ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে দিয়ে দিলে বাধিত হব।'

মাস কয়েক পর সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ ডেকে পাঠান তাহেরকে। জানান যে, তাকে কুমিল্লা ব্রিগেড থেকে বদলি করা হয়েছে ডিরেক্টর ডিফেন্স পারচেজ হিসেবে। ততদিনে শেখ মুজিব ফিরে এসেছেন। তাহের দেখা করেন শেখ মুজিবের সাথে। বলেন : আমি একটা অ্যাকটিভ কমান্ডে আছি, আমাকে কেন বদলি করা হলো?

শেখ মুজিব বলেন : ঐখানে একজন সৎ লোক দরকার। নানা চুরিচামারী হয়। তুমি গেলে ভালো হবে।

বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন তাহের। লুৎফাকে বলেন : ঐসব সৎ লোক টোক কোনো ব্যাপার না। আসলে কুমিল্লায় আমি যা করছি অধিকাংশ সিনিয়র আর্মি অফিসারদেরই সেসব পছন্দ না। চিফ অব স্টাফের তো আরও পছন্দ না। তারা

আমাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়। বঙ্গবন্ধুকে নিশ্চয় তারা কনভিন্স করেছে। তাছাড়া আমি যে বঙ্গবন্ধুর কথায় লন্ডন যাওয়া রিফিউজ করেছি সেজন্যও সম্ভবত তিনি মাইন্ড করেছেন। আচ্ছা বলো ডিফেন্স পারচেজে গিয়ে এসব কেনাবেচা করা কি আমার কাজ? আমি এই ট্রান্সফার নেব না। আমার মনে হচ্ছে আমারও একটা ডিসিশন নেওয়ার সময় এসেছে। মাই ডেইজ ইন আর্মি ইজ নাম্বার্ড।

লুৎফা : চিন্তা ভাবনা করে দেখো। হুট করে কিছু সিদ্ধান্ত নিও না।

ভাবনার একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছান তাহের। পাকিস্তান আমলে একটা লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলেন তাহের, সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পাকিস্তান আমলেই সেনাবাহিনী ছেড়ে দেবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তারপর মুক্তিযুদ্ধের উথাল পাথাল সময়ে তার সামরিক শিক্ষার সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে। স্বাধীন বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে, শেখ মুজিবের প্রতি আস্থা রেখে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে যাবেন তার লক্ষ্যের দিকে, সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের দিকে, এমনই প্রত্যাশা, এমনই পরিকল্পনায় অগ্রসর হচ্ছিলেন তিনি। ঘোরগ্রস্ত হয়ে একটি স্বপ্নের দ্বীপের মতো গড়ে তুলছিলেন তার ক্যান্টনমেন্টটিকে। কিন্তু তাতে হোচট খেলেন যেন। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তার স্বপ্নের কারখানা। শেখ মুজিবের প্রতিও ম্লান হয়ে আসছে তার আস্থা।

তাহের আলাপ করতে বসেন ইউসুফ আর আনোয়ারের সঙ্গে, তার ভাই রাজনৈতিক বন্ধু।

তাহের বলেন : ইউসুফ ভাই, ভাবছি রিজাইন করব আর্মি থেকে।

ইউসুফ : তোমার ট্রান্সফারটা কি ঠেকানো যায় না?

তাহের : মনে হয় না। তাছাড়া আমি চিন্তা করে দেখলাম, হোয়াই স্যুড আই ওয়েস্ট মাই টাইম ইন দি আর্মি এনি মোর? আমি তো আর্মিতে ঢুকেছিলাম ওয়ার ফেয়ারটা শেখার জন্য। আমার সেই নলেজের চূড়ান্ত ব্যবহার আমি করেছি। কুমিল্লায় পিপলস আর্মির একটা মডেল করতে চাইলাম, কেউ তো সাপোর্ট করছে না। আমি ভেবেছিলাম জেনারেল জিয়া এটাকে ব্যাক করবেন কিন্তু উনিও তো কোনো উচ্চবাচ্য করেন না।

ইউসুফ : বঙ্গবন্ধু যদি ইন্টারেস্ট নিতেন তাহলে হয়তো এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতে।

তাহের : এক্স্যাক্টলি। আমি তো সেই চেষ্টাই করলাম। ভেবেছিলাম আমার এই আর্মির মডেলটা অন্য ক্যান্টনমেন্টেও রেপ্লিকেট করা হবে। কতভাবে উনার এটেনশন ড্র করার চেষ্টা করলাম কিন্তু উনার তো সময়ই নাই। এখন আমাকে বলছেন অস্ত্র কেনাবেচা করতে। হোয়াই স্যুড আই বি ডুইং দ্যাট। দেখেন বঙ্গবন্ধুর মতো এমন জনপ্রিয়তা ইতিহাস খুব কম মানুষকেই দেয়। তিনি কি না করতে পারতেন এই জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে। কিন্তু সব ডিরেইলড হয়ে যাচ্ছে।

এনি ওয়ে, আমি যে আর্মির কথা ভেবেছি সেটা যখন হচ্ছে না তখন এই ব্যারাক আর্মিতে থেকে আমার আর লাভ কি। আর্মি ছেড়ে দেব। মাইক্রো স্কেলে কাজ করে আর লাভ নাই।

আনোয়ার : কাদের সাথে কাজ করবেন কিছু ভেবেছেন?

তাহের : ভেবেছিলাম স্টেট স্ট্রাকচারের ভেতরে থেকে কাজ করব। সেটা যখন হলো না তখন এই স্টাকচারকেই আঘাত করতে হবে। পার্টি পলিটিক্সে ইনভলব হতে হবে। জিয়াউদ্দীন সিরাজ শিকদারের সাথে গেছে। আমি মনে করি না তার সাথে আর কাজ করা হবে। তাছাড়া এ মুহূর্তে আমি তার অ্যাপ্রোচটাও ঠিক মনে করি না। কথা বলে দেখি না আরও কারো কারো সাথে। জলিল এসেছিল। জাসদের সাথেও কথা বলে দেখতে পারি। তবে লেফটরা ইউনাইটেড হয়ে কিছু একটা করতে পারলে ভালো হবে।

ইউসুফ : ছাড়বার আগে সিনিয়র দু-একজন অফিসারের সাথে কথা বলে দেখো। আর আমরা তো আছিই তোমার সাথে।

একদিন তাহের যান জেনারেল জিয়ার বাসায়। জিয়া তখন উপ সেনাপ্রধান। পারিবারিকভাবে আগেও যোগাযোগ রয়েছে তাদের। আর্মিতে তার অবস্থান নিয়ে তাহের কথা বলেন জেনারেল জিয়ার সঙ্গে।

তাহের বলেন : স্যার, আমার ট্রান্সফারটা মনে হচ্ছে পলিটিকালি মোটিভেটেড। আই অ্যাম সিওর, মোস্ট অব দি সিনিয়র অফিসারস ডোন্ট লাইক হোয়াট আই অ্যাম ডুইং ইন ৪৪ ব্রিগেডে।

জিয়া বলেন : ইউ আর রাইট, তাহের।

তাহের : আমি আপনার সাপোর্ট এক্সপেক্ট করেছিলাম।

জিয়া : বাট ইউ নো দ্যাট ইজ দি চিফ হু মেকস অল দিজ ডিসিশনস।

তাহের বলেন : আমি প্রবাবলি আর্মি থেকে রিজাইন করব।

নীরব থাকেন জিয়া। বলেন, তুমিও কি জিয়াউদ্দীন আর জলিলের মতো পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার শুরু করবে?

তাহের : দেখা যাক।

জিয়া যথারীতি বলেন, কিন্তু সাবধানে ডিসিশন নাও।

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের সঙ্গেও কথা বলেন তাহের।

মঞ্জুর বলেন, মাথা গরম করো না তাহের। লুৎফাকে বলেন, ভাবী আপনি বুঝান। এখনই চাকরি ছাড়তে নিষেধ করেন।

তাহের পরে লুৎফাকে বলেন : ওদের লাইফে তো আর পলিটিক্যাল এজেন্ডা নাই। আর্মিতে ক্যারিয়ার করাই মূল ব্যাপার। আমার সাথে ওদের মিলবে না। আমি কিন্তু রিজাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। একটু কষ্ট হবে তোমার। এই লাইফে কি তোমার খুব মোহ জন্মেছে?

লুৎফা বলেন : মোটেও না। তোমার সাথে সাথেই তো আছি। তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, আমিও আছি তোমার সাথে।

সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগের আনুষ্ঠানিক চিঠি তাহের জমা দেন ১৯৭২ এর ২২ সেপ্টেম্বর। তাহের চিঠিতে তার পদত্যাগপত্রের প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা করে কি কি কারণে তিনি অব্যাহতি চান তার উলেখ করেন। শেষে লেখেন :

> ... প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকভাবে চাইতেন চিকিৎসার জন্য যাতে আমি বিদেশে যাই। যখন আমি দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম তখন আমি জানতে পারি যে, মন্ত্রিসভার জনৈক সদস্যসহ সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার প্রধানমন্ত্রীর দেশে অনুপস্থিতির সুযোগে দেশের ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা করছে (সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন।)। আমি তখন ভাবলাম প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরা পর্যন্ত আমার বিদেশ গমন স্থগিত রাখা উচিত। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলোই না উপরন্তু সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ আমাকে ৪৪ নং ব্রিগেড কমান্ড ত্যাগ করে ডিডিপি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। আমি অনুভব করি ষড়যন্ত্র এখনও চলছে এবং আরও অনেকে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এই ধরনের ক্ষমতা দখল হচ্ছে সামগ্রিকভাবে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়া এবং এটাকে অবশ্যই রুখতে হবে। যদি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে সেনাবাহিনীর যে সুনাম রয়েছে তা নষ্ট হবে। এধরনের সেনাবাহিনীতে আমার কাজ করা সম্ভব নয়। আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম একজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে নয় বরং একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, আমি এটাকে আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক বলে মনে করি। জনগণের স্বার্থই আমার কাছে সর্বোচ্চ। আমি সেনাবাহিনী ত্যাগ করে জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই, যারা মুক্তিযুদ্ধকালে আমার চারদিকে জড়ো হয়েছিল। আমি তাদের বলব কি ধরনের বিপদ তাদের দিকে আসছে।
>
> আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।
>
> আপনার একান্ত বাধ্যগত।
>
> লে. কর্নেল এম এ তাহের।
>
> কমান্ডার, ৪৪ ব্রিগেড
>
> কুমিল্লা সেনানিবাস।

লক্ষ করবার ব্যাপার যে তাহের স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় অনুমান করছিলেন দৈত্যের মতো একটা বিপদ ধেয়ে আসছে দেশের মানুষের দিকে। কিন্তু সে দৈত্য যে এতটা নিকটবর্তী সেটা হয়তো টের পাননি তিনি নিজেও।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাহেরকে। বিদায় অনুষ্ঠানে তাহের বলেন : মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি যে জনগণের সাথে ছিলাম আবার ফিরে যাচ্ছি তাদের মাঝেই।

এবার ক্যান্টনমেন্টের খড়ির গণ্ডির বাইরে এসে দাঁড়ান তাহের।

নতুন তাহেরের জন্ম মুক্তিযুদ্ধেরই গর্ভে। তাই ঘুরে ফিরে তাহেরের কথায় ভাবনায় আসে মুক্তিযুদ্ধ। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে তাহের তার মনের হতাশা, ক্ষোভ, আক্রোশের কথা লিখে ফেলেন 'গ্রেনেড' নামে মুক্তিযোদ্ধাদেরই একটি পত্রিকায়। লেখার শিরোনাম দেন 'মুক্তিযোদ্ধারা আবার জয়ী হবে'। 'আবার' কথাটি ব্যবহার করে দ্বিতীয় একটি যুদ্ধের ডাক যেন তিনি দেন, যে দিন বদলের কল্পনার যুদ্ধটি তার অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। নতুন সরকার কাঠামোর ওপর আস্থা রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। তার সহযোদ্ধা, সহকর্মীরা এক এক করে রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে চলে গেলেও ধৈর্য ধরেছেন তিনি। সে ধৈর্যের বাঁধ তার ভেঙ্গে গেছে, আস্থা তার উবে গেছে। তাই লেখায় সে ক্ষোভ প্রকাশে এখন তিনি অকপট।

তাহের লেখেন—'১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাভাবিক বিজয়ের ফলশ্রুতি ছিল না। এটা ছিল দেউলিয়া রাজনীতির অধৈর্যতার ফল। ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চলে গেছে, জয়ী হয়েও তারা হেরে গেছে। ষড়যন্ত্র পঙ্গু করে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের। মুক্তিযোদ্ধা রাজাকারের প্রভেদ মুছে গেছে এখন। যে সামরিক অফিসার পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে দাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মুল করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন তিনি আজ আরও উচ্চপদে সমাসীন। যে পুলিশ অফিসার দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে সোপর্দ করেছে পাকিস্তনিদের হাতে তিনি এখন মুক্তিযোদ্ধাদের নামে হুলিয়া বের করতে ব্যস্ত। যে আমলারা রাতদিন খেটে তৈরি করেছে রাজাকার বাহিনী তারা মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরি দিয়ে এখন দয়া প্রদর্শনের অধিকারী। যে শিক্ষক দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারেননি তিনিই এখন তরুণদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন। যুদ্ধ চলাকালে যারা পাকিস্তানিদের হয়ে প্রচারনায় মত্ত ছিলেন তারাই এখন ভোল পাল্টিয়ে সংস্কৃতির মধ্যমণি হয়েছেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের পর প্রত্যেক দেশে করা হয় কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প, সেখানে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে যুদ্ধবিরোধীদের আত্মশুদ্ধির সুযোগ দেওয়া হয় যাতে তারা বিপ্লবী জনতার অংশ হতে পারে। যাদের কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে গিয়ে আত্মশুদ্ধি করার কথা তারাই এখন নেতৃত্বের আসন দখল করে বসেছে।'

তাহের ভেবেছিলেন ক্যান্টনমেন্টের বিচ্ছিন্ন এক ভূখণ্ডে খণ্ডিত এক বিপ্লবের সাফল্য দিয়ে অনুপ্রাণিত করবেন বিরাজমান রাষ্ট্রকাঠামোকে। ব্যর্থ হয়েছে সে প্রত্যাশা। এবার প্রস্তুত হয়েছেন ব্যক্তিগত মনন, মেধা, অভিজ্ঞতাকে নিয়োজিত করবেন কোনো বিপ্লবী দলীয় কাঠামোতে। সে চেষ্টা তিনি আগেও একবার করেছেন সিরাজ শিকদারের সঙ্গে। সাফল্য, ব্যর্থতার চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এবার তিনি আগের চেয়ে স্থিতধী। তাহের বেরিয়ে পড়েন একটি যথার্থ বিপ্লবী পার্টির খোঁজে।

স্বাধীন বাংলাদেশে বামপন্থী বিপ্লবীরা নানা দলে উপদলে বিভক্ত, তাদের মধ্যে মতাদর্শগত কোন্দল। সেই মধুচন্দ্রিমার সময় ট্রেনের কামরায় দেখা মস্কোপন্থী বামনেতা মোজাফফর আহমদ আর মতিয়া চৌধুরী তখনও গাঁটছাড়া বেঁধে আছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে দেখা হলে হয়তো ভালো হতো, তারা সেই অচেনা মেজরের নতুন রূপ দেখে অবাকই হতেন নিশ্চয়। কিন্তু তারা ভাবছেন শেখ মুজিবকে সঙ্গী করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন। তাহের সে আশা ছেড়েছেন আগেই ফলে তিনি মনে করেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো ফায়দা নেই। আব্দুল হক প্রমুখের নেতৃত্বাধীন চীনাপন্থী যে বাম দল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই মেনে নেয়নি তাদের সঙ্গে যোগাযোগও অর্থহীন। তাহের তাই যোগাযোগ করেন মোহাম্মদ তোয়াহা, আবুল বাশার, সিরাজুল হোসেন খান প্রমুখ চীনাপন্থী নেতাদের সঙ্গে, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিয়েছেন কিন্তু আবার আওয়ামী লীগের শাসনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাননি। বাংলাদেশে দ্রুত একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাব্যতা নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন তাহের। কিন্তু তারা বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশ কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য উপযোগী নয়। বাংলাদেশে পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেনি, আধা সামন্ত এমন একটি দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে শিল্পায়ন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদ আরও খানিকটা বিকশিত হবার পর সমাজতন্ত্রে ডাক দেবেন তারা।

ক্রাচে ভর দিয়ে তাহের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান বদরুদ্দীন উমরের শান্তিনগরের বাড়িতে। বদরুদ্দীন উমর পড়াশোনা জানা মানুষ। একসময় চীনা পন্থীদের সঙ্গে থেকে তিনি 'গণশক্তি' পত্রিকা বের করেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চীনাপন্থীদের বিভ্রান্তিকর মূল্যায়নের কারণে তিনি সরে আসেন তাদের কাছ থেকে। নিজেই দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন একটি আন্দোলন। বদরুদ্দীন উমর মার্ক্সবাদের টীকা টিপ্পনীসহ তাহেরকে বোঝান বাংলাদেশের বিপ্লবের স্তর, সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ এবং বলেন দেশ এখন বিপ্লবের স্তরে নেই।

ক্রাচে ভর দিয়ে শহরময় ঘুরে ঘুরে তাহের খুঁজছেন একজন সঙ্গী, একটি দল যার সঙ্গে ভাবনার মিল হবে তার। এবার আর ভুল করতে চান না তিনি। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না। আনোয়ারকে একদিন বলেন : ভাবলাম সিনিয়র বাম নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটা পথ পাওয়া যাবে। ভেবেছিলাম সব বামপন্থীদের মিলে যৌথভাবে কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু সবাই তো যার যার পুকুরে সাঁতার কাটছে। আর সিনিয়র নেতারা সব থিওরিটিক্যালি কোন স্টেপ ভুল, কোনটা শুদ্ধ এই অংক করতে করতেই জীবন পার করে দিচ্ছেন। আমার মনে হয় পরিস্থিতিটাকে তারা খুব মেকানিক্যালি দেখছেন। তারা কেউ মনে করছেন না যে এ মুহূর্তে সোসালিস্ট রেভ্যুলেশন করা সম্ভব। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে

তারা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। সময় আমাদের হাতে খুব বেশি নাই। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা চান্স আমরা হারিয়েছি। যত দেরি করব আবারও আমরা চান্স হারাবো। আমাদের একটা বিপ্লবী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার দ্রুত। তাত্ত্বিকভাবে সেটা হঠকারী হবে কিনা কিনা জানি না। কিন্তু এছাড়া আর কোনো বিকল্প আমি দেখি না। সিরাজ শিকদার সোসালিস্ট রেভ্যুলেশনের কথা বলছে কিন্তু ঐ আন্ডারগ্রাউন্ড টেরোরিজম দিয়ে সেটা হবে না। জাসদ তো নতুন হয়েছে, ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

আনোয়ার বলেন : জাসদের মূল তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। যুদ্ধের আগে যখন সূর্যসেন স্কোয়াড করি তখনই তার সঙ্গে যোগাযোগ।

তাহের বলেন : দেখো না একদিন তাকে নিয়ে আসতে পারো কিনা এখানে।

আনোয়ার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যায়ে পড়াশোনা করছেন, ইউসুফ চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, বেলাল আর বাহার স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীর প্রথম ব্যাচে নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু নানা প্রশাসনিক জটিলতায় প্রশিক্ষণে যোগ দিতে পারছেন না। আর সাঈদ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে করতে চাইছেন ব্যতিক্রমী কিছু। ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক। তাহের একদিন ডাকেন সাঈদকে : কি কর এখন?

সাঈদ : যুদ্ধ তো শেষ কি করব বুঝতেছি না।

তাহের : বিপ্লবীর যুদ্ধ কখনো শেষ হয় না সাঈদ। বিপ্লবীর কোনো রেস্ট নাই। যাও গ্রামে গিয়ে একটা কালেক্টিভ ফার্ম করো।

তাহের রিজাইন করবার পর পেনশন, গ্রাচুইটির যা টাকা পেয়েছেন তা দিয়ে একটা ট্রাক্টর কিনে দেন সাঈদকে।

সাঈদ কাজলায় গিয়ে শুরু করেন চাষাবাদ।

এর মধ্যে একদিন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ওসমানী তাহেরকে ডেকে একটি চাকরির প্রস্তাব দেন। ওসমানী তখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। ওসমানী তাহেরকে নারায়ণগঞ্জ ড্রেজিং সংস্থার ডিরেক্টর পদে যোগ দিতে বলেন। বাংলাদেশের নদী এবং বন্যা তাহেরের আগ্রহের বিষয়, এ নিয়ে রয়েছে তার নিজস্ব ভাবনা, যে কথা তিনি লিখেছেন তার সোনার বাংলা গড়তে হলে লেখাতে। চাকরিটি গ্রহণ করতে রাজি হন তাহের। একটা বেসামরিক চাকরিতে থেকে রাজনীতির পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নেওয়া বরং সহজ হবে বলেই মনে করেন তিনি। লুৎফা, জয়াকে নিয়ে গিয়ে ওঠেন নারায়ণগঞ্জের সংস্থার ডিরেক্টরের বাসভবন 'জান মঞ্জিলে'। নারায়ণগঞ্জেই জন্ম নেয় লুৎফা তাহেরের দ্বিতীয় সন্তান যীশুর।

আনোয়ার একদিন সিরাজুল আলম খানকে নিয়ে আসেন নারায়ণগঞ্জে তাহেরের বাসায়। ষাট দশকে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে নিউক্লিয়াস গড়ে চমক তৈরি করেছিলেন সিরাজুল আলম খান, স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে তুলেছেন প্রথম বিরোধী দল। লম্বা চুল, মুখ ভরা দাঁড়ি গোঁফ অনেকটা কার্ল মার্ক্সের মতো চেহারা তখন সিরাজুল আলম খানের। জাসদের এই নেপথ্য নেতাকে সবাই দাদা বলে ডাকেন। প্রকাশ্য জনসভায় তিনি বিশেষ আসেন না, নিজেকে রহস্যে ঢেকে রাখেন। বিচিত্র চেহারার এই মানুষটিকে দেখে কৌতূহল হয় লুৎফার। তাহের অবশ্য তখন তার পরিচয় গোপন রাখেন লুৎফার কাছে। বলেন : উনি একজন বিজনেসম্যান। দেখি একটা ব্যবসা করব ভাবছি উনার সঙ্গে।

তাহের সিরাজুল আলম খানকে বলেন : জাসদের পলিসিটা বোঝান।

সিরাজুল আলম খান বলেন : তার জন্য সময় লাগবে। তবে একটা বেসিক কথা হচ্ছে আমাদের এখানে ভারত, রুশ, চীন নানা ধারার কমিউনিজম তো চলছে অনেক দিন। আমরা একেবারে দেশজ একটা সমাজতন্ত্রের কথা বলছি।

তাহের : সেটা তো খুব ভালো কথা।

খান : আমরা শেখ মুজিবকে সামনে রেখে দেশে সমাজতন্ত্রের কথা ভেবেছিলাম কিন্তু তিনি তো সে রাস্তায় চলছেন না। আমাদের তিনি দূরে ঠেলে দিলেন।

তাহের : আপনারা কিভাবে ভাবছেন?

সিরাজুল আলম খান তখন তার সঙ্গে আসা তরুণ নেতা ইনুকে পরিচয় করিয়ে দেন তাহেরের সঙ্গে। বলেন, এর নাম ইনু, হাসানুল হক ইনু, ইঞ্জিনিয়ার। সে এসে আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করবে।

বুয়েট থেকে সদ্য পাস করেছেন ইনু। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির জাতীয় পর্যায়ের তুখোড় স্পোর্টসম্যান, ফুটবলার। এখন ঝুঁকেছেন রাজনীতিতে। ঝুঁকেছেন জাসদে।

পরদিন অনেক সকালে ইনু তার হোন্ডা চালিয়ে হাজির হন তাহেরের নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে। আলাপ হয় লুৎফার সঙ্গেও।

ইনু তাহেরকে বলেন : আমাদের বেশ কয়েকটা সিটিং লাগবে। কখন আপনার জন্য সুবিধা।

লুৎফা বলেন : বিজনেসের আলাপ নাকি?

হেসে দেন তাহের। বলেন : তোমাকে বলব সব পরে।

ইনুকে তাহের বলেন : আমার নয়টায় অফিস। ভালো হয় তুমি যদি আরও সকালে আসতে পারো। তোমার সঙ্গে আলাপ সেরে তারপর অফিস যাব।

তাই ঠিক হয়। পরদিন ভোর সাতটায় যথারীতি হোন্ডা নিয়ে হাজির হন ইনু। গিয়ে দেখেন তাহের পাশের একটি ডোবার কাছে দাঁড়িয়ে লোকজনকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছেন। পাশে আনন্দে লাফাচ্ছে মেয়ে জয়া।

ইনু কাছে গিয়ে জানতে চান কি হচ্ছে। তাহের বলেন : ব্যাঙ ধরা হচ্ছে।

ইনু : কেন?

তাহের : ভেজে খাওয়া হবে, সোনা ব্যাঙ, খুবই ভালো জাতের।

ইনু : আপনি এই ব্যাঙগুলো ভেজে খাবেন, বলেন কি?

তাহের : কি বলো বিপ্লব করতে চাও আর ব্যাঙ খেতে পারবে না? আমি শিখেছি আমেরিকায় গেরিলা ট্রেনিং নিতে যেয়ে।

জয়ার সঙ্গে ব্যাঙ নিয়ে কিছুক্ষণ মজা করে ঘরে ফিরে আসেন তাহের। চা নিয়ে বসেন ইনুর সঙ্গে বলেন : বলো, শুনি তোমার কথা।

ইনু বলেন : আগে বলেন আপনি তো গভর্নমেন্টের অফিসার রাজনীতি করা সমস্যা হবে না তো?

তাহের : একাত্তরেও তো গভর্নমেন্টের অফিসার ছিলাম, যুদ্ধ করতে অসুবিধা হয়েছে?

ইনু : শুরুতেই আপনাকে বাংলাদেশে বামপন্থীদের মধ্যে বিপ্লবের স্তর নিয়ে যে বিতর্ক আছে সে ব্যাপারে দু একটা কথা বলতে চাই। আপনি জানেন যে অধিকাংশ বাম রাজনৈতিক দল মনে করে বাংলাদেশ একটা আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং নয়া উপনিবেশবাদী দেশ।

তাহের : হ্যাঁ, আমি বেশ অনেকের সঙ্গেই এ নিয়ে কথা বলেছি। বাংলাদেশে বিপ্লবের স্তর নিয়ে নানা রকম তত্ত্ব তাদের আছে। তারা তো সবাই মনে করেন এখনও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এসে পৌঁছায়নি।

ইনু : তাদের আর্গুমেন্টটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করতে হলে সমাজে পুঁজিবাদী উপাদান থাকা জরুরি। তারা মনে করেন, যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী কোনো উপাদান নেই, ফলে এখানে আগে অসম্পূর্ণ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। তারপরে হবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু হলিডে-তে ড. আখলাক ধারাবাহিকভাবে 'বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ' নামে নিবন্ধ লিখেছেন সেটা কি আপনার চোখে পড়েছে?

তাহের : হ্যাঁ, দু একটা ইন্সটলমেন্ট পড়েছি।

ইনু : উনি ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস ইকোনমিস্ট। তিনি বলছেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি আসলে পুঁজিবাদী স্তরেই আছে। তিনি দেখিয়েছেন বাংলাদেশে সামান্য যে শিল্প কারখানা রয়েছে তার উৎপাদন ধারা পুঁজিবাদী তো বটেই, এ দেশের কৃষি অর্থনীতিতেও দেখা দিয়েছে পুঁজিবাদী প্রবণতা। কৃষিতে বেশির ভাগ জমি এখন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, অধিকাংশ

কৃষক ক্রমশ সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে, জমি এখন রূপান্তরিত হয়েছে পুঁজি বিনিয়গের উপায় হিসেবে, সেই সঙ্গে কৃষিতে উৎপাদন হচ্ছে মালিক মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে, তাছাড়া কৃষিতে যা উৎপাদন হচ্ছে তা পরিণত হচ্ছে জাতীয় পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে। এগুলো সামন্তবাদী কৃষির বৈশিষ্ট্য নয়, এ সব কিছুই প্রমাণ করে দেশের অর্থনীতি পুঁজিবাদী ধারায় প্রবেশ করেছে।

এসময় লুৎফা ব্যাঙের পা ভেজে আনেন। তাহের ইনুকে বলেন : ট্রাই ইট।

ইনু একটু ইতস্তত করে হাতে তুলে নেন একটা। মুখে পুরে বলেন : মন্দ না তো?

তাহেরও মুরগির রানের মতো হাতে তুলে নেন ব্যাঙের রান। ফিরে আসেন আলাপে।

ইনু বলেন : ড. আখলাক মনে করেন আওয়ামী লীগ সরকার এই পুঁজিবাদী ধারাটিকে বিকাশ করতেই সহায়তা করছে। আমরা তার এই এনালাইসিসটাকে গ্রহণ করি। তিনি বেসিক্যালি জাসদের সঙ্গেই আছেন। আমরা মনে করি আওয়ামী লীগের এই পুঁজিবাদী ধারাকে উচ্ছেদ করে এ মুহূর্তে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া জরুরি। হয়তো বাংলাদেশের সমাজে এখনও কিছু সামন্ততান্ত্রিক উপাদান আছে, হয়তো জাতীয়তাবাদী সংগ্রামেরও অপূর্ণতা আছে কিন্তু আমরা মনে করি সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই একইসাথে এসব অপূর্ণতাকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

তাহের বলেন : সেই নাইনটিন ফর্টিএইটে ইন্ডিয়া স্বাধীন হবার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক বি টি রনদিভে এমন একটা প্রস্তাবই কিন্তু করেছিলেন। তিনি সেটাকে বলেছিলেন 'ইন্টার টোয়াইনিং থিয়োরি অব টু রেভ্যুলেশনস'। তিনি গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একই সঙ্গে সম্পন্ন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

ইনু : ঠিকই বলেছেন। ভারতের বাম দলগুলো এ প্রস্তাব তখন গ্রহণ করেনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক বামপন্থী তা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী শিবদাস ঘোষ ছিলেন এ দলে। তিনি সোসালিস্ট ইউনিট সেন্টার গঠন করে এ মতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন যে ভারত সামন্ত বা আধা সামন্ত নয় বরং পুঁজিবাদী। সুতরাং বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আমাদের দাদা শিবদাস ঘোষের অনুসারী বলতে পারেন।

ইনু আর তাহেরের মধ্যে জাসদের তাত্ত্বিক অবস্থান নিয়ে আলাপ চলে আরও কয়দিন। মাঝে মাঝে রাতেও এসে থাকেন ইনু।

তাহের জিজ্ঞাসা করেন : আমি ফুললি এগ্রি করি যে বাংলাদেশে এখন সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের ডাক দেওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু তোমাদের স্ট্রাটেজিটা বলো।

ইনু বলেন : এটা তো স্পষ্ট যে এই সরকার দিয়ে সমাজতন্ত্র হবে না। মস্কোপন্থীরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবর্তে বলছেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা। চীনাপন্থী সমাজতন্ত্রীরা কেউ কেউ বাংলাদেশকে স্বীকারই করেননি, বাকিরা বলছেন স্বশস্ত্র বিপ্লবের কথা। কিন্তু জাসদে আমরা অন্য রাস্তা ধরতে চাই। আমরা সরকারবিরোধী একটা গণঅভ্যুত্থানের দিকে যেতে চাই। এ মুহূর্তে আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যেতে চাই না। উগ্রভাবে যেটা সিরাজ শিকদার করছেন। গণবিচ্ছিন্ন গোপন রাজনীতিও করতে চাই না। উন্মুক্ত রাজনীতির সব রকম সুযোগ নিতে চাই। সে সংগ্রামে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ঘটিয়ে তার মধ্য থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিকশিত করতে চাই আমরা। ধারাবহিকভাবে সরকারের সীমাবদ্ধতাগুলো সাধারণ মানুষের ভেতর তুলে ধরে ধীরে ধীরে একটা গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিতে চাই। এই অভ্যুত্থানই এক পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের স্তরে উপনীত হবে।

তাহের : তোমরা কি শুধু গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের কথা ভাবছ?

ইনু : আমরা কিন্তু বিশেষভাবে শহরাঞ্চলের আন্দোলন জোরদার করতে চাচ্ছি।

তাহের : গুড আমার ভাবনার সঙ্গে কিন্তু খুবই মিলছে।

মাঝে মাঝে সিরাজুল আলম খানও আসেন। তাহেরও তাকে ডাকেন দাদা বলে। বলেন, এ মুহূর্তে আপনাদের এই মাস মুভমেন্টের কনসেপ্টটাকে আমি পছন্দ করছি। আমার মনে হয় এখন এভাবেই এগুনো উচিত।

সিরাজুল আলম খান : তবে একটা ব্যাপার বলতে চাই মাস মুভমেন্টের পাশাপাশি এক পর্যায়ে করেসপন্ডিং সশস্ত্র একটা গণবাহিনীও তৈরি করতে চাই আমরা, যাতে বাধা আসলে সরিয়ে ফেলা যায়। আপনাকে ঐ গণবাহিনীর নেতৃত্বে দেখতে চাই।

জীবন যাপনের নানা বিচিত্র ধারা সিরাজুল আলম খানের। তিনি ভাত বিশেষ খান না, অনেক সময় মুড়ি খেয়েই কাটিয়ে দেন সারাদিন। মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমান। তাহের, আনোয়ার বেশ মুগ্ধ খানের ব্যাপারে। মুগ্ধ না শুধু সাঈদ। সাঈদ বলে, দাদা তো আমার নাম, সে এইটা হাইজ্যাক করল ক্যামনে। আর ঘরে বিছানা থাকতে মাদুর পাইতা শোয়ার তো আমি কোনো কারণ দেখি না। সাঈদ বলেন : এই সব আমার কাছে স্টান্টবাজি মনে হয়। খেয়াল রাইখেন একটু।

ধমক দেন তাহের : সাঈদ তুমি বেশি কথা বলো। উনি সিম্পল লাইফ লিড করতে চান এর মধ্যে স্টান্টবাজির তুমি কি দেখলা?

একদিন মেজর জলিলও আসেন তাহেরের সঙ্গে দেখা করতে। বলেন : স্যার, আমি খুব খুশি হয়েছিলাম যখন শুনলাম আপনি আর্মি থেকে রিজাইন করেছেন। চলে আসেন স্যার আমাদের সঙ্গে। আই থিঙ্ক দিস ইজ দি রাইট পার্টি ফর ইউ।

আনোয়ারের সঙ্গে আলাপ করেন তাহের। বলেন : জাসদকে আমার সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছে। আমার চিন্তার সঙ্গে প্রচুর মিল পাচ্ছি। ড. আখলাকের মতো অর্থনীতিবিদ, সিরাজুল আলম খানের মতো তাত্ত্বিক আছে এদের সঙ্গে। ইনু, রব, শাজাহান সিরাজের মতো পপুলার ইয়াং লিডাররা আছে, আর আছে স্পিরিটেড মেজর জলিল। আমার মনে হচ্ছে এরা কিছু করতে পারবে। এদের সাথেই যোগ দেব ভাবছি।

তাহের আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন জাসদে। নতুন অধ্যায় শুরু হয় তাহেরের জীবনে। সিদ্ধান্ত হয় জাসদের একটা অফিসিয়াল আর্মড ফোর্স থাকবে। তাহের হবেন তাঁর প্রধান। দ্বিতীয় নেতৃত্বে ইনু। তাহেরকে করা হয় জাসদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। নতুন পরিচয় তাঁর। কিন্তু সরকারি চাকরি করছেন বলে তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়না। জাসদ নেতা মোহাম্মদ শাজাহান এক জনসভায় বলেন, সময়মতো আমরা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম ঘোষণা করব, সে নাম শুনে আপনারা খুশিই হবেন।

জনৈক সাংবাদিক

ড্রেজিং কোম্পানির চাকরিকে মূলত জীবিকা হিসেবে দেখলেও স্বভাবসুলভভাবেই ঐ সংস্থার উন্নয়ন নিয়েও তৎপর হয়ে উঠেন তাহের। দেশের নদী এবং নদীপথ নিয়ে তাহেরের আগের আগ্রহকে আরও গভীরতায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন তিনি। কোম্পানির স্পিড বোট নিয়ে ছুটে যান নানা নদীর শাখা প্রশাখায়, পড়াশোনা করেন নদীর ইতিহাস নিয়ে। কোনো কোনো দিন সংস্থার কর্মচারীরা অবাক হয়ে দেখেন তাদের ডিরেক্টর, এক পা'তেই কেমন পানির উপর দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছেন ওয়াটার স্কেটিং করতে করতে। বহু পুরনো লঞ্চ, স্টিমারকে ঠিক করে তাহের নামিয়ে দেন পানিতে। কিছুদিনের মধ্যেই ড্রেজিং সংস্থাকে একটি লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেন তাহের। অবশ্য এগুলো তাঁর প্রকাশ্য কর্মচাঞ্চল্য হলেও তাঁর আসল কাজটি চলতে থাকে গোপনে। জাসদের রাজনৈতিক সভাগুলোতে নিয়মিত যোগ দিতে শুরু করেন তিনি।

এসময় ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউয়ের সংবাদদাতা হিসেবে বাংলাদেশের বন্যার ওপর ফিচার করবার জন্য আসেন মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎস। এ নিয়ে নানাজনের সঙ্গে কথা বলেন লিফসুলৎস। এক সাংবাদিক তাকে পত্রিকায় প্রকাশিত তাহেরের 'সোনার বাংলা গড়তে হলে' লেখাটি দেখিয়ে বলেন, আপনি এই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে পারেন। প্রাক্তন আর্মি অফিসার কিন্তু নদী নিয়ে তার নিজস্ব কিছু ধারণা আছে।

লিফশুলৎস একদিন চলে যান তাহেরের নারায়ণগঞ্জের ড্রেজিং অফিসে। দুজনের পরিচয় হয়। কথা হয় বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে। তাহের

বাংলাদেশের বন্যা নিয়ে যে কথা লিফশুলৎসকে শোনান অন্য কারো কাছে তিনি তা শোনেননি। টেবিলের উপর মোগল আমালের চার শ বছরের পুরনো বাংলাদেশের এক ম্যাপ রেখে তাহের বলেন, আমি মনে করি আমাদের দেশে বন্যার প্রধান কারণ ব্রিটিশদের তৈরি রাস্তা আর রেল লাইন।

লিফশুলৎস জানতে চান : কি রকম?

তাহের বলেন : মোগল আমলে বন্যার পরিস্থিতি কিন্তু এমন ছিল না। নদী তো স্বভাবতই ভার্টিক্যাল আর ব্রিটিশরা তাদের প্রয়োজনে এ দেশের মাটির উপর তৈরি করেছে হাজার হাজার মাইল রাস্তা আর রেল লাইন, যেগুলো অধিকাংশই হরাইজন্টাল। কিন্তু আপনি ম্যাপে মোগল আমলের রাস্তাঘাট দেখেন, সব কিন্তু নদীর প্যারালাল। তারা এ ব্যাপারটা খেয়াল করেছিল। ব্রিটিশদের এই হরাইজন্টাল রাস্তা বিশেষ করে রেললাইন হওয়াতে প্রাচীন কাল থেকে যে পথে নদীর স্রোত চলছিল, পানি নিষ্কাশন হয়ে আসছিল তা বাধা পায়। এটিই আমাদের জন্য হয় ড্যামেজিং।

লিফশুলৎস : ইন্টারেস্টিং আইডিয়া।

তাহের : আরও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। বিশেষ করে এখন সবুজ বিপ্লবের নামে বিদেশি দাতা সংস্থারা যে উচ্চফলনশীল ধান এদেশে এনেছে এগুলো প্রচলিত জাতের চাইতে উচ্চতায় খাটো। আমাদের দেশিয় জাতের ধান উচ্চতায় এমন যে পানি একটু কমে আসলেই এগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। ন্যাচারাল পদ্ধতিতেই হয়তো এই অঞ্চলের কারেক্টার অনুযায়ী এখানকার ধানের হাইট হয়েছে। কিন্তু এই গ্রীন রেভ্যুলেশনের হাইব্রিড ধান এদেশের মাটির চরিত্র অনুযায়ী তো হয়নি। এগুলো উচ্চতায় খাটো হওয়াতে বন্যার পর অনেক বেশি দিন পানির নিচে ডুবে থাকে। পানি একেবারে না সরে যাওয়া পর্যন্ত এগুলোর মাথা আর দেখা যায় না। ফলে সব ধানই নষ্ট হয়। সুতরাং বন্যা নিয়ে কিছু করতে হলে এসবের দিকে নজর দিতে হবে।

লিফশুলৎস : আপনি তো বেশ নতুন নতুন কথা শোনোলেন আমাকে। এ লাইনে তো কাউকে ভাবতে দেখিনি। আপনি আর্মির মানুষ, এ ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট গ্রো করল কিভাবে?

হাসেন তাহের। বলেন : আসলে নদী বলে না, সাধারণভাবে বাংলাদেশের সামগ্রিক ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমার কিছু চিন্তা ভাবনা আছে। আরেকদিন সময় করে আসলে আলাপ করা যাবে।

লিফশুলৎসের জানার কথা নয় যে নদীপ্রেমিক প্রাক্তন এই সেনা কর্মকর্তা আসলে গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন একটি বিপ্লবের। কিন্তু তাদের এই কাকতালীয় সাক্ষাত অচিরেই পরিণত হবে একটি ঐতিহাসিক যোগাযোগে। সেজন্য দুজনকেই অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন।

একে একে নিভিছে দেউটি

যারা শেখ মুজিবকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছিলেন, যারা দেশের জন্য একটা সক্রিয়, ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে চাইছিলেন তাদের অনেকেই একে একে দূরে সরে যেতে থাকেন তার কাছ থেকে। শেখ মুজিবের প্রতি দূর থেকে আস্থা রাখছিলেন তাহের, ভেবেছিলেন তিনি ঘুরিয়ে দেবেন রাষ্ট্রের মুখ। কিন্তু সে আস্থায় চির ধরে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর থেকে আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখেন না তিনি। পদত্যাগ করেন অবশেষে।

শেখ মুজিবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন অগাধ আস্থায় বার বার ছুটে গেছেন শেখ মুজিবের কাছে। কিন্তু তাজউদ্দীনও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী আমেরিকার ব্যাপারে তার অনমনীয় মনোভাব, তার বিরুদ্ধে শেখ মণি প্রমুখদের নানা কান কথায় শেখ মুজিবের সঙ্গে ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি হয়েছে তাজউদ্দীনের। ক্রমশ দলের এবং সরকারের ভেতর কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন তিনি। তারপর একপর্যায়ে তিনিও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

নতুন বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনার দায়িত্ব ছিল যাদের হাতে সেই পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরাও এক এক করে পদত্যাগ করতে শুরু করেন। কমিশনের কাজ ছিল উন্নয়নের সুপারিশ দেওয়া আর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন মন্ত্রিপরিষদ। কিন্তু কমিশনের সুপারিশ অধিকাংশই উপেক্ষা করতেন মন্ত্রীরা। তারা কাজ করতেন তাদের নির্বাচনী উদ্দেশ্য মাথায় রেখে নানা জনপ্রিয় ধারায়। কমিশনের সদস্যদের তারা মনে করতেন উটকো ঝামেলা। তাদের সুপারিশকে তারা বলতেন অতিরিক্ত তত্ত্বনির্ভর। আমলারাও অসহযোগিতা করতে শুরু করেন তাদের সঙ্গে। কমিশনের সদস্যদের কারণে ব্যাহত হতো আমলাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। তাছাড়া অনেক আমলাই ভেতরে ভেতরে পাকিস্তানপন্থী যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বহালতবিয়তে চাকরি করেছেন পাক সরকারের অধীনেই। ফলে নানা কিছু মিলিয়ে কমিশনের সদস্যদের সাথে আমলাদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে দিন দিন।

কমিশনের সবাই ক্রমশ অনুভব করেন যে সরকার পরিচালনায় তাদের আর কোনো ভূমিকা নেই। শেখ মুজিবের প্রতি সবার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অটুট থাকলেও একে একে তারা বিদায় নিতে থাকেন। আনিসুর রহমান পদত্যাগ পত্রে লেখেন—

বঙ্গবন্ধু,

> পরিকল্পনা কমিশনের অবৈতনিক সদস্য হিসেবে আমার দায়িত্বভার শেষ করার প্রাক্কালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু ভাবপ্রবণতায় পারিনি। ... আপনার স্নেহ মনে রাখব। গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি হতভাগ্য

দুঃখী মানুষেরা আপনার দিকে চেয়ে আছে। ভাতকাপড়ের চাইতেও বেশি তারা চায় আশ্বস্ত হতে যে আপনি তাদের সাথেই আছেন। যে কোনো ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে ডাকবেন। সরকারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ। অনেক বেয়াদবী করেছি, ক্ষমা নিশ্চয় করবেন।—আনিসুর রহমান।

পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামও একদিন শেখ মুজিবের অফিসে গিয়ে তাঁর কাজ থেকে অব্যাহতি চান। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। যেদিন শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেছেন, সেদিন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। শেখ মুজিব একাকী বসে আছেন প্রায় অন্ধকার অফিসে। বিষণ্ণ হয়ে পড়েন তিনি। শেখ মুজিব বলেন : নুরুল ইসলাম সাহেব, আমি মুক্ষুসুক্ষু মানুষ আপনাদের ওপর ভরসা করলাম আর আপনারা সব আমাকে ফেলে একে একে চলে যাচ্ছেন?

জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ ঝড় দেখেন শেখ মুজিব। বলেন : মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানেন, আমি গভীর একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে রাতের বেলা অন্ধকারে একা একা হাঁটতেছি।

অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে ঐ আলো আধারিতে অসহায় দেখায়। দেশপ্রেমের সংজ্ঞাকে টেনে যতবড় করা যায় শেখ মুজিব ততখানিই ভালোবাসেন এই দেশটিকে। কিন্তু তার অগাধ দেশপ্রেম আর অসাধারণ মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব দিয়েও তিনি যেন আর আগলে রাখতে পারছেন না নতুন এই দেশের জটিল রসায়নকে। পূরণ করতে পারছেন না মানুষের পাহাড় প্রমাণ আকাঙ্ক্ষাকে। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নানা সীমাবদ্ধতা যেন একে একে গ্রাস করছে তাকে।

নতুন ঘূর্ণি

প্রায়ই জাসদের মিটিংগুলোতে মেঝেতে আসন পেতে গিয়ে বসেন তাহের। পাশে শুইয়ে রাখেন ক্রাচ, হাতে স্টার সিগারেটের প্যাকেট! জাসদের তরুণ নেতা ইনু, রব, জলিল, জিকু, শাহাজাহন সিরাজ, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, মাহাবুবুল হক, কাজী আরেফ, মার্শাল মণি সবাই ঘিরে থাকেন দাদা সিরাজুল আলম খানকে। সিরাজুল আলম খান পর্যালোচনা করেন তাদের অবস্থান। বলেন : আমাদের দুটি ধারায় সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একদিকে একটা নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারনাকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। বঙ্গবন্ধুও সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন কিন্তু মানুষকে বুঝতে হবে যে ঐ সমাজতন্ত্র গরিবের রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছাবে না কোনোদিন। উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন না করে দেশের সবকিছু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব

করলে তার ফল ভোগ করবে ক্ষমতাসীনরাই। পাশাপাশি আমাদের একটা হার্ড কোর গণবাহিনীও প্রস্তুত রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিপ্লবের সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তি দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। কর্নেল তাহের আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি এই দিকটাতে আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা কর্নেল তাহেরের কাছে কিছু শুনতে পারি।

তাহের মেঝেতে রাখা তার ক্রাচটি স্পর্শ করেন। বলেন : আমি আবারও মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটা হাইলাইট করতে চাই। বাংলাদেশের মানুষ একটা সশস্ত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যেই গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে সে আস্থা নষ্ট হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকেই আমি সমাজতন্ত্রের একটা সশস্ত্র সংগ্রাম হিসেবে দেখতে চেয়েছিলাম। যে বিপ্লবী গণবাহিনীর কথা আমরা ভাবছি তার মাধ্যমে আমরা সেই অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধকেই সমাপ্ত করব বলে আমি মনে করি।

জাসদ সারাদেশে প্রচুর জনসভা করে আওয়ামী সরকারের অরাজকতার কথা তুলে ধরে এবং তাদের প্রতি জনসমর্থনের প্রক্রিয়া শুরু করে। দেশজুড়ে তারা মিছিল, কর্মিসভা, দেয়াল লিখন, প্রচারপত্র বিলি করতে থাকে। ডাক দেয় প্রতিরোধ দিবস, হরতালের। মানুষ সাড়া দেয় সে ডাকের। গণকণ্ঠ আর লাল ইশতেহার পত্রিকার মাধ্যমে চালিয়ে যায় তাদের প্রচারণা।

পাশাপাশি সশস্ত্র গণবাহিনী গঠনের কাজও অব্যহত রাখে। প্রকাশ্যে তার নাম উচ্চারিত না হলেও গোপনে তাহের ব্যাপকভাবে জড়িয়ে যান জাসদের কর্মকাণ্ডে। বিশেষ করে সশস্ত্র গণবাহিনী গঠনের কাজে। লুৎফাকে তাহের বলেন : সিরাজ শিকদারের সাথে যে কাজটা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল, সেটা এবার সম্পূর্ণ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে।

ইতোমধ্যে জাসদের জন সমর্থন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে, জাসদের ব্যাপারে জনগণের প্রত্যাশাও বাড়তে থাকে উত্তরোত্তর। এক পর্যায়ে জাসদ তার আন্দোলনকে ক্রমশ জঙ্গি রূপ দিতে থাকে। ১৯৭৪-এ জাসদ সিদ্ধান্ত নেয় দেশের প্রধান প্রধান দপ্তর, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাসভবন ঘেরাও করবে। তারা ঘেরাও করবে রেডক্রসের চেয়ারম্যান, ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যানের অফিস, সচিবালয়, পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রী সাংসদের বাড়ি ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত হয় এ ঘেরাও কর্মসূচির সূচনা ঘটবে ১৭ মার্চ ঢাকার মিণ্টু রোডে অবস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন ঘেরাও এবং স্মারকলিপি পেশের মধ্য দিয়ে। সেদিন পল্টন ময়দানে জাসদের জনসভা শেষে হাজার হাজার মানুষ রওনা দেয় মিণ্টু রোডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির দিকে। সেখানে জঙ্গি জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় পুলিশের। একপর্যায়ে রক্ষীবাহিনী গুলিবর্ষণ করে ঘটনাস্থলে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বারো জন জাসদ কর্মী। ঘটনাস্থল থেকে রব, জলিলসহ জাসদের প্রধান অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। সারাদেশেও ব্যাপকভাবে শুরু হয় জাসদের

কর্মী গ্রেফতার। বন্ধ করে দেওয়া হয় জাসদের পত্রিকা গণকণ্ঠের অফিস, গ্রেফতার করা হয় সম্পাদক আল মাহমুদকে।

দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে শুরু হয় আরও এক ঘূর্ণিপাক।

ফ্যান দাও

এদিকে দেশে সংকট এসে ঠেকেছে ভাতের থালাতেও। খাবার নেই দেশে। নয় মাসের যুদ্ধে তেমন ফসল হয়নি কিছুই, বিদেশ থেকে যে খাদ্য কিনবে সে পয়সাও নেই বাংলাদেশের হাতে। স্বাধীনতার পরই হয় বিপুল এক খরা এবং তার ঠিক পর পরই লাগাতার দু দুটি ভয়াবহ বন্যা। যে সামান্য কিছু উৎপন্ন হয়েছে দেশে ভাঙ্গা ব্রিজ, রাস্তাঘাটের কারণে তা বাজারে পৌঁছানোও হয়ে ওঠেছে দুষ্কর। পাশাপাশি চোরাচালান আর অসাধু ব্যবসায়ীর খাদ্য মজুদ করা তো আছেই। সব মিলিয়ে শূন্য হয়ে গেছে দরিদ্র মানুষের ভাতের থালা, মধ্যবিত্ত ভাত ছেড়ে খাওয়া শুরু করেছে রুটি।

কিসিঞ্জার কথা দিয়েছিলেন আমেরিকা খাদ্য পাঠাবে। সে ভরসায় বসে আছেন শেখ মুজিব। হঠাৎ একদিন মার্কিন রাষ্ট্রদূত খবর পাঠান আমেরিকা কোনো খাদ্য পাঠাবে না। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে সরকারের কাঁধে। কি ব্যাপার? তারা জানায় বাংলাদেশ কিছুদিন আগে কিউবার কাছে কিছু চটের ব্যাগ বিক্রি করেছে আর আমেরিকার পিএল ৪৮০ নিয়ম অনুযায়ী যে দেশ সমাজতান্ত্রিক কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য করবে সে দেশ কোনো খাদ্য সাহায্য পেতে পারবে না।

শেখ মুজিবের কমিউনিস্ট বন্ধু ক্যাস্ট্রোর কাছে দুটো চটের ব্যাগ বিক্রি করার দায়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভুক্ত রাখবার নির্মম সিদ্ধান্ত নেয় আমেরিকা। আমেরিকার শত্রু ক্যাস্ট্রো, সেই ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে ভাব করবার কি পরিণতি হতে পারে তা শেখ মুজিবকে হাড়ে হাড়ে শিক্ষা দেয় আমেরিকা।

ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় দেশে। গ্রাম থেকে মানুষ কাতারে কাতারে চলে আসতে থাকে শহরে। ঢাকা শহর পরিণত হয় কঙ্কালসার মানুষের প্রেতপুরীতে। পথে পথে হাজার হাজার অভুক্ত মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত ঢাকার পথে পথে ভিক্ষুকরা কাঁদে —"ফ্যান দেও।" ভাত আর চায় না কেউ, চায় সামান্য ফ্যান।

দেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য লঙ্গরখানায় লাইন দেয় লক্ষ লক্ষ অভুক্ত মানুষ।

আমি কার কাছে যাব?

বাংলাদেশ জুড়ে কেবলই টলটলে পানি। ছোটবড় কত অসংখ্য নদী। সেইসব নদীর কূলে বুকের মধ্যে পুঞ্জীভুত ক্ষোভ, আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে বিহ্বল,

অনিশ্চিত মানুষ। মুক্তিযুদ্ধ যেন তাদের কাছে অনেকদিন আগে দেখা একটা স্বপ্ন। পথ হারানো মানুষ যেন সব।

বরিশাল থেকে লঞ্চে চড়ে কীর্তনখোলা নদী বেয়ে ঢাকায় আসেন এক লাজুক কবি আবুল হাসান। শহরের অস্থির হাওয়ার ভেতর হাঁটেন। কবিতার বই বের করেন, নাম 'রাজা যায় রাজা আসে'। লেখেন :

> আমি কার কাছে যাবো, কোনোদিকে যাব?
> অধঃপতনের ধুম সবদিকে, সভ্যতার সেয়ানা গুণ্ডার মত
> মতবাদ, রাজনীতি, শিল্পকলা শ্বাস ফেলছে এদিক ওদিক
> শহরের সবদিকে সাজানো রয়েছে শুধু শানিত দুর্দিন, বন্যা অবরোধ
> আহত বাতাস।
> আমি কার কাছে যাবো? কোনোদিকে যাবো?

সৎ মানুষের লিস্ট

জিনিসপত্রের লাগামহীন দাম, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, বেআইনি অস্ত্র, ব্যাংক লুট, ভেজাল, দুর্নীতির এক বিশাল পাহাড় তখন শেখ মুজিবের সামনে। বিহ্বল শেখ মুজিব ভেবে পান না কি করে এই পাহাড় ডিঙোবেন তিনি। এক বক্তৃতায় তিনি আক্ষেপ করে বলেন : সবাই পায় সোনার খনি, তেলের খনি, আর আমি পাইছি চোরের খনি।

এসময় একদিন দর্শনের অধ্যাপক সাইদুর রহমান তার সম্পাদিত 'দর্শন' পত্রিকার একটি সৌজন্য কপি নিয়ে যান শেখ মুজিবের কাছে। ১৯৪৫-এ শেখ মুজিব যখন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র তখন তার শিক্ষক ছিলেন সাইদুর রহমান। শিক্ষক এসেছেন ছাত্রের সাথে দেখা করতে, যিনি এখন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে শেখ মুজিব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন : স্যার, আমাকে লজিকে কত নম্বর দিয়েছিলেন মনে আছে?

সাইদুর রহমান নীরব থাকেন।

শেখ মুজিবের অফিসে আরও কিছু মানুষ। উপস্থিত সবার সামনেই মুজিব বলেন : আমাকে স্যার আপনি লজিকে ২৭ নম্বর দিয়েছিলেন।

সাইদুর রহমান কিছুটা বিব্রত হয়ে বলেন : মুজিব, তুমি এখন নম্বরের অনেক উপরে।

শেখ মুজিব : দেশের অবস্থা তো দেখছেন স্যার। যে লজিকে ২৭ পায় দেশ এর চেয়ে ভালো চালানোর ক্ষমতা তার থাকে না। তবে স্যার আপনি তো অনেক মানুষকে চেনেন। দয়া করে আমাকে একটা ১০০ ভালো মানুষের তালিকা করে দেবেন? আমি আবার তাদের নিয়ে চেষ্টা করে দেখি।

সিধা রাস্তা

একটা বিধ্বস্ত, নিঃস্ব দেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনবার চেষ্টা করছেন শেখ মুজিব। ছুটে গেছেন ধনবান আমেরিকার কাছে। গুড় যা মিলেছে তা খেয়েছে পিঁপড়ায়। এরপর মিলল অপমান। খাদ্যের জাহাজ পাঠিয়েও আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেল তারা। দেশকে বাঁচাবেন বলে হাত বাড়িয়েছেন সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর দিকেও। সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো একটা সূক্ষ্ম দড়ির ওপর দুলতে দুলতে এগিয়ে গেছেন তিনি। একবার ডানে একবার বাঁয়ে। সম্বল তার আত্মবিশ্বাস, ক্যারিশমা। কিন্তু আর তাল রাখতে পারছেন না। একদিকে তাকে নেমে পড়তেই হবে এবার।

একটা কোনো কঠোর ব্যবস্থার কথা, দেশে একটা মৌলিক পরিবর্তনের কথা শেখ মুজিব তার মন্ত্রী পরিষদের কাছে বলতে থাকেন প্রতিনিয়ত। কঠোরতর কোনো পদক্ষেপের ব্যাপারে তিনি ধারাবাহিক বৈঠক করতে থাকেন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে। শেখ মুজিব দলীয় নেতৃবৃন্দকে তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন, আমি এবার এর শেষ দেখে ছাড়ব।

শেষ মুজিব সিদ্ধান্ত নেন আর ডান বাম নয় তিনি দেশে এবার সমাজতন্ত্র কায়েম করবেন। কিছুদিন আগে জেনারেল পিনোশের নেতৃত্বে আমেরিকার মদদে সংঘটিত অভ্যুত্থানে নিহত হন চিলির সমাজতন্ত্রী ঘেষা জাতীয়তাবাদী নেতা প্রেসিডেন্ট আলেন্দে। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে বলেন, '... আমার পরিণতি যদি আলেন্দের মতোও হয় তবু আমি আপস করবো না।'

১৯৭৪ সালের শেষে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন শেখ মুজিব।

প্রবীণ নেতাদের ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকেন মুজিব। নিজ দলের তরুণ নেতাদের ভেতরকার নানা দ্বন্দ্বেও তিনি বিরক্ত। একদিন তরুণ বামপন্থী ছাত্রনেতা হায়দার আকবর খান রনো আর রাশেদ খান মেননকে তার বত্রিশ নম্বর বাড়িতে ডেকে পাঠান শেখ মুজিব। সেটি পচাত্তর সালের শুরুর দিকে। শেখ মুজিব বলেন : সিরাতুল মুসতাকিনের মানে বুঝিস? মানে হলো সিধা রাস্তা। আমি ঠিক করেছি সমাজতন্ত্র করে ফেলব। বিয়ের প্রথম রাতে বিড়াল মারার গল্প জানিস? আমি অলরেডি লেট। আর দেরি নয়। এবার সমাজতন্ত্র করে ফেলব। তোরা আয় আমার সঙ্গে। আমি পাঞ্জাবি ক্যাপিটালিস্ট তাড়িয়েছি তাই বলে মারোয়াড়ী ক্যাপিটালিস্ট এলাও করব না। আমি ক্যাপিটালিজম হতে দেব না, সোসালিজম করব। তোরা আয় আমার সঙ্গে।

তরুণ রনো, মেনন তর্ক জুড়ে দেন শেখ মুজিবের সঙ্গে; কিন্তু এভাবে কি সমাজতন্ত্র হয়? আপনি চাইলেন আর সমাজতন্ত্র হয়ে গেল? এর একটা প্রক্রিয়া আছে না?

কিন্তু নিজের ওপর অগাধ আস্থা মুজিবের। তিনি বিশ্বাস করেন তিনি যেটা চাইবেন, দেশের মানুষের মধ্য দিয়ে তাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেনই। শেখ মুজিব কখনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন করেননি। তিনি করেছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, করেছেন ভোটের রাজনীতি। সমাজতান্ত্রিক নয় চেয়েছিলেন মিশ্র অর্থনীতি। কিন্তু পোড় খেয়ে এবার ধরতে চাইলেন উল্টোপথ। তার শখের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জন্য উঠে পড়ে লাগলেন তিনি।

সে সময়ে ঘটা করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিচিত্র নাটকের স্মৃতিচারণ করেছেন তরুণ ক্ষেপাটে লেখক আহমদ ছফা। তিনি তখন ইউনিসেফের ফান্ড নিয়ে কুমিল্লা বোর্ডে গবেষণা করছেন। ৭৫-এ জুলাইয়ের শেষের দিকে প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল ইকোনমিক সেক্রেটারি ড. সাত্তার একদিন বার্ডে এসে বললেন শেখ মুজিব তাকে বলেছেন একটা দুটো গ্রামে সমাজতন্ত্রের মডেল প্র্যাকটিস করতে। তিনি তার নিজের গ্রাম চাঁদপুরে মেহেরপুর পঞ্চগ্রাম সমিতি গঠনের প্ল্যান করেছেন। সমাজতন্ত্রের ধরনটা কেমন হবে সেটা পর্যালোচনা করার জন্য ঐ গ্রামে একটা ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করেন তিনি। সেখানে একাডেমীর পদস্থ কর্মকর্তা, কুমিল্লার ডিসি, এডিসি, এসডিও, স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনের লোকজন উপস্থিত। যাবার সময় সাত্তার সাহেব শেখ মুজিবের জন্য কাঁঠাল এবং ছোট মাছ ভাজা নিয়ে যান।

দ্বিতীয় বিপ্লব

শেখ মুজিব বলেন, তিনি এবার সবকিছুর শেষ দেখে ছাড়বেন। কঠোর থেকে কঠোরতর হবার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। জরুরি অবস্থা ঘোষণার এক মাসের মাথায় ১৯৭৫ এর জানুয়ারিতে দেশের সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী আনা হয়। সেই অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর বদলে শেখ মুজিব হন প্রেসিডেন্ট। দেশের সর্বময় ক্ষমতা হাতে নেন তিনি। দেশের সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্ত হয় দেশে শুধু একটি মাত্র দল থাকবে। সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা জারির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ৭৫-এর ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল নামে একটা নতুন দলের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাকশালকেই শেখ মুজিব তাঁর নিজস্ব ধারার সমাজতন্ত্রের একটি মডেল হিসেবে দাঁড় করাতে চান। শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, বাকশালের অধীনে প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলকভাবে বহুমুখী সমবায় সমিতি গড়া হবে, জেলাগুলোকে বিলুপ্ত করে প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় পরিণত করা হবে, ছোট ছোট জেলাগুলো হবে এক একটি কমিউন। তার দায়িত্ব দেওয়া হবে একজন গভর্নরকে। সেনাবাহিনী এবং পেশাজীবীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। সমস্ত দৈনিক পত্রিকা নিষিদ্ধ

ঘোষণা করে সরকার নিয়ন্ত্রিত গুটিকয় পত্রিকা প্রচার করা হবে। শেখ মুজিব বললেন, এটি তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব।

আওয়ামী লীগের প্রায় সব সংসদ সদস্য, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সব কর্মকর্তা বাকশালের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। নানা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানও একে একে যোগ দিতে শুরু করেন বাকশালে। ৭ জুন ১৯৭৫ আনুষ্ঠানিকভাবে সব সংগঠন প্রতিষ্ঠানের বাকশালে যোগদানের দিন। সেদিন বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, দমকা হাওয়া। এসবকে উপেক্ষা করে শত শত প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, ছাত্র, নারী, ঢলের পানির মতো আসতে থাকেন বাকশালে যোগ দিতে। শেখ মুজিবের ছবি, ব্যানার, পোস্টার, পতাকা, নানা রং-বেরঙের স্লোগানবাহী মিছিল। অফিসের বারান্দায় বসে এ দৃশ্য দেখেন শেখ মুজিব।

এ মিছিল কি স্বতঃস্ফূর্ত নাকি সাজানো? এই অতি উৎসাহ কি ভয় থেকে? প্রশ্ন জাগে জনমনে। এমনকি শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাঁর ঘনিষ্ঠ মানুষ প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম বলেন : আপনার এত বড় বড় ছবি নিয়ে এধরনের মিছিল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

শেখ মুজিব নীরব থাকেন কিছুক্ষণ, বলেন : দেখেননি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ওরা এমন করে।

সমাজতন্ত্রের ঘোর যেন লেগেছে শেখ মুজিবের মনে।

কিছুদিন পরই মস্কো-আফ্রো এশিয়া লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে গেছেন শেখ মুজিব। সেখানকার প্রতিনিধিদের তিনি বলেন : কি হাস্যকর দেখেন আমি সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করলাম আর আমাকেই কিনা একদলীয় বাকশাল বানাতে হলো। আমি চাইনি কিন্তু বাধ্য হয়েছি। তবে আমি মনে করি এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা।

বাকশাল একটি ডুবন্ত দেশকে মরিয়া হয়ে টেনে তুলবার শেষ চেষ্টা শেখ মুজিবের। পৃথিবী তখন ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র দুটো শিবিরে বিভক্ত। দুটোই সমানভাবে শক্তিশালী। দুদিকে ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিব ঝুঁকলেন এক দিকে।

অশনিসঙ্কেত

কিন্তু সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গে এ পদক্ষেপ মেলে না। রাশিয়া, চীন, কিউবায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে একটি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। সমাজতন্ত্র মানে এক শ্রেণী দ্বারা আরেক শ্রেণীর উচ্ছেদের মাধ্যমে একটি শ্রেণীহীন সমাজের দিকে যাত্রা। সেই সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণে রয়ে গেছে কত অপ্রীতিকর কৃত কৌশল। দেশের মানুষের শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যে কোনো

পরিবর্তন না করে এধরনের শান্তিপূর্ণ, অবৈপ্লবিক কৃত্রিম পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা শেখ মুজিবের জন্য হয়ে উঠে এক আত্মঘাতী পদক্ষেপ।

স্বাধীনতার পর পরই এমন একটি ব্যবস্থা নিলে হয়তো এই পদক্ষেপের অন্য একটি অর্থ দাঁড়াতো। কিন্তু এত ঘটনা দুর্ঘটনার পর হঠাৎ সব দল নিষিদ্ধ করে এমন একটি একদলীয় ব্যবস্থা দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রতীয়মান হয় স্বৈরাচারী ব্যবস্থা হিসেবে। তারা টের পান যদি বাকশাল এবং শেখ মুজিব থাকেন তাহলে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে হবে। একটা পথ বেছে নিতে হবে তাদের। তারা থাকবেন নাকি শেখ মুজিব ?

বাকশালের মাধ্যমে শিল্প কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব জাতীয়করণের ঘোষণা হলে হাত গুটিয়ে নেন বিদেশি পুঁজিপতিরা। বন্ধ হয়ে যায় স্থানীয় পুঁজিপতিদেরও বিকাশের পথ। বিদেশি বিনিয়োগকারী বা স্থানীয় পুঁজিপতি দুদলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শেখ মুজিব থাকলে বাংলাদেশে তাদের পথ বন্ধ। তাদেরও বেছে নিতে হবে একটা পথ। তারা থাকবেন নাকি শেখ মুজিব?

বাকশালের সিদ্ধান্ত পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রভু পরাক্রমশালী আমেরিকার জন্য হয় একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত। এমনিতেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির পরাজয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কিসিঞ্জার। পাকভারত উপমহাদেশে আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একীভুত পাকিস্তান ছিল জরুরি। বাংলাদেশ তা হতে দেয়নি। বিশ্বের পরাক্রমশালী জাতির জন্য এ বড় অপমান। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কিসিঞ্জার এসেছেন এদেশকে সাহায্য করবার জন্য। আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন খাদ্য বোঝাই জাহাজ। যেন হুলো বেড়াল খেলছেন এক নেংটি ইঁদূরের সঙ্গে। এই রকম অবস্থায় বাকশালের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বস্তুত আমেরিকা থেকে পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া। বাংলাদেশের মতো এমন একটি নেংটি ইঁদূরের এত বড় দুঃসাহসে দ্বিতীয়বারের মতো অপমানিত হয় আমেরিকা। ফলে আমেরিকাকেও বেছে নিতে হবে একটা পথ। শেখ মুজিবকে তার পথে চলতে দেওয়া হবে, নাকি এই অপমানের উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে এখনই?

দেশের ভেতর যেসব দল পাকিস্তানপন্থী, ইসলামপন্থী, আমেরিকাপন্থী তাদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাকশালের মাধ্যমে যে রাষ্ট্র শেখ মুজিব গড়তে যাচ্ছেন তাতে তাদের আর কোনো ভবিষ্যত নাই। 'মুসলিম বাংলা' বলে একটি আন্দোলনকে বেশ গুছিয়ে আনছিলেন তারা। ফলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাদেরও। কার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করবেন, নিজেদের নাকি শেখ মুজিবের?

আর দেশে যারা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়ছেন তারা বিরক্ত। শেখ মুজিব কি বামপন্থীদের এতদিনের সংগ্রামকে হাইজ্যাক করতে চান? বাকশালের মাধ্যমে এ কেমন সমাজতন্ত্রের বনভোজন শুরু করেছেন শেখ মুজিব?

শেখ মুজিব নিজের ডানে, বায়ে জন্ম দেন মারাত্মক সব শত্রুর। বাকশালের মাধ্যমে শেখ মুজিব চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন চারদিকে। হয় তুমি আমার পক্ষে, নয় তুমি বিলুপ্ত।

শেখ মুজিব অনেকের জন্যই হয়ে দাঁড়ালেন মূর্তিমান প্রকাণ্ড এক বাধা। বাকশাল যদি ব্যর্থ হয়, শেখ মুজিব যদি দৃশ্যপট থেকে সরে যান তবে তা কারো জন্য অস্তিত্বের বিজয়, কারো জন্য স্বস্তি, কারো জন্য তা প্রত্যাশিত পরিবর্তন। চারদিক থেকে শুরু হয়ে যায় বাকশাল মোকাবেলার আয়োজন। বহুমুখী বিরুদ্ধ শক্তির রোষানলে পড়েন শেখ মুজিব। সম্ভাবনা দেখা দেয় একটি পট পরিবর্তনের। কিন্তু গুটিটা কে চালবেন? ডানপন্থীরা না বাম?

সক্রিয় গণবাহিনী

মিটিংয়ে বসেন জাসদ নেতৃবৃন্দ। বাকশাল বিষয়ে তাদের দলীয় অবস্থান কি হবে তাই নিয়ে আলাপ করেন তারা।

তাহের ইতোমধ্যে সক্রিয়ভাবে জড়িত জাসদের কর্মকাণ্ডে। তিনিও আছেন মিটিং।

তাহের বলেন : বাকশালের মাধ্যমে রাষ্ট্রের মূল চরিত্রের পরিবর্তন হবার কোনো কারণ তো আমি দেখি না।

সিরাজুল আলম খান : শেখ মুজিব শুধুমাত্র তার আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে একটা হেরে যাওয়া যুদ্ধ লড়তে চাইছেন।

ড. আখলাক : কিন্তু সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে এভাবে একটা বেপথে চলে যেতে দেওয়া যায় না।

ইনু : বাকশাল হবার পর থেকে ইতোমধ্যে সারা দেশে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে অজস্র জাসদকর্মীকে কিন্তু গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিরাজুল আলম খান : আমরা ওপেন পলিটিক্সের একটা সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সব পার্টি ব্যান্ড হয়ে গেলে সুযোগটা তো আর থাকছে না। এখন আমাদের এগ্রেসিভ হওয়া ছাড়া উপায় নাই। গণআন্দোলনের সুযোগ যখন আর নাই, আমাদের হার্ড কোর গ্রুপটাকে সক্রিয় হতে হবে এখন, সশস্ত্র গণবাহিনী তৈরির গতি বাড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের গণবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ কর্নেল তাহের এ ব্যাপারে আমাদের লিড করবেন।

তাহের : আমি ইতোমধ্যেই গ্রাউন্ড ওয়ার্ক শুরু করেছি। ইতোমধ্যে সারাদেশে আমাদের ভালো গণভিত্তি তৈরি হয়েছে। এখন আমাদের সম্ভবত একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকেই যেতে হবে। আমাদের দ্রুত গণবাহিনীর সদস্যদের গেরিলা ট্রেনিং শুরু করতে হবে। কয়েক বছর আগে সিরাজ শিকদারের দলের জন্য যে ট্রেনিং ম্যানুয়াল করেছিলাম সেটা রিভাইস করছি। ওটা করেছিলাম

গ্রামের গেরিলা যুদ্ধের জন্য। মাওয়ের গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাওয়ের স্ট্যাটেজি ছিল আমাদের। কিন্তু আমাদের রেভ্যুলেশনটা তো চীনা স্টাইলে হবে না, হয়তো খানিকটা বলশেভিক স্টাইলে হবে। প্রথমত শহরের শক্তিকেন্দ্রগুলোকে দখল করতে হবে আমাদের তারপর তার সমর্থনে আমাদের গণসংগঠনের কর্মীদের মোবিলাইজ করতে হবে। আমাদের কনফনট্রেশনটা হবে প্রথমত শহরে। আমি তাই শহরভিত্তিক গেরিলা স্ট্যাটেজিগুলো ডেভেলপ করছি। আমাদের গণবাহিনীর প্রচুর ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে, ফলে তাদের অলরেডি আর্মস ট্রেনিং কিছু আছে।

ব্যস্ততা বেড়ে যায় তাহেরের। দিনে ড্রেজার সংস্থার অফিসের কাজ আর রাত জেগে শহরভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি এবং রণকৌশলের ওপর ম্যানুয়াল আর ধারাবাহিক বক্তৃতা তৈরি করা। জয়া আধো আধো বোলে ছড়া বলে তখন আর ছোট ছোট পা ফেলে হাটে যীশু। তাহের কোলে তুলে নেন জয়া আর যীশুকে, চুমু খান ওদের গালে। বলেন : লুৎফা, পার্টিতে এখনই এতটা একটিভ রোলে আসতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু পলিটিক্স এমন একটা টার্ন নিল যে হঠাৎ করে আমার রেসপনসিবিলি অনেক বেড়ে গেছে। সামনে যে কি আছে বুঝতে পারছি না।

লুৎফা চাপা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দূর থেকে দেখেন তার ব্যস্ত, গোপন বিপ্লবী স্বামীকে। জয়া, যীশুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেন তিনি।

নতুন করে পড়াশোনার মাত্রা বেড়ে যায় তাহেরের। রাতে বিছানায়, খাবার টেবিলে এমনকি টয়লেটেও বই নিয়ে ঢোকেন তিনি। ঠোঁটে সিগারেট। বক্তৃতা মালা তৈরি করতে গিয়ে ব্রাজিল, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশের শহরে গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতাগুলোর ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করতে শুরু করেন তাহের। সেগুলো উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের উপযোগী করে। অভ্যুত্থানমূলক রণনীতিতে শহরভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের গুরুত্ব, শহরে গেরিলা যোদ্ধার টিকে থাকার কৌশল, কি করে শিল্পাঞ্চলে, সেনা অবস্থানের চারপাশে গেরিলা সংগঠন করতে হয়, কি করে লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে সে সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করতে হয়, ঝটিকা আক্রমণ শেষে পালিয়ে আসতে হয় এই সব এক একটি প্রসঙ্গের ওপর বক্তৃতা তৈরি করেন তাহের। ঐ বক্তৃতা ঢাকার গণবাহিনীর এরিয়া কমান্ডারদের প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হয়। একটা পুস্তিকা আকারে সে নির্দেশনা সাইক্লোস্টাইল করে দেশের অন্যান্য এলাকাতেও পাঠায় জাসদ।

গণবাহিনীর নামে দেয়াল লিখন, ঝটিকা সভা, লিফলেট ছড়ানো ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি ৭৪-এর ২৬ নভেম্বর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে হরতালও ডাকে জাসদ। আগের রাতে বোমা বানাতে গিয়ে মারা যান বুয়েটের মেধাবী শিক্ষক জাসদকর্মী নিখিল রঞ্জন সাহা। তার নামে জাসদ তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী বোমার নাম রাখে নিখিল বোমা। বোমার সশব্দ প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকার জন্যই গণবাহিনী বোমাকে তাদের উপস্থিতি জানানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে।

রক্ষীবাহিনী গ্রামেগঞ্জে ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে গণহারে গ্রেফতার করতে থাকে জাসদকর্মীদের। জাসদ তার পার্টি পত্রিকায় লেখে, 'দেশে একটা যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, এখন সংগ্রাম অর্থ যুদ্ধ।' বাকশালের চ্যালেঞ্জ জাসদকে বাধ্য করে একটা মৃদু অবস্থান থেকে জঙ্গি অবস্থানে চলে আসতে। গণআন্দোলনের স্তর পেরিয়ে পার্টি যেহেতু সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে ঝোঁকে, ফলে পার্টিতে তাহেরের অবস্থানেরও একটা গুনগত পরিবর্তন ঘটে। এযাবত তাহের ছিলেন পার্টির সহযোগী সংগঠন গণবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ, এই পর্যায়ে যেহেতু গণবাহিনী আন্দোলনের কেন্দ্রে চলে আসে, তাহেরও চলে আসেন পার্টি নেতৃত্বের পুরোভাগে।

লাল ঘোড়া

শহরে, গ্রামে নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে আগে থেকেই প্রবল চাপের মুখে রেখেছেন সিরাজ শিকদার। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবার পর তার তৎপরতা আরও বাড়িয়ে দেন সিরাজ শিকদার। চুয়াত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে হরতাল ডাকে সর্বহারা পার্টি। বোমা ফাটিয়ে, লিফলেট বিলি করে আতঙ্ক তৈরি করে তারা। দেশের নানা এলাকায় তাদের ডাকে হরতাল সফলও হয়। রক্ষীবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন খুঁজছে সিরাজ শিকদারকে। সরকারের মোস্ট ওয়ান্টেড মানুষ তিনি। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া দুষ্কর। কঠোর গোপনীয়তায়, নানা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান তিনি। নিরাপত্তার জন্য এমনকি নিজের দলের ভেতর কারো আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন তিনি।

১৬ ডিসেম্বর হরতাল সফল হবার পর আরও ব্যাপক কর্মসূচি নেবার পরিকল্পনা নিয়ে সিরাজ শিকদার তখন তার পার্টি নেতৃবৃন্দের সাথে লাগাতার মিটিং করছেন চট্টগ্রামে। একেক দিন থাকছেন একেক গোপন আস্তানায়। ১৯৭৫ এর প্রথম দিন, ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামে হালিশহরের কাছে এক গোপন শেল্টার থেকে একজন পার্টি কর্মীসহ সিরাজ শিকদার যাচ্ছিলেন আরেকটি শেল্টারে। বেবিট্যাক্সি নিয়েছেন একটি। সিরাজ শিকদার পড়েছেন একটি দামী ঘিয়া প্যান্ট এবং টেট্রনের সাদা ফুল শার্ট, চোখে সান গ্লাস, হাতে ব্রিফকেস। যেন তুখোড় ব্যবসায়ী একজন। বেবিট্যাক্সিতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে একজন অপরিচিত লোক এসে তার কাছে লিফট চায়, বলে তার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ, ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন, সে সামনেই নেমে যাবে। শিকদার বেশ কয়বার আপত্তি করলেও লোকটির অনুনয় বিনয়ের জন্য তাকে বেবিট্যাক্সিতে তুলে নেন। চট্টগ্রাম নিউমার্কেটের কাছে আসতেই অপরিচিত লোকটি হঠাৎ লাফ দিয়ে বেবিট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে পিস্তল ধরে থামতে বলে। কাছেই সাদা পোশাকে বেশ কয়জন অপেক্ষমাণ পুলিশ

স্টেনগান উঁচিয়ে ঘিরে ফেলে বেবিট্যাক্সিকে। স্বাধীন বাংলাদেশের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও তার দলের সদস্যেরই বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে যান পুলিশের হাতে।

সিরাজ শিকদারকে হাত কড়া পড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ডাবল মুরিং থানায়। সেদিন সন্ধ্যায় একটি বিশেষ ফকার বিমানে তাকে নিয়ে আসা হয় ঢাকা। তাকে রাখা হয় মালিবাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে। সরকারের ত্রাস, বহুল আলোচিত, রহস্যময় এই মানুষটিকে এক নজর দেখবার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্য, আমলাদের মধ্যে ভিড় জমে যায়।

৩ জানুয়ারি সারা দেশের মানুষ পত্রিকায় পড়ে, 'বন্দি অবস্থায় পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি নামে পরিচিত একটি গুপ্ত চরমপন্থী দলের প্রধান সিরাজুল হক শিকদার ওরফে সিরাজ শিকদার।' ছাপানো হয় সিরাজ শিকদারের মৃতদেহের ছবি।

সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর খবরে মর্মাহত হন তাহের। যদিও তাহের এবং সিরাজের পথ হয়ে গিয়েছিল ভিন্ন। তবু উভয়ের জীবনের পথ অন্তত কিছূটা সময় মিলেছিল এক বিন্দুতে। ঘনিষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন তারা একত্রে। সিরাজ তার মতোই যুথভ্রষ্টের দলে। মেধাবী প্রকৌশলী ছেলে জীবনের ছক ছেড়ে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন রাইফেল। পৃথিবী বদলে ফেলবেন বলে গোপন আস্তানা গেড়েছেন টেকনাফের পাহাড়ে। আশ্রয় নিয়েছেন মুরং পাড়ায়, কবিতা লিখেছেন, 'হায় কবে নিটোল স্বাস্থ্যবতী মুরং তরুণীর কাঁধে উঠবে রাইফেল?' দুর্ধর্ষ যুদ্ধ করে পেয়ারা বাগান মুক্ত করে রেখেছিলেন পাকবাহিনীর হাত থেকে। সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন বলে শুরু করেছিলেন কঠোর, অপ্রিয়, সহিংস সংগ্রাম। তিনি একাই হয়ে উঠেছিলেন বিশাল ক্ষমতাশীল সরকারের সবচাইতে ভয়ংকর প্রতিপক্ষ।

স্তব্ধ করে দেওয়া হলো তাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে শুরু হলো তাৎপর্যপূর্ণ মৃত্যুর আড়ম্বর। এই স্বাপ্নিক বিপ্লবীর পুরো গল্পটি কেউ একদিন হয়তো আমাদের শোনাবেন। কিন্তু আপাতত সিরাজ শিকদারের মৃত্যু বিষয়ক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি অধিকাংশ মানুষই অবিশ্বাস করে। মানুষের ধারণা হয় পুলিশ প্রহরায় সচেতনভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

প্রতিহিংসা বা হত্যার রাজনীতি শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনচর্চার মূল বৈশিষ্ট্য নয়। ফলে তার নির্দেশে সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়েছে সেটি হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে তার একজন প্রবল প্রতিপক্ষ ঘায়েল হওয়াতে তার ভেতর একটা স্বস্তি লক্ষ করা যায়। তিনি এমনকি জাতীয় সংসদের বক্তৃতায় বলেন : আমি লাল ঘোড়া দাবড়ায়ে দিছি... কোথায় সেই সিরাজ শিকদার?

সিরাজ শিকদারের মৃত্যুতে সর্বহারা পার্টি হয়ে পড়ে নাজুক। সরকারের জন্য তারা আর তখন বড় কোনো হুমকি নয়। এতে করে শেখ মুজিব এবং তার সরকারের অন্যতম প্রতিপক্ষ তখন হয়ে দাঁড়ায় জাসদ। সিরাজ শিকদার বিষয়ে শেখ মুজিবের উক্তি ক্ষুব্ধ করে জাসদের কর্মীদের। আতঙ্কিতও করে। জাসদের নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে আগেই। তারা ভাবে হয়তো এই দমননীতি আরও কঠোর হয়ে উঠবে। হয়তো জাসদের বড় বড় নেতাকেও হত্যা করা হবে।

জাসদ ক্রমাগত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে তাদের আন্দোলন। তাদের অধিকাংশ প্রধান নেতা তখন জেলে বন্দি। ফলে গণআন্দোলনের কার্যক্রম নানাভাবে ব্যাহত। তাদের মনোযোগ তখন দলের অঙ্গসংগঠন গণবাহিনীর দিকে। গণবাহিনীই তখন জাসদের মূল চালিকা শক্তি। ফলে জাসদ রাজনীতির অন্যতম ভূমিকায় তখন গণবাহিনী প্রধান তাহের। একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুচারু পরিকল্পনায় তাহের গুছিয়ে তুলছেন গণবাহিনীকে। ঢাকা শহরকে অনেকগুলো ইউনিটে ভাগ করেছেন তিনি। প্রতি ইউনিটে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন মিলিটারি কমান্ডার, একজন পলিটিক্যাল কমিশার। মিলিটারি কমান্ডার আর ইউনিটের গণবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেবেন আর পলিটিক্যাল কমিশার দেবেন সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির প্রশিক্ষন। ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় দেয়াল লিখন তখন, 'বিপ্লবী গণবাহিনীতে যোগ দিন।' এদের মূল পরিকল্পনাগুলো করে চলেছেন, তাকে সহযোগিতা করছেন ইনু আর নেপথ্য থেকে পরামর্শ দিচ্ছেন সিরাজুল আলম খান। জাসদের অন্য নেতাদের সঙ্গে সময় সময় মিটিং হচ্ছে তার।

সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অস্ত্র সংগ্রহেরও নানা পরিকল্পনা করতে থাকেন তারা। বৈধ অস্ত্র আছে সেনাবাহিনীর ভেতর, ফলে সেনাবাহিনীতে গণবাহিনীর একটি ভিত্তি গড়ে তুলবার প্রয়োজন বোধ করেন তাহের। যদিও সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন তাহের তবু ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ করে সিপাইদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অনেক সিপাই ১১ নম্বর সেক্টরে তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন কিংবা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তার সঙ্গে কাজ করেছেন লাঙ্গল ব্রিগেডে।

এসময় সেনাবাহিনীর সিপাইদের মধ্যেও নানাবিধ হতাশা। সব সৈন্যদের প্রশিক্ষণ, বাসস্থান, বস্ত্র দিতে পারেনি সরকার। অনেকেই ব্যারাকের মেঝেতে, বারান্দায় থাকেন মাসের পর মাস। যে সিপাইরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেশগড়ার কাজে যোগ দিতে চান। ক্যান্টনমেন্টের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন তারা। অফিসারদের সঙ্গে সৈনিকদের প্রতিষ্ঠিত অধস্ত

নীয় সম্পর্কেও ধরেছে চির। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ বদলে দিয়েছে তাদের মানস। যুদ্ধের সময় যে অফিসারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গনে অস্ত্র চালিয়েছেন তারা, থেকেছেন একই তাঁবুতে, স্বাধীনতার পর তারা হয়ে উঠেছেন সুদূরের মানুষ। এক লাফে মেজর থেকে মেজর জেনারেল হয়েছেন তারা। অথচ সিপাইদের জীবনে বদল ঘটেনি কিছুই। তারা ব্যারাকের বারান্দায় শুয়ে এখন মশা মারছেন। এসব মিলিয়ে সেনাবাহিনীর নিচু স্তরের সদস্যদের মধ্যে তখন তৈরি হয়েছে ভিন্ন এক অসন্তোষ।

এ সময় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনীর কিছু মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক নিজেদের মধ্যেই একত্রিত হয়ে একটি ছোট সংগঠন তৈরি করেন দেশের অরাজকতা, সেনাবাহিনীর ভেতর বৈষম্য এগুলোর বিরুদ্ধে কিছু একটা করবার ভাবনা নিয়ে। নায়েব সুবেদার মাহবুবর রহমান, নায়েব সুবেদার জালালউদ্দীন আহমেদ, এয়ার ফোর্সের কর্পোরাল ফখরুল আলম প্রমুখেরা ছিলেন এর নেতৃত্বে। তারা ক্যান্টনমেন্টের বাইরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে থাকেন। ব্যারাকে পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকার কারণে সে সময় অনেক সৈন্যদের বেসামরিক এলাকার থাকতে দেওয়ার অনুমতি দেয় হয়। তাছাড়া সদ্য স্বাধীন দেশের নতুন সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাও ততটা কঠোর নয়। ফলে অনেক সৈনিকই শহরের নানা স্থানে আয়োজিত রাজনৈতিক জনসভাগুলোতে যোগ দেন। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকরা, যারা আওয়ামী শাসনের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ, তারা আকর্ষিত হন জাসদের রাজনীতিতে। জাসদের মেজর জলিলের সাথে যোগাযোগ করেন তারা। তাহের যেহেতু কোনো প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডে থাকতেন না এবং জনসমক্ষে তার নামও উচ্চারিত হতো না, ফলে অনেকেই জাসদের সঙ্গে তাহেরের সংশ্লিষ্টতার কথা জানতেন না। সৈনিকদের সঙ্গে পরবর্তীতে সিরাজুল আলম খানেরও দেখা হয়। জলিল এবং সিরাজুল আলম সৈনিক নেতাদের পরিচয় করিয়ে দেন কর্নেল তাহেরের সঙ্গে এবং তার সঙ্গেই যাবতীয় যোগাযোগ রাখবার নির্দেশ দেন।

সেনাবাহিনীর ভেতর কাজ করবার সক্রিয় চিন্তাভাবনা করছিলেন তাহের। এই সৈনিক নেতাদের সুবাদে একটা শুভযোগ ঘটে যায়। সৈনিকদের সঙ্গে তাহের এবং ইনুর মিটিং হয় এলিফ্যান্ট রোডে বড় ভাই আবু ইউসুফের বাসায়। কেউ কেউ তাহেরকে আগেই জানতেন। তাহের সৈনিকদের জাসদের রাজনীতি এবং তার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা বলেন। তাদের বলেন : সৈনিকরা বছরের পর বছর ক্যান্টনমেন্টে লেফট রাইট করবে কবে যুদ্ধ বাধবে সেজন্য আর দেশের মানুষের দেওয়া ট্যাক্সের ষাট সত্তরভাগ বসে বসে খাবে, আমাদের মতো গরিব দেশে এটা তো হতে পারে না, এটা অন্যায়। এ অবস্থা পাল্টাতে হবে।

সৈনিকরা প্রবলভাবে সমর্থন করেন তাহেরের বক্তব্য।

অভ্যুত্থানের লক্ষ্যে তাহেরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ভেতর কাজ করতে সম্মত হন সৈনিকরা। সেনাবাহিনীর অধস্তন কিছু নন কমিশন অফিসার এবং সৈনিক যোগ দেন জাসদে। এক ব্যতিক্রমী মাত্রা যোগ হয় জাসদে। 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে ক্যান্টনমেন্টে অতি সন্তর্পণে কাজ শুরু করেন তারা। নন কমিশনড অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে বাড়তে থাকে সংগঠনের আকার। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হয় তাহের এবং ইনুর। শহরের নানা জায়গায় গোপনে মিটিং চলে তাদের। সেনাবাহিনীর শিথিল শৃঙ্খলার সুযোগে প্রায়ই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা চলে আসেন বুয়েটে ইনুর হোস্টেলে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ চলে রাজনীতির ক্লাস। সিপাইদের সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়।

ইনু একফাঁকে তাহেরকে বলেন, ক্যান্টনমেন্টে অফিসারদের মধ্যেও কি আমাদের কাজ করা উচিত না?

তাহের বিশেষ আগ্রহ দেখান না। বলেন : অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে লাভ নাই। ওরা সব ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে। আমি কুমিল্লায় তো তাদের নিয়ে পলিটিক্যাল ক্লাস করেছি। ওদের মাইন্ড সেট বদলানো খুব ডিফিকাল্ট। ওদের কনসার্ন হচ্ছে চেইন অব কমান্ড, ডিসিপ্লিন এসব। রেভ্যুলেশনারি কিছু কাজ ওদের দিয়ে করানো সমস্যা। তাছাড়া সৈনিকরা তো সব এদেশের কৃষকেরই সন্তান। তুমি তো জানো লেনিন ওদের বলেছিলেন ইউনিফর্ম পড়া কৃষক। অফিসাররা খুব বেশি কাজে আসবে না, এই সৈনিকরাই মূলত আমদের রেভ্যুলেশনারী শক্তি।

ইনু : তা ঠিক। তবু ধরেন আফিসারদের মধ্যে ছোটখাটো একটা বেইজ করতে পারলেও আমাদের লাভ হতো। কারো সাথে কি কথা হয়েছে কখনো ?

তাহের : কিছু ইয়াং এজিটেডেড অফিসার আছে। এরা বিভিন্ন সময় এসেছে আমার কাছে। বলে, সিচুয়েশন খারাপের দিকে যাচ্ছে, একটা কিছু করে ফেলা দরকার। আমি ওদের বলেছি পলিটিক্সটা বোঝ। কিছু করবার আগে সোসাল এনালাইসসটা বোঝ। মার্ক্সবাদের বেসিক কিছু বইপত্র ওদের দিয়েছি। এরপর থেকে দেখি ওরা আর আসে না। তবে অফিসারদের মধ্যে একমাত্র মেজর জিয়াউদ্দীন আছে আমাদের সাথে। ঐ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকেই সে আমার সাথে যোগাযোগ রেখেছে। সুন্দরবনে ট্রিমেন্ডাস ওয়ার করেছে সে। জিয়াউদ্দীন আসবে আমাদের সঙ্গে। আর সিনিয়রদের মধ্যে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে তো আমার যোগাযোগ আছেই। আমরা কি করছি তিনি তা জানেন। তিনি তো সবসময় একটা নো ম্যানস ল্যান্ডে থাকেন। তবে কিছু একটা ঘটলে আমার বিশ্বাস হি উইল নট গো এগেউনস্ট আস।

যেমন রানী মৌমাছিকে ঘিরে থাকে মৌচাকের সমস্ত মৌমাছি। তাহেরকেও তেমনি ঘিরে আছে তার পরিবার। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে তাহেরের চারপাশে যেমন যোদ্ধার বেশেই ছিল তার সব ভাই বোন, তাহের যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন জাসদের গণবাহিনীর নেতৃত্বে তখনও তার পরিবার সক্রিয়ভাবে আছেন তার পাশে।

আনোয়ার গণবাহিনীর ঢাকা অঞ্চলের প্রধান। সর্বক্ষণ আছেন তাহেরের সঙ্গে। জাসদ এবং সৈনিক সংস্থার প্রায় সবগুলো মিটিংয়েরই অনিবার্য স্থান বড় ভাই আবু ইউসুফের এলিফেন্ট রোডের বাসা। পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্তে ইউসুফের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। তাহেরের ছোট ভাই বেলাল আর বাহার বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীতে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও নানা প্রশাসনিক জটিলতায় শেষ পর্যন্ত সেটি হয়ে ওঠেনি। তারা দুজনই তখন গণবাহিনীর সক্রিয় সদস্য। তারা দুজন ঢাকার দুটি ইউনিটের মিলিটারি কমান্ডার। এছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য গণবাহিনীর একটি সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে, যার অন্যতম সদস্য বেলাল এবং বাহার।

তাহের যখন জাসদে যোগ দিয়েছেন তখন আরেক ভাই সাঈদ কাজলায় তাহেরের দেওয়া ট্রাক্টরে কৃষিকাজ করছেন, গ্রামে চালাচ্ছেন বয়স্ক শিক্ষার স্কুল। তাহেরের আহ্বানে সাঈদ গণবাহিনীতে যোগ দিলেও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জাসদের রাজনীতি নিয়ে নানা প্রশ্নবাণে তিনি ব্যস্ত রাখেন তাহেরকে। একদিন ইউসুফের বাসায় ড. আখলাক এক পীরের আলাপ করছিলেন, তিনি যার ভক্ত। ঠোঁটকাটা সাঈদ বলেন : মার্কসিস্ট মানুষ পীরের আস্তানায় যায় এ আবার কেমন কথা। তাহের ভাই আগেই বলছি সাবধানে থাইকেন কিন্তু।

এবারও বকা দিয়ে সাঈদকে থামিয়ে দেন তাহের।

এসময় নেত্রকোণায় এক আওয়ামী লীগ নেতা খুন হন। আওয়ামী লীগের দুই শত্রু সর্বহারা এবং জাসদ দুটোর সঙ্গেই যোগ রয়েছে সাঈদের। কাজলায় কৃষিকাজে ব্যস্ত সাঈদকেই সন্দেহ করা হয়। মিথ্যা মামলায় জেল হয়ে যায় তার। তাহের এবং তার ভাইরা যখন গণবাহিনী তৈরিতে ব্যস্ত তখন এক মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সাঈদ জেলে।

শুধু বড় ভাই আরিফ রাজনীতি থেকে দূরে, সরকারি চাকরি করেন। তবে বড় ভাইয়ের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা ব্যাপারটিও পরিবারের একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। গণবাহিনী নিয়ে তাহের যখন তৎপর হয়ে উঠেছেন তখন তিনি আরিফের মোহাম্মদপুরের বাসায় গিয়ে বার বার বলে এসেছেন : আরিফ ভাই আপনি কিন্তু নিজেকে এসব থেকে দূরে রাখবেন। আপনার সেইফ থাকা দরকার। আমরা মুভমেন্টের যে স্টেজে আছি তাতে যেকোন সময় সবগুলো ভাই গ্রেফতার হয়ে

যেতে পারি। একটা বড় বিপদ নেমে আসবে আমাদের বৌ বাচ্চাদের ওপর, ডালিয়া জুলিয়া এখনও ছোট। একজনকে সেইফ থাকা দরকার এদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য।

আরিফ বলেন : সব ভেবেচিন্তে করছ তো? পার্টি পলিটিক্সে তুমি তো নতুন। জাসদ নিয়ে কিন্তু নানা রকম কথাও শোনা যায়।

তাহের ভাই : আমার পলিটিক্যাল মিশন তো আজকের না বড় ভাইজান আপনি সেটা জানেন। একটা পার্টির মধ্যদিয়ে তো আমাকে মিশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অনেক তো দেখলাম, বহুজনের সাথেই কথা বলালাম। এ মুহূর্তে এদেরকেই আমার সঠিক রেভ্যুলেশনারি পার্টি মনে হচ্ছে। সন্দেহের কথা বলছেন? সেটা তো আছেই। আমি বিশ্বাস রাখতে চাই।

বাড়ি থেকে বের হবার সময় ঠাট্টা করে তাহের বলেন : বাই দি ওয়ে আমরা যদি পাওয়ারে চলে যাই তখন কিন্তু কারো কোনো পারসোন্যাল প্রপার্টি থাকবে না। আপনার মোহাম্মদপুরের এই বাড়ি তখন আমরা নিয়ে নেব।

হাসেন আরিফ।

ইউসুফের এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে তখন নিয়মিত জাসদের মিটিং। তাহের প্রায় দিনই নারায়ণগঞ্জ থেকে চলে আসেন এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িটিতে। মাঝে মাঝে লুৎফাও আসেন তার সঙ্গে। বাড়িতে অগণিত মানুষের আনোগোনা, তাদের দেখাশোনা, চা নাস্তা, খাওয়া দাওয়ার শ্রমসাধ্য কাজটি করে চলেছেন ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা।

ফাতেমা বলেন : বুঝলে লুৎফা আমার এটা তো কোনো বাসা না, সংসার করব কি, এটা তো একটা পার্টি অফিস। তাহের বলেন : ভাবী, সত্যি ভীষণ খারাপ লাগে, যেভাবে বিপ্লবীরা দখল করেছে আপনার বাড়ি! ক্ষমা করে দেন। বিপ্লব যদি সফল হয় আপনার কন্ট্রিবিউশন কিন্তু আমরা ভুলব না।

ফাতেমা, লুৎফা কারোরই বাঙালি নারীর স্বপ্নের গৃহকোণ রচনার সুযোগ আর হয় না। বিচিত্র বিপ্লবী ব্রাদার্স পার্টিকে সামলাতেই হিমসিম খান তারা।

রাতে সব ভাইরা খেতে বসেন এক সাথে। অবিরাম কথা হয় দেশের পরিস্থিতি নিয়ে।

তাহের বলেন : গণবাহিনী যেভাবে এক্সপান্ড করছে আমি খুব আশাবাদী। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার এই ডেভেলভমেন্টটাও আমাদের জন্য একটা বড় প্লাস পয়েন্ট।

আনোয়ার : কবে নাগাদ আমরা একটা চূড়ান্ত অ্যাকশানে যেতে পারব বলে মনে করেন।

তাহের : জাসদের লিডারদের জেল থেকে বের করে আনা জরুরি। তবে যে গতিতে সব এগোচ্ছে তাতে আমি তো মনে করি বছর খানেকের মধ্যেই আমরা

একটা ফাইনাল অ্যাকশনে যেতে পারব। আমি টার্গেট করছি ছিয়াত্তরের মাঝামাঝি বা শেষ নাগাদ।

ইউসুফ : অবশ্য শেখ মুজিব কি ধরনের অ্যাকশনে যাবেন তার ওপরও নির্ভর করছে।

তাহের : তা অবশ্য ঠিক।

ইউসুফ : আসলে শেখ মুজিব রিয়েলিটিটা বুঝতে পারছেন না। ইতিহাসে সব নেতারই একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে, সে ভূমিকাটা তিনি পালন করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার এজেন্ডাটা তিনি পূরণ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির যে এজেন্ডা সেটা তার একার পক্ষে ফুলফিল করা তো সম্ভব না। এখানে এসে তার উচিত ছিল স্পেসটা ছেড়ে দেওয়া। উল্টো তিনি আরও বেশি বেশি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন। ফলে এরকম একটা সশস্ত্র আপ রাইজিং ছাড়া ক্ষমতা বদলের আর কোনো অপশন তিনি রাখছেন না।

লুৎফা : আচ্ছা, তোমরা যদি পাওয়ারে যাও তাহেলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কি করবে?

তাহের : সেটা পরিস্থিতিই বলে দেবে। আমি মনে করি বাংলাদেশের হিস্ট্রিতে তার যে কন্ট্রিবিউশন আছে সেটাকে আমরা অবশ্যই সম্মান জানাবো। ইন্দোনেশিয়ার কমুনিস্ট পার্টি সুকর্নকে একটা সেরিমোনিয়াল রোলে রাখতে চেয়েছিল, আমরাও সে রকম একটা কিছু করতে পারি।

ইউসুফের বাড়িতে রাতের খাওয়া খেয়ে, অনেক রাতে নারায়ণগঞ্জে বাড়ি ফেরে তাহের লুৎফা। ক্রাচ সামলে ড্রেজার কোম্পানির জীপে ওঠেন তাহের। ড্রাইভার গাড়ি চালায়। লুৎফার কোলে মাথা রেখে গাড়ির সিটের উপর ঘুমিয়ে জয়া, তাহেরের কোলে যিশু। অন্ধকারে হেডলাইটের আলো ফেলে ঢাকা নারায়াণগঞ্জের হাইওয়েতে চলে জীপ।

সামনের রাস্তায় সোজা তাকিয়ে থাকা তাহেরের দিকে আড় চোখে দেখে লুৎফা। সেই কবে বিয়ের পর ঈশ্বরগঞ্জ থেকে ফেরার পথে ট্রেনের কামরায় এমনি কতবার আড় চোখে দেখেছে তাহেরকে। পাশে বসা সেই মানুষটি এখন কেমন যেন এক দূর গ্রহের মানুষ। তিনটি জীবন তার। একটি ড্রেজিং কোম্পানির সরকারি চাকুরের, একটি প্রাক্তন সামরিক অফিসারের, আরেকটি গোপন বিপ্লবীর। যে মানুষটি এই তিনটি জীবন যাপন করছে সে মানুষটি আবার পঙ্গু। এক পায়ের জীবন তার। যেন ক্রাচে ভর দেওয়া এক বিচিত্র অ্যাক্রোব্যাট, সমান্তরালে টেনে নিচ্ছেন তিনটি জীবন। তিন জীবনেরই সাক্ষী, সহযোগী লুৎফা। তাহের যখন বিপ্লবের চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন লুৎফা তখন তৃতীয় বারের মতো গর্ভবতী। মিশু তার গর্ভে।

বেবিট্যাক্সির লাইসেন্স

একটি বেবিট্যাক্সির লাইসেন্সের দরখাস্ত নিয়ে জনৈক মেজর আবদুর রশীদ হাজির হন পুরান ঢাকার আগামসি লেনে খন্দকার মোশতাকের তিনতলা বাড়িতে। খন্দকার মোশতাক তখন আওয়ামী লীগের বাণিজ্য মন্ত্রী। রশীদের বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দিতে। তার পাশের গ্রামের পীর হযরত খন্দকার কবিরুদ্দিন আহমদের ছেলে খন্দকার মোশতাক আহমদ। পাশের গ্রামের একজন আর্মি অফিসার এসেছেন একটা বেবিট্যাক্সির লাইসেন্সের জন্য, ব্যাপারটি নেহাত মামুলি। আলাপ চালান মোশতাক। কিন্তু বেবিট্যাক্সি মেজর রশীদের ওছিলা মাত্র। কথা উঠে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে। দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ : বলেন রশীদ।

মোশতাক বলেন : অবশ্যই।

দেশে একটা পরিবর্তন দরকার : বলেন রশীদ।

মোশতাক বলেন : অবশ্যই।

নেতৃত্বের একটা পরিবর্তন দরকার : বলেন রশীদ।

মোশতাক বলেন : তা ঠিক।

মেজর রশীদ বলেন : শেখ মুজিবকে সরিয়ে দিলে কেমন হয়?

নড়েচড়ে বসেন মোশতাক : দেশের স্বার্থে সেটা ভালো কাজ হবে। তবে কাজটা কঠিন।

মেজর রশীদ বলেন : সেই কঠিন কাজটি করার ব্যবস্থা আমরা করছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে থাকবেন?

খন্দকার মোশতাক বলেন : তিনি তাদের সঙ্গে থাকবেন। সেই খন্দকার মোশতাক যিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি বলে তাজউদ্দীনের সঙ্গে বিবাদ করে মুক্তিযুদ্ধের সময়েই চলে যেতে চেয়েছিলেন মক্কায়, যিনি মাঝপথে মুক্তিযুদ্ধ থামিয়ে আমেরিকার সহায়তায় পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন এবং একমাত্র আওয়ামী লীগ নেতা যিনি সবসময় টুপি এবং আচকান পড়ে থাকেন।

একটি পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট তখন বাংলাদেশে। প্রশ্ন ছিল, পরিবর্তনের গুটিটা কে চালবেন, বামপন্থী না ডানপন্থীরা? পরিবর্তনের দাবিতে বামপন্থীদের মধ্যে সবচাইতে সোচ্চার তখন সর্বহারা পার্টির সিরাজ শিকদার, আর অন্যদিকে জাসদ। সিরাজ শিকদারের মৃত্যুতে সর্বহারার দাবি স্তিমিত। দাবি জাগরুক রেখেছে জাসদ। তারা ব্যাপক গণজাগরণের মধ্য দিয়ে, সচেতন জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বিপ্লবী গণবাহিনীর নেতৃত্বে ধীরে ধীরে একটি অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কিন্তু আমেরিকা আর পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষাকারী যে ডানপন্থীরা তখন পট পরিবর্তন চাইছেন তাদের পক্ষে কোনো জন সমর্থন অর্জন, গণজাগরণ সৃষ্টি

অসম্ভব। ফলে তাদের জন্য যে একটি মাত্র পথ খোলা আছে সেটি হচ্ছে ষড়যন্ত্র। গোপনে, নিভৃতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ তাই নেমে পড়েছেন অতলান্ত গভীর এক ষড়যন্ত্রে।

বুদবুদ

এই ষড়যন্ত্রের কুশীলব হয়ে দাঁড়ান সেনাবাহিনীর দুই মেজর। শেখ মুজিব এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে চারপাশে যে অসংখ্য ক্ষোভের বুদবুদ, তেমনি দুটি বুদবুদের নাম মেজর আব্দুর রশীদ এবং তার ভায়রা মেজর দেওয়ান ইশরাতুল্লাহ সৈয়দ ফারুক রহমান। ফারুক রাজশাহীর পীর বংশের সন্তান। দেশে যখন যুদ্ধ হচ্ছে মেজর ফারুক তখন আবুধাবীতে আর্মড রেজিমেন্টে স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে কাজ করছেন। সেখান থেকে ১৯৭১ এ ১২ ডিসেম্বর স্বাধীনতার মাত্র তিনদিন আগে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন ফারুক। তিনদিনের মুক্তিযোদ্ধা ফারুকের সাথে মেজর আবদুর রশীদের পরিচয় পশ্চিম পাকিস্তানের রিসালপুর মিলিটারি একাডেমীতে। যুদ্ধের সময় রশীদ পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশ স্বাধীন হবার মাস খানেক আগে পাকিস্তান থেকে ছুটি নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন তিনি। ফারুক আবেগ প্রবণ, প্রগলভ, রশীদ ধীর, স্থির, স্বল্পবাক। চট্টগ্রামের এক নামজাদা শিল্পপতির দুই মেয়েকে বিয়ে করেছেন তারা। এই দুই আধেক মুক্তিযোদ্ধার পুঁজি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তাদের উগ্র ক্ষোভ। ফারুককে নিয়োজিত করা হয়েছিল দেশের নানা এলাকায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে, তখন অনেক অস্ত্র আওয়ামী লীগ নেতাদের হাতে। সেসব অস্ত্র উদ্ধার করতে গিয়ে ফারুকের সাথে দ্বন্দ্ব, বিতণ্ডা বাধে আওয়ামী অনেক নেতাকর্মীর, পরে এ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয় তাকে। ক্ষোভ বাড়ে ফারুকের। যেহেতু তাদের এই ক্ষোভ বিশেষ গভীর কোনো রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা তাড়িত নয়, ইতিহাস তাই এই দুই মেজরের ক্ষোভের বুদবুদকে ব্যবহার করে আমেরিকাপন্থী, পাকিস্তানপন্থী, ইসলামপন্থীদের ষড়যন্ত্রের অনুকূলে। এই দুই বুদবুদকে দিয়ে ইতিহাস ঘটিয়ে নেয় এদেশের নাটকীয়তম ঘটনাটি।

তারা জানেন দেশের যা পরিস্থিতি তাতে শেখ মুজিব দৃশ্যপট থেকে সরে যাক সেটি বহুজনের প্রত্যাশা। যদি তাই হয় তাহলে গণজাগরণের মতো দীর্ঘমেয়াদী ইত্যাকার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন কি? শেখ মুজিবকে স্রেফ হত্যা করে আক্ষরিক অর্থে দৃশ্যপট থেকে মুছে ফেলে দিলেই তো চলে। সে সাহস যদি কারো না থাকে আমাদের থাকবে—ভাবেন মেজরদ্বয়। আমাদের হাতে বৈধ অস্ত্র আছে, দরকার মোক্ষম একটা সুযোগের, প্রয়োজন এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবার মেজাজসম্পন্ন কয়েকজন মানুষ, দরকার শেখ মুজিবকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিস্থাপন করবার মতো একজন ব্যক্তি এবং সর্বোপরি এই নতুন অবস্থাকে

টিকিয়ে রাখবার জন্য দরকার একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সমর্থন। এই ভাবনা নিয়ে গোপনে, সন্তর্পণে পরিকল্পনা করতে থাকেন তারা।

প্রাথমিক সম্মতি পাবার পর আগামসি লেনের তিনতালা বাড়িতে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে একাধিক মিটিং চলে মেজর রশীদের। শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ, টুপি আচকান পড়া শুকনো এই মানুষটি ভেতরে ভেতরে বস্তুত মুক্তিযুদ্ধে পরাজিতদেরই দলে। তিনি পাকিস্তান থেকে বিযুক্ত হতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন ইসলামী ধারার দেশ, চেয়েছিলেন ধনতান্ত্রিক আমেরিকার বন্ধুত্ব, চেয়েছিলেন ক্ষমতা। কোনোটিই পাননি, বাকশাল গঠনের পর সে সম্ভাবনা হয়েছে আরও ধূলিসাৎ। ফলে মেজর যখন বলেছে শেখ মুজিবকে সরিয়ে ফেলবার কথা, লুফে নিয়েছেন তিনি। বলেছেন সেটি হবে দেশের জন্য মঙ্গলজনক। পুরনো পাকিস্তান যখন পাওয়া গেল না এবার না হয় তৈরি করা যাক বাঙালিদের ছোট একটি পাকিস্তান।

মেজর রশীদ মোশতাককে জানান শেখ মুজিবকে সরিয়ে ফেলবার কঠিন কাজটির ব্যবস্থা করছেন তিনি এবং তার ভায়রা মেজর ফারুক। পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তিনি প্রস্তুত হতে বলেন খন্দকার মোশতাককে।

ফারুক সেনাবাহিনীর একমাত্র ট্যাঙ্ক ইউনিট বেঙ্গল ল্যান্সারের সহঅধিনায়ক, রশীদ টু ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ডিং অফিসার। ফারুকের দখলে ট্যাঙ্ক, রশীদের দখলে কামান। ঘটনাটি তাদের ঘটাতে হবে সেনাবাহিনীর অস্ত্রের জোরেই। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর উঁচু পর্যায়ের কারো সমর্থন তাদের দরকার। মেজর বুদবুদদ্বয় ভাসতে ভাসতে গিয়ে পৌঁছান সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জেনারেল জিয়ার কাছে। পাকিস্তানের রিসালপুর মিলিটারি একাডেমীতে যখন ফারুক, রশীদ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তখন জিয়া তাদের প্রশিক্ষক। জুনিয়র অফিসার হলেও জিয়ার সঙ্গে ভালো যোগাযোগ তাদের। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে জেনারেল জিয়ার ক্ষোভের কথা মেজর ফারুক, রশীদ ভালো করেই জানেন। জানেন যে সেনাপ্রধান না করার কারণে জেনারেল জিয়া ক্ষুব্ধ। এও জানেন জেনারেল জিয়াকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেবার যে গুজব উঠেছে তাতেও তিনি অত্যন্ত বিরক্ত। শেখ মুজিবকে অপসারণের পরিকল্পনা জেনারেল জিয়াকে জানান তারা।

বরাবরের মতো এবারও স্বভাবসুলভভাবে সাবধানী মন্তব্য করেন জিয়া : আমি এধরনের কাজে নিজেকে জড়াতে চাই না। তোমরা জুনিয়র অফিসাররা যদি কিছু একটা করতে চাও তাহলে তোমাদের নিজেদেরই তা করা উচিত। আমাকে এসবের মধ্যে টেনো না।

একজনের সঙ্গে আছি আবার নেই, অভূতপূর্ব এই এক দক্ষতা অর্জন করেছেন জেনারেল জিয়া। বহুবছর পর জিয়া যখন এদেশের রাজনীতির প্রধান

এক কুশীলব তখন তার জীবনীকার ডেনিস রাইট মন্তব্য করেন : 'যখন ফলাফল অস্পষ্ট তখন খানিকটা নিরাপদ দূরত্ব থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সব রকম পথ খোলা রাখা জিয়ার স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য।'

তবে মেজরদ্বয়ের জন্য ঐ মন্তব্যটুকুই ছিল যথেষ্ট। তারা জুনিয়র অফিসার সুতরাং জানেন যে কিছু একটা ঘটিয়ে ফেললেও ক্ষমতা তারা দখল করতে পারবেন না। সিনিয়র অফিসাররা তা মেনে নেবেন না, বরং কোনো প্রতিআক্রমণ বা প্রতিরোধ হলে তারা নিহত হবেন। তাদের প্রয়োজন কোনো সিনিয়র অফিসারের সবুজবাতি। জিয়ার ঐ মন্তব্যে তারা এইটুকু আশ্বস্ত হন যে তারা যদি একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলেন সেনাবাহিনীর উপপ্রধান তা জানবেন, প্রত্যক্ষ সমর্থন না করলেও তিনি বাধা দেবেন না।

এরপর তাদের দরকার ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবার মতো কিছু বেপরোয়া মানুষ। এখানে পুঁজি হিসেবে পাওয়া যায় আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে ঘটে যাওয়া সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটি। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিন একসাথে বরখাস্ত হয়েছিলেন মেজর ডালিম, নুর, রাশেদসহ বেশ কিছু অফিসার। শেখ মুজিবের কাছে বিচার চেয়েও কোনো ফল পাননি তারা। সেই থেকে বুকে শেখ মুজিবের ব্যাপারে প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে অপেক্ষা করছেন সেইসব ক্ষুব্ধ অফিসাররা। শেখ মুজিবকে উৎখাতের এমন একটি অপারেশনে যোগ দিতে সোৎসাহে রাজি হয়ে যান তারা।

১৯৭৫ এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাকশালের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবার কথা। দেশের ৬১টি জেলায় বাকশালের ৬১ জন গর্ভনর নিয়োগ পাবেন সেদিন থেকে। তাতে আরও শক্ত হয়ে যাবে শেখ মুজিবের ভিত্তি। কিছু ঘটাতে হলে ঘটাতে হবে এর আগেই। বেঙ্গল ল্যান্সারের অধিনায়ক তখন ছুটিতে ফলে সবগুলো ট্যাঙ্ক ফারুকের অধীনে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর কথা ভাবেন তারা। ১৫ তারিখ শুক্রবার, যে কাজটি তারা করতে যাচ্ছেন তাদের মতে সেটি একটি পবিত্র কাজ। ফলে এর জন্য একটি পবিত্র দিনই যথার্থ। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। তারা মনে করেন শেখ মুজিব ভারতের পুতুল সরকার মাত্র। ফলে ঐ দিন তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে ভারতকে একটা শিক্ষা দেওয়া যাবে। ১২ আগস্ট ফারুক তার তৃতীয় বিবাহবার্ষিকী আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের আর্মি ব্যান্ডের সঙ্গীতের মূর্ছনা, পোলাও আর রেজালার সুবাসের মধ্যে একফাঁকে ফারুক তার ভায়রা রশীদকে জানান : ঘটনাটি আমি ১৫ আগস্টই ঘটাবো।

ফারুক, রশীদ যখন ঘটনা ঘটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন খন্দকার মোশতাক তখন তার পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে থাকেন। তিনি চাঙ্গা করে নিতে শুরু করেন তার পুরনো যোগাযোগগুলো। দাউদকান্দিতে দেশের বাড়ি বেড়াতে যাবার ছলে মোশতাক কুমিল্লা বার্ডে বৈঠক সেরে নেন তার পুরনো সহযোগী

মাহবুবুল আলম চাষী এবং শেখ মুজিবের তথ্যমন্ত্রী তাহের উদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে। বিচিত্র জুটি তারা, একজন চাষী, অন্যজন মুসলমান ঠাকুর। চাষীর মাধ্যমে মোশতাক আমেরিকার সঙ্গে তাদের পুরনো সূত্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাদের। আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বোস্টারকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এমন একটি ষড়যন্ত্র বিষয়ে অবহিত করে রাখেন তারা। আওয়ামী লীগের ভেতরের কিছু মানুষের সঙ্গেও সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করেন মোশতাক। যোগাযোগ করেন পাকিস্তানের সঙ্গেও। খন্দকার মোশতাক এবং তার সহযোগীরা যখন মুজিববিহীন পরিস্থিতির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, মেজর ফারুক এবং রশীদ তখন প্রস্তুত হচ্ছেন মূল ঘটনাটি ঘটাবার জন্য। তেঁতুলিয়ার ভোরের শিশির, টেকনাফের নাফ নদীর টলমলে পানি কেউ তা জানে না।

খোলা দুয়ার

স্বাধীনতার পর পরই কলকাতা থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঢাকায় এসেছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে। গেট দিয়ে সোজা চলে গেলেন বসবার ঘরে। শেখ মুজিব এলে সুভাষ বলেন : একেমন ব্যবস্থা? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম কোনো সিকিউরিটি নাই, আমার ব্যাগও চেক করল না কেউ, ওতে পিস্তলও তো থাকতে পারত।

শেখ মুজিব হো হো করে হাসেন : কি যে বলেন, আমার দেশের মানুষ আমাকে মারবে না।

কুরবানি

১৯৭৪-এর মাঝামাঝি। ভারত সফরে গেছেন শেখ মুজিব। খাওয়ার টেবিলে ইন্দিরা গান্ধীকে শেখ মুজিব হঠাৎ বলেন, বুঝলেন ইন্দিরা, মোশতাক হচ্ছে আমার শালা, বাংলাদেশে শালার মতো এমন মধুর সম্পর্ক আর নাই।

টেবিলে বসে আছেন প্ল্যানিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম আর ড. কামাল হোসেন। তাঁরা জানেন মুজিবের সঙ্গে মোশতাকের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। তাঁরা ভাবেন, এই ঠাট্টার তাৎপর্য কি? মোশতাক কোনো মন্তব্য না করে গম্ভীর বসে থাকেন।

ভারত থেকে ঢাকায় ফিরছেন তাঁরা। ফেরার পথে প্লেনে শেখ মুজিব তার কেবিনে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। পর্দার আরেক দিকে পাশের কেবিনে প্ল্যানিং কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম এবং খন্দকার মোশতাক কথা বলছেন। তারা কথা বলছেন দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে। উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করছিলেন তাঁরা।

নুরুল ইসলাম বলছিলেন ইতিহাসে দেখা যায় কোনো দেশে মুদ্রাস্ফীতি ডবল ডিজিট ছাড়িয়ে গেলে সে সরকার আর ক্ষমতায় থাকতে পারে না। হঠাৎ শেখ মুজিব পর্দার ওপাশ থেকে এসে মোশতকের পাশে বসেন।

শেখ মুজিব বলেন : নুরুল ইসলাম সাহেব কি বলে শুনছ তো?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে শেখ মুজিব আবার বলেন : কালকে রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম আল্লাহ আমাকে হযরত ইব্রাহিমের মতো আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে কুরবানি দিতে বলছেন। অনেক চিন্তা করলাম কে আমার সবচেয়ে প্রিয়। চিন্তাভাবনা করে পরে ঠিক করলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছ মোশতাক তুমি। তোমাকেই কুরবানি করতে হবে।

হাসেন মুজিব। মোশতাক এবারও গম্ভীর।

ঝড় বা ভূমিকম্পের আগে যেমন টের পায় পাখি শেখ মুজিবও যেন আভাষ পাচ্ছেন দুর্ঘটনার।

চায়ের বদলে ট্যাঙ্ক

মেজর ফারুক এবং রশীদ ক্যান্টনমেন্টে জানান ১৪ আগস্ট ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার ও দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি একটা যুক্ত মহড়া করবে। অন্ধকারে সৈন্যদের নিজ নিজ অস্ত্র বেছে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার ট্রেনিং এক্সারসাইজ এটি। স্থান নির্মীয়মান কুর্মিটোলা এয়ারপোর্ট।

কুর্মিটোলা এয়ারপোর্টের প্রকাণ্ড ছাতার মতো পিলারগুলো তখন তৈরি হয়েছে কেবল। তার চারপাশে অসমাপ্ত দেয়াল, ইট, বালি, সুড়কি। ১৯৭৫-এর ১৪ আগস্ট রাতে সেখানে ঘন অন্ধকার। কথামতো অব্যবহৃত, অন্ধকার রানওয়েতে মেজর ফারুক ট্রাকবোঝাই সৈন্য আর ২৮টি ট্যাঙ্ক নিয়ে উপস্থিত হন। আরব ইসরাইল যুদ্ধের সময় আরবদের প্রতি সংহতি প্রকাশের নিদর্শন হিসেবে শেখ মুজিব মিসরকে কয়েক টন চা পাঠিয়েছিলেন। তার বিনিময়ে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত মুজিবকে পাঠিয়েছিলেন ৩০টি টি—৫৪ ট্যাঙ্ক। চায়ের বদলে পাঠানো সেই ট্যাঙ্কগুলো এক একটি অতিকায় পোকার মতো তখন বসে আছে রানওয়ের অন্ধকারে।

আরও ১২ ট্রাক সৈন্য আর ১৮টি কামান নিয়ে কিছুক্ষণ পর উপস্থিত হন মেজর রশীদ। রাত এগারোটায় আসেন মেজর ডালিম, পাশা এবং হুদা। আসেন মেজর শাহরিয়ার। এক এক করে আসেন মেজর নুর এবং মহিউদ্দীন। সবাই কালো পোশাক। কাঁধে স্টেনগান। ফারুকের হাতে ঢাকার ম্যাপ। পরিকল্পনামতো মূল অপারেশনের দায়িত্ব ফারুকের এবং রশীদের দায়িত্ব অপারেশন পরবর্তী অবস্থা সামাল দেওয়ার।

কালো পোশাক, কাঁধে স্টেনগান নিয়ে রানওয়েতে ছোটাছুটি করেন মেজর ফারুক। তার সঙ্গে কয়েকশত সৈন্য, আটাশটি ট্যাঙ্ক, আঠারোটি কামান, অসংখ্য হালকা, ভারী অস্ত্র। অন্ধকার রানওয়ের বিশাল চত্বরে সবাই অপারেশনের জন্য প্রস্তুত। মূল পরিকল্পনায় জড়িত কয়জন অফিসার এবং গুটিকয় এনসিও ছাড়া কেউ জানে না কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু সেনাবাহিনীর শপথ... That I shall go whereever my superior orders me even at the peril of my life.

অপারেশনের মূল টার্গেট করা হয় ঢাকা শহরের তিনটি বাড়িকে।

শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি।

তার বোনের ছেলে এবং বাকশাল সেক্রেটারী শেখ ফজলুল হক মণির ধানমন্ডি ১৩ নম্বর রোডের বাড়ি।

ভগ্নিপতি এবং মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবতের মিণ্টু রোডের বাড়ি।

সিদ্ধান্ত হয় তিনটি পৃথক দল একই সময় তিনটি বাড়িতে আক্রমণ করবে।

শেখ মুজিবের ৩২ নম্বরের বাড়ি আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর ডালিমকে। কিন্তু এই ৩২ নম্বরে স্ত্রী নিম্মিকে নিয়ে বহুবার গেছেন ডালিম, শেখ মুজিবের স্ত্রীকে ডেকেছেন মা, একসঙ্গে বসে মুড়ি খেয়েছেন। ডালিম মনে করেন ৩২ নম্বর বাড়িতে এই অপারেশন করতে গিয়ে আবেগ আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন তিনি। ফলে তিনি শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। তিনি দায়িত্ব নেন আবদুর রব সেরনিয়াবতের বাড়ি আক্রমণের।

শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণের দায়িত্ব নেন মেজর মহিউদ্দীন, সঙ্গে নুর এবং বজলুল হুদা। মেজর ফারুকের আস্থাভাজন এনসিও রিসালদার মুসলেউদ্দীন নেন শেখ মণির বাড়ি আক্রমণের দায়িত্ব।

এয়ারপোর্টের আলো আঁধারীতে অতিকায় পোকার মতো বসে থাকা উপহার হিসেবে পাওয়া মিসরীয় ট্যাঙ্কগুলো আড়মোড়া ভাঙ্গে ১৫ আগস্ট ভোর বেলা। তখন ফজরের আজান হচ্ছে।

মাছের শেষ আহার

১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। স্বাধীনতার পর প্রথম শেখ মুজিব যাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তিনি। উপাচার্য মতিন চৌধুরী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁকে। সাজানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবের জন্য তৈরি বক্তৃতা মঞ্চের কাছে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সে ঘটনা নিয়ে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা দল সেদিন ব্যস্ত।

আগের দিন শেখ মুজিব যথারীতি অফিস করেছেন গণভবনে। বিকালে অভ্যাসমাফিক গণভবনের লেকের মাছগুলোকে আধার খাইয়েছেন তিনি। লেকের

পারে বসেই পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি অনুষ্ঠান হবে, তিনি বক্তৃতায় কি কি বলবেন এই নিয়ে সংশিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বেশ রাতে ফিরে গেছেন তার ৩২ নম্বরের বাসায়। রাতে শেখ মণি এসে মুজিবকে দিয়ে গেছেন বিশ্ববিদ্যলয়ের সর্বশেষ অবস্থার খবর। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হবে বলে চলে গেছেন। রাতে এসেছেন সেরানয়াবতও। সেদিন তার মা'র মৃত্যুবার্ষিকী। তার বাড়িতে আত্মীয়স্বজন। রাতে খাওয়ার পর বৈঠক ঘরে বসে শেখ মুজিব সেরনিয়াবতের কাছে দেশের বন্যা পরিস্থিতির খবর জানতে চান। সেরনিয়াবত তখন বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী। পাইপে ধোঁয়া ছেড়ে মুজিব গল্প করেন : ছোটবেলায় ড্রেজার কোম্পানির যে ব্রিটিশরা ছিল ওদের সাথে নদীর পাড়ে ফুটবল খেলতাম। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ড্রেজারের বার্জগুলো সব বার্মাতে নিয়ে গেল, আর ওগুলো আসল না। আমি যেখানে ফুটবল খেলতাম ওখানে এখন আর নদীর নিশানা নাই, খালি চর। বাকশাল হলে আবার এই ড্রেজারের কাজ শুরু করব।

সেরনিয়াবত অনেক রাতে বিদায় নেন। বেশ রাত করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নিরাপত্তার সব খবরা খবর নিয়ে ফেরেন শেখ কামাল। অনেক রাত পর্যন্ত পাশের বাড়ির এক বন্ধুর সঙ্গে ক্যারাম খেলে বাড়ি ফেরে শেখ জামাল। শেখ কামাল, শেখ জামাল দুজনের ঘরেই সদ্য বিবাহিত স্ত্রী। মাস খানেক আগেই বিয়ে হয়েছে তাদের। বাড়ির বৌ রোজী আর সুলতানার হাতে তখনও মেহেদীর দাগ। ঘরে বিয়ের উপহারের প্যাকেট তখনও খোলা হয়নি সব। সেদিন বিকেলে গণভবনের লেকে সাঁতার শিখতে নেমেছিল রাসেল। সে ক্লান্ত। ঘুমিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি। কাজের সূত্রে সেদিন খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছেন শেখ মুজিবের ভাই শেখ নাসের। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনিও। ঘরে নেই মেয়ে হাসিনা আর রেহানা। শেখ হাসিনা তখন তার স্বামীর সঙ্গে জার্মানিতে, সঙ্গে শেখ রেহানা। মাঝ রাতের পর ঘুমাতে যান শেখ মুজিব। রান্নাঘর সামলে অনেক রাতে শুতে আসেন স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা। রোজকার মতো বেডরুমের দরজার সামনে করিডোরে ঘুমিয়ে পড়ে গৃহভৃত্য রমা আর সেলিম।

তারা কেউ জানেন না একটি অতি সাধারণ রাত আর কিছুক্ষণ পরেই পরিণত হবে একটি বিভীষিকায়।

৩২ নম্বর

ভোরের অস্ফুট আলোয় নির্জন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোড। সামনের লেকে কে একজন গোসল করতে নেমেছে। লেকের পাড়ের এক গাছ চুপিসারে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আরেক গাছের পাখিকে। একটা আটপৌড়ে দিন। ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বিখ্যাত বাড়িটির চারপাশে এসময় হঠাৎ ঘিরে দাঁড়ায় অনেকগুলো সৈন্য বোঝাই ট্রাক, জীপ। বাড়িকে তাক করে চারপাশে পজিশন নেয় ভারী কয়েকটি কামান।

অতর্কিতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আর কামান থেকে শুরু হয়ে যায় তুমুল গুলিবর্ষণ। ঘটনার আকস্মিকতায় বাড়ির নিরাপত্তায় থাকা পুলিশ বিহ্বল হয়ে পড়ে। কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই অস্ত্র হাতে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে ঘাতক দল।

প্রচণ্ড গুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় বাড়ির সবার। ধড়ফড়িয়ে উঠেন সবাই। অপ্রস্তুত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রত্যেকে। ঘরের ভেতর শুরু হয়ে যায় ছুটোছুটি। শেখ মুজিব সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নেমে আসেন নিচে। টেলিফোন করবার চেষ্টা করেন বিভিন্ন জায়গায়। লাইন পেতে সমস্যা হয় তার। তিনি সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ এবং তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল জামিলকে ফোন করতে সক্ষম হন। তিনি দ্রুত ফোর্স পাঠিয়ে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করবার অনুরোধ করেন। ফোন সেরে উঠে যান দোতলায়। সিঁড়িতে গৃহভৃত্য রমা তাকে তার পাঞ্জাবি এবং পাইপটি হাতে দেয়, শেখ মুজিব পাঞ্জাবিটি পরে নেন।

শেখ মুজিবের টেলিফোন পাওয়া সত্ত্বেও অপ্রস্তুত, বিমূঢ় সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ ত্বরিত কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন। দ্রুত সময় গড়ায়।

ইতোমধ্যে ঘাতক দল ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতরে। নিচতলায় তারা হত্যা করে শেখ কামালকে। শেখ মুজিব ছুটে আসবার চেষ্টা করেন নিচে। সিঁড়ির উপর তাকে ঘিরে ধরে ঘাতক দল। উত্তেজিত শেখ মুজিব হুঙ্কার দেন : তোরা কি চাস? পাকিস্তান আর্মি আমাকে কিছু করতে পারেনি, তোরা কি করবি...।

কিন্তু পাকিস্তান আর্মি যা করতে পারেনি বাংলাদেশ আর্মির কতিপয় তরুণ অফিসার তাই করে। শেখ মুজিবকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে তারা। সিঁড়ির উপর লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তাক্ত হয়ে যায় সাদা পাঞ্জাবি। হাত থেকে পড়ে যায় তার পাইপটি। যে তর্জনি উঁচিয়ে তিনি ভাষণ দিতেন বিখ্যাত সেই তর্জনিটি গুলির আঘাতে ছিটকে পড়ে তার দেহ থেকে দূরে।

এরপর ঘাতকেরা ৩২ নম্বর বাড়ির উপর তলা, নিচ তলার বিভিন্ন ঘরে, বারান্দায়, টয়লেটে আশ্রয় নেওয়া পরিবারের সদস্যদের একে একে গুলি করে হত্যা করতে থাকে। বাড়ির নানা প্রান্তে পড়ে থাকে রক্তাক্ত লাশ—বেগম ফজিলাতুন্নেসার, শেখ কামালের, শেখ জামালের, সুলতানা কামাল আর রোজী জামালের, শেখ রাসেল আর শেখ নাসেরের।

শুধু শেখ মুজিব নন, পুরো পরিবারকে বাংলাদেশের দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার কাজটি নিশ্চিত করে তারা।

কর্নেল জামিল শেখ মুজিবের ফোন পেয়ে বিছানার পোশাকে, পায়জামার উপরই ড্রেসিং গাউন পড়ে তার লাল ভক্সওয়াগন গাড়িটি চালিয়ে ৩২ নম্বরে ছুটে আসলে তাকেও গুলি করা হয়। দৃশ্যপটে যুক্ত হয় আরও একটি মৃতদেহ।

সমান্তরাল সময়ে অতর্কিতে আক্রমণ করা হয় শেখ মণি এবং আবদুর রব সেরনিয়াবতের বাড়ি। নিহত হন শেখ মণি এবং তার স্ত্রী, আবদুর রব

সেরনিয়াবত এবং তাঁর দুই সন্তান। সেখানে দ্রুত অপারেশন সেরে মেজর ডালিম এবং রিসালদার মোসলেউদ্দীন চলে আসেন নাটকের মূল মঞ্চ ৩২ নম্বরের বাড়িতে।

সম্ভাব্য প্রতি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য মেজর ফারুক তার ট্রাঙ্ক বহর নিয়ে শেরে বাংলাস্থ রক্ষীবাহিনীর সদর দফতর ঘিরে ফেলে ভড়কে দেন তাদের। রক্ষীবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে মেজর ফারুকও চলে আসেন ৩২ নম্বরে। সফল অভিযানের জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানান তিনি।

শেখ মুজিবের বাড়ির আশপাশের দালানগুলোর আতঙ্কিত অধিবাসীরা সন্তর্পনে জানালার পর্দার আড়াল থেকে দেখেন মুজিবের বাড়ির চারপাশে কালো পোশাক পড়া অস্ত্রধারীদের এলোমেলো পদচারণা, গেটের সমানে ট্রাক, লরী।

একটি জীবকে এসময় আমেরিকার ফ্ল্যাগ উড়িয়ে টহল দিতে দেখা যায়।

১৫ আগস্ট বাংলাদেশের নানা প্রান্তের মানুষের ঘুম ভাঙ্গে রেডিওর ঘোষণায় :

আমি মেজর ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে এবং সারাদেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ এখন থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে...

দেশজুড়ে এক গাঢ় নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

নতুন কুশীলব

মেজর ফারুক তার দায়িত্ব শেষ করবার পর শুরু হয় মেজর রশীদের ভূমিকা। কথামতো খন্দকার মোশতাককে এবার নিয়ে আসতে হবে দৃশ্যপটে। একটি সেনা জীপে উঠে বসেন মেজর রশীদ, পেছনে ল্যান্সারের একটি ট্যাঙ্ক এবং এক ট্রাক বোঝাই সৈন্য। রশীদ রওনা দেন আগামসি লেনের দিকে। যাবার আগে তিনি দেখা করেন ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত জামিলের সঙ্গে। শাফায়াতে জামিলের সরাসরি অধীনস্ত অফিসার রশীদ। তার অধীনস্ত অফিসার এত কাণ্ড ঘটালেও শাফায়াত জামিল এ ব্যাপারে তখনও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। রশীদ যাবার পথে শাফায়াত জামিলকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলেন : উই হ্যাভ কিল্ড শেখ মুজিব। উই হ্যাভ টেকেন ওভার দি কন্ট্রোল অফ দি গভর্নমেন্ট আন্ডার দি লিডারশিপ অফ খন্দকার মোশতাক।... আপনি এই মুহূর্তে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে যাবেন না। কোনো পাল্টা ব্যবস্থা নিলে গৃহযুদ্ধ বাধবে।

সৈন্য আর ট্যাঙ্ক নিয়ে এরপর মেজর রশীদ হাজির হন খন্দকার মোশতাকের আগামসি লেনের বাড়িতে। ভোরবেলা পাড়ার ভেতর ট্যাঙ্ক দেখে হচকচিয়ে যায় মহল্লার মানুষ। তারা জানে না যে তারা ইতিহাসের পটপরিবর্তনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হচ্ছেন। কিন্তু মোশতাক তা ভালো জানেন। তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন আগেই।

রশীদ মোশতাককে সকালের অপারেশনের সাফল্যের কথা জানান, শেখ মুজিবের নিহত হবার খবর জানান। পরিকল্পনামতো এবার রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নেবেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। তাকে এখন যেতে হবে রেডিও স্টেশনে এবং নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ভাষণ দিতে হবে জাতির উদ্দেশে। মোশতাক ঘরের ভেতর যান, তার পরিচিত আচকানটি পরে নেন, পরে নেন তার বিখ্যাত টুপি। পুরনো পোশাক তার কিন্তু নাটকে এবার তার চরিত্র ভিন্ন। সৈন্য আর ট্যাঙ্ক পরিবেষ্টিত হয়ে এরপর মোশতাক রওনা দেন রেডিও স্টেশনের দিকে। প্রায় জনশূন্য ঢাকা শহরের ভোর। থমথমে ভাব চারদিকে। কোনো কোনো মোড়ের দোকানে ছোট জটলা, মানুষ রেডিওতে শুনছে মেজর ডালিমের ঘোষণা—স্বৈরাচার শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে...

প্রেসিডেন্ট ইজ ডেড সো হোয়াট?

মেজর রশীদের কাছে শেখ মুজিবের মৃত্যুর খবর পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত ভোর বেলা দ্রুত পায়ে হেঁটে রওনা দেন কাছাকাছি উপ সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের বাসায়। উত্তেজিত হয়ে দরজা ধাক্কান তিনি। বেরিয়ে আসেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাঁর গায়ে স্লিপিং ড্রেসের পায়জামা এবং সান্ডো গেঞ্জি। একগালে শেভিং ক্রিম লাগানো। শাফায়াত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন : প্রেসিডেন্ট ইজ কিল্ড।

জিয়াকে মোটেও বিচলিত মনে হয় না। তিনি শান্তকণ্ঠে বলেন : প্রেসিডেন্ট ইজ ডেড সো হোয়াট? ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ দেয়ার। গেট ইওর ট্রুপস রেডি। আপহোল্ড দি কন্সটিটিউশন।

কৌতূহলোদ্দীপক জেনারেল জিয়ার প্রতিক্রিয়া। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু যেন নেহাত একটি দাপ্তরিক ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট মারা গেলে ভাইস প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব নেবেন, এটাই নিয়ম। সুতরাং এতে বিচলিত হবার কিছু নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাসের মোড় ফেরানো ঐ দিনটিতে জেনারেল জিয়াকে আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা যাক।

হতবিহ্বল সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সেদিন সকালে চিফ অব জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশারফ এবং উপ সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে সেনা সদরে ডাকেন। খালেদ মোশারফ নিজে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি চালিয়ে চলে আসেন তৎক্ষণাৎ, তার পরনে রাতের পায়জামা, শার্ট, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার কিছুক্ষণ পর আসেন জিয়াউর রহমান, ড্রাইভারচালিত অফিসিয়াল গাড়িতে, ক্লিন শেভড এবং মেজর জেনারেলের পূর্ণাঙ্গ ইউনিফর্মে।

ভোর বেলা ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনার কোনো অভিঘাত ঘটবার চিহ্ন জিয়াউর রহমানের মধ্যে নেই।

সেনা সদর

সেদিন সকালে বিভ্রান্ত সিনিয়র আর্মি অফিসাররা সেনা সদরে বসে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাদের করণীয় নিয়ে আলাপ করতে বসেন। তারা বুঝতে পারেন যে, পুরো সেনাবাহিনী তো নয়ই, বরং সেনাবাহিনীর ক্ষুদ্র দুটি ইউনিটের জুনিয়র কিছু সদস্য এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং গোয়েন্দা সংস্থা ব্যর্থ হয়েছে এর আগাম কোনো খবর পেতে। তারা আলাপ করে দেখতে পান যে এখন তাদের জন্য দুটো পথ খোলা আছে

এক. অন্যান্য ট্রুপস দিয়ে বিদ্রোহী এই ইউনিট দুটোকে আঘাত করা এবং মুখোমুখি সংঘর্ষে চলে যাওয়া।

দুই. পরিবর্তিত অবস্থাটিকে মেনে নেয়া।

প্রশ্ন ওঠে এই মুহূর্তে প্রতিঘাত বা সংঘর্ষ ঘটিয়ে কি বা ফল পাওয়া যাবে? যাকে রক্ষার জন্য তা করা যেতে পারত তিনিই তো বেঁচে নেই। শেখ মুজিবই যখন মারা গেছেন তখন আর নতুন করে রক্তপাতের পথে গিয়ে কি লাভ? সবাই তাই এই মত দেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিকেই মেনে নিয়ে কি করে এগিয়ে যাওয়া যায় সে চেষ্টা করবেন।

কিছুক্ষণ পর সেনাসদরে স্টেনগান উঁচিয়ে হাজির হন সকালের নাটকের অন্যতম এক কুশীলব, মেজর ডালিম। রেডিও মারফত তখন তার নাম পৌঁছে গেছে সমগ্র দেশে। তার উপস্থিতিতে সেনা সদরের আশপাশে একটি চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ডালিম সোজা সভাকক্ষে ঢুকে স্টেনগান উঁচিয়ে ধরেন শফিউল্লাহর দিকে। বলেন, তাকে এবং অন্য দুই বাহিনীর প্রধানকে নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক রেডিও স্টেশনে যেতে বলেছেন। শফিউল্লাহ সামান্য বাদানুবাদ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মাত্র ঘণ্টাখানেক আগেই মেজর ডালিম রক্তে রঞ্জিত করে এসেছেন তাঁর হাত। একটা ভীতি ঘিরে থাকে সবাইকে। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ, নৌ বাহিনীপ্রধান এম এইচ খান এবং বিমান বাহিনীপ্রধান এয়ার মার্শাল এ কে খন্দকার ডালিমের সঙ্গে অস্ত্রধারী সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে রওনা দেন রেডিও স্টেশনে।

ডেঞ্জারাস গেম

১৫ আগস্ট ভোর বেলা ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে কেউ একজন ফোন করে তাহেরকে জানায়, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সে এও বলে তাহের যেন রেডিও স্টেশনে চলে আসেন। আনোয়ার সেদিন নারায়ণগঞ্জে। ঘুম থেকে আনোয়ারকে ডেকে তোলেন তাহের। উত্তেজিত হয়ে বলেন : রেডিওটা ছাড়ো তো। বঙ্গবন্ধুকে নাকি মেরে ফেলেছে!

রেডিওতে তারা ডালিমের ঘোষণা শোনেন। তাহের ফোন করেন ইনুকে।

তাহের : তুমি শুনেছো মুজিব ইজ কিলড?

ইনু : না তো।

তাহের : কারা মেরেছে ঠিক বুঝতে পারছি না। ডালিমের নাম শোনা যাচ্ছে, মোশতাকের নামও শুনলাম। একটা চেঞ্জ ওভার হচ্ছে কিন্তু খুব খারাপ চেঞ্জ। পুরো আর্মি ইনভলবড না, হলে আমরা জানতাম। সাম অফ দেম। আমি রেডিও স্টেশনে যাচ্ছি। মেইন অ্যাকটররা সব ওখানে। আই নো মোস্ট অব দেম। উই মাস্ট অ্যাক্ট বিফোর ইট ইজ টু লেট। তুমি শাহবাগ মোড়ে থাকো আমি তুলে নেব।

নারায়ণগঞ্জে তাহেরের বাসার পাশে সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প। তাহের তার অধিনায়ককে বলেন একটি জীপ যোগাড় করে দিতে। ক্রাচটি তুলে নেন আর হাতে স্টিক।

খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন লুৎফা। বলেন : এই সময় ওখানে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? কত রকম বিপদ হতে পারে।

তাহের : লুৎফা তুমি আমার বিপদের কথা বলছ? দেশে একটা ভীষণ বিপদ নেমে আসছে। প্রতিটা মিনিট জরুরি। আমার ওখানে যাওয়া দরকার।

তাহের জীপে রওনা দেন রেডিও স্টেশনের দিকে। আনোয়ারকে বলেন : তুমিও চলো।

ঘটনার এই নাটকীয়, অপ্রত্যাশিত মোড়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাহের। এমন একটি পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। এই ঘটনায় মুহূর্তে যেন ধূলিসাৎ হয়ে যায় তার এতদিনের প্রস্তুতি, ভবিষ্যত পরিকল্পনা। কিন্তু ঘটনার গতিপ্রকৃতি বুঝবার জন্য দ্রুত তিনি মূল দৃশ্যপটে উপস্থিত হতে চান।

শাহবাগে ইনুকে তুলে নিয়ে তারা রেডিও স্টেশনে যান। গেটে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার এক পরিচিত সৈনিক তাদের জানান যে, মেজর ফারুক এবং মেজর রশীদ এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ক্রাচে ভর দিয়ে বড় বড় পা ফেলে তাহের দ্রুত ঢোকেন রেডিও স্টেশনে। ভেতরে ঢুকতে মেজর রশীদ এগিয়ে আসেন। রশীদ তাহেরকে পুরো ঘটনা বিস্তারিত বলতে উদ্যত হলে তাহের তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন : হু ইজ ইওর লিডার?

রশীদ : খন্দকার মোশতাক। উনি ভেতরে আছেন। উনিই আপনাকে ফোন করে খবর দিতে বলেছেন।

ইনু আর আনোয়ারকে বাইরে রেখে ভেতরের একটি ঘরে ঢোকেন তাহের এবং রশীদ। তাহের সেখানে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে তাহের উদ্দীন ঠাকুর এবং মাহবুবুল্ আলম চাষীকে দেখতে পান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের মোশতাক ত্রয়ী। তারা তখন খন্দকার মোস্তাকের বেতার ভাষণ প্রস্তুতে ব্যস্ত।

তাহেরের সেই কৈশোরে পরিচয় হওয়া তাহের উদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে ইতিহাসের এই নাটকীয় মুহূর্তে দেখা আবার। তাদের দুজনের পথ তখন ভিন্ন।

জীবিত শেখ মুজিবের সবচাইতে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল জাসদ। শেখ মুজিব সরকারের উচ্ছেদই ছিল জাসদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। জাসদের রয়েছে ব্যাপক গণসমর্থন। মোশতাক ভাবেন মুজিববিহীন এই নতুন পরিস্থিতিতে জাসদের খুশি হবার কথা। তিনি যদি জাসদকে তাঁর সঙ্গে পান তবে শুরুতেই তাঁর একটি বড় রাজনৈতিক ভিত্তি হয়ে যায়। তাতে এই নতুন পরিস্থিতি সামাল দেওয়া তাঁর জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। সে সময় দ্রুত বিকাশমান গণবাহিনী আর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অধিনায়কত্বের সুবাদে তাহের তখন জাসদের অন্যতম প্রধান নেতৃত্বের আসনে। ইতিহাসের মোড় ঘুরবার ঐ ঊষালগ্নেই মোশতাক তাই প্রথম স্মরণ করেন তাহেরকে।

মোস্তাক তাহেরকে বলে : আমরা নতুন একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে যাচ্ছি। আপনাকে আমরা এই গভর্নমেন্টে চাই।

রশীদ বলে : স্যার আপনি আমাদের সাথে থাকলে আর কোনো প্রবলেমই থাকে না।

তাহের উদ্দীন ঠাকুর তার পুরনো অভিভাবকসুলভ কণ্ঠে বলে : যা হবার হয়ে গেছে। এখন তুমি এসে কন্ট্রিবিউট করো টু টেক দি নেশন ফরোয়ার্ড।

তাহের চুপচাপ শোনেন সবার কথা। তার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। তারপর ক্রাচটি হাতে নিয়ে উঠে পড়েন তিনি চেয়ার থেকে। তিনজনের দিকে চোখ বুলিয়ে বলেন : নো ওয়ে। আমি আপনাদের সাথে থাকতে পারি না। দিস ইজ নট দি গভর্নমেন্ট উই ওয়ান্টেড। নো কোশ্চেন। আপনারা শেখ মুজিবকে হত্যা করে উৎখাত করেছেন কিন্তু আপনাদের সে রাইট নাই। জনগণ মুজিবকে নির্বাচিত করেছে, জনগণেরই অধিকার আছে তাকে উৎখাত করার। বাট ইট ইজ টু লেট নাউ। এখন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল একটা জেনারেল ইলেকশন দেন এবং সব পার্টির অংশগ্রহণ এনশিওর করেন। আর কোনো কন্সপিরেন্সি করবার চেষ্টা করবেন না।

এই বলে ক্রাচে ঠক ঠক শব্দ তুলে বেরিয়ে যান তাহের। ইনু আর আনোয়ারকে নিয়ে উঠে বসেন জীপে। যেতে যেতে বলেন : একটা ডেঞ্জারাস গেম শুরু হয়েছে। এখানে আমাদের এক মুহূর্তও থাকা ঠিক না। এই মোশতাক, চাষী, ঠাকুর মিলে সেভেন্টি ওয়ানে আমেরিকার সাথে মিলে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন করার চেষ্টা করেছিল। ওরা তিনটা মিলেছে আবার। একটা ডিপ কন্সপিরেন্সি হচ্ছে। আমি মোশতাককে বলেছি ইমিডিয়েটলি ইলেকশন দিতে। কিন্তু এ লোক তো ধুরন্ধর, মনে হয় না দেবে।

ইনু : শুনলাম মুজিবের পুরো ফ্যামিলিকে মেরে ফেলা হয়েছে।

তাহের : দিস ইজ আনএকসেপ্টবল। আমাদের একটা কিছু করা দরকার। চলো আগে ইউসুফ ভাইয়ের ওখানে যাই।

জীপ রওনা দেয় আবু ইউসুফের এলিফ্যান্ট রোডের বাসার দিকে।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

তাহের চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তিন বাহিনীর প্রধান রেডিও স্টেশনে আসেন। ফারুক রশীদের ট্যাঙ্ক আর আর্টিলারি সৈন্য ঘেরাও করে রেখেছে রেডিও স্টেশন, চারদিকে অস্ত্রের আওয়াজ। মোশতাক তিন প্রধানকে স্বাগত জানান। তাদেরকে বলা হয় মোস্তাকের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করতে।

তিন প্রধান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিস্থিতিকে অনুসরণ করতে থাকেন। তাঁরা এক এক করে ফারুক রশীদ মনোনীত রাষ্ট্রপতি মোশতাকের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁদের আনুগত্য প্রকাশের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। সে বক্তব্য প্রচারিত হয় রেডিওতে। দেশজুড়ে যে নিরালম্ব একটা অনিশ্চয়তা ঝুলছিল, বাহিনী প্রধানদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তার অবসান হয়। লোকে বোঝে দেশ এখন পুরোপুরি মোশতাক এবং তার সহযোগীদের দখলে।

মোস্তাক একটি পতাকাবাহী গাড়িতে রেডিও স্টেশন থেকে বের হন। আগে পিছে দুটি করে চারটি ট্যাঙ্ক, কয়েকটি সামরিক ট্রাক, জীপ, অনেকগুলো প্রাইভেট কার নিয়ে রেডিও স্টেশন থেকে প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে মোশতাক চলে যান বঙ্গভবনে। সেখানে রাষ্ট্রপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করেন তিনি। সেদিন শুক্রবার বঙ্গভবনেই জুম্মা নামাজ আদায় করেন মোশতাক।

সন্ধ্যায় তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন :

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার ও সঠিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের পুত দায়িত্ব সামগ্রিক এবং সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার ওপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সরকারের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। ...

অভ্যুত্থানকারী মেজরদের তিনি সূর্য সন্তান আখ্যায়িত করেন। যে কোনো বক্তৃতার শেষে এ যাবত ব্যবহৃত জয় বাংলার পরিবর্তে তিনি বললেন, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম মানুষ কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জয় বাংলার বদলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শুনল। বোঝা গেল দিন বদলে গেছে।

এদিকে যখন এতকিছু ঘটছে শেখ মুজিবের লাশ তখনও পড়ে আছে তার ৩২ নম্বরের বাড়ির সিঁড়িতে।

মোমের আলোয় লাশ

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন কমান্ডার কর্নেল হামিদকে দায়িত্ব দেওয়া হয় শেখ মুজিবের বাসা থেকে সব লাশ নিয়ে রাতের মধ্যেই দাফনের ব্যবস্থা করতে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় শুধু শেখ মুজিব ছাড়া বাকি সবাইকে বনানী গোরস্তানে দাফন করার। ইতোমধ্যে সিপাইরা বৈঠক ঘরের টেলিফোনের পাশ থেকে শেখ কামাল, সিঁড়ির উপর থেকে শেখ মুজিব, করিডোর থেকে বেগম ফজিলাতুন্নেসা, শোবার ঘরের মেঝে থেকে শেখ জামাল এবং কামালের স্ত্রী, শেখ রাসেল, টয়লেট থেকে শেখ নাসেরের লাশ নিয়ে এক এক করে ভরেছেন কফিনে। রাতের অন্ধকারে কর্নেল হামিদ এসে পৌঁছান ৩২ নম্বরের বাড়িতে।

সব কফিন ট্রাকে উঠিয়ে একটি কফিন আলাদা করে রেখে দেওয়া হয় গাড়ি বারান্দায়। কর্তব্যরত সুবেদার কর্নেল হামিদকে জানান :এটি শেখ সাহেবের লাশ স্যার।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাফনের জন্য ট্রাকের কফিনগুলো যাবে বনানী কবরস্থানে আর শেখ মুজিবের কফিন হেলিকপ্টারে যাবে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। শেষ বারের মতো শেখ মুজিবের মুখটি একবার দেখবার ইচ্ছে হয় কর্নেল হামিদের। তিনি সুবেদারকে বলেন : কফিনটা খোলেন তো একবার।

হাতুড়ি বাটাল দিয়ে কফিনটিকে খোলা হলে কর্নেল হামিদ চমকে উঠে দেখেন লাশটি শেখ মুজিবের নয়, তাঁর ভাই শেখ নাসেরের। দুজনের চেহারায় বিস্তর মিল। ভুল করে ফেলেছে সিপাইরা। ক্ষিপ্ত হন কর্নেল হামিদ। কিন্তু কোথায় শেখ মুজিবের লাশ? ট্রাকের উপর সারি সারি বাঁধা কফিনের কোনো একটিতে নিশ্চয়? তখন মাঝরাত। ট্রাকের উপর অন্ধকার। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে এক এক করে সব কফিনের ঢাকনা খুলে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন কর্নেল হামিদ। একটির ঢাকনা খুলতেই বরফের স্তূপের ভেতর থেকে দেশলাইয়ের আধো আলোয় দেখা যায় শেখ মুজিবের হিম শীতল পরিচিত মুখ।

বাংলাদেশের ব্যাপারে একধরনের অধিকারসুলভ ভালোবাসা ছিল এই মানুষটির। এ ধরনের ভালোবাসা বিপজ্জনক। তিনি তার প্রমাণ রেখেছেন। বাংলাদেশের আকাশে এই আশ্চর্য নক্ষত্রটির উত্থান এবং পতনের গাঁথা একদিন রচিত হবে নিশ্চয়।

পেরেক ঠুকে কফিনটি বন্ধ করা হয় আবার। ট্রাক থেকে নামিয়ে রাখা হয় গাড়ি বারান্দায়। একটা উদ্ভট ঐতিহাসিক ভুল শুধরে নেওয়া হয় এই ফাঁকে।

একটি সভা

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব নিহত হওয়াতে সারাদেশের মানুষ অপ্রস্তুত। এ মৃত্যু সংবাদে না শোক, না প্রতিবাদ, না আনন্দ, এক নিরালম্ব বোধে

তাড়িত হয়ে হতবিহ্বল পুরো জাতি। ভবিষ্যত নিয়ে এক অজানা উৎকণ্ঠা চারদিকে। কারও কাছে ঠিক পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠছে না ঘটনা। যাবতীয় ঘটনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে ক্যান্টনমেন্টে। এমনকি ক্যান্টনমেন্টের সেনা অফিসারদের কাছেও সবকিছু অস্পষ্ট, ঝাপসা।

এসময় সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সেনা সদরে একটি মিটিং ডাকেন সব সিনিয়র আর্মি অফিসারদের নিয়ে। সেখানে উপস্থিত অভ্যুত্থানের মূল হোতা মেজর ফারুক এবং রশীদ।

শফিউল্লাহ বললেন, প্রেসিডেন্ট মোশতাকের নির্দেশে ফারুক এবং রশীদ এখন সিনিয়র অফিসারদের অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করবেন।

শেখ মুজিবের দুঃশাসনের প্রেক্ষাপটে কি করে তারা এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছেন মেজর রশীদ তা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। রশীদ দাবি করেন অভ্যুত্থানের আগে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করেছেন। সবাই চুপচাপ শুনছিলেন রশীদের বক্তব্য।

হঠাৎ ক্ষেপে যান ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন : ইউ আর অল লায়ার্স, মিউটিনার্স অ্যান্ড ডেজার্টার্স। তোমরা সব খুনি। তোমাদের মোশতাক একটা ষড়যন্ত্রকারী। সে তোমাদের প্রেসিডেন্ট হতে পারে কিন্তু জেনে রেখ আমি সুযোগ পেলেই তাকে শেষ করে দেব। আর তোমরা যা করেছ এজন্য তোমাদের সবার বিচার হবে।

থেমে যান রশীদ। সবাই উৎকণ্ঠার সঙ্গে একে অন্যের দিকে তাকান। তাকান অভ্যুত্থানকারী দুই মেজরের দিকে। তারা কি আবার কোনো বিভীষিকার জন্ম দেবে? একটা অস্বাভাবিক পরিবেশের জন্ম হয়। সভা ভেঙ্গে দেন শফিউল্লাহ।

উল্টো স্রোত

বঙ্গভবনে বসেছেন নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক। ভবনের বাইরে ভারী কামান, ট্যাঙ্ক। ভবনের ভেতর তাঁকে ঘিরে আছেন অভ্যুত্থানকারী সশস্ত্র আর্মি অফিসাররা। অস্ত্রের ঝনঝনানির বেস্টনীর ভেতর তিনি শুরু করেছেন নতুন সরকার। অস্ত্রই খন্দকার মোশতাকের প্রধান শক্তি তখন।

বাতাসে তখনও অনিশ্চয়তা, ভয়, উদ্বিগ্নতার আভাস। খন্দকার মোশ্তাক টের পান যত দ্রুত সম্ভব নিজের অবস্থানকে তার নিরাপদ করা প্রয়োজন। মোশতাক প্রথমেই শেখ মুজিব নির্বাচিত সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে সরিয়ে ফেলেন, তাঁকে পাঠিয়ে দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে তিনি নির্বাচিত করেন জেনারেল জিয়াকে। জিয়া পেশাদার অফিসার, শেখ মুজিবের মৃত্যুতে যার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটেনি, প্রতিদিনের মতো ক্লিন শেভড, কেতাদুরস্তভাবে এসেছেন অফিস করতে। উপ সেনাপ্রধান থেকে সেনাপ্রধান হলেন তিনি। মূল

মঞ্চে এক ধাপ অগ্রসর হলেন জেনারেল জিয়া। স্বল্পবাক জিয়া কিন্তু এই পদোন্নতির চিঠি হাতে পেয়ে তাঁকে সহসা খুবই উৎফুল্ল হতে দেখা যায়। যেন অভিমানী বালক হাতে পেয়েছেন শখের লাঠি লজেন্স। পদোন্নতির চিঠিটা হাতে পেয়ে জিয়া তার ব্যাচমেট এবং বন্ধু কর্নেল হামিদকে তাঁর রুমে ডেকে পাঠান। কর্নেল হামিদ তখনও জানেন না সে খবর। হামিদ তাঁর ঘরে ঢুকতে গেলে দুষ্টুমি ভরা মৃদু মৃদু হাসিমুখ নিয়ে জেনারেল জিয়া বলেন, 'স্যালুট প্রপারলি ইউ গুফি। ইউ আর এন্টারিং চিফ অব স্টাফ'স অফিস।'

কিন্তু খন্দকার মোশতাক ঝানু রাজনীতিবিদ। তিনি জিয়াকেও নিয়ন্ত্রণের ভেতর রাখেন। তিনি সেনাপ্রধানেরও উপরে দুটো নতুন পদ সৃষ্টি করেন। একটি পদ চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের, যে পদে তিনি বসান তাঁর আস্থাভাজন মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে। অন্য পদটি মিলিটারি সেক্রেটারির, সে পদে বসান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ওসমানীকে। মোশতাক শেখ মুজিবের আরেকজন আস্থাভাজন বিমান বাহিনীপ্রধান এ কে খন্দকারকেও সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। তার জায়গায় আনেন এম জি তোয়াবকে। ভদ্রলোক একসময় বিমান বাহিনীতে ছিলেন। ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন। অবসর নিয়ে ব্যবসা করছিলেন জার্মানিতে। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর। যুদ্ধে যোগ দিতে বলা হয়েছিল তাকে, অস্বীকার করেছিলেন তিনি। জার্মানি থেকে তাঁকে অনেকটা ধরে এনে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত করে দেওয়া হয় বিমান বাহিনী প্রধানের দায়িত্ব। মোশতাক ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন এ বি এস সফদারকে। সফদার সেইসব বাঙালি কথিত ভাগ্যবান পুলিশ অফিসারদের অন্যতম যাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ একাডেমী, আইপিএ'তে পাঠিয়েছিলেন প্রশিক্ষণের জন্য। যে একাডেমীটি আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত করেছিল বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট দমনের মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে। মোশতাক রক্ষীবাহিনীও বিলুপ্ত করে তাদের সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করার নির্দেশ দেন।

পুরস্কৃত করা হয় অভ্যুত্থানের নায়কদেরও। মেজর ফারুক ও রশীদকে তাদের কৃতকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ উন্নীত করা হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে। বহিস্কৃত মেজর ডালিমকে সেনাবাহিনীতে পুনর্বহাল করা হয়। তাকেও দেওয়া হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদ।

সর্বপরি খন্দকার মোশতাক যিনি একজন বেসামরিক রাজনীতিবিদ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জারি করেন সামরিক শাসন। সেই সঙ্গে তিনি এই মর্মেও ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন যে, ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার করা চলবে না এবং এর জন্য কোনো শাস্তিও দেওয়া যাবে না।

বিশ্বস্ত কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল, পুলিশ আর সেইসঙ্গে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের প্রাচীর দিয়ে খন্দকার মোশতাক নিজের জন্য গড়ে তোলেন দুর্গ।

আওয়ামী লীগে তার পুরনো সতীর্থদের অধিকাংশই নতুন পরিস্থিতির হতবিহ্বলতায়, অস্ত্রের ভয়ে কিংবা সুযোগের সন্ধানে আনুগত্য দেখান তাঁর প্রতি। যাঁরা তাঁর সঙ্গে আসতে অস্বীকার করেন তাঁদের সবাইকে মোশতাক ঠেলে দেন জেলে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম শেখ মুজিবের চার সহযোগী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামান।

এরপর তিনি শুরু করবেন তাঁর স্বপ্নের ছোট পাকিস্তান, বাঙালিদের পাকিস্তান গড়ার যাত্রা। ঘর সামলেছেন তিনি, এবার তাঁর দরকার বাইরের সুনজর। সপ্তাহ না যেতেই এক কাপ চা হাতে নিয়ে হাসি হাসি মুখে মোশতাক বঙ্গভবনের সবাইকে জানান যে তাঁকে অভিনন্দন এবং স্বীকৃতি জানিয়েছে আমেরিকা, সৌদি আরব এবং চীন। তিনটি দেশ যারা সরাসরি বিরোধিতা করেছিল মুক্তিযুদ্ধের। যারা স্পষ্ট চেয়েছিল পাকিস্তান থাকুক অটুট। পর পরই আসে পাকিস্তানেরও অভিনন্দন।

শুভেচ্ছার বাণী আর পণ্য নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম পাকিস্তানি জাহাজ সফিনা এ ইসলাম ভেড়ে চট্টগ্রাম বন্দরে। ঈদ উপলক্ষে সৌদি আরব থেকে আসে রাশি রাশি খোরমা।

ধীরে ধীরে উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে ইতিহাসের চাকা।

মোড় ফেরাবার উদ্যোগ

সেনাবাহিনীতে যে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন তাহের, তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, এক ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে আসছে বাংলাদেশের মানুষের ওপর। একটা বিপদের আশঙ্কা তাহের করছিলেন অনেকদিন থেকেই। ১৫ আগস্ট ভোর বেলায় খবর পেয়েই তাহের ছুটে গেছেন বিপদের সত্যিকার চেহারাটি দেখতে। স্পষ্ট বুঝেছেন, যে বিপদের ভয় তিনি করছিলেন সেটিই অবশেষে স্বমূর্তিতে উপস্থিত।

জাসদের নেতৃবৃন্দ মিটিংয়ে বসেন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে। যথারীতি মিটিং বসেছে আবু ইউসুফের এলিফ্যান্ট রোডের বাসায়। জাসদের যাবতীয় সংগ্রাম ছিল শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগকে ঘিরে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্রাম করছিলেন তাঁরা। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, জনতা এবং সৈনিকদের সমন্বয়ে আওয়ামী লীগের শাসনের বিরুদ্ধে একটি গণজাগরণ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছিলেন। হিসেব করেছিলেন ছিয়াত্তরের শেষ নাগাদ পটপরিবর্তনের। কিন্তু আকস্মিকভাবে শেখ মুজিবের এই মৃত্যুতে তাদের হিসাব এলোমেলো হয়ে গেছে।

তাহের বলেন : আমরা একটা চেঞ্জ চাচ্ছিলাম কিন্তু তা এমন ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তো না। খন্দকার মোশতাকের এই টেকওভার আমরা কোনোভাবেই এক্সেপ্ট করতে পারি না।

সিরাজুল আলম খান বলেন : আমাদের লক্ষ করতে হবে নতুন এই ক্ষমতা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কিন্তু রুশ-ভারতের বলয় থেকে এখন গিয়ে ঢুকছে পাক—মার্কিন বলয়ে। যেটা আগের চেয়েও ক্ষতিকর।

ড. আখলাক বলেন : বাকশালের বিরোধিতা আমরা করেছি ঠিক কিন্তু বাকশালের বিকল্প তো মার্শাল ল না।

একই রকম মন্তব্য করেন উপস্থিত অন্য নেতারাও। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ঠিক কি হবে তাদের পদক্ষেপ এই নিয়ে খানিকটা বিভ্রান্তিতে পড়েন তাঁরা।

সিরাজুল আলম খান বলেন : আমি মনে করি আমাদের আন্দোলন যে পথে চলছিল সে পথেই চলবে, শুধু প্রতিপক্ষ বদলাবে।

তাহের : এগজাক্টলি। আমরা যে সোসালিস্ট এজেন্ডা নিয়ে আর্মস স্ট্রাগলের দিকে যাচ্ছিলাম, মোশতাকের এই প্রো-আমেরিকান গভর্নমেন্টের সময় সেটা তো আরও জাস্টিফাইড। আপনাদের তো বলেছি যে, সেদিন সকালেই মোশতাক আমাকে দলে ভেড়াতে চেয়েছিল। সে ভেবেছিল আমরা যেহেতু অ্যান্টি মুজিব ফলে আমরা তার সঙ্গে গিয়ে ভিড়ব। আর জাসদকে সাথে পেলে তো তাদের একটা বিরাট সিভিল বেজ হয়ে যায়। এনি ওয়ে আমি আউটরাইট রিজেক্ট করে দিয়েছি।

ড. আখলাক : এখন পুরো পরিস্থিতি তো কনসেন্ট্রেটেড হয়েছে ক্যান্টনমেন্টে। কর্নেল তাহের, ক্যান্টনমেন্ট তো আপনার চেনা জায়গা। এখন আপনার রোল আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রাচটা দেয়ালে হেলান দিয়ে কোণার এক চেয়ারে বসেছেন তাহের। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে তার। বলেন : বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে আমি তো অলরেডি ক্যান্টনমেন্টে কাজ শুরু করেছি। গণবাহিনীর একটিভিটি বাড়িয়ে দিলেও এখন ফোকাস করতে হবে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকেই। আসলে ক্যান্টনমেন্টের শুধুমাত্র বেঙ্গল ল্যান্সার আর টু ফিল্ড আর্টিলারি এই দুই ইউনিট শুধু ক্যুটা ঘটিয়েছে। ক্যান্টনমেন্টে আরও অনেক ইউনিট আছে লগ এরিয়া, সিগনাল, সাপ্লাই, ইঞ্জিনিয়ারিং এরা কেউ কিন্তু এই ক্যুর সাথে নাই। মোশতাক অফিসারদের যতই তার চারপাশে ভেড়াক না কেন, সোলজারদের সে তার সাথে পাবে না। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তো দূরের কথা, সাধারণ কোনো মুক্তিযোদ্ধা জোয়ান তার সঙ্গে ভিড়বে না।

ইনু : কিন্তু ফারুক রশীদের ইউনিটের সোলজাররা তাদের নির্দেশেই চলছে।

তাহের : সেটা ঠিক, কিন্তু তারা মাইনরিটি। ক্যান্টনমেন্ট কিন্তু এখন দুইভাগে বিভক্ত। একদিকে যারা সরাসরি ক্যুর সাথে ছিল আর অন্যদিকে যারা ছিল না। আর যারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল না তারা কিন্তু বেশ ভয়ে আছে।

সিরাজুল আলম খান এই যে আর্মি ডিভাইডেড হয়ে আছে এর সুযোগটা কিন্তু আমাদের নিতে হবে।

ড. আখলাক : মোশতাক কামান আর ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে দেশ শাসন করতে চাচ্ছে। সেটা তো এত সোজা হবে না।

তাহের : আমি মনে করি, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে মূল অ্যাকশনে নিয়ে আসতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মোশতাক তো জেনেছে যে আমরা তার সাথে নাই। দ্রুত অ্যাকশন শুরু না করলে এই গভর্নমেন্ট আমাদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে নামবে। ইন্দোনেশিয়ায় যেমন কমিউনিস্ট জেনোসাইড ঘটানো হয়েছে।

শেখ মুজিবের মৃত্যুর আগেই জাসদ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করলে দলের ভেতর তাহেরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ঘটনার পটপরিবর্তনে রাজনীতি ক্যান্টনমেন্টকেন্দ্রিক হয়ে উঠলে দল আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে তাহেরের ওপর। তাহেরের ভূমিকা হয়ে ওঠে মুখ্য।

তাহের ইনুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িয়ে দেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কাজের গতি।

যেহেতু তারা ক্যু ঘটিয়েছে সেহেতু ক্যান্টনমেন্টে বেঙ্গল ল্যান্সার আর টু ফিল্ড আর্টিলারির সৈনিকদের দাপট। বাকি ইউনিটের সৈন্যরা সন্ত্রস্ত কখন তাদের ওপর কোন বিপদ নেমে আসে এই ভয়ে। ফলে অনেকটা নিরাপত্তার স্বার্থে, একধরনের আশ্রয়ের আশায় অনেক সিপাই তখন যোগ দিতে থাকে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থায়। শক্তি বাড়তে থাকে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার।

রাতে লুৎফা জিজ্ঞাসা করেন তাহেরকে : কি করতে চাচ্ছ তোমরা এই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মধ্য দিয়ে?

তাহের : মোশতাকের কাছ থেকে পাওয়ার সেন্টারটা সরাতে হবে। আমরাই পাওয়ার নিয়ে নিতে পারি। জেনারেল জিয়া চিফ হওয়াতেও আমাদের সুবিধা হয়েছে।

লুৎফা : কিন্তু মোশতাকই তো জিয়াকে চিফ বানিয়েছেন?

তাহের : অতো ঠিক? এখন জিয়া মোশতাকের সঙ্গে আছেন ঠিকই, আমরা কিছু একটা করতে পারলে উনি আমাদের সঙ্গেই চলে আসবেন। তার চিফ হওয়ার স্বপ্ন ছিল, সেটা পূরণ হয়েছে কিন্তু উনি খুব ভালো মতোই জানেন যে, ব্যাপারটা কোনো স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে হয়নি। উনি তো বুদ্ধিমান মানুষ, ভালো মতোই জানেন ঘটনা কখন কোন দিকে মোড় নেয় সেটা বলা যায় না।

তাহের এবং ইনুর সঙ্গে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার যোগাযোগ বেড়ে যায় বহু মাত্রায়। গোপনে গাণিতিকহারে বাড়তে থাকে সৈনিক সংস্থার সদস্য সংখ্যা।

তাহের সৈনিকদের বলেন : দেশের ভেতর একটা গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, আমাদের অ্যাকশনে যেতে হতে পারে, তোমরা প্রস্তুত থাকবে।

অক্টোবর মাসের শুরুতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ক্যান্টনমেন্টে একটি লিফলেট বিলি করে। খন্দকার মোশতাকের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সৈনিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয় সে লিফলেটে।

তাহের সেদিন অফিস থেকে ফিরে লুৎফাকে বলেন : জানো আজকে জেনারেল জিয়া ফোন করেছিলেন।

লুৎফা : কি বললেন?

তাহের : বললেন তাহের, তোমার লোকেরা আমার টেবিলেও লিফলেট রেখে গেছে।

লুৎফা : তারপর? রেগে গেলেন নাকি?

তাহের : আরে না। উনি তো সবসময় কম কথা বলেন। আমাকে অ্যাস্যুর করলেন যে আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে উনি অ্যাওয়ার আছেন। আর আমি যে ব্যাপারটা লিড করছি সেটাও তিনি বুঝতে পারছেন। এটা আমাদের জন্য ভালো। তার সাথে যোগাযোগ থাকাটা দরকার। সময়মতো আমাদের কাজে লাগবে।

লুৎফা : আমার কিন্তু কেমন ভয় হচ্ছে।

তাহের : পরিস্থিতির একটা ড্রামাটিক টার্ন নিতে পারে যে কোনো সময়। তুমি প্রিপেয়ার্ড থেকো। আমাকে আরও ঘন ঘন ঢাকায় যেতে হবে।

একটি টুপি

খন্দকার মোশতাক সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক। ইতিহাসের এক নাটকীয় পটপরিবর্তনের পর দেশের প্রথম নীতিনির্ধারণী বৈঠক। সে বৈঠকের আশ্চর্য এক আলোচ্য বিষয়, টুপি। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন খন্দকার মোশতাক, টেবিলের চারপাশে নয়া মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ। মোশতাক হঠাৎ তার মাথার টুপিটি খুলে টেবিলের উপর রাখেন। তারপর বলেন : আমাদের জাতীয় পোশাক আছে তবে পোশাকটা কমপ্লিট না। আমাদের মাথায় কোনো টুপি নাই। এই টুপিটা যদি এপ্রুভ করেন তাহলে এই টুপি আমাদের ন্যাশনাল ড্রেসের পার্ট হয়ে যায়।

টেবিলের উপর একটি কালো টুপি, তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেশের তাবৎ রাজনীতিবিদরা। কেউ তেমন কোনো মন্তব্য করছেন না।

শেখ মুজিব সরকারের শেষ অর্থমন্ত্রী এ আর মল্লিকও আছেন ঐ মিটিংয়ে। তাকে এক রকম জোর করে ধরে আনা হয়েছে সভায়। তার চোখে ভেসে ওঠে মাত্র মাসকয়েক আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিব গেছেন দিল্লি। এ আর মল্লিক তখন সেখানে বাংলাদেশের হাই কমিশনার। তার বাসায় ডিনারের দাওয়াত। খন্দকার মোশতাক সারাক্ষণ শেখ মুজিবের পাশে পাশে আছেন। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব মল্লিককে বলেন, চলেন আপনার বাসাটা ঘুরে দেখি। মুজিব উঠলে সাথে সাথে মোশতাকও উঠেন। মুজিব ঘুরে এসে আবার বসেন। তারপর বলেন, চলেন আপনার লনটা দেখি। মোশতাকও চলেন পাশাপাশি। এক ফাঁকে মোশতাকের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হলে শেখ মুজিব মল্লিককে

বলেন : আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল কিন্তু মোশতাক তো সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকছে।

মল্লিক বলেন : উনাকে বললেই তো হয়।

মুজিব : না, ইট ডাজ নট লুক নাইস।

তারা আবার ঘরে ফিরে এসে বসলে শেখ মুজিব হঠাৎ শীর্ণ দেহের মোশতাকের মাথায় সর্বক্ষণ শোভা পাওয়া লম্বাটে টুপিটি মাথা থেকে খুলে নিয়ে টেবিলের উপর রাখেন। এ আর মল্লিককে উদ্দেশ্য করে বলেন : ড. সাহেব আপনি বিদ্বান মানুষ। এই টুপিটা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

একটু ইতস্তত করেন এ আর মল্লিক। বলেন : এ টুপি মোশতাক ভাইকে মানায়। তার শরীরের গঠন, আকার উচ্চতা সব মিলিয়ে এ টুপি মোশতাক ভাইকে মানাবে। কিন্তু এই টুপি আপনাকে মানাবে না। আপনি লম্বা, বড় সড় মানুষ আপনি টুপি পরলে সেটা হতে হবে উঁচু, বড়। মুজিব মোশতাককে বলেন : শুনলেন তো বিদ্বান লোকের কথা?

খন্দকার মোশতাকের সেই টুপিটি তখন বৈঠকের টেবিলের উপর, যদিও অবশ্য শেখ মুজিব ঐ মুহূর্তে তার গুলিবিদ্ধ শরীর নিয়ে কবরে শায়িত। এ আর মল্লিক টুপিটিকে জাতীয় পোশাক করার ব্যাপারে আপত্তি করলেও বাকিরা সমর্থন করেন। টুপিটিকে জাতীয় পোশাকের অংশ করবার প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। টুপি বিষয়ক সিদ্ধান্তের পরই শেষ হয়ে যায় মন্ত্রি সভার প্রথম বৈঠক।

পরাবাস্তব

দেশের একটা ঘোর ক্রান্তিকালে যখন একটি টুপি হয়ে ওঠে সবচেয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখন অবস্থাটি আর ঠিক বাস্তব থাকে না, কেমন যেন রহস্যময়, রূপকথার পরাবাস্তব এক জগতে পরিণত হয়।

ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের যে বাড়িটি সরগরম ছিল অহর্নিশ, সেখানে একটি নিঃসঙ্গ হুলো বিড়াল শব্দহীন পায়ে এঘর ওঘর করে। গ্রামের মুদির দোকানের একটি সস্তা সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে ইতোমধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় কবর দেওয়া হয়েছে শেখ মুজিবকে। যে মানুষটির সভায় লোক সমাগম হয়েছিল দশ লক্ষ, তার জানাজায় দেখা যায় গোটা দশ ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ।

ফারুক যিনি একজন মেজর, প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত রাজহাঁসের মতো ধবধবে সাদা মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়িটি নিয়ে চারদিকে ঘোরেন, সৈনিকদের নির্দেশ দেন। মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার প্রমুখেরা বোকা বোকা চোখে তা দেখেন। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান বিশেষ একটি সানগ্লাস পরেন আজকাল। সানগ্লাসে ঢেকে রাখা যায় চোখের অপমান।

ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করেছিলেন শেখ মুজিব। সেই সূত্র ধরে ভারত কি পাল্টা কোনো ব্যবস্থা নেবে? চাপা সেই উৎকণ্ঠাকে ম্লান করে দিয়ে একদিন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেন দেখা করেন মোশতাকের সঙ্গে। শেখ মুজিব যেখানে নেই কাকে নিয়ে আর বাজি ধরা যাবে?

কেবল কাউবয় টুপি পরা টাঙ্গাইলের যুদ্ধসম্রাট কাদের সিদ্দীকি গোপন আস্তানায় গিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেন। তাঁকে অবশ্য সেনাবাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয় ভারতে।

আওয়ামী লীগের বন্দি প্রধান চার নেতা তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলী জেলের ভেতর নিজেদের ভয়, গ্লানি তাড়াবার জন্য ফুলের বাগান করেন। এদেরকে মুক্ত করবার জন্য কোথাও কেউ কি গোপনে কোনো আয়োজন করছে?

রেড মাওলানা ভাসানী অভিনন্দন জানিয়েছেন মোশতাককে। তাকে সমর্থন করেছে চীনা বামপন্থী দলরাও।

কেবল বাগে আসছে না জাসদ। তারা দাঁড়িয়েছে পুরো পরিস্থিতির বিপক্ষে। সারাদেশে মোশতাক বিরোধী মিছিল করছে জাসদ। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তো বটেই, পাশাপাশি তারা গণবাহিনীকেও চাঙ্গা করে তুলছে। জাসদ কর্মীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দেন মোশতাক। সারাদেশে গণহারে গ্রেফতার করা হতে থাকে হাজার হাজার জাসদ কর্মীদের।

মোশতাক ভালোভাবেই জানেন এ সবকিছুর পেছনে আছেন কর্নেল তাহের। নানাভাবে তাঁকে কাজে কোনঠাসা করা শুরু হয়। একদিন তাহেরকে ডেকে পাঠান মোশতাক। বলেন : ড্রেজার কোম্পানি নিয়ে অভিযোগ আছে। মুজিবের ছেলের বিয়েতে নাকি নৌ বিহারের জন্য ড্রেজার কোম্পানি থেকে জাহাজ দেওয়া হয়েছিল। এসব তদন্ত হবে।

তাহের ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন প্রচণ্ড। বলেন : এজন্যই ডেকেছেন আমাকে? গো এহেড উইথ ইউর ইনভেস্টিগেশন। এসব করে আমাকে কাবু করতে পারবেন বলে ভেবে থাকলে ভুল করেছেন।

তারপর তাঁর হাতের লাঠিটি উঁচিয়ে মোশতাকের দিকে তাক করে বলেন : বাই দা ওয়ে মুজিব মুজিব করবেন না, বলেন বঙ্গবন্ধু। বেঁচে থাকতে তো উঠতে বসতে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু করতেন।

ক্রাচে শব্দ করে বেরিয়ে যান তাহের।

বঙ্গভবনে পায়চারী করেন মোশতাক। স্বস্তি নেই তার মনে। ভাবেন দেশে অনেক অস্ত্রের ঝনঝনানি হলো, রক্তপাত হলো, এবার একটু আনন্দ ফুর্তি হোক। মোশতাক সরকার আয়োজন করলেন এক আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট, আগা খান গোল্ড কাপ। নানা দেশ থেকে ফুটবল দল আসতে লাগল ঢাকায়।

তখন শীত আসছে বাংলাদেশে। হালকা ঠাণ্ডা হাওয়া চারদিকে। স্টেডিয়ামে যতই ফুটবল খেলা হোক না কেন সবার মনে একটা চাপা আতঙ্ক। পথে পথে আর্মি। মানুষের সতর্ক চলাচল। শীতের হাওয়ায় ঢাকার পথে উড়াউড়ি করে শুকনো পাতা।

গুমোট চা চক্র

সেনাবাহিনীর রক্তপ্রবাহের মূল যে চালিকা শক্তি, চেইন অব কমান্ড, তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই ক্যান্টনমেন্টে। কে সিনিয়র, কে জুনিয়র, কে কাকে নির্দেশ দিচ্ছে, তার আর কোনো নিশানা নেই কোনো দিকে। নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে ক্যান্টনমেন্ট। মোশতাক প্রেসিডেন্ট হলেও প্রকারান্তরে দেশ চালাচ্ছে অভ্যুত্থানকারী মেজররা।

ভেতর ভেতর অফিসারদের মধ্যে জমছে প্রবল ক্ষোভ আর অসন্তোষ। ক্ষোভের কথা স্পষ্ট করে বলে উঠতে পারছেন না কেউ। ৩২ নম্বরের রক্ত ভয় পাইয়ে দিচ্ছে তাদের। কয়েকজন মেজর উদ্ধত বালকের মতো ছোটাছুটি করছে বটে কিন্তু তাদের সুতো নাড়াচ্ছে আরও দূরের, আরও শক্তিশালী কোনো শক্তি, সেটি টের পাচ্ছেন তারা। কোনো প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিপদ ডেকে আনতে চাচ্ছেন না কেউ।

খন্দকার মোশতাক ক্যান্টনমেন্টের এই অস্বাভাবিক হাওয়া একটু হালকা করবার জন্য একটি চা চক্রের আয়োজন করেন। সিনিয়র অফিসাররা বললেন ফারুক এবং রশীদ যদি সেই চা চক্রে থাকে তাহলে তারা সেখানে যাবেন না। মোশতাক সে চা চক্র থেকে ফারুক এবং রশীদকে বাদ দিলেন। অফিসাররা এলেন চা চক্রে। খন্দকার মোশতাক খোশ মেজাজে, হল রুমের এ প্রান্তে সে প্রান্তে ঘুরে সবার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সবাই গম্ভীর। কেউই মোশতাকের সঙ্গে বিশেষ কোনো কথা বললেন না। নিজেদের মধ্যেও কেউ কোনো আলাপ করলেন না তেমন। নিঃশব্দে চায়ের কাপ নিয়ে সবাই এ সোফায় সে সোফায় বসলেন, বিস্কুটে কামড় দিলেন এবং চায়ের কাপ শেষ করে দ্রুত উঠে গেলেন। ঐ চা চক্র পরিণত হলো অস্বাভাবিক গুমোট এক সামাজিক অনুষ্ঠানে। যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটবার আগের মুহূর্তের গাঢ় নিস্তব্ধতা।

চেইন অব কমান্ড

একটি স্রোত ধারার মতো ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করে দেশটি যেদিকে ধাবিত হচ্ছিল, খন্দকার মোশতাক থামিয়ে দিয়েছেন সে স্রোত। তিনি বদলে ফেলতে চাইছেন সেই স্রোতের গতিপথ। জন্ম দিয়েছেন এক গুমোট, উৎকেন্দ্রিক,

নাটুকে পরিস্থিতির। তাহের এবং জাসদ যখন এই স্রোত উল্টে ফেলবার সুচারু রাজনৈতিক আয়োজন করছেন, তখন ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রিক, বৃহত্তর কোনো রাজনৈতিক মাত্রা বিবর্জিত ভিন্ন আরেক উত্তেজনা অকস্মাৎ আরো একবার পাল্টে দেয় ঘটনার গতি।

ক্যান্টনমেন্টের দেয়ালে দেয়ালে তখন গুঞ্জন। নানা পাল্টা ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ। ক্যান্টনমেন্টের ভেতর চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়ায় অফিসারদের মধ্যে জমাট ক্ষোভের কথা যিনি প্রকাশ্যে অকপটে বলেছিলেন সেই ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত জামিল সক্রিয় হয়ে ওঠেন এক পর্যায়ে। একদিন জেনারেল জিয়াকে গিয়ে শাফায়াত বলেন : স্যার, আপনি চিফ, আপনি অর্ডার করলে আই ক্যান ট্রাই টু রেস্টর চেইন অব কমান্ড বাই ফোর্স।

জিয়া আদিম সন্তের মতো এবারও উচ্চারণ করেন তার পুরনো মন্ত্র : লেট আস ওয়েট এ্যান্ড সি।

পদ বিন্যাসে মেজর জেনারেল জিয়ার পরেই রয়েছেন মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ। তিনি চিফ অব জেনারেল স্টাফ। মুক্তিযুদ্ধের কে ফোর্সের অধিনায়ক। শেখ মুজিবের মৃত্যুতে মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। রাতের পোশাকে, নিজেই গাড়ি চালিয়ে ভোর বেলা হাজির হয়েছিলেন অফিসে। এ মুহূর্তে তিনি মাঠের বাইরে দাঁড়ানো খেলোয়াড়। সেনাবাহিনীতে যেখানে সেনা প্রধানেরই কোনো ভূমিকা নেই সেখানে তিনি তো নেহাতই বাহুল্য। শাফায়েত জামিল কথা বলেন খালেদ মোশাররফের সঙ্গেও। তাকে উদ্বুদ্ধ করেন একটা কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। খালেদ মোশাররফও ক্ষুব্ধ। তিনি একমত হন শাফায়াতের সঙ্গে। বলেন : উই মাস্ট ব্রিং দোজ মেজরস আন্ডার চেইন অব কমান্ড। উই ক্যানোট এলাও দিস টু গো অন লাইক দিস ফর এভার।

খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পরিকল্পনায় বসেন দুজন। তারা সিদ্ধান্ত নেন যেহেতু সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমান চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন ফলে তাকে তারা বন্দি করবেন এবং তারপর মোশতাক এবং তার সহযোগীদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবেন। এ নিয়ে গোপনে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর নানাজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন তারা। অনেকেই এগিয়ে আসেন তাদের সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এগিয়ে আসেন রক্ষীবাহিনীর প্রধান কর্নেল নুরুজ্জামান। রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত হবার পর সেনাবাহিনীতে তিনি এবং রক্ষীবাহিনী সদস্যরা নেহাতই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। রক্ষীবাহিনী শেখ মুজিবের হত্যা প্রতিহত করতে পারেনি, এ ব্যর্থতার গ্লানি আছে নুরুজ্জামানের। আর পরাজিত দলের সদস্য হয়ে চোখের সামনে কনিষ্ঠ অফিসারদের ঔদ্ধত্য দেখতে তারও অসহ্য ঠেকছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন তার রক্ষীবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে খালেদ মোশাররফের পাশে দাঁড়াবেন। বেশ

কজন জুনিয়র অফিসার এসে ভেড়ে তাদের সাথে। যোগ দেয় বিমান বাহিনীর কিছু অফিসারও। বঙ্গভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত মেজর ইকবালও আনুগত্য প্রকাশ করেন খালেদ এবং শাফায়াতের প্রতি। এছাড়া ক্যান্টনমেন্টে তাদের অধীনস্থ আর্টিলারি এবং ইনফেন্ট্রির সিপাইরা তো আছেনই।

ক্যান্টনমেন্টের ছায়ায় ছায়ায়, দেয়ালের আড়ালে আড়ালে তৈরি হয়ে যায় দ্বিতীয় একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা। তবে খালেদ মোশারফ স্পষ্ট বলেন সবাইকে যে এই অভ্যুত্থান হবে সম্পূর্ণ রক্তপাতহীন, এর কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই, তার মূল লক্ষ হচ্ছে সেনাবাহিনীর ভেতর চেইন অব কমান্ড পুনর্প্রতিষ্ঠা করা।

ইতিহাসের একটি নাটকীয়তার ঘোর না কাটতেই শুরু হয় আরেকটি নাটক।

দেশের ভেতর দেশ

২ নভেম্বর ১৯৭৫, রাত। কনকনে শীত বাইরে। মেজর ইকবালের অধীনস্ত ১ বেঙ্গলের একটি কোম্পানি পাহারা দিচ্ছে বঙ্গভবনে। ভেতরে অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং করছেন খন্দকার মোশতাক, জেনারেল খলিল আর মেজর রশীদ। সেনাবাহিনীর ভেতরের অস্থিরতা নিয়েই কথা বলছিলেন তারা। সম্ভাব্য যেসব অফিসার সমস্যা তৈরি করতে পারেন তাদের কাউকে চাকরি থেকে অব্যাহতি, অন্যান্যদের বিভিন্ন জায়গায় বদলির কথাবার্তা হচ্ছিল। বঙ্গভবনের চারপাশে ফুলের বাগান। কিন্তু ফুল বাগান শোভিত নিরীহ ঐ ভবনটি তখন দেখাচ্ছিল মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের মতো। মাঝরাত পেরিয়ে গেলে বঙ্গভবন পাহারারত মেজর ইকবালের কোম্পানিটি হঠাৎ তাদের কামান, মেশিনগানসহ অন্ধকারে, অত্যন্ত চুপিসারে বঙ্গভবন ছেড়ে রওনা দেয় ক্যান্টনমেন্টের দিকে। ভেতরে মিটিংরত মোশতাক এবং তার সঙ্গীরা তখনও তা জানেন না।

এক পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে মিটিংয়ে এসে বলেন : স্যার বঙ্গভবন থেকে আর্মির লোক সব চলে গেছে।

বিচলিত হয়ে পড়ে রশীদ। বাইরে গিয়ে দেখেন সত্যিই বঙ্গভবনের পাহারায় কেউ নেই। বঙ্গভবন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এতক্ষণ কামান, মেশিনগানের যে নিরাপত্তাবেষ্টনীতে বসে তারা মিটিং করছিলেন সে বেষ্টনী এখন উধাও। টের পান, যে আশঙ্কা তারা করছিলেন তাই ঘটতে যাচ্ছে। একটা পাল্টা অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছে। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন তারা। বঙ্গভবনেই ঘুমাচ্ছিলেন মেজর ফারুক। তাকে ডেকে তোলেন রশীদ। মোশতাক, খলিল, ফারুক, রশীদ দ্রুত জরুরি আলোচনায় বসে যান। সম্ভাব্য কারা এই অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছে এবং তাদের করণীয় ঠিক করতে চেষ্টা করেন।

ফারুক দ্রুত বঙ্গভবনে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং ক্যান্টনমেন্টে তার অধীনস্ত ট্যাঙ্কগুলো সচল করে তোলেন। রশীদের অধীনস্ত কামানগুলোও তখন কিছু সোহরোয়ার্দী উদ্যানে কিছু ক্যান্টনমেন্টে। যার যার স্থানে আক্রমণাত্মক পজিশনে তৈরি থাকে তারা। খন্দকার মোশতাক তার সামরিক উপদেষ্টা ওসমানীকে সেই মুহূর্তে বঙ্গ ভবনে চলে আসতে অনুরোধ করেন। গভীর রাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হঠাৎ এতগুলো ট্যাঙ্ক সচল হওয়ার শব্দে গাছে গাছে ঘুমিয়ে থাকা পাখিগুলোর ঘুম ভেঙ্গে যায়। খুব কিচির মিচির করতে থাকে তারা। তাদের তো বুঝবার কথা নয় ইতিহাসের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে আবার।

মেজর ইকবালের নেতৃত্বে বঙ্গভবনের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পাল্টা অভ্যুত্থান। পাশপাশি তরুণ ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহর নেতৃত্বে একটি দল যায় সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দি করতে। রাত একটায় ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ তার প্লাটুন নিয়ে ঘিরে ফেলেন জিয়ার বাড়ি। ঘটনার আকস্মিকতায় জিয়ার বাড়ির নিরাপত্তা রক্ষীরা আত্মসমর্পণ করেন। জিয়া বেরিয়ে আসেন তার ড্রয়িং রুমে, রাতের পায়জামা, পাঞ্জাবি পরা। হাফিজুল্লাহ বলেন : স্যার আপনি চিফ অব জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফের নির্দেশে বন্দি।

জিয়া কোনো উত্তেজনা দেখান না। কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। শান্ত কণ্ঠে বলেন, অল রাইট।

হাফিজুল্লাহর নির্দেশে তার দলের সিপাহীরা ড্রইংরুমের টেলিফোনের লাইনটি বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসেন খালেদা জিয়া। হাফিজুল্লাহ তাকেও বলেন : ম্যাডাম আপনারা হাউজ এ্যারেস্ট। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারবেন না। ভয়ে ঘুম থেকে উঠে যায় দুই ছেলে তারেক এবং আরাফাত। খালেদা তাদের সামলাতে যান। জিয়া বসে থকেন ড্রইং রুমের সোফায়। ড্রইংরুমের টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করলেও হাফিজুল্লাহ ভুলে যান বেডরুমেও একটি টেলিফোন রয়েছে। তরুণ ক্যাপ্টেন জানেন না ঐ ভুলে যাওয়া টেলিফোনের তার দিয়েই ঘটনা অচিরেই মোড় নেবে আরেক নাটকীয় স্রোতে।

দুই তারিখ মধ্য রাত থেকে খালেদ মোশারফ ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের রুমে বসে অভ্যুত্থান পরিচালনা করছেন। তার সঙ্গে শাফায়াত জামিল। রাতের মধ্যেই রংপুর থেকে কর্নেল হুদা এসে যোগ দেন খালেদ মোশাররফের সঙ্গে। বগুড়া থেকে চলে আসে দশ বেঙ্গল। খালেদ মোশাররফের পক্ষলম্বনকারী বিমান বাহিনীর এক অফিসার কাকডাকা ভোরে একটি ফাইটার মিগ বিমান নিয়ে চক্কর দিতে থাকেন বঙ্গভবনের উপর দিয়ে। একজন একটি হেলিকপ্টার নিয়ে সশব্দে উড়তে থাকেন ক্যান্টনমেন্টের উপর। বঙ্গভবন এবং ক্যান্টনমেন্ট যেন দুটি পৃথক দেশ। দেশের ভেতর দেশ, যুদ্ধংদেহী রূপে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের মুখোমুখি।

টেলিফোন যুদ্ধ

অভ্যুত্থানের প্রাথমিক দৃশ্যপট রচিত হয়ে যায় নভেম্বর ৩ তারিখ সকাল বেলাতেই। একটা গৃহযুদ্ধ বেধে যাবার আশঙ্কা দেয়। কিন্তু খালেদ মোশারফ রক্তপাত এড়াতে চান। অভ্যুত্থানের এক বিচিত্র পথ ধরেন খালেদ। তিনি অপর পক্ষের সঙ্গে শুরু করেন টেলিফোন আলাপ। ক্যান্টনমেন্ট আর বঙ্গভবন, আপাত এই দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে শুরু হয় টেলিফোনে কথা চালাচালি। খালেদ মোশারফ টেলিফোনে বঙ্গভবনের মেজরদের আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তাব দেন। মেজররা প্রত্যাখ্যান করেন সে প্রস্তাব। বঙ্গভবনে অবস্থানরত ওসমানীর সঙ্গে বাদানুবাদ করেন খালেদ।

খালেদ যখন টেলিফোন যুদ্ধ চালাচ্ছেন তখন বন্দি জিয়া পরিস্থিতির বিপদ বিবেচনা করে দ্রুত পুরো দৃশ্যপট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে তিনি পাশাপাশি আবেদন করেন তাকে যেন অন্তত অবসর কালীন পেনশন এবং ভাতাটুকু দেওয়া হয়। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসে থাকেন তার ড্রইংরুমে। তবে পদত্যাগ করলেও জিয়াউর রহমান তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বরাবরের মতো ঘটনার শেষ দেখবার আগ পর্যন্ত একটি বিকল্প পথও খুলে রাখেন, যার পরিচয় আমরা পাবো অচিরেই।

বিদ্যুৎ গতিতে এগুতে থাকে ঘটনা। জিয়ার পদত্যাগে উদ্দীপনা বেড়ে যায় খালেদের। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকে অভিনন্দন বার্তা আসতে থাকে তার কাছে। খালেদ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তিনি ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার প্রতিনিধিদের লিখিত দাবি নিয়ে পাঠান বঙ্গভবনে। তিনি আবারও ফারুক, রশীদকে আত্মসমর্পণ করে ক্যান্টনমেন্টে আসতে বলেন এবং বঙ্গভবন থেকে সব ট্যাঙ্ক, কামানকে ক্যান্টনমেন্টে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন। ফারুক, রশীদ আবারও এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

বঙ্গভবনের উপরের আকাশে তখনও বৃত্তাকারে ঘুরছে মিগ বিমান। খালেদ খন্দকার মোশতাককে বলেন : আমি কিন্তু সত্যি ব্লাড শেড এভয়েট করতে চাচ্ছি। কিন্তু আপনারা যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে আমি বঙ্গভবনের উপর বোম্ব ড্রপ করতে বাধ্য হব আর কিছুক্ষনের মধ্যেই।

ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেও চূড়ান্ত উত্তেজনা তখন। ল্যান্সারের বিরুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য মোতায়েন করেছেন খালেদ। এক ইউনিট অন্য ইউনিটের বিরুদ্ধে অস্ত্র তাক করে আছে। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের যাতায়াতও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ইনফেন্টির অফিসাররা যাচ্ছেন না টু ফিল্ড আর্টিলারির সামনে দিয়ে।

ইতোমধ্যে খালেদ অনুগত একটি ট্রুপস রেডিও স্টেশন দখল করে নিয়েছে। রেডিওতে সব রকম সম্প্রচার বন্ধ রয়েছে তখন। মেজাজ হালকা করবার জন্য

এক উপস্থিত রেডিও কর্মীকে তারা বলেন গান চালিয়ে দিতে। রেডিও কর্মী হতের কাছে পান রুনা লায়লার গানের টেপ। আকাশে যুদ্ধ বিমান, পথে পথে কামান, চলছে টেলিফোন যুদ্ধ আর দেশের মানুষ রেডিওতে শোনে রুনা লায়লা অবিরাম গেয়ে চলেছেন : 'গানের খাতায় স্বরলিপি লিখে বল কি হবে... ।' পরিস্থিতি আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের কাছে।

এস ও এস

জিয়া সকালে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করলেও এর আগে গভীর রাতে গোপনে একটি কাজ সেরে রাখেন। গৃহবন্দি অবস্থায় তখন তাকে ঘিরে আছেন খালেদ মোশারফের অনুগত অফিসার এবং সিপাইরা। ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ তার ড্রইং রুমের টেলিফোনটি বিচ্ছিন্ন করলেও জিয়া জানেন তার শোবার ঘরে ফোনটির লাইন খোলা আছে। এক উছিলায় শোবার ঘরে গিয়ে সন্তর্পনে জিয়া ডায়াল করেন একটি নম্বরে। নম্বরটি কর্নেল তাহেরের নারায়ণগঞ্জের বাড়ির। রাত তখন চারটা। ফোন ধরে ঘুম জড়ানো গলায় লুৎফা বলেন, হ্যালো।

জিয়া : আমি জিয়া বলছি, তাহেরকে দেন তাড়াতাড়ি।

কদিন ধরে গ্যাস্টিকের ব্যথায় ভুগছেন তাহের। ঘুম হচ্ছিল না ভালো। টেলিফোনের শব্দে জেগে ওঠেন তিনিও। তাহের হ্যালো বলতেই জিয়া নিচুস্বরে বলেন : তাহের লিসেন কেয়ারফুলি, আই এ্যম ইন ডেঞ্জার, সেভ মাই লাইফ।

লাইনটা কেটে যায়।

তাহের মুহূর্তে টের পেয়ে যান যে আরও একটি ক্যু ঘটে গেছে। এমন একটা সম্ভাবনার কথা সৈনিক সংস্থার লোকেরা জানিয়েছিল তাকে।

ব্যাপারটি কৌতূহলোদ্দীপক যে জিয়া ঐ সংকটাপন্ন অবস্থায় তার ত্রিসীমানায় চেনা জানা অসংখ্য টেলিফোন নম্বরের মাঝ থেকে রাত চারটার সময় ফোন করলেন নারায়ণগঞ্জে তাহেরের বেসামরিক বাসার ঐ নম্বরে।

ব্যাপারটির গণিত জটিল কিছু নয়। জিয়া এই বন্দি দশা থেকে মুক্ত হতে চান। কে এখন এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে? মেজর ফারুক, রশীদ, মোশতাক, ওসমানী? তারা সবাই ঐ মুহূর্তে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ব্যস্ত আছেন নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায়। বন্দি জিয়াকে নিয়ে ভাববার কোনো সময় বা স্বার্থ তাদের নেই। সেনাবাহিনীতে এদের পরে যিনি শক্তিশালী অবস্থানে আছেন তিনি হচ্ছেন খালেদ মোশারফ। কিন্তু অভ্যুত্থান ঘটিয়ে খালেদ মোশারফই বন্দি করেছেন জিয়াকে। সুতরাং সামরিক বাহিনীর ভেতর কে এমন আছেন, যে ঐ মুহূর্তে বন্দি অবস্থা থেকে জিয়াকে মুক্ত করবেন? জিয়া টের পান, কেউ নেই।

কিন্তু আর কেউ না জানলেও জিয়া জানেন যে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর সবার অগোচরে রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী আরও একটি দল, সেটি বিপ্লবী সৈনিক

সংস্থার। জিয়াকে গৃহবন্দি অবস্থায় পাহারায় রেখেছেন সে সিপাইরা তাদের মধ্যেও অনেকেই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য। ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাকে যদি এ মুহূর্তে কেউ মুক্ত করতে পারে তবে তা কেবল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সিপাইরাই। আর জিয়া বেশ ভালোই জানেন যে, এই সংস্থা চলছে একজন মানুষেরই নির্দেশে, তিনি কর্নেল তাহের। রণাঙ্গনে পরিচয় হয়েছে যার সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। জিয়া বরাবর একধরনের অনিশ্চিত দূরত্ব থেকে সমর্থন দিয়ে গেছেন তাহেরকে। সুতরাং হিসাব জিয়ার কাছে পরিষ্কার যে ঐ মহাবিপদের মুহূর্তে এই বিশ্ব সংসারে একজন মাত্র মানুষই আছেন যিনি রক্ষা করতে পারেন তাকে, তিনি হচ্ছেন কর্নেল তাহের। জিয়া তার শেষ বাজির তাসটি খেলেন। ঝুঁকি নিয়ে ভোররাতে ফোন করেন তাহেরকে যেখানে তার অনুরোধ সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট—সেভ মাই লাইফ।

রক্তাক্ত কারাগার

বঙ্গভবনে যারা আছেন, মোশতাক, ওসমানী, খলিল, ফারুক, রশীদসহ তাদের সহযোগী মেজর, সবার ভেতরেই একটি গভীর আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তাদের দখলে যে ট্যাঙ্ক, কামান, অস্ত্রগুলো আছে তাই দিয়ে তারা খালেদ মোশাররফের এই পাল্টা অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করবেন কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বঙ্গভবনে বসে তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না পাল্টা অভ্যুত্থানকারীদের শক্তি কতটা। জানেন না সেনাবাহিনীর কোন কোন অংশ আছে তাদের সাথে। তারা খোঁজ পেয়েছেন যে বিমানবাহিনী প্রধান এম এ জি তোয়াব, যাকে মোশতাকই জার্মান থেকে নিয়ে এসে করেছিলেন বিমান বাহিনীপ্রধান, তিনি পক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিয়েছেন খালেদের সঙ্গে। এমনকি খালেদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নৌবাহিনীপ্রধানও। আর তাদের বানানো সেনাবাহিনীপ্রধান জিয়া তো বন্দিই হয়ে আছেন। মোশতাক টের পান যে খেলা আর তার হাতে নেই।

এই অভ্যুত্থানকারীদের সাথে কি ভারতের যোগসাজশ আছে? বন্দি আওয়ামী নেতাদের যোগসাজশ আছে? তারা জানেন না তাও। বঙ্গভবনে বসে তারা আশঙ্কা করেন হয়তো ভারত খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জেলে বন্দি চার প্রধান আওয়ামী লীগ নেতাকে মুক্ত করে আবার বাকশাল সরকারকে ক্ষমতায় আনতে চাইছে। তাদের মাথার উপর তখনও উড়ছে বোমারু বিমান। খালেদ মোশারফ বলেছেন বঙ্গভবনের উপর বোমা ফেলবেন যে কোনো মুহূর্তে।

মোশতাক তখন ফারুক, রশীদসহ অভ্যুত্থানকারী মেজরদের বলেন : দেখেন আমার মনে হয়, উই আর ফাইটিং এ লুজিং গেম। আর চেষ্টা করে লাভ নাই। আপনারা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যান তারপর দেখা যাক কি করা যায়।

রশীদ বলেন : ইম্পসিবল। আমরা ক্যান্টনমেন্ট গেলে আমাদের একজনকেও আস্ত রাখবে মনে করেছেন?

ফারুকও এ মতে সায় দেন। অভ্যুত্থানকারী কোনো অফিসারই আর ক্যান্টনমেন্টে ফিরতে চান না। তারা প্রস্তাব করেন এই পাল্টা অভ্যুত্থানকে যদি আর কোনোভাবেই ঠেকানো না যায় তাহলে ক্যান্টনমেন্ট কেন, বাংলাদেশের কোনো জায়গা আর তাদের জন্য নিরাপদ নয়। তারা মোশতাক এবং ওসমানীকে বলেন, তাদের বরং দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

ওসমানী টেলিফোনে খালেদকে মেজরদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। বলেন, অফিসিয়ালী মেজর ডালিম এবং মেজর নুর এই প্রস্তাব নিয়ে খালেদের কাছে যাবেন।

বিদ্রোহীদের কাবু হতে দেখে স্বস্তি পান খালেদ। ওসমানীকে বলেন, এ ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

ফারুক, রশীদসহ মোশতাকও নতুন পরিস্থিতিতে বেশ নাজুক হয়ে পড়েন। মেজররা দেশের বাইরে চলে গেলে তার নিজের কি পরিণতি হবে এই ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান তিনি। এদিকে তাদের আদৌ দেশের বাইরে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, সে ব্যাপারে খালেদও কোনো সিদ্ধান্ত দেননি তখন পর্যন্ত।

বঙ্গভবনে তখন বন্দি হয়ে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে একটি নৃশংস, রক্তাক্ত নাটকের প্রধান অভিনেতারা। তারা অনিশ্চিত, সন্ত্রস্ত, ভীতও বটে। তারা তাদের পরাজয় ঠেকানোর সব রকম ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করতে থাকেন। এর আগে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন যে যদি হুমকি আসে তাহলে আওয়ামী লীগ এবং এর নেতৃত্বকে আর কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবেন না তারা। এই পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারত এবং বন্দি চার নেতার সূত্রে আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানের একটা সম্ভাবনা তারা আঁচ করেন। এই রকম একটি সম্ভাবনাকে সমূলে উৎপাটন করবার জন্য বঙ্গভবন গোষ্ঠী জেল খানায় বন্দি আওয়ামী লীগের প্রধান চারনেতাকে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত নেন। হত্যায় ইতোমধ্যেই সিদ্ধহস্ত হয়েছেন তারা। তাদের শেষ কামড় হিসেবে সে রাতেই তারা ঘটান তাদের দ্বিতীয় রক্তকাণ্ড।

মেজর ফারুকের বিশ্বস্ত রিসালদার মোসলেমউদ্দীন, যিনি সাফল্যের সঙ্গে হত্যা করেছেন শেখ মণিকে, তারই নেতৃত্বে একটি দলকে তারা পাঠান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। মোসলেউদ্দীন তার দলবল নিয়ে গভীর রাতে জেলে পৌঁছে আওয়ামী লীগ নেতাদের হত্যা করতে চাইলে হতভম্ব হয়ে পড়েন জেলের আইজি, ডিআইজি এবং জেলার। জেলে এসময় ফোন আসে বঙ্গভবন থেকে। মেজর রশীদ এর আগেই আইজি প্রিজন নুরুজ্জামানকে জানিয়েছিলেন মোসলেমউদ্দীনের

জেলে আসবার কথা। ফোন করে মেজর রশীদ জিজ্ঞাসা করেন : মোসলেমউদ্দীন কি পৌঁছেছে?

নুরুজ্জামান বলেন, জী পৌছেছেন কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রশীদ : আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেন।

খন্দকার মোশতাক ফোন ধরলে নুরুজ্জামান বলেন : স্যার মোসলেউদ্দীন সাহেব তো বন্দিদের গুলি করবার কথা বলছেন।

মোশতাক বলেন, সে যা বলছে তাই হবে।

ফোন রেখে দেন মোশতাক।

বিমূঢ় হয়ে পড়েন আইজি প্রিজন নুরুজ্জামানসহ উপস্থিত জেলার এবং ডিআইজি। উদভ্রান্তের মতো মোসলেউদ্দীন তার দল নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েন জেলে। জেলের পাগলা ঘণ্টা বেজে ওঠে। তারা বন্দুকের মুখে উপস্থিত কর্মকর্তাদের বন্দিদের কাছে নিয়ে যেতে বলেন। হতভম্ব, আইজি, ডিআইজি, জেলার বন্দুকের মুখে প্রাণ ভয়ে তাদের নিয়ে যান বন্দিদের সেলের দিকে। ১নং সেলে ছিলেন তাজউদ্দীন এবং সৈয়দ নজরুল, পাশের সেলে মনসুর আলী আর কামরুজ্জামান। পাগলা ঘণ্টার শব্দে আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছেন তাঁরা।

চারজনকেই আনা হয় ১নং সেলে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয় তাদের। খুব কাছ থেকে অতি অল্প সময়ে এই চার নেতার উপর গুলি চালান মোসলেমউদ্দীন। সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাজউদ্দীন তখনও বেঁচে আছেন। তাজউদ্দীন অস্ফুটস্বরে বলেন, পানি, পানি। ঘাতক দলের একজন আবার ফিরে এসে বেয়োনেট চার্জ করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়, কারাগারের ভেতর নিরস্ত্র বন্দিদের হত্যা করার এক বিরল নজির স্থাপন করে চলে যায় ঘাতকেরা।

শেখ মুজিবের পাশে সবসময় ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা নটোরিয়াস লোকটি, যিনি দেশের সীমান্ত বরাবর একটি ছোট্ট ডাকোটা বিমানে উড়ে উড়ে তৈরি করছিলেন এদেশের প্রথম সরকার, নয় মাসের যুদ্ধের যে গল্প তিনি শেখ মুজিবকে শোনাবেন বলে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন তিনি সে গল্প বুকে নিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন অন্ধকার জেলের রক্তাক্ত মেঝেতে। খসে পড়ে আরও একটি নক্ষত্র। একটি জনপদের রক্তের ঋণের বোঝা বাড়ে আরও এক ধাপ।

বন্দুকের পেছনের হাত

ঘটনা, দুর্ঘটনা,অতি ঘটনার এক আশ্চর্য সময় পার করছে তখন বাংলাদেশ। মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিনের মধ্যে বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপট। যেন প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে নতুন এক একটি ইতিহাস।

গভীর রাতে জেনারেল জিয়ার টেলিফোন পাবার পর আর বিছানায় যাননি তাহের। ঘুম থেকে উঠে গেছেন লুৎফাও। তাহের বলেন : চা করো এক কাপ।

লুৎফা বলেন : তোমার তো আলসারের ব্যথা।

তাহের : এক কাপে কিছু হবে না।

রাতে রান্নাঘরে বাতি জ্বালিয়ে চা করতে বসেন লুৎফা। বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে তখনও।

গভীর উদ্বিগ্নতায় চিন্তামগ্ন বসে থাকেন তাহের। লুৎফা চা নিয়ে এলে কাপটা হাতে নিয়ে বলেন : ক্যু, কাউন্টার ক্যু করে দেশটাকে ধ্বংস করে দেবে এরা। এবার আমাকে একটা অ্যাকশনে যেতেই হবে।

তাহের তখনও জেল হত্যার খবর জানেন না।

পরদিন খুব ভোর বেলাতেই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার বেশ অনেক সদস্য এসে ভিড় করেন তাহেরের নারায়ণগঞ্জের বাড়ি 'জান মঞ্জিলে'। উত্তেজিত তারা। তাহেরকে তারা ক্যান্টনমেন্টের চরম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। অফিসারদের এই ক্ষমতার কাড়াকড়ি নিয়ে তারা জানান তাদের প্রচণ্ড ক্ষোভ।

ক্ষুব্ধ হাবিলদার বলেন : এটা স্যার কোন ধরনের আর্মি? কে চিফ হবে, কে প্রেসিডেন্ট হবে এইসব ঝগড়া ঝাটিতে আমরা সিপাইরা মরব কেন?

এক কর্পোরাল বলেন : অফিসারদের দিন শেষ স্যার, আপনি অর্ডার দেন এবার স্যার আমরাই ক্ষমতা দখল করব।

সিপাইদের সংগঠিত করার জন্য সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন তাহের। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টসহ দেশের নানা ক্যান্টনমেন্টে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে জোরদার করছিলেন একটা অভ্যুত্থানের লক্ষ্যেই। ঘটনার এই অপ্রত্যাশিত মোড় আবারও একটা ক্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয় তাকে। সিপাইরা ছুটে এসেছেন তাহেরের কাছেই। তারা এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিত্রাণ চান, নেতৃত্ব চান তাহেরের।

১৫ আগস্টের পর থেকে ক্যান্টনমেন্ট বস্তুত দুই ভাগে ভাগ হয়ে আছে। মুজিব হত্যার অপারেশনে যুক্ত ছিল সশস্ত্রবাহিনীর কোর, যার মধ্যে আছে টু ফিল্ড আর্টিলারি, ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার, ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ আর তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ইনফেন্ট্রির অধীনে ৪৬ বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ফার্স্ট বেঙ্গল, ফোর্থ বেঙ্গল এইসব বিভাগ। খালেদ মোশারফ ফার্স্ট বেঙ্গল, ফোর্থ বেঙ্গল নিয়ে অভ্যুত্থান করেছেন এবং তাদের বসিয়ে দিয়েছেন কোরের মুখোমুখি। একে অপরের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ক্যান্টনমেন্টের ভেতর ইনফেন্ট্রির অফিসার, সৈন্যরা কোরের কোনো অফিসার বা সিপাইয়ের সামনে দিয়ে পর্যন্ত হাঁটছে না। কিন্তু এই পুরো ঘটনা, পাল্টা ঘটনায় এ যাবত সিপাইরা কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটাননি। সিপাইরা অনুগতভাবে অফিসারদের আদেশ পালন করে গেছেন শুধু।

১৪ আগস্ট কুর্মিটোলা এয়ারপোর্টের অন্ধকারে যে সিপাইরা ফারুক আর রশীদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই জানতেন না কোন অভিযানে যুক্ত হচ্ছেন তারা, তারা শুধু অফিসারের আদেশ মেনে গেছেন। সেভাবেই তারা পৌঁছে গেছেন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর। মেজর ইকবালের নেতৃত্বে যে সিপাইরা বঙ্গভবনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন কিছুদিন পর তাদেরই বলা হলো বঙ্গভবনের দিকে বন্দুক তাক করতে। খালেদ মোশারফের নির্দেশে তার অধীনস্ত সিপাইরা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন অন্যান্য ইউনিটের তাদেরই সতীর্থ সিপাইদের বিরুদ্ধে। অফিসারদের নির্দেশ মেনে সিপাইরা একে অন্যের দিকে অস্ত্র তাক করে আছেন। সকালে পূর্বে তো বিকালে তাদের বলা হচ্ছে পশ্চিমে বন্দুক ঘোরাতে।

অফিসাররা হুকুম করবেন, সিপাইরা নতমুখে হুকুম তামিল করবে, সেনাবাহিনীর এই তো রেওয়াজ। কিন্তু এটি ভাববারও যেন কারো ফুসরত নেই, যে হাত অস্ত্রগুলো ধরে আছে সেগুলো কিছু রক্ত মাংসের মানুষের। যাদের আছে বোধ, বিবেচনা, অহং। সেই মানুষেরা নড়েচড়ে ওঠে এবার। অভ্যাসের ঘোরে এতকাল যন্ত্রের মতো অফিসারদের নির্দেশ মেনে গেলেও এবার সহ্যের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন তারা। অফিসাররা যার যার প্রমোশন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন আর সিপাইদের বসিয়ে রাখা হবে একদল আরেক দলের দিকে বন্দুক তাক করে, এ অবস্থা আর তারা মেনে নিতে রাজি নন। বিশেষ করে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিক যারা মুক্তিযুদ্ধের গাঢ় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, তাদের আছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, আছে বঞ্চনা আর অসহায়ত্বের বোধ। সেইসঙ্গে তাহের তাদের দেখিয়েছেন নতুন এক জনগণতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর স্বপ্ন। অফিসারদের কুটিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে আবারও ধূলিসাৎ হতে বসেছে সেই স্বপ্ন। এবার এ ষড়যন্ত্র রুখে দিতে চান তারা। রাত পোহাতেই সেনাবাহিনীর নিয়ম উপেক্ষা করে, দিনের প্রথম আলোয় তাই তারা ছুটে এসেছেন তাহেরের কাছে। তারা নির্দেশ চান তাদের নেতার কাছে। ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত সিপাইরা ঘিরে রেখেছেন নারায়াণগঞ্জের জান মঞ্জিল।

গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে তাহেরও এই নতুন পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। মনে মনে তিনিও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার। কিন্তু ঐ মুহূর্তে উত্তেজিত সৈন্যদের আস্বস্থ করেন তিনি : আমি তোমাদের সাথে একমত। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। কিন্তু ভুলে যাবে না বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা একটা রাজনৈতিক দল। কোনো সংকীর্ণ স্বার্থে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। শুধু ক্ষমতা দখল করলেই তো হবে না। ভেবেচিন্তে অগ্রসর হতে হবে। কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদের পার্টি লিডারদের সাথে বসতে হবে। তোমরা রেডি থাকো। আজকেই আমরা মিটিং করে ঠিক করব পরবর্তীতে আমাদের কর্মসূচি কি হবে। আমি ঢাকায় রওনা দিচ্ছি এখনই।

যদিও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা জাসদের একটি অঙ্গ সংগঠন, কিন্তু সে মুহূর্তে জাসদের মূল কর্মকাণ্ড আবর্তিত হচ্ছে তাদেরকে ঘিরেই। ফলে জাসদকে তখন নিয়ন্ত্রণ করছে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাই। আর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বে আছেন তাহের। ফলে ঘটনা প্রবাহের গতি নির্ভর করছে তাহেরের সিদ্ধান্তের উপর। কিন্তু তাহের বরাবরই সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি মনে করেন। ফলে তিনি দ্রুত নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় রওনা দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

তাহের লুৎফাকে বলেন : আমি ঢাকায় চললাম, কখন ফিরবো ঠিক নাই। জরুরি মিটিংয়ে বসতে হবে।

বিয়ের পর থেকে লুৎফা যেন ক্রমাগত এক জরুরি অবস্থার মধ্যেই চলছেন। লুৎফা বলেন : এতোদূর জার্নি করবে, গাড়ির ঝাঁকুনিতে তোমার আলসারের ব্যথাটা বাড়তে পারে। আমি বরং গাড়ির পেছনে একটা বিছানা পেতে দেই, ওটাতে শুয়ে যাও।

গাড়ির পেছনের সীটে লুৎফার পাতা বিছানায় শুয়ে তাহের নারায়াণগঞ্জ থেকে রওনা দেন ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে আবু ইউসুফের বাসায়। এবার চূড়ান্ত এক অধ্যায়ের সূচনা করতে।

ডু নট রিপিট বার্মা

জেলের ভেতরে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনা তখনও চারদিকে গোপন। জেলের আইজি পরদিন বঙ্গভবনে ফোন করে জেল হত্যার খবরটি জানালে খন্দকার মোশতাকের ঘনিষ্ঠ কয়জন খবরটি জানেন। নিরুত্তাপ থাকেন মোশতাক। বাকিরা নীরবতায় সমাধিস্থ করে রাখেন এ সংবাদ। জানেন না খালেদ মোশারফও। তিনি তখনও মেজরদের দেশত্যাগের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় করছেন। খালেদ বলেন, তিনি রক্ত পাত এড়াতে মেজরদের দেশ ত্যাগের অনুমতি দিতে প্রস্তুত।

নভেম্বর ৩ তারিখ সন্ধ্যায় অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ফারুক, রশীদসহ ১৭ জন সদস্য একে একে তেজগাঁ বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ বাংলাদেশ বিমানের একটি প্লেন ওঠেন। সঙ্গে তাদের স্ত্রী, সন্তানেরা। তাদেরকে ভীত এবং বিমর্ষ দেখায়। তারা নিরাপত্তার স্বার্থে কাছে অস্ত্র রাখতে চান। সে অনুমতি দেওয়া হয় না তাদের। রাত প্রায় নয়টার দিকে বিদ্রোহী অফিসারদের নিয়ে আকাশে উড়ে বিমান। চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে তেল রিফুয়েলিং করবার জন্য বিমানটি নামে আবার। তারপর রওনা দেয় ব্যাংককের দিকে। এদেশের ইতিহাসের বীভৎসতম নাটকের কুশীলবদের নিয়ে বিমান পেরিয়ে যায় বাংলাদেশের সীমান্ত।

পরদিন সকালে খালেদ মোশারফ প্রথমবারের মতো জানতে পারেন জেল হত্যার খবর। বিস্মিত হন তিনি। যে অশঙ্কায় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে

তার কোনো যোগসূত্রই কোনো দিকে নেই। খালেদ মোশারফের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই ঘটেনি ঐ নেতাদের। তার লক্ষ্য তখন শুধু সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠিত করা।

মোশতাকের নির্দেশে ঘটে যাওয়া জেল হত্যার খবরে উত্তেজিত হয়ে উঠেন খালেদের সহযোগী ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত। তিনি আগেও একবার মোশতাকের ব্যাপারে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। শাফায়াত খালেদকে বলেন : স্যার মোশতাক ইজ দি মেইন কালপ্রিট। তাকে আর কিছুতেই প্রেসিডেন্ট পোস্টে রাখা চলবে না। উই মাস্ট রিমুভ হিম।

একমত হন খালেদ মোশারফ। আর কোনো টেলিফোন সংলাপ নয়। এম এ জি তোয়াব এবং এম আর খানকে নিয়ে এবার খালেদ সরাসরি চলে যান বঙ্গ ভবনে। সাথে করে নেন জিয়ার নিজের হাতে লেখা পদত্যাগপত্র।

বঙ্গভবনে পৌঁছে খালেদ ক্ষুব্ধ হয়ে মোশতাকের কাছে জেল হত্যার ব্যাখ্যা চান। মোশতাক দক্ষ অভিনেতার মতো ভাব করেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। তিনি বোঝাতে চান পলাতক মেজররাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। খালেদ মোশারফ এবার মোশতাকের কাছে দাবি করেন, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য তাকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করতে। তিনি জিয়ার লেখা পদত্যাগপত্র তুলে দেন মোশতাকের হাতে। মোশতাক তখনও দক্ষ খেলোয়াড়ের মতো গুটি চেলে চলেছেন। তিনি বলেন, এ সিদ্ধান্ত নিতে হলে কেবিনেট মিটিং ডাকতে হবে। ডাকা হয় কেবিনেট মিটিং।

মন্ত্রিপরিষদের মিটিংয়ে জেল হত্যা নিয়ে আলাপ হলেও খালেদ মোশারফ তার সেনাপ্রধান হওয়ার ব্যাপারটি আলোচনায় তোলেন। নানা সাংবিধানিক জটিলতার প্রশ্ন তুলে আপত্তি করেন ওসমানী। এই নিয়ে বাক বিতণ্ডা চলতে থাকে মন্ত্রিপরিষদের সভায়। চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে অভ্যুত্থানের সূচনা হলেও, তা শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকে খালেদ মোশারফের সেনাপ্রধান হওয়ার এজেন্ডায়। এ বড় অদ্ভুত যে খালেদ মোশারফ যিনি অভ্যুত্থানের প্রধান হোতা, চাইলে সেনাপ্রধান কেন, প্রেসিডেন্টের পদটিও নিয়ে নিতে পারেন। অথচ যাদের বিরুদ্ধে তার অভ্যুত্থান তাদের দেশত্যাগের সুযোগ দিয়ে, সেই ঘাতকদের মনোনীত প্রেসিডেন্টের কাছে সেনা প্রধানের পদটির জন্য আবদার করে চলেছেন। এ যেন এক বিচিত্র, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিবর্জিত, বিরল প্রজাতির অভ্যুত্থান।

খালেদ মোশারফ যখন বঙ্গভবনে চিফ অব আর্মি স্টাফ বিষয়ে দেন দরবার করছেন, তখন দেশের মানুষ ঘোর অন্ধকারে। কি ঘটছে দেশে. কে চালাচ্ছে দেশ কোনো কিছু বুঝবার উপায় নেই। একটি বদ্ধ ঘরে চলছে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের নাটক। কোনো খবর আসছে না রেডিও টিভিতে। রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তখনও রেডিওতে অবিরাম গান গেয়ে চলেছেন রুনা লায়লা।

আর বঙ্গভবনের সভাকক্ষের বাইরের চত্বরে, করিডোরে, বারান্দায় অস্ত্রধারী নানা অফিসার, খোলা পিস্তল, স্টেনগান আর তাদের ভারী বুটের আওয়াজ।

বঙ্গভবনে যখন মিটিং চলছে তখন সীমাহীন অনিশ্চয়তা ঝুলে আছে ক্যান্টনমেন্টে। চারদিকে নানা গুজব। বন্দি হয়ে আছেন জিয়া। সিপাইদের মধ্যে দ্রুত বাড়ছে উৎকণ্ঠার পারদ। অফিসাররা ছোট ছোট গ্রুপে কানাঘুষা করছেন। খালেদ সেই সকালে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে গেছেন বঙ্গভবনে কিন্তু তারপর থেকে তার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ নেই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় কমান্ডিং অফিসার শাফায়াত জামিলের সঙ্গে। উৎকণ্ঠায় খালেদ মোশারফের সংবাদের জন্য ক্যান্টনমেন্টে অপেক্ষা করছেন শাফায়াত। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে তারপরও কোনো খবর নেই খালেদের। এবার খালেদ মোশারফের উপরেই ক্ষেপে যান শাফায়াত। বস্তুত পাল্টা অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তিনিই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সবাইকে। শাফায়াত কয়েকজন সঙ্গীসহ রওনা দেন বঙ্গভবনে। এবার নিজেই তিনি ঘটনার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেখানে অপেক্ষা করে আরেক নাটকীয়তা।

বঙ্গভবনে পৌঁছে শাফায়াত দেখেন মোশতাক, ওসমানী, খালেদ মোশারফ. এম এ জি তোয়াব এবং এম এইচ খান মিটিং রুম থেকে বেরিয়ে আসছেন। করিডোর দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা। মোশতাক উত্তেজিত হয়ে খালেদকে বলছেন : আই হ্যাভ সিন মেনি ব্রিগেডিয়ার্স অ্যান্ড জেনারেলস অব পাকিস্তান আর্মি। ডোন্ট ট্রাই টু টিচ মি।

করিডোরে শাফায়াতের সাথে কিছু সৈনিকসহ দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজর ইকবাল। মেজর ইকবাল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তার হাতের সাবমেশিনগানটি মোশতাকের দিকে কক করে বলেন : ইউ হ্যাভ সিন জেনারেলস অব পাকিস্তান, নাউ সি দি মেজরস অব বাংলাদেশ।

ইকবালের সঙ্গের সিপাইরা তাদের অস্ত্র তাক করে ধরে মোশতাকের দিকে। মোশতাকের পাশে দাঁড়ানো ওসমানী শাফায়াতকে চিৎকার করে বলেন, শাফায়াত, সেভ দি সিচুয়েশন, ডোন্ট রিপিট বার্মা।

বার্মার জেনারেল নেউইনের নেতৃত্বে যখন অভ্যুত্থান হয়েছিল তখন সে দেশের প্রেসিডেন্ট প্যালেসে ঘটে গিয়েছিল রক্তপাত। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে উপর্যুপরি নৃশংস রক্তকাণ্ড, যেকোনো মুহূর্তে নতুন আরও একটি রক্তপাতের সম্ভাবনা।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই স্তম্ভিত, হতবিহ্বল। মোশতাক আতঙ্কিত। এবার দৃশ্যপটে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শাফায়েত জামিল। তিনি গিয়ে দাঁড়ান মেজর ইকবাল আর মোশতাকের মাঝখানে। ইকবালকে সরে যেতে বলেন তিনি। শাফায়াত জামিলের হাতেও অস্ত্র। তিনি সবাইকে বলেন, কেবিনেট কক্ষে ঢুকে যেতে। চুপচাপ করিডোরে দাঁড়ানো সবাই গিয়ে ঢোকেন কেবিনেট কক্ষে। পেছনে

পেছনে সশস্ত্র সৈন্য, অন্যান্য অফিসার। সভাকক্ষের ভেতরে যারা ছিলেন হঠাৎ এত অস্ত্রধারীদের দেখে ভড়কে যান সবাই। কেউ কেউ দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে।

সভাকক্ষে ঢুকে যেন নাটকের মঞ্চে প্রবেশ করেছেন এমন ভঙ্গিমায় বাকি সবাইকে দর্শকের ভূমিকায় রেখে শাফায়াত বেশ একটি উত্তেজিত বক্তৃতা দেন। তিনি মোশতাক এবং তার সহযোগীদের জেল হত্যার জন্য দায়ী করেন। শাফায়াত খন্দকার মোশতাককে খুনি বলে সম্বোধন করেন এবং তাকে পদত্যাগ করতে বলেন। খালেদ মোশারফকে অবিলম্বে সেনাপ্রধান ঘোষণার দাবি করেন।

বেশ কিছু উত্তেজিত, বিশৃঙ্খল মুহূর্ত কাটাবার পর সশস্ত্র সৈন্যদের উপস্থিতিতে আবার শুরু হয় সভা। দীর্ঘ আলোচনা চলে। সভায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, শেখ মুজিব হত্যা এবং জেল হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে, খালেদ মোশারফকে চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হবে এবং বঙ্গ ভবন থেকে সৈনিকরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাবে।

সেই সভার সিদ্ধান্তের পরই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী প্রধান করা হয়। জেল হত্যার অভিযোগে চার মন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমান, তাহের উদ্দীন ঠাকুর, নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে গ্রেফতার করে পাঠানো হয় জেলে।

এম এ জী তোয়াব এবং এম এইচ খান অভিনন্দন জানান তাকে। খালেদ মোশারফের দুপাশে বসে ব্রিগেডিয়ারের র‍্যাঙ্ক খুলে তার দুই কাঁধে পরিয়ে দেন মেজর জেনারেলের র‍্যাংক।

দীর্ঘ মিটিং শেষে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মোশতাক ভোর রাতে বিশ্রাম নিতে যান বঙ্গভবনে তার শোবার ঘরে। ওসমানী বিদায় নেন তার কাছে। কোলাকুলি করে বলেন : উই প্লেইড এ ব্যাড গেম।

৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় খন্দকার মোশতাক পদত্যাগপত্র সই করেন। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে খন্দকার মোশতাক পুলিশ প্রহরায় রওনা দেন তার আগামসি লেনের তিনতলার বাড়িতে, যেখান থেকে ১৫ আগস্ট ভোরে ট্যাঙ্ক আর কামান প্রহরায় আচকান পড়ে তিনি বেরিয়েছিলেন দেশের ক্ষমতা গ্রহণের জন্য। কলঙ্ক আর ইতিহাসের অভিশাপ নিয়ে শেষ হয় খন্দকার মোশতাকের ৮১ দিনের রাজত্ব।

দুটি ছবি, একটি খবর

এসময় দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় দুটি ছবি ছাপা হয়।

একটিতে খালেদ মোশারফের দুপাশে বসে তোয়াব এবং এম এইচ খান তার দুই কাঁধে পরিয়ে দিচ্ছেন মেজর জেনারেলের র‍্যাংক। সুদর্শন খালেদ মোশারফ হাসিতে উদ্ভাসিত করে রেখেছেন তার মুখ।

অপর ছবিটি একটি মিছিলের। মিছিলে খালেদ মোশারফের ভাই রাশেদ মোশারফ। রাশেদ আওয়ামী লীগ করেন। তিনি আওয়ামী লীগের কর্মীদের নিয়ে একটি মিছিল বের করেছেন, মিছিলে জয় বাংলার ব্যানার। খালেদ মোশারফের মা'ও যোগ দিয়েছেন সে মিছিলে। শেখ মুজিব হত্যার পর সেই প্রথম আওয়ামী লীগের ব্যানারে কোনো মিছিল। সেই প্রথম আবার জয় বাংলা।

সেদিন সন্ধ্যায় ভারতের রেডিও এবং টিভি খালেদ মোশারফের ক্ষমতা দখলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে খবর প্রচার করে।

সেনা প্রধানের র‍্যাংক কাঁধে মিষ্টি হাসি, জয় বাংলা শ্লোগানে মা এবং ভাইয়ের মিছিল আর ভারতীয় রেডিওর উচ্ছ্বাস, এই তিন মিলিয়ে এক অশনিসংকেত রচনা করে খালেদ মোশারফের জন্য। লোকের মনে প্রশ্ন জাগে :

খালেদ মোশারফ যা কিছু করছেন তাতো ক্ষমতার মসনদে বসবার জন্যই, নইলে সেনাপ্রধান হয়ে তার ঐ আকর্ণ বিস্তৃত হাসি কেন?

তার এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে আওয়ামী লীগ অবশ্যই জড়িত নইলে তিনি ক্ষমতায় বসবার সঙ্গে সঙ্গে জয় বাংলা শ্লোগান নিয়ে কেন তার মা, ভাই রাস্তায়?

তার সঙ্গে অবশ্যই ভারতের যোগাযোগ আছে নইলে তারা এত উচ্ছ্বসিত কেন?

খালেদ মোশারফ আওয়ামী লীগ এবং ভারতের ইঙ্গিতে এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন, বাস্তব ভিত্তি না থাকলেও, এই গুজবটি জোরদার হয়ে ওঠে তখন। রেডিও টিভিতে নিজের অবস্থান, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে একবারও কোনো বক্তব্য রাখেন না খালেদ। এতে করে চারদিকে কেবলই ছড়াতে থাকে সন্দেহের ধুম্রজাল।

এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ি

খন্দকার মোশতাক আর খালেদ মোশারফ তখন নাগর দোলায়। একজন উঠছেন, একজন নামছেন। কিন্তু তারা কেউ জানেন না ঠিক সেই সময়টিতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে, শহরের অন্য এক প্রান্তে।

আবু ইউসুফের এলিফ্যান্ট রোডের ৩৩৬ নম্বর বাসাটি তখন আবারও সরগরম। তার বাসাটি যে গলিতে সেটি নোয়াখালী সমিতির গলি নামে পরিচিত। সেই সমিতির পাশাপাশি ইউসুফের বাসা। তার উল্টোদিকেই থাকেন ওয়েভ পত্রিকার সম্পাদক কে বি এম মাহমুদ। জাসদের শুভাকাঙ্ক্ষী তিনি। তার প্রশস্ত ড্রইং রুমেও তখন ভিড়। জাসদের তরুণ কর্মীরা ছাড়াও ইউসুফ এবং মাহমুদের বাসা জুড়ে সেনাবাহিনী থেকে চলে আসা অসংখ্য হাবিলদার, সুবেদার, কর্পোরাল, সার্জেন্ট ওয়ারেন্ট। এরা সবাই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য। দফায় দফায় মিটিং হচ্ছে, জটলা করছেন তারা।

গত কয়দিনেই হঠাৎ করে বেড়ে গেছে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য সংখ্যা। নিয়মিত পুরনো সদস্য ছাড়াও এসময় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থায় যোগ দিয়েছে ফারুক, রশীদের অনুসারী সিপাইরাও। ফারুক রশীদ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াতে তাদের অধীনে ল্যান্সার এবং ২ ফিল্ড আর্টিলারির সিপাইরা মানসিকভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছেন। যাদের পেছনে দাঁড়িয়ে তারা বিদ্রোহ করেছেন তারা তাদের ফেলে রেখে চলে গেছেন দেশের বাইরে। সেনাবাহিনীতে তাদের কোনো আশ্রয় তখন আর নেই। তারা আতঙ্কিত হয়ে ভাবছেন এবার হয়তো খালেদ মোশারফ তাদের বিচার শুরু করবেন। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন তারা। এই বেকায়দা অবস্থায় তারা এমন একটি পক্ষ চাচ্ছিলেন যারা হবে খালেদ মোশারফের বিপক্ষে। এমনকি খালেদ মোশরফের দলের ফার্স্ট বেঙ্গল এবং ফোর্থ বেঙ্গলের অনেক সৈন্যও শুধুমাত্র সিনিয়র অফিসারের আদেশ রক্ষা করতে গিয়ে তাদের সহকর্মী সিপাইয়ের দিকে বন্দুক তাক করতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক সাধারণ সৈন্য এও মনে করেন যে অন্যায়ভাবে সেনাপ্রধান জিয়াকে বন্দি করেছেন খালেদ মোশারফ। তারা খালেদ মোশারফের পতন চান। এদের সবার বিকল্প হয়ে দাঁড়ায় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। এরা সবাই আসেন তাহেরের কাছে উদ্ধারের আশায়।

তারা বিদ্রোহ করতে চান। কেউ খালেদ মোশারফকে উৎখাত করতে চান। কেউ চান খালেদ, জিয়াসহ সব অফিসারদের হত্যা করতে। তাহের তাদের লাগামহীন উত্তেজনার রাশ টেনে ধরেন। তাদের বোঝান হত্যা বিপ্লব নয়। তবে এও বলেন যে, সময় এসেছে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার এবং অচিরেই তারা একটি পদক্ষেপ নেবেন। কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে তাদের। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নয়, জাসদের সামগ্রিক অবস্থাটিও বিবেচনা করতে হবে। সে জন্যই প্রয়োজন জাসদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার।

৪ নভেম্বর থেকে আবু ইউসুফ এবং এ বি এম মাহমুদের বাসায় শুরু হয় জাসদের নেতৃবৃন্দের লাগাতার মিটিং। জাসদের প্রধান অনেক নেতা যেমন মেজর জলিল, রব, নুর আলম জিকু, শাজাহান সিরাজ, মোঃ শাহজাহান, রুহুল আমিন ভুঁইয়া, মীর্জা সুলতান রাজা, ছাত্রনেত্রী শিরিন আক্তার তখন জেলে। যারা বাইরে ছিলেন একে একে আসেন এলিফ্যান্ট রোডে। আসেন সিরাজুল আলম খান, ড. আখলাকুর রহমান, হাসানুল হক ইনু, আ ফ ম মাহবুবুল হক, খায়ের এজাজ মাসউদ, কাজী আরেফ প্রমুখেরা। অন্যান্য নেতা মার্শাল মণি, শরীফ নুরুল আম্বিয়া তখন ঢাকার বাইরে। আর যথারীতি আছেন তাহেরের ভাই আবু ইউসুফ, আনোয়ার এরাও। সরাসরি মিটিংয়ে যোগ না দিলেও আশপাশে আছেন বেলাল, বাহার। যে কোনো প্রয়োজনে প্রস্তুত। আছেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতা হাবিলদার হাই, কর্পোরাল আলতাফ, নায়েব সুবেদার মাহবুব, জালাল, সিদ্দিক প্রমুখেরা। সেইসঙ্গে অগণিত সাধারণ সৈনিক, গণবাহিনীর তরুণ কর্মীরা ঘোরাঘুরি

করছেন নোয়াখালী সমিতির গলিটিতে। দেশের অন্যতম প্রধান এই দল যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তুমুল দাবি নিয়ে তোলপাড় তুলেছে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে, তারা একবার দিকভ্রান্ত হয়েছেন শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের কারণে, বাধাগ্রস্ত হয়েছে তাদের যাত্রা। দ্বিতীয়বারের মতো রাজনীতির গতিপথ বদলে দেবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন খালেদ মোশারফ। এবার জাসদ তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে মোকাবেলা করতে চায় এ পরিস্থিতি। আর জাসদের প্রধান শক্তি তখন গণবাহিনী এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। দুটি অঙ্গসংঠনেরই কমান্ডার ইন চিফ তাহের। ফলে সবার মনোযোগ তখন তাহেরের দিকে।

তারা খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানটি নিয়ে কথা বলেন। একে দুর্বল রাজনৈতিক ভিত্তির বিশৃঙ্খল একটি অভ্যুত্থান হিসেবেই চিহ্নিত করেন তারা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার নামে খালেদ মোশারফ তার সেনাপ্রধান হওয়ার ইচ্ছাই চরিতার্থ করছেন শুধু। তাছাড়া বিনা বিচারে শেখ মুজিবের খুনিদের দেশত্যাগের সুযোগ দিয়ে বিরাট অন্যায় করেছেন তিনি। কেউ কেউ ভারতের সাথে তার যোগসাজশের ব্যাপারটিও খতিয়ে দেখতে চান। বিমান বাহিনীর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা জানান তারা খবর পেয়েছেন, ভারতীয় বিমান নাকি বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

তাহের বলেন : আর্মিতে একটা টোটাল কেওয়াস তৈরি হয়েছে। দেশে সত্যিকার অর্থে এ মুহূর্তে কোনো সরকার নেই। স্টেট একটা ভীষণ ভালনারেবল জায়গায় আছে। আমি মনে করি পুরো ব্যাপারটার মধ্যে ইন্টারভেন করার এইটাই সঠিক সময়।

ড. আখলাক বলেন, আপনি কিভাবে ইন্টারভেন করার চিন্তা করছেন।

তাহের : ক্যান্টনমেন্টে সিপাইরা মারাত্মকভাবে এজিটেটেড হয়ে আছে। তারা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে, তাদের ইউজ করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই এই এক্সপ্লয়টেশন চলছে। তারা এর একটা শেষ দেখতে চায়। ক্যান্টনমেন্টে আমাদের একটা ভালো বেইজ আছে। জাসদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনগুলো সাপোর্ট করলে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে লীড করে আমরা ক্যান্টনমেন্টের কন্ট্রোল নিতে পারি।

ড. আখলাক বলেন : কিন্তু শুধু ক্যান্টনমেন্টে কন্ট্রোল নিলেই তো হচ্ছে না। পার্টি হিসেবে এ মুহূর্তে জাসদের পক্ষে এরকম একটা পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেবার মতো অবস্থা কি আছে? আমাদের মেইন লিডাররা সব বন্দি, জাসদের বিশ হাজার কর্মী জেলে। এ অবস্থা আমরা সামাল দিতে পারব ? আমার তো মনে হয় আমাদের উচিত এখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা।

তাহের : নিশ্চয়ই শুধু ক্যান্টনমেন্ট দখল করে হবে না। সেজন্যই তো জাসদের অন্য ফোরামগুলোর সাপোর্ট চাচ্ছি। কিন্তু আমি মনে করি এ মুহূর্তে

জাসদ নিষ্ক্রিয় থাকলেও অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আর্মিতে একটা বিদ্রোহ ঘটবেই। এই বিদ্রোহকে যদি আমরা এখন আমদের পক্ষে আনতে না পারি আমি নিশ্চিত যে এর ফল ভোগ করবে শত্রুপক্ষের কেউ। এ অবস্থায় আমাদের ক্ষমতা দখলের সুযোগ হাত ছাড়া করা হবে মারাত্মক ভুল। স্টেট এখন সবচেয়ে দুর্বল। এই দুর্বল অবস্থায় আঘাত না হানলে আমাদের হয়তো পরে ক্ষমতা দখলের জন্য আরও শক্তিশালী বুর্জুয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়তে হবে। আমি মনে করি আমাদের একটা একটিভ রোলে যাওয়া উচিত।

কোনো প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডে, জনসভায় না থাকলেও সিরাজুল আলম খান জাসদের নীতিনির্ধারণী সভাগুলোতে থাকেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সভাতেও তিনি উপস্থিত। সিরাজুল আলম খান বলেন : আমার মনে হয় কর্নেল তাহের যা বলছেন সেটা আমাদের গুরুত্বের সাথে ভাবা দরকার। রাষ্ট্র এখন যেরকম নাজুক অবস্থায় আছে এমন অবস্থা আমরা হয়তো আর পাবো না। ১৫ আগস্টে একবার পরিস্থিতি আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে,এবারও সে সুযোগটা দেওয়া ভুল হবে। কিন্তু এটাও খুব সত্য যে, সিপাইদের সঙ্গে জনতার একটা যোগাযোগ ঘটাতে না পারলে আমরা যাই করি না কেন সেটা আরেকটা আর্মি ক্যুতে পরিণত হবে। আমাদের গণবাহিনীর অবস্থাটা কি?

কথা বলেন ইনু, খায়ের এজাজ, মাহবুবুল হক। তারা জানান আগে রক্ষীবাহিনী, পরে মোশতাকের দমন নীতির কারণে গণবাহিনীর সদস্যরা ঐ মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। ইনু বলেন : তবে সময় পেলে তাদের সক্রিয় করে তোলা যেতে পারে।

তাহের : আসলে আমি মনে করি, পুরোপুরি একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলবার মতো প্রস্তুতি সিপাইদের নাই। এতবড় ঘটনা এই মুহূর্তে শুধু তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সময় গড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু আমি দাদার সাথে একমত যে তাদেরকে অবশ্যই জনগণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আপনারা যদি প্রস্তুত থাকেন এবং সংগঠিত শ্রমিকদের বের করে নিয়ে আসতে পারেন আমি সিপাইদের নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিতে পারব এবং সেখান থেকে অস্ত্র বের করে আনতে পারব বাইরে। আর বাইরে যদি পিপল রেডি থাকে তাহলে এটা একটা জয়েন্ট আপরাইজিং হতে পারে। কিন্তু আমাদের ডিসিশন নিতে হবে তাড়াতাড়ি। ইতিহাসের মোড় যে কোনো দিকে ঘুরে যেতে পারে।

জাসদের নেতৃবৃন্দ খানিকটা দ্বিধান্বিত থাকলেও তাহেরের আত্মপ্রত্যয় প্রভাবিত করে তাদের। তারা সমর্থন করেন তাহেরকে। ড. আখলাক অবশ্য তখনও নিষ্ক্রিয় থাকার পক্ষে। বাদানুবাদ চলে। সিরাজুল আলম খান শেষে বলেন: এই পরিস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় থাকা জাসদের জন্য হবে বোকামী। যতটুক শক্তি আছে

তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াই হবে সমীচীন। দেশে একটা স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এখন জরুরি এবং তা আনতে হবে আরেকটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেই।

দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে একটি অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেবে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, এরপর জাসদ তার গণবাহিনী এবং অন্যান্য সংগঠনসহ ছাত্র, শ্রমিক জনতাকে এই বিপ্লবে শামিল করবে। এটি হবে সিপাই জনতার বিপ্লব। এই অপারেশনের নেতৃত্ব দেবেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সুপ্রিম কমান্ডার কর্নেল তাহের।

এলিফেন্ট রোডের বাসায় যখন মিটিং চলছে তখন বাইরে বিপুল সংখ্যক সৈনিক সংস্থার সদস্য, অন্যান্য বাহিনী এবং রেজিমেন্টের সিপাইরাও আছেন। আনোয়ার এবং ইউসুফ ঘর বাহির করছেন। রাস্তায় টহল দিচ্ছে বেলাল, বাহারসহ মোশতাক, মাসুদ, বাচ্চু, হারুন, বাবুল, সবুজ প্রমুখ গণবাহিনীর অন্য তরুণরা। ইউসুফের স্ত্রী এতগুলো উত্তেজিত মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। ডাল চাল মিশিয়ে খিচুরি রান্না হচ্ছে। তার সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন প্রতিবেশী ওয়েব পত্রিকার সম্পাদক কে বিএম মাহমুদের স্ত্রী , কন্যারা।

সিদ্ধান্ত হয় পরদিন অর্থাৎ ৫ নভেম্বর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার পক্ষ থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে একটি লিফলেট বিলি করা হবে। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর অন্যান্য সিপাই এবং অফিসারদেরকে আসন্ন বিপ্লবী উদ্যোগের ব্যাপারে অবহিত করা হবে। দেখা হবে তাদের প্রতিক্রিয়া। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৯ নভেম্বর সারাদেশে ডাকা হবে হরতাল। এই হরতালের মধ্য দিয়ে জাসদের অন্যান্য গণ সংগঠনগুলোকে চাঙ্গা করে মাঠে নামানো হবে এবং আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা হবে। তারপর পরিস্থিতি বুঝে ধার্য করা হবে বিপ্লবের নির্দিষ্ট দিন।

গোপনে বিপ্লবের সিদ্ধান্ত যখন চূড়ান্ত হয়ে গেছে খালেদ মোশারফ তখনও তার সেনাবাহিনী প্রধানের পদ নিয়ে দেন দরবার করছেন মোশতাকের সঙ্গে। জিয়া বন্দি হয়ে আছেন তার বাড়িতে। ক্যান্টনমেন্ট জুড়ে চাপা উত্তেজনা।

একটি লিফলেট

পার্টির অনুমোদন পাওয়ার পর এবার ঘটনাকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব তাহেরের। সিপাইদের উত্তেজনাকে আপাতত সামাল দিতে এবং পরিস্থিতিকে আরও ভালোমতো বুঝতে পরিকল্পনা মতো লিফলেট বিলির প্রস্তুতি নিতে থাকেন তাহের। লিফলেটের ব্যাপারে তাহেরের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। কিশোর বয়সে চট্টগ্রামের প্রবর্তক সংঘ স্কুলের ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী শিক্ষকের কাছে যখন শুনছিলেন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগে তারা সারা শহর জুড়ে ছড়িয়েছেন ইস্তেহার,

মানুষকে প্রস্তুত হতে বলেছেন অভ্যুত্থানের জন্য, সেই স্মৃতি যেন গেঁথে আছে তার মনে। তাহের নিজে যখন একটি অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন কৈশোরিক সেই নস্টালজিয়া যেন ভর করে তাকে। অভ্যুত্থানটি তিনি শুরু করতে চান ঐ ইস্তেহার বিলি করার মধ্য দিয়েই।

তাহের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে বলেন : আমরা একটা অভ্যুত্থানে যাব, তোমরাই সে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেবে, কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে যাব, স্টেপ বাই স্টেপ। একটা লিফলেট আমরা আগে ছড়াবো ক্যান্টনমেন্ট। লিফলেটটা আগে তোমরা লেখ, সেটা আমরা দেখে দেব। অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তোমরা কি অর্জন করতে চাও সেটা লেখ।

তাহের, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইনু এবং আনোয়ারকে নিয়ে বসেন। বলেন : মনে রেখ বিপ্লবটা কিন্তু সিপাইদের, আমরা শুধু ফেসিলিটেট করব। লিফলেটের ড্রাফট তারা করুক পরে আমরা দেখবো। লিফলেটটা ক্যান্টনমেন্ট ছড়িয়ে রিয়াকশনটা দেখতে চাই। সিপাই অফিসার সবাইকে প্রিপেয়ার করা দরকার। অফিসারদের ইনিশিয়ালি এর মধ্যে রাখতে চাই না। ওরা পুরো ব্যাপারটাই বানচাল করে দিতে পারে। শুধু মেজর জিয়াউদ্দীন থাকবে আমাদের সাথে। তারপর অবস্থা বুঝে দেখব কি করা যায়।

লিফলেটের খসড়া তৈরি করেন ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের হাবিলদার বারী এবং নায়েক সুবেদার জালাল। পরে ইনু, আনোয়ারসহ আরও কয়জন মিলে চূড়ান্ত করেন ঐ লিফলেট। লিফলেটে তারা তাদের আক্রোশ আর ইচ্ছার কথা লেখেন—

"সৈনিক ভাইয়েরা, আমরা আর ধনিক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হইতে চাই না। নিগৃহীত, অধিকারবঞ্চিত সিপাইরা আর কামানের খোরাক হইবে না। আসুন আমরা একটি অভ্যুত্থান ঘটাই। আমাদের এই অভ্যুত্থান শুধুমাত্র নেতৃত্বের পরিবর্তন করিবার জন্য হইবে না বরং এই অভ্যুত্থান হইবে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য। এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া আমরা ঔপনিবেশিক আমলের রীতিনীতি বদলাইয়া ফেলিয়া সশস্ত্র বাহিনীকে জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী একটি বাহিনীতে পরিণত করিব। আমরা রাজবন্দিদের মুক্ত করিব, দুর্নীতিবাজদের অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিব। মনে রাখিবেন এখন সিপাই আর জনতার ভাগ্য এক। তাই সিপাই জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করিতে হইবে। সিপাই সিপাই ভাই ভাই সুতরাং সিপাইদের ঐক্যবদ্ধভাবে অফিসারদের এই ক্ষমতার লড়াইকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যদি অফিসাররা নির্দেশ দেয় আরেক সৈনিক ভায়ের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরিবার তাহা হইলে আপনারা বন্দুক ধরিবেন না। আসুন ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করি।"

জাসদের রাজনৈতিক প্রকাশনা দেখতেন শামসুদ্দিন পেয়ারা, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় লিফলেটটি ছাপানোর। শামসুদ্দিন সেই রাতের বেলাতেই

জিন্দাবাজারে তার পরিচিত এক প্রেসে গিয়ে হাজির হন। দাঁড়িয়ে থেকে জরুরি ভিত্তিতে ছাপান দশ হাজার লিফলেট। তাহের শামসুদ্দিনকে বলেন : লিফলেটগুলো ক্যান্টনমেন্ট ফার্স্ট গেটে দিয়ে আস।

শামসুদ্দিন বলেন : আমি তো কখনো ঐদিকে যাইনি, কাকে দেবো, চিনি না তো কাউকে।

তাহের : ভয়ের কিছু নাই। ওখানে যারা ডিউটিতে থাকবে তারা আমাদের সৈনিক সংস্থার লোক। কারো সঙ্গে তোমার কোনো কথা বলতে হবে না। তোমার হাতে বান্ডিল দেখলেই ওরা বুঝবে। তুমি গার্ডরুমের সিঁড়িতে বান্ডিলটা রেখে দিলেই হবে। বাকিটা ওরাই করবে।

গোপন অভিযানের ভঙ্গিতে রাতের বেলা একটি বেবিট্যাক্সি নিয়ে শামসুদ্দিন চলে যান ক্যান্টনমেন্টের গেটে। একটি বাক্যও উচ্চারন না করে দশ হাজার লিফলেটের বান্ডিলটা তিনি রেখে আসেন সেখানে। সেরাতেই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা সারা ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে দেয় সেই লিফলেট। ব্যারাকের মসজিদে, নামাজের স্থানে , টয়লেটে, মশারির উপরে, মেঝে, খাবার মেসে ছড়িয়ে রাখা হয় লিফলেট, যাতে সকালে উঠেই তা সবার চোখে পড়ে।

যথারীতি ঘুম থেকে উঠতেই সবার চোখে পড়ে সেই লিফলেট। সিপাইদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি তখন বিস্ফোরনমুখ। সাধারণ সৈনিকরা তখন আগ্নেয়গিরির মতো ফুসছে। যারা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার তৎপরতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তারা এই লিফলেট পড়ে মুহূর্তে জ্বলে উঠেন বিদ্যুতের মতো। একটি অভ্যুত্থানের আহ্বান, জনগণের স্বার্থ রক্ষাকারী একটি সেনাবাহিনীর স্বপ্ন, অফিসারদের রুখে দেবার অঙ্গীকার দাবানলের মতো আগুন ধরিয়ে দেয় যেন সিপাইদের মধ্যে। লিফলেটের প্রতিটি লাইন গিয়ে যেন বেঁধে তাদের বুকে। এ যেন তাদের সবারই মনের গোপন সত্য কথা। লিফলেট পড়ে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকরা তো বটেই অন্য সৈনিকরাও যেন প্রস্তুত হয়ে উঠেন এমন একটি অভ্যুত্থানের জন্য। তারা সবাই এসে দাঁড়ান সৈনিক সংস্থার পাশে। ক্যান্টনমেন্টে তৎক্ষণাৎ এক অভূতপূর্ব উত্তেজনাকর পরিস্থিতির জন্ম হয়। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাও প্রস্তুত ছিলেন না তার জন্য। সাধারণ সিপাইরা তীব্র দাবি তোলেন, অভ্যুত্থান যদি ঘটাতেই হয় তবে আর দেরি কেন,ঘটাতে হবে পরদিনই। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাদের, তারা এগিয়ে যেতে চান অভ্যুত্থানের দিকে, এর যে কোনো পরিণতি মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত। লিফলেট অফিসারদের হাতেও পড়ে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে। পরবর্তী নির্দেশনার জন্য বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতারা আসেন তাদের চিফ কমান্ডার তাহেরের কাছ।

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা যখন গোপনে তাদের অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে ফেলেছে খালেদ মোশারফ তখন ক্যান্টনমেন্টে তার অবস্থান দৃঢ় করবার কাজে ব্যস্ত। ইতোমধ্যে বগুড়া থেকে দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ঢাকায় এনে শেরে বাংলানগরে রেখেছেন খালেদ মোশারফ। এই রেজিমেন্টের সৈন্যরাই তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ করেছে। খালেদ মোশারফের সমর্থনে রংপুর থেকে বাহাত্তর ব্রিগেডের কর্নেল কে এস হুদাও এর মধ্যে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। ক্যান্টনমেন্টে সৈনিক সংস্থার লিফলেট ছড়ানোর খবর খালেদ মোশারফের কাছেও পৌঁছে। সৈনিক সংস্থার কথা আবছা কিছুটা শুনলেও এদের কাজের বিস্তৃতি এবং ধরন সম্পর্কে বিশেষ ধারণা ছিল না তার। লিফলেটের কারণে সিপাইদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে সে খবর খালেদ মোশারফ পান। এই উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থা হিসেবে খালেদ মোশারফ বিভিন্ন রেজিমেন্টের সিপাইদের ঢাকা থেকে অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে বদলি করতে শুরু করেন। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতাদের খুঁজে বন্দি করবার নির্দেশ দেন তিনি।

নানা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকায় সৈন্য সমাবেশ এবং ঢাকার সৈন্যদের বদলির ঘটনায় সিপাইদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায় আরও। সৈনিক সংস্থার নেতাদের বন্দি করার পায়তারার খবরও তারা পান। সেদিন সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর সব নিয়মকানুন ভেঙ্গে সিপাইরা দলে দলে এসে ভীড় করেন এলিফেন্ট রোডে তাহেরের কাছে। অনেকেই ছদ্মবেশ নেওয়ার জন্য ইউনিফর্মের উপর একটি লুঙ্গি চাপিয়ে চলে আসেন। সিপাইরা তাহেরকে জানান, প্রতিটি মুহূর্ত এখন গুরুত্বপূর্ণ, আগামীকালের মধ্যে কিছু ঘটাতে না পারলে খালেদ মোশারফ বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতাদের বন্দি করবেন, বাকিদের বদলি করে দেবেন ঢাকার বাইরে। তখন আর করার থাকবে না কিছুই। সিপাইরা বলেন অভ্যুত্থান ঘটাতে হলে, ঘটাতে হবে আজই।

এমন একটি পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তাহের। তাহের আবারও সিপাইদের শান্ত হতে বলেন। বলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে পার্টির সাথে কথা বলে নিতে হবে।

সেদিন বিকালে আবু ইউসুফের এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় আবারও একে একে চলে আসেন জাসদের প্রধান নেতারা। আবু ইউসুফের বাসা এবং তার পাশে সাপ্তাহিক ওয়েভ পত্রিকার মালিক কে বি এম মাহমুদের বাসা তখন জাসদ এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অস্থায়ী অফিস। দুই বাসায় জাসদ এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোকজনের ছোটাছুটি।

ক্রাচে শব্দ তুলে তাহের এ ঘর ও ঘর পায়চারী করেন। গভীর চিন্তিত মুখ তার। অপ্রত্যাশিত এক পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত এক সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। শান্ত

কণ্ঠে পার্টি নেতাদের তাহের বলেন : আমি জানি যে আমরা এরকম একটা সিচুয়েশনের জন্য প্রস্তুত না, এত তাড়াতাড়ি সব ঘটবে আমারও তা ধারণায় ছিল না। তবে আমাদের আর ফিরে আসবার উপায় নেই। অভ্যুত্থান ঘটাতেই হবে এবং তা কালকেই। অভ্যুত্থান যারা করবে তারা প্রস্তুত। তাদের আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ঘটনার গতিপথকে এখন আমাদের ফলো করতেই হবে। আমরা এমন একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি যে দিস হ্যাজ টু বি নাও অর নেভার। কাল মধ্য রাতের পরই অর্থাৎ সাতই নভেম্বর আমি অভ্যুত্থানটি ঘটাতে চাই।

আশ্চর্য কাকতালীয় ব্যাপারই বটে। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার চূড়ান্ত বিপ্লবটি ঘটেছিল ৭ নভেম্বরই। লেনিনও এমন এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছিলেন। বলেছিলেন, বিপ্লবের জন্য ৬ তারিখ বেশি আগে হয়ে যাবে, ৮ তারিখ হবে বেশি দেরি, বিপ্লব ঘটাতে হবে ৭ তারিখেই। লেনিন বলেছিলেন, অভ্যুত্থান কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের ওপর নির্ভর করে না। সমাজের এক ক্রান্তিলগ্নে যখন পরিবর্তনকামী মানুষ তাদের অগ্রণী বাহিনীর নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে তখনই অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি পেকে ওঠে। তার উত্তরসূরি স্তালিন বলেন, 'এমন সময়কে চূড়ান্ত আঘাত হানার মুহূর্ত, অভ্যুত্থান আরম্ভ করার মুহূর্ত হিসেবে স্থির করতে হবে যখন সংকট চরমে পৌঁছেছে, যখন স্পষ্টই বোঝা গেছে যে আগ্রগামী বাহিনী শেষ পর্যন্ত লড়তে প্রস্তুত, মজুত বাহিনী অগ্রগামীদের সমর্থন করতে প্রস্তুত, এবং শত্রু শিবিরে চূড়ান্ত আতঙ্ক বিরাজ করছে।'

আগ্রগামী বাহিনী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তখন শেষ পর্যন্ত লড়তে প্রস্তুত, মজুত বাহিনী, জাসদের গণবাহিনী অগ্রগামীদের সমর্থন করতে প্রস্তুত, এবং শত্রু শিবিরে অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্টের ক্ষমতাশালীদের মধ্যে তখন চূড়ান্ত আতঙ্ক বিরাজ করছে। সুতরাং ঢাকাতেও অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি পেকে উঠেছে বলা যেতে পারে।

তাহেরের প্রস্তাবে কেউ কেউ আবারও ঐ মুহূর্তে পার্টির সার্বিক প্রস্তুতির অভাবের কথা বলেন। তারা পূর্ব পরিকল্পিত ৯ তারিখের হরতালটি আগে পালন করে শক্তি সঞ্চয়ের কথা প্রস্তাব করেন। কিন্তু একটা স্রোতের তোড়ের মধ্যে তারা তখন সবাই।

তাহের বলেন : না, সে সুযোগ আর এখন নেই। একটা দিন দেরি করলেই পুরো পরিস্থিতি আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তবে পার্টি পুরোপুরি প্রস্তুত না বলে আমিও মনে করি এই মুহূর্তেই জাসদ বা সৈনিক সংস্থার পুরোপুরি ক্ষমতা দখল করা ঠিক হবে না। একটা ইন্টেরিম পিরিয়ড আমাদের দরকার, যে সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারব। এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমরা ক্ষমতার কেন্দ্রে না থেকেও পরিস্থিতিকে কন্ট্রোল করতে

পারব। সেজন্য এই মধ্যবর্তী সময়ে সিপাই এবং জনগণ সমর্থন করবে এমন একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়ে জাতীয় সংহতি রক্ষা করা দরকার, তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজেদের অবস্থা অনুকূলে এনে তারপর আমরা পাওয়ার নিতে পারি।

পার্টি সদস্যরা জানতে চান, তাহের কার কথা ভাবছেন।

তাহের বলেন : আমি জেনারেল জিয়ার কথা ভাবছি। আপনাদের আগেই জানিয়েছি যে উনি আমাকে ইতোমধ্যে তাকে রেসকিউ করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন। দুই তারিখ রাতে ফোন ছাড়া পরেও এক সুবেদারের মাধ্যমে আমাকে এস ও এস ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন। এ মুহূর্তে উনিই সবচেয়ে এক্সেপ্টেবল হবেন। ন্যাশালিস্ট, সৎ অফিসার হিসেবে আর্মিতে তার একটা ইমেজ আছে। স্বাধীনতার ঘোষণার কারণে সাধারণ মানুষের কাছেও তার একটা পরিচিতি আছে। যুদ্ধের মাঠ থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। আপনাদের আগেও জানিয়েছি যে তার সঙ্গে আমার টাইম টু টাইম যোগাযোগ হয়েছে, জাসদের একটিভিটিজের ব্যাপারে উনি বেশ ভালোমতোই জানেন এবং এ ব্যাপারে সবসময় একটা নীরব সমর্থন তার আছে। তাছাড়া আমরা পুরো অভ্যুত্থানটা ঘটাতে চাচ্ছি সিপাইদের নিয়ে, এটা স্পষ্ট যে আমাদের সঙ্গে তেমন কোন অফিসার নাই। এটা আমাদের একটা উইকনেস। মেজর জিয়াউদ্দিন ছিল, আনফরচুনেটলি এই মুহূর্তে সে ঢাকার বাইরে, গেছে খুলনা। আমাদের অফিসারদের সাপোর্ট দরকার। আর টপ অফিসার জিয়া যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন, তাহলে তো পুরো পরিস্থিতিটা ট্যাকল দেওয়া আমাদের জন্য অনেক ইজি হবে।

কাজী আরেফ বলেন : কিন্তু জিয়া আমাদের পক্ষে থাকবেন সেটা আপনি কতটা নিশ্চিত?

তাহের : এ মুহূর্তে জিয়ার অবস্থাটা চিন্তা করে দেখেন। তার তো ভবিষ্যত বলতে কিছু নাই। তিনি ইতোমধ্যে আর্মি থেকে রিজাইন করেছেন। বসে আছেন বন্দি হয়ে। তাকে মেরেও ফেলা হতে পারে যে কোনো সময়। আমরা তাকে মুক্ত করতে পারলে তাকে একরকম মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করা হবে। একজন মৃত্যু পথযাত্রী আর কতটা সাহস দেখাতে পারবে বলেন? জিয়াকে তো আমি চিনি, হি উইল বি আন্ডার আওয়ার ফুট। তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে প্রথমে আমাদের সব পার্টি লিডারদের কারামুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। পার্টি নেতারা যার যার এলাকায় গিয়ে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করা এখন জরুরি। আমাদের অবস্থাটা খানিকটা অর্গানাইজড হলে সুবিধামতো তাকে সরিয়ে দেওয়া যাবে।

পার্টি তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খান অনুমোদন করেন এই পরিকল্পনা। অন্য নেতাদেরও বোঝান যে এ মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো বিকল্প আর নাই।

তাহের বলেন :, তবে দাদা মিলিটারি অপারেশনের দায়িত্ব পুরো আমার, কিন্তু সিভিল মোবিলাইজেশনের দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে।

পার্টি নেতারা বলেন তারা তা করবেন। তেজগাঁও, পোস্তগোলা শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে জাসদের ভালো সংগঠন রয়েছে, আদমজী থেকেও শত শত শ্রমিককে জড়ো করা সম্ভব, বিশ্ববিদ্যালয়েও জাসদের শক্ত অবস্থান আছে, আছে ঢাকার গণবাহিনীর কয়েকশত সদস্য। ফলে এদের মাঠে নামাতে পারলে সহজেই নিশ্চিত হবে বিজয়। তারা তাহেরকে এগিয়ে যেতে বলেন।

এপর্যায়ে আলাপ ওঠে অভ্যুত্থান যদি সফল হয়, তবে বিজয়ী সিপাই জনতা কার নামে স্লোগান দেবে। অনেকেই বলেন, অবশ্যই তাহেরের নামে। কিন্তু তাহের আপত্তি করেন। বলেন, ক্যান্টনমেন্টে আমার নামে স্লোগান হলে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আমি আর্মি থেকে রিটায়ার্ড একজন মানুষ তাছাড়া সাধারণ মানুষও জাসদের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানে না। হঠাৎ করে আমার নাম চারদিকে উচ্চারিত হতে থাকলে আবার একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাবে মানুষ। জাসদের কোনো পাবলিক ফিগারের নামেই স্লোগান হওয়া উচিত।

কিন্তু জনগণের কাছে পরিচিত জাসদ নেতা জলিল, রব, শাহাজাহান সিরাজ তখন কারাগারে। আর সিরাজুল আলম খান নেপথ্যের মানুষ, জাসদের আনুষ্ঠানিক কোনো নেতা তিনি নন, সাধারণ লোকে তার নামই জানে না। ড. আখলাকও কোনো পাবলিক ফিগার নন। তাহের বলেন : সে ক্ষেত্রে জিয়ার নামে স্লোগান হলেই ভালো। উনি আর্মির লোক, তাকে আমরা মুক্ত করছি তাছাড়া সাধারণ মানুষের কাছেও তার একটা পরিচিতি আছে। অনেকেই তবুও বলেন অভ্যুত্থানের নেতা যেহেতু তাহের, তার নামেও স্লোগান হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় জিয়া এবং তাহেরের নামেই স্লোগান হবে তবে বিভ্রান্তি এড়াতে প্রধানত জিয়াকেই তুলে ধরা হবে জনগণের কাছে।

ঘটনাচক্র আর কাকতালীয় সমাপতনে দ্বিতীয়বারের মতো জিয়াউর রহমানের পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার এক আকস্মিক ঘটনায় এক অপরিচিত মেজর দেশ দেশান্তরে হয়ে উঠেছিলেন পরিচিত নাম। দ্বিতীয়বার কৌশলগত কারণে তার নামটিকেই সিপাহী বিদ্রোহের অভ্যুত্থানের মূল দৃশ্যপটে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তে আবারও জিয়াউর রহমানের জীবনের মোড় ফিরবার প্রেক্ষাপট রচিত হয়।

এলিফ্যান্ট রোডের নোয়াখালী সমিতির গলিতে যখন তার জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে জিয়া তখন সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করা এক সাধারণ নাগরিক যিনি পায়জামা পাঞ্জাবি পড়ে বন্দি হয়ে বসে আছেন তার বাড়িতে। ইতোমধ্যে তার জীবনরক্ষার বার্তা পাঠিয়ে তিনি ক্ষীণ আশা নিয়ে অপেক্ষা করছেন হয়তো তাহের তাকে উদ্ধার করবেন কখনো।

নানা পথ ঘুরে দেশের এক চরম ক্রান্তিকালে দেশের ইতিহাসের ঘুড়ির নাটাই এসে পড়েছে তাহেরের হাতে। আশরাফুন্নেসার তিন নম্বর সন্তান নান্টু, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো নান্টু, এক পা হারানো নান্টুর হাতে তখন বাংলাদেশের ভবিষ্যত।

খানিকটা বিহ্বল তাহের। এতবড় একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবার জন্য তিনি কি প্রস্তুত? আবার নিজেকেই প্রশ্ন করেন তিনি এমন একটি ঘটনার জন্যই কি নিজেকে প্রস্তুত করছেন না সারাটা জীবন? ঠাণ্ডা মাথায় পুরো অভ্যুত্থানের ছকটি তৈরি করতে বসেন তাহের। তার সঙ্গে ইনু, ভাই আনোয়ার, ইউসুফ। ভাই বাহার বেলালও আছে সহযোগী হিসেবে।

অভ্যুত্থানের দুটি পর্ব, একটি সামরিক, অন্যটি বেসামরিক। কথা হয়েছে তাহের তার নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্টে অভ্যুত্থানের সামরিক পর্বটি সফল করবার পর, জাসদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বেসামরিক পর্বে শামিল করবেন শ্রমিক, ছাত্র সাধারণ জনগণকে। তাহের অভ্যুত্থানের প্রধান অংশ সামরিক পর্বটি সুচারু পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কিন্তু বেসামরিক পর্বটির প্রস্তুতিতে দেখা দেয় নানা অনিশ্চয়তা। জাসদের যে জননেতারা শ্রমিক কৃষক, ছাত্রদের জমায়েত করতে পারবেন তারা অধিকাংশই কারাগারে। যারা বাইরে আছেন তারা সাধারণ মানুষকে এই অভ্যুত্থানে যুক্ত করবার জন্য খানিকটা সময় চেয়েছিলেন। হরতাল, গণজমায়েতের মধ্য দিয়ে মানুষকে এই অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু সে সুযোগ তারা পাননি। ঘটনা, সময়ের দাবিতে তারা বাধ্য হচ্ছেন অভ্যুত্থানে পক্ষে যেতে। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাহেরই। যদিও তারা সমর্থন জানিয়েছেন এই অভ্যুত্থানকে, পারতপক্ষে খানিকটা আধো মন নিয়েই দাঁড়িয়েছেন তাহেরের পেছনে। তারা দেখতে চাচ্ছেন তাহের কতদূর যান, কতটা সফল হন, তারপর মাঠে নামবেন তারা।

রহস্যময় মানুষ দলের চিন্তাগুরু দাদা সিরাজুল আলম খান তাহেরকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে চলে যান অজ্ঞাতস্থানে। যদিও সেখান থেকে তিনি যোগাযোগ রাখেন তাহেরের সঙ্গে কিন্তু মূল দৃশ্যপট থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন তিনি। ড. আখলাক যিনি বরাবরই এই অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করে এসেছেন, তিনি আশ্রয় নেন এক পীরের দরগায়, যেখানে সংকটাপন্ন সময়ে প্রায়ই আশ্রয় নিয়ে থাকেন তিনি। সবাই অভ্যুত্থানের ঘোরে ব্যস্ত থাকলেও সিরাজুল আলম খান এবং ড. আখলাকের অবস্থানটিকে বিশেষভাবে নজরে রাখেন তাহেরের ভাই সাঈদ। সাঈদ ইতোমধ্যে জেল থেকে বেরিয়েছেন এবং নিজেকে খানিকটা দূরে রেখেছেন এ ঘটনার।

অভ্যুত্থানের প্রথম সারির প্রথম মানুষটি তখন তাহের। ইউসুফ একফাঁকে জিজ্ঞাসা করে : তাহের, যদি জাসদের লিডাররা পিপল মোবিলাইজ করতে না পারে, তাহলে শুধু সিপাইরা কিন্তু এ ঘটনা সামলাতে পারবে না।

তাহের : আমি তা জানি ইউসুফ ভাই। কিন্তু সেটা তো তাদের দায়িত্ব। আমি যে দায়িত্বটা নিয়েছি সেটা থেকে তো আমার পেছানোর কোনো সুযোগ নাই।

সেদিন রাতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে চূড়ান্ত মিটিংয়ে বসেন তাহের। এবার মিটিং এলিফ্যন্ট রোডে নয় আবু ইউসুফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার সিদ্দীকির গুলশানের বাসায়। গুলশানের সেই বাড়িতে তখন কয়েকশত সৈন্য। সভা পরিচালনা করেন তাহের। সভার শুরুতে সকালে ক্যান্টনমেন্টে বিলি করা লিফলেটটি আবার পড়া হয়। তাহের সিপাইদের জানান পার্টির অনুমোদনক্রমে ৬ তারিখ দিবাগত রাত অর্থাৎ ৭ নভেম্বরই অভ্যুত্থান ঘটানো হবে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সৈনিকদের মধ্যে। তাহের সৈনিকদের বুঝিয়ে বলেন : তোমাদের মনে রাখতে হবে দেশের একটা সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে জনজীবনে শৃঙ্খলা আনবার জন্য সেনাবাহিনী এবং জনগণ দুই পক্ষ মিলে এই অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছে। তবে এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকবে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। অন্য সৈনিকদের সাথে সম্মিলিতভাবে অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে। এরপর আমরা একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করব। তাহের এক এক করে অভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট কর্মসূচি বর্ণনা করেন সিপাইদের কাছে :

১. রাত বরোটায় ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিপ্লবের সূচনা করা হবে।
২. জীবন বাঁচানোর অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া কাউকে গুলি করা যাবে না।
৩. খালেদ মোশাররফকে গ্রেপ্তার করা হবে।
৪. জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হবে এবং নিয়ে আসা হবে এলিফ্যান্ট রোডের বাসায়।
৫. সৈনিকেরা বিপ্লবের পক্ষে স্লোগান দিয়ে ট্রাকে ট্রাকে শহর প্রদক্ষিন করবে।.
৬. প্রতিটি ট্রাকে অন্তত একজন সৈনিক সংস্থার লোক থাকবে।
৭. ৭ তারিখ সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সৈনিকদের সমাবেশ হবে।
৮. বিপ্লবের পর বেতার টেলিভিশনে নেতাদের বক্তব্য প্রচার করা হবে।
৯. কোনো লুটপাটে অংশগ্রহণ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
১০. বিপ্লবের পর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ইউনিট এবং নেতাদের নিয়ে বিপ্লবী পরিষদ বা রেভ্যুলেশন কমান্ড কাউন্সিল গঠন করা হবে।
১১. সামরিক অফিসারদের বিপ্লব সমর্থন করার আহ্বান জানানো হবে। যারা করবে না তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।
১২. কর্নেল তাহের বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এরপর তাহের, ইনুকে সঙ্গে নিয়ে সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলো ভাগ করে দেন। এখানেও কৈশোরে শোনা ব্রিটিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অপারেশনের আদলে সৈনিক সংস্থার যারা অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করবেন তাদের ছয়টি দলে ভাগ করেন তাহের :

গ্রুপ এক—এই গ্রুপের নেতৃত্ব দেওয়া হয় নায়েব সুবেদার মাহবুবকে। এরাই সিগনাল দখল করে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করার মাধ্যমে বিদ্রোহ সূচনার প্রথম সংকেত দেবেন। এরপর সেন্ট্রাল অর্ডিনেন্স ডিপো (সিওডি) দখল করে অস্ত্রাগারের অস্ত্র নিজেদের হেফাজতে আনবেন। ওদিকে বিদ্রোহ সূচনা সংকেত শোনার পর সমর্থন সূচক গুলিবর্ষণ করবেন ফার্স্ট ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার, সেন্ডে ফিল্ড আর্টিলারি, ফার্স্ট ট্যাংকের সৈন্যরা।

গ্রুপ দুই : এই গ্রুপের নেতা হাবিলদার সুলতান। এদের দায়িত্ব বিদ্রোহ শুরু হবার পর সব অফিসারদের টু ফিল্ড আর্টিলারি অফিসে জড়ো করা। যাতে অফিসাররা নিজেরা মিলে আর কোনো ষড়যন্ত্র করতে না পারে।

গ্রুপ তিন : এ দলের নেতা নায়েব সুবেদার জালাল এবং জমির আলী। এদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রথম দল ব্যর্থ হলে তারা এগিয়ে আসবেন সাপ্লাই ব্যাটালিয়ান নিয়ে।

গ্রুপ চার : এই দলের নেতা হাবিলদার মুরাদ এবং হাবিলদার বারি। এদের দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

গ্রুপ পাঁচ : এই দলের নেতা হাবিলদার হাই। এদের দায়িত্ব জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করে এলিফ্যান্ট রোডে নিয়ে আসা।

গ্রুপ ছয় : এই দলের নেতা নায়েক সিদ্দীক এবং সরোয়ার। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে খালেদ মোশারফকে গ্রেপ্তার করা।

ভয় আর উত্তেজনার মিলিত অনুভূতি তখন সৈনিকদের। তারা জানেন তাদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে বলেন : জিয়াকে মুক্ত বা খালেদ মোশারফকে বন্দি করবার দরকার কি? দুজনকে মেরে ফেললেই তো হয়।

তাহের স্পষ্ট করে আবার বলেন : মনে রাখবে একটা গৃহযুদ্ধ ঠেকাবার জন্য আমরা এগিয়ে এসেছি, এসব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দেশকে আবার একটা যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না। তোমাদের আবার বলছি কাউকে হত্যা করা যাবে না। খালেদ মোশারফকে বন্দি করা এবং জিয়াকে মুক্ত করে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারার মধ্যেই আমাদের এই পুরো অভ্যুত্থানের সাফল্য নির্ভর করছে। সুতরাং খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে।

তাহের হাবিলদার হাইকে ইতোমধ্যে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে প্রস্তুত থাকবার কথা জানিয়ে দিতে বলেন। হাই শুরু থেকে জিয়াকে যারা

বন্দি করে রেখেছেন এবং তার আশপাশের সৈনিকদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। জিয়ার ব্যাটম্যান হাবিলদার সুলতান, ড্রাইভার কুদ্দুস মোল্লা, জিয়ার গার্ড ইন চার্জ সুবেদার রইসউদ্দীন এরা সবাই ৭১ এ হাইয়ের সহযোদ্ধা। হাবিলদার হাই জিয়ার দেহরক্ষীদের গিয়ে বলেন, স্যারকে জানিয়ে রাখবেন, যে কোনো মুহূর্তে আমরা তাকে মুক্ত করতে আসতে পারি, তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন।

ইনু বলেন : তাহের ভাই, একটা ব্যাপার আমাদের মনে রাখা দরকার, সৈনিকদের মধ্যে কিন্তু ফারুক, রশীদ, মোশতাকের পক্ষেরও অনেকে আছে।

তাহের বলেন : আমি জানি কিন্তু তারা খুবই ভ্যালনারেবল এখন। আপাতত ওদের শক্তিটাও থাকুক আমাদের সাথে। সময় মতো ওদের কিক আউট করতে হবে। তাছাড়া এরা যোগ দিলে বরং একটা বড় প্রতিপক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকবে।

সিদ্ধান্ত হয় অভ্যুত্থানের সময় তাহের ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থাকবেন। ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে না, ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বাইরে থেকে। এজন্য জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বলয় থেকে বের করে আনা খুবই জরুরি। অভ্যুত্থানের মূল কর্মকাণ্ড হবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এবং প্রয়োজনে সাহায্য নেওয়া হবে অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে থাকা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের।

ঢাকা স্টেডিয়ামে তখন চলছে আগা খান গোল্ড কাপ। ছয় তারিখ বিকেলে জাসদ কর্মীরা দল বেধে যান থাইলান্ডের পেনাং এবং ব্রাদার্স ইউনিয়নের খেলা দেখতে। এক ফাঁকে আগের দিনে ক্যান্টনমেন্টে ছাড়া লিফলেটটি এবার জাসদ কর্মীরা ছাড়েন স্টেডিয়ামে। খেলার মাঠে হঠাৎ উড়তে দেখা যায় হাজার হাজার ইস্তেহার। উড়ে আসা লিফলেট হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখে ফুটবলপ্রেমী মানুষেরা। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না লিফলেটের মর্মার্থ। অর্থ বুঝবার জন্য তাদের সবাইকে অপেক্ষা করতে হয় সেদিন মাঝরাত পর্যন্ত।

ঘুম নেই

মিটিংয়ের মাঝখানে একফাঁকে বেরিয়ে এসে বেলালকে বারান্দায় পান তাহের। বলেন : তোমার ভাবীকে ফোন করে বলে দাও আজকে রাতে আমি নারায়ণগঞ্জ ফিরব না। ইউসুফ ভাইয়ের বাসাতেই থাকব। আমি পরে ফোন করব ওকে।

লুৎফা নারায়ণগঞ্জের জান মঞ্জিলে উদ্বিগ্নতায় দিন কাটাচ্ছেন কয়দিন। বুঝতে পারছেন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। চিন্তিত, ব্যস্ত তাহের স্পষ্ট করে বলছে না কি ঘটছে। মাঝে শুধু একবার ফোন করে বলেছেন : আমাদের হয়তো একটা সিরিয়াস ডিসিশন নিতে হবে। আরেকটা কাউন্টার ক্যু ঘটবে হয়তো। চিন্তা করো না। আমি সেফ থাকব।

রাতে ফোন বেজে ওঠে। লুৎফা ফোন ধরলে বেলাল বলেন, ভাবী সেজ ভাইজান আজকে আসবেন না। মেজ ভাইজানের ওখনে থাকবে।

লুৎফা : কি হচ্ছে বলো তো।

বেলাল : আমি সব জানি না ভাবী। মিটিং চলতেছে।

লুৎফা : আর কারা আছে?

বেলা : পার্টি লিডাররা আছে আর সিপাইরা। সেজ ভাইজান আপনাকে পরে ফোন করবেন বলছে।

ফোন রেখে দেন লুৎফা। উৎকণ্ঠায় তার বুক কাঁপে। হয়তো একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে আজ। তাহের নিরাপদে থাকবে তো? ইতোমধ্যে মিশুরও জন্ম হয়েছে। তাহের যখন অভ্যুত্থানের আয়োজন করছেন, লুৎফা তখন সামলাচ্ছেন তিন শিশু নীতু, যীশু, মিশুকে। সেদিন তিনজনকেই তাড়াতাড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন লুৎফা। নিজে সামান্য একটু ভাত মুখে দিয়ে টেলিফোনের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। তন্দ্রায় ঢুলতে ঢুলতে মাঝে মাঝে হঠাৎ চমকে উঠে ফোনের দিকে তাকান, ফোন বাজল কি?

জিরো আওয়ার

আর দশটি রাতের মতোই আরও একটি রাত নামে ঢাকা শহরে। ঘড়ির কাঁটা মধ্য রাত পেরোয়, সেদিন ৭ই নভেম্বর। শহরের উপর দিয়ে বয়ে যায় নভেম্বরের ঠাণ্ডা হাওয়া। মানুষ লেপের নিচে গা ঢাকে। অবশ্য তারা জানে না, সেই ১৮৫৭ সালের পর প্রায় দেড়শত বছর পেরিয়ে আর কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে উপমহাদেশের দ্বিতীয় সিপাহী বিপ্লব।

এলিফ্যান্ট রোডের বারান্দায় আধো অন্ধকারে অধীর আগ্রহে বসে আছেন তাহের, ইনু, ইউসুফ, আনোয়ার। নীরব শুনশান চারদিকে। অপেক্ষা করছেন প্রথম ফায়ার ওপেন হবার খবরের জন্য। ক্যান্টনমেন্ট থেকে এলিফ্যান্ট রোড বেশ খানিকটা দূরে, তবু তারা আশা করছেন ফায়ার শুরু হলে রাতের নীরবতায় হয়তো তা শোনা যাবে সে শব্দ। হঠাৎ একটা গুম গুম আওয়াজ। চমকে উঠেন তারা, তবে কি শুরু হলো অভ্যুত্থান? না, পরে দেখো গেল পাশের বাড়ির লোকেরা তাদের পানির পাম্প ছেড়েছে, তারই শব্দ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন তারা। উদ্বিগ্নতায় কথা বলেন না কেউ। ইতোমধ্যে পরিকল্পনামাফিক প্রথম ফায়ারের সময় পার হয়ে গেছে। বাড়ির বাইরে মূল রাস্তায় পায়চারী করছে ঢাকা নগরীর গণবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াড—বাহার, বেলাল, মুশতাক, বাবুল, সবুজ, বাচ্চু, মাসুদ, হারুন প্রমুখেরা।

প্রথম ফায়ারটি ওপেন করার কথা যে নায়েব সুবেদার মাহবুবের তিনি ঐ মুহূর্তে এক অপ্রত্যাশিত ঝামেলায় জড়িয়ে গেছেন। আর্মি হেডকোয়ার্টারের কাছে লাল মসজিদের পাশে জেসিওদের কোয়ার্টারে মাহবুবের বাসা। সারাদিন বাইরেই মিটিংয়ের পর মিটিং করে কাটিয়েছেন তিনি। অপারেশনে যাবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে

দেখা করতে রওনা দিলে বাসার কাছে তার পথ আগলে দাঁড়ান সুবেদার নুরুন্নবী। নুরুন্নবী মাহবুবের প্রতিবেশী। অবাক হন মাহবুব : কি ব্যাপার নুরুন্নবী ভাই?

নুরুন্নবী বলেন : মাহবুব ভাই, আপনাদের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেছে। জেনারেল খালেদ অর্ডার দিয়েছেন আপনাকে এরেস্ট করার। আমি আপনাকে এরেস্ট করতে এসেছি।

মুহূর্তের জন্য খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়েন মাহবুব। কিন্তু তিনি জানেন যে তার ওপরই নির্ভর করছে পুরো বিদ্রোহ। সবাই অপেক্ষা করে থাকবেন তার ওপেনিং ফায়ারের জন্য। যে কোনো উপায়ে এ অবস্থাকে অতিক্রম করতে হবে তার। মাহবুব বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। বলেন : অনেক দেরি করে ফেলেছেন নুরুন্নবী ভাই। এখন আমাকে এরেস্ট করেও কোনো লাভ হবে না, সারা ক্যান্টনমেন্টে আমাদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোক এখন পজিশন নিয়ে আছে। একটু পরেই তারা দখল করে নেবে ক্যান্টনমেন্ট। আপনাদের আর কয়জন পারবেন না আমাদের সাথে? বিপ্লব হবেই। আর বিপ্লব সফল হলে আপনার পরিণতি কি হবে ভেবে দেখছেন? আপনি খালেদ মোশাররফের সঙ্গে গেছেন, তার দলে থাকলে আপনি সুবেদার সুবেদারই থাকবেন। বিপ্লব করে আমরা সিপাই অফিসারের পার্থক্য তুলে দেবো। আপনি আমাদের সঙ্গে আসেন।

মাহবুবের আত্মবিশ্বাস দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন নুরুন্নবী। কিছু না বলে পথ ছেড়ে দেন মাহবুবের। মাহবুব দ্রুত বাসায় গিয়ে দু মুঠো ভাত খেয়ে ইউনিফর্ম পড়েন, ঘরে রাখা কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেন, স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যান অন্ধকারে। রাত এগারোটায় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তার দেখা করার কথা ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারের সৈনিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখেন কেউ নেই। অবাক হয়ে যান মাহবুব। এসময় সৈনিক সংস্থার এক সদস্য তাকে জানান যে ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারের সৈন্যদের খালেদের লোকেরা এসে বন্দি করে নিয়ে গেছেন এবং তাদের তৃতীয় গ্রুপের নেতা নায়েব সুবেদার জালালকেও এরেস্ট করা হয়েছে। কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না মাহবুব। এসময় একজন হাবিলদার খোঁজ নিয়ে আসেন যে ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ারের অধিকাংশ সিপাই বন্দি হলেও ১৭ জন অস্ত্র নিয়ে পাশের জঙ্গলে পালিয়ে আছেন। মাহবুব সেই হাবিলদারসহ পালিয়ে থাকা সৈন্যদের নিয়েই বিদ্রোহ শুরু করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঐ ছোট দল নিয়ে আচমকা সেন্ট্রাল অর্ডিনেন্স ডিপো (সি ওডি) আক্রমণ করেন। সিওডির নাইট কমান্ডার তখনও অভ্যুত্থান বিষয়ে কিছু জানেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় নাইট কমান্ডার আত্মসমর্পণ করেন। তাছাড়া সিওডি পাহারারত ব্যাটালিয়ানের অধিকাংশ সিপাইই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য। তারা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন এই আক্রমণের জন্য, ফলে মাহবুব সেখানে কোনো প্রতিরোধের মুখোমুখি হন না। অস্ত্রাগার খুলে দেন সিপাইরা। অস্ত্রাগার ভরা এল এমজি। বিদ্রোহী সৈন্যরা যার যার মতো হাতে তুলে নেন হাতিয়ার।

কথা ছিল অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে আর্মি হেডকোয়ার্টার দখল করার পর ফায়ার ওপেন করার কিন্তু ইতোমধ্যেই দেরি হয়ে যাওয়াতে মাহবুব সিওডিতেই ফায়ার ওপেন করেন। তখন ৭ নভেম্বর রাত ১২টা ৩০ মিনিট। প্রথম ফায়ারটি দেরি হওয়াতে শুরুতে সৈনিক সংস্থার বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমন্বয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সৈনিক সংস্থার লোকদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি এবং ভীতিরও সঞ্চার হয়। কিন্তু মাহবুবের ফায়ার শুনবার সাথে সাথে, আগে থেকে প্রস্তুত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার শত শত সৈনিক ফায়ার করতে করতে এগিয়ে যেতে শুরু করে আর্মি হেডকোয়ার্টারের দিকে। সারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাজার হাজার বুলেট ছুটে যেতে থাকে আকাশে। চারদিকে ফায়ার ফায়ার চিৎকার। কিছুক্ষণ পর আর্টিলারির কামান ফায়ার ওপেন করে, বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাঙ্কগুলোও চালু হয়ে যায়। ঘুম থেকে জেগে ওঠে পুরো ক্যান্টনমেন্ট। চারদিকে স্লোগান সিপাই সিপাই ভাই ভাই, সিপাই বিপ্লব লাল সালাম, কর্নেল তহের লাল সালাম, জেনারেল জিয়া লাল সালাম।

সিপাই সিপাই ভাই ভাই

রাত একটার দিকে ক্যান্টনমেন্টের চারদিক থেকে সিপাইরা এসে আর্মি হেডকোয়ার্টার দখল করেন। কথামতো অপারেশনের দু নম্বর দল বিভিন্ন মেস, কোয়ার্টার থেকে অফিসারদের এনে জড়ো করেন টু ফিল্ড আর্টিলারিতে। অনেক অফিসাররাই সিপাইদের মেসের দিকে আসতে দেখে ভড়কে যান, এদিক ওদিক ছুটে পালান, বাকিরা রাতের পোশাকে, কেউ সেন্ডেল পায়ে, কেউ খালি পায়ে আতঙ্কিত মুখে অনুসরণ করেন সিপাইদের। বুঝে উঠতে পারেন না ঠিক কি হচ্ছে।

অফিসারদের টু ফিল্ড আর্টিলারির হল রুমে বসিয়ে রেখে, তাদের সামনেই সিপাইরা একে অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি করে। এক সৈনিক জনৈক কর্নেলকে বলেন, স্যার আজ থেকে সিপাই আর অফিসারের মধ্যে আর কোনো র‍্যাংকের পার্থক্য নাই। আমরা সব সমান।

কর্নেল কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, অভূতপূর্ব ঘটনায় তারা হতবিহ্বল। যারা তাদের হুকুমের দাস, অতি অধস্তন এইসব কর্মচারী যাদের দিকে তারা ভালোমতো চোখ তুলে তাকানওনি, যারা তাদের জুতা পালিশ করে দেয় তারা কিনা তুখোর বাঘের মতো ঘিরে রেখেছে তাদের আর তারা পরাক্রমশালী অফিসাররা হরিনশাবকের মতো কাঁপছে।

সিপাইদের একটা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার খবর খালেদ মোশারফ পেলেও অভ্যুত্থানের ব্যাপকতা বিষয়ে তার কোনো ধারণা ছিল না। বিদ্রোহের আভাষ পেয়ে ইতোমধ্যেই ক্যান্টনমেন্টে তার নির্ধারিত মিটিং বাতিল করে দিয়েছিলেন

তিনি। বঙ্গভবন থেকে ফোন করে তিনি জানতে পারেন যে ক্যান্টনমেন্টের অধিকাংশ সৈনিক বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে, এমনকি তিনি যে ইউনিটে বসে তার অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছেন সেই চতুর্থ বেঙ্গলও।

খেলা ঘুরে যাচ্ছে আবার। ক্যালাইডোস্কোপের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে যেন বদলে যাচ্ছে রাজনীতির নকশা। এবার কোনো মেজর, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল নন, এবার ঘটনার নায়ক সাধারণ সিপাই, হাবিলদার, সুবেদাররা। ঘটনা কোনোদিকে মোড় নিচ্ছে বুঝে উঠতে পারেন না খালেদ। তবে বিপদের আঁচ করে তিনি বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। চলে যান রক্ষীবাহিনী প্রধান শুভাকাঙ্ক্ষী ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের বাসায়, সেখানে সামরিক পোশাক পাল্টে নেন তিনি এবং তারপর যান তার এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করেন তিনি। বিস্ময়ের সাথে জানতে পারেন যে ক্যান্টনমেন্ট পুরোপুরি সিপাইদের দখলে। হিসাব মেলে না খালেদের। তিনি টের পেয়ে যান যে এ বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। তিনি বরং চলে যান শেরে বাংলা নগরে অবস্থান করা দশম বেঙ্গলে। এটি তার বিশ্বস্থ ইউনিট, এখান থেকেই তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। তার সঙ্গে কর্নেল হুদা আর হায়দার। তার অভ্যুত্থানের সেকেন্ড ইন কমান্ড শাফায়াত জামিল তখনও বঙ্গভবনে।

ওদিকে খালেদ মোশারফকে বন্দি করবার উদ্দেশে যাওয়া সৈনিক সংস্থার দলটি নির্ধারিত স্থানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রওনা দেন টু ফিল্ড আর্টিলারিতে। আকাশে অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকেন তারা, স্লোগান দিতে থাকেন মুহুর্মুহু। নিজের বাড়ি থেকে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার কর্নেল হামিদ। তিনি রাতের পোশাকেই আধো অন্ধকারে নেমে পড়েন সৈনিকদের বিজয় মিছিলে। কিছুক্ষণ পর স্লোগান ওঠে সিপাই সিপাই ভাই ভাই অফিসারের রক্ত চাই। ভয় পেয়ে যান কর্নেল হামিদ। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান।

রাতের ঘোষণা

ইউসুফের বাড়ির টেলিফোন বেজে ওঠে। তাহের, ইনু , ইউসুফ ধড়মড়িয়ে উঠেন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য ফোন করে জানান সিপাইরা আর্মি হেডকোয়ার্টার দখল করেছে, অফিসারদের টু ফিল্ড আর্টিলারিতে আনা হয়েছে এবং একটি দল গেছে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করতে। তাহের তার ক্রাচটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যান রেলিংয়ের দিকে, যেন চেষ্টা করেন সৈনিকদের ফায়ারে কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা। উত্তেজিত তাহের। ইনু বেরিয়ে পড়েন

রাস্তায়। অভ্যুত্থান শেষে সৈনিকদের আসবার কথা এলিফ্যান্ট রোডে। ইনু এগিয়ে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন তারা আসছে কিনা। কিছুক্ষণ পর আরেকটি ফোন আসে, সৈনিকরা জানান তারা রেডিও স্টেশন দখল করেছেন। একের পর এক অভ্যুত্থানের টার্গেট অর্জিত হচ্ছে বলে আনন্দিত হয়ে ওঠেন তাহের। অভ্যুত্থানের এরপরের গুরুত্পূর্ণ মিশন জিয়ার মুক্তি। ইউসুফ সে খবরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন টেলিফোনের পাশে। তাহের আনোয়ারকে বলেন, গণবাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দিতে যাতে তারা মাইকিং করে শহরের লোকদের বিপ্লবের খবর জানায় এবং আগামীকাল সকালের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং শহীদ মিনারের জনসভায় যোগ দেবার আহ্বান জানায়। তাহের আনোয়ারকে আরও বলেন এ বি এম মাহমুদের বাসার টেলিফোন থেকে সিরাজুল আলম খানকে খবর জানাতে। আনোয়ার ফোন করে গোপন আস্তানায় থাকা সিরাজুল আলম খানকে অভ্যুত্থানের সাফল্যের খবর জানান। সিরাজুল আলম বলেন, বিপ্লবের পক্ষে রেডিওতে একটি ঘোষণা দিয়ে দিতে। টেলিফোনেই তিনি রেডিওতে প্রচারের জন্য বক্তব্যটি বলেন এবং আনোয়ার তা টুকে নেন।

আনোয়ার, গণকণ্ঠের সাংবাদিক শামসুদ্দিন পেয়ারাকে সঙ্গে করে তার কমলা রঙের মটোর সাইকেলটি নিয়ে রাতের অন্ধকারে রওনা দেন রেডিও স্টেশনের দিকে। যাবার আগে রাস্তায় টহল দেওয়া গণবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডের নেতা ভাই বাহার আর বেলালকে বলেন বিপ্লবের পক্ষে মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করতে। তাহেরের ড্রেজার সংস্থার জীপটি নিয়ে বেলাল, বাহার, মুশতাক, সবুজ এবং অন্যরা বেরিয়ে পড়েন মাইকের খোঁজে। মাঝরাতে মাইকের দোকানদারকে ঘুম থেকে তোলেন তারা।

আনোয়ার এবং শামসুদ্দিন শাহবাগে ডায়াবেটিক হাসপাতালের পাশে রেডিও স্টেশন গিয়ে দেখেন গেটের সামনে ট্যাঙ্ক, রাস্তা জুড়ে উল্লসিত সৈনিকরা। আকাশে অটোমেটিক ফায়ার করছেন কেউ কেউ। সৈন্যরা আনোয়ারকে চেনেন। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নিয়মিত রাজনৈতিক ক্লাস নিয়েছেন তিনি। ফলে আনোয়ারকে দেখে রেডিও স্টেশনের গেট খুলে দেন সিপাইরা। বিপ্লবের ঘোষণাটি তখন তাদের হতে, কিন্তু শামসুদ্দিন বা আনোয়ার কি করে রেডিওতে ঘোষণা দিতে হয় জানেন না। রেডিও স্টেশনে ঘুমাচ্ছিলেন এক বেতার কর্মচারী, তিনি জানান রেডিওর চিফ টেকনিশিয়ান থাকেন কাছেই। তাকে ডেকে আনলেই হবে। কয়েকজন সিপাইসহ সেই কর্মচারী গিয়ে বাসা থেকে ধরে আনেন সেই টেকনিশিয়ানকে। টেকনিশিয়ান এসে অন এয়ার চালু করেন। শামসুদ্দিনকে ঘোষণাটি পড়তে বলেন আরোয়ার। গভীর রাতে ইথারে ভেসে আসে শামসুদ্দিন পেয়ারার কণ্ঠ : 'বাংলাদেশের বীর বিপ্লবী জনগণ, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, ও

গণবাহিনীর যৌথ নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর জোয়ানরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। আপনারা শান্ত থাকুন। গণবাহিনীর সদস্যরা স্ব স্ব এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুন এবং আঞ্চলিক কমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন... ।'

তিন মাস কালের ব্যবধানে বাংলাদেশে তিন তিনটি বিপরীতমুখী অভ্যুত্থানের ডামাডোল।

মুক্ত সেনাপ্রধান

জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করবার দায়িত্ব ছিল হাবিলাদার হাইয়ের। তিনি ২০/৩০ জন সিপাই নিয়ে জিয়ার বাসভবনে যান। তারা শ্লোগান দিতে দিতে আসেন 'কর্নেল তাহের লাল সালাম, জেনারেল জিয়া লাল সালাম'। ক্যান্টনমেন্টের পারিস্থিতি এমন যে কে কখন কাকে আক্রমণ করবে, হত্যা করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। খালেদ মোশারফের নির্দেশে যে ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ জিয়াকে বন্দি করে রেখেছিলেন, এতগুলো সৈনিককে শ্লোগান দিতে দিতে আসতে দেখে ভয় পেয়ে যান তিনি। দ্রুত সরে পড়েন সেখান থেকে। জিয়াকে বন্দি করে রাখা গার্ড দলের মধ্যেও তখন আছে সৈনিক সংস্থার লোক। ফলে বিনা বাধায় হাবিলদার হাই পৌঁছে যান জিয়ার বাসভবনে। ঘরের ভেতরে সাদা পায়জামা, পাঞ্জাবি পড়ে বসে আছেন জিয়া। হাবিলদার হাই তাকে বলেন : কোনো চিন্তা করবেন না স্যার, কর্নেল তাহের আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য। সৈনিক সংস্থা এবং জাসদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে মুক্ত করতে এসেছি।।

গভীর রাতে টেলিফোনের মাধ্যমে নিজের জীবন রক্ষার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাহের যে বাস্তবিকই তাঁকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন তা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন জেনারেল জিয়া। তিনি হাবিলদার হাইকে আলিঙ্গন করে বলেন : তাহের কোথায়?

হাই বলেন : কার্নেল তাহের এলিফ্যান্ট রোডে তার ভাইয়ের বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। আপনাকে তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন আমাদের। আপনি আমাদের সঙ্গে চলেন।

খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন জিয়া। কিন্তু চারপাশে তাকে ঘিরে আছে সিপাইরা, শ্লোগান দিচ্ছে জেনারেল জিয়া লাল সালাম, কর্নেল তাহের লাল সালাম। তিনি বেশিক্ষণ দোদুল্যমান থাকবার সুযোগ পান না। উঠে পড়েন সৈনিকদের আনা গাড়িতে। গাড়ি কিছুদূর এগোতেই সামনে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ পান তারা। সৈনিকরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এটি তাদের পক্ষের না বিপক্ষের গোলাগুলি। তখন গোলমেলে সময়। এসময় ফারুক, রশীদের এক

সহযোগী মেজর মহিউদ্দীন এসে জিয়াকে বহনকারী গাড়িটিকে থামান। তিনি বলেন খালেদ মোশারফের দলের সৈন্যরা আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে আসছে,এখন ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যাওয়া মোটেও নিরাপদ না। জিয়াকে টু ফিল্ড আর্টিলারিতে নিয়ে যাবার ব্যাপারে মেজর মহিউদ্দীন খুব তৎপর হয়ে উঠেন। সিপাইরা খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। নিরাপত্তার কথা ভেবে শেষে তারা তাকে টু ফিল্ড আর্টিলারিতেই নিয়ে আসেন। সেখানে আতঙ্কিত বসে আছেন আরও অফিসার। জিয়াকে টু ফিল্ড আর্টিলারিতে দেখে অফিসারদের মধ্যে একটা স্বস্তি নেমে আসে। জিয়াও সেখানে গিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। এতজন সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে এতক্ষণ ঠিক নিরাপদ বোধ করছিলেন না তিনি। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন না তিনি সত্যিই মুক্ত কিনা। মেজর মহিউদ্দীন এবার গিয়ে দাঁড়ান জিয়ার পাশে। বলেন : আপনার স্যার এখন ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যাওয়ার কোনো দরকার নাই। সে মুহূর্তে বোঝা না গেলেও পরবর্তীতে অনেকেই সন্দেহ করেন জেনারেল জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বের হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করতে মেজর মহিউদ্দীনই রাস্তায় গোলাগুলির ঐ নাটক সাজিয়েছিলেন।

জিয়াও ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছেন তার মুক্ত অবস্থার সাথে। তিনিও আর ক্যান্টনমেন্টের বাইরের কোনো অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ে যেতে চাইলেন না। সৈনিকদের তিনি নাম ধরে কয়েকজন সিনিয়র অফিসারদের ডেকে আনতে বলেন। সৈনিকরা গিয়ে দ্রুত ডেকে আনেন মীর শওকত আলী, আবদুর রহমান, নুরুদ্দিন প্রমুখ কর্নেল এবং ব্রিগেডিয়ার পর্যায়ের অফিসারদের। সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে বসে জিয়া বেশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেন। জেনারেল জিয়া এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের দেখে এতক্ষণ সিপাই, হাবিলদার পরিবেষ্টিত, আতঙ্কিত অফিসাররাও ক্রমশ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে থাকেন। রাত দুটো বাজে তখন, ক্যান্টনমেন্ট সরগরম। জিয়া বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যদের বলেন : তোমরা বরং কর্নেল তাহেরকে এখানে নিয়ে আস। তাহের আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে আমার ভাই। আমি এখানেই তার সঙ্গে মিলিত হতে চাই।

বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার লোকেরা। তারা জানেন যে তাহের এবং জিয়া পরস্পর বন্ধু। তারা এতক্ষণ তাহের, জিয়া দুজনের নামেই স্লোগান দিয়ে এসেছে। ফলে জিয়া যখন তাহেরকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসতে বললেন তখন তারা ব্যাপারটিকে একটি স্বাভাবিক নির্দেশ হিসেবেই বিবেচনা করেন। তাদের সঙ্গে কোনো অফিসার নেই। তাহের শুরু থেকেই কোনো অফিসারদের অভ্যুত্থানের যুক্ত করেননি। তাদের একমাত্র অফিসার শুভাকাঙ্ক্ষী মেজর জিয়াউদ্দীন দুর্ভাগ্যজনকভাবে অফিসের কাজে তখন ছিলেন ঢাকার বাইরে। ফলে শুধু সিপাইদের পক্ষে তা তারা যত বিপ্লবীই হোন না কেন, বহু বছরের অভ্যস্থতায়

কোনো অফিসারের নির্দেশ অমান্য করা হয়ে ওঠে অসম্ভব আর সে নির্দেশ যদি আসে চিফ অব আর্মি থেকে তাহলে তো কথাই নেই।

জিয়ার নির্দেশ পেয়ে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য নায়েক সিদ্দিকুর রহমান তিন ট্রাক সৈন্য নিয়ে চলে যান এলিফ্যান্ট রোডে তাহেরকে নিয়ে আসবার জন্য। আর্মি হেডকোয়ার্টার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার পর সুবেদার মাহবুব ইতোমধ্যে রেডিও স্টেশন দখল করেছেন। জিয়াকে মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করে হাবিলদার হাইও গেছেন রেডিও অফিসের পরিস্থিতি বুঝতে।

অন্যদিকে সৈনিক সংস্থার আরেকটি দল চলে যান ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। তারা বন্দি সব জাসদ নেতাদের বেরিয়ে আসতে বলেন। ট্রাক বোঝাই অসংখ্য সৈন্যদের দেখে জেলের নিরাপত্তাকর্মীরাও বিনা বাধায় খুলে দেয় জেলের গেট। কিন্তু জাসদ নেতারা বিভ্রান্ত। তারা এধরনের কোনো অভ্যুত্থানের খবর আগে পাননি। তারা ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিলেন না এটি কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ কিনা। কিছুদিন আগেই জেলে বীভৎসভাবে নিহত হওয়া চার নেতার স্মৃতি তখনও তাদের মনে উজ্জ্বল। জেল থেকে জাসদ নেতাদের মধ্যে শুধু এম এ আউয়াল, মোহাম্মদ শাহাজাহান এবং মির্জা সুলতান রাজা বেরিয়ে আসেন। মোহাম্মদ শাহাজাহান এবং মির্জা সুলতান রাজা এলিফ্যান্ট রোডে তাহেরর সঙ্গে দেখা করতে রওনা দিলেও, এম এ আউয়াল ফিরে যান তার বাড়িতে।

চোরাগোপ্তা তৎপরতা

মাঝরাতে বিপ্লবের প্রথম ফায়ার ওপেন হবার পর ঘণ্টা দুয়েক কেটেছে। সৈনিকরা প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেছেন। সেনাবাহিনী তখন কার্যত তাদের দখলে। খালেদ মোশারফ পলাতক। বন্দি জিয়া মুক্ত। বিপ্লবের নেতা কর্নেল তাহের কিছুক্ষণের মধ্যেই আবির্ভূত হবেন দৃশ্যপটে। এই স্বল্পসময়ের মধ্যে তৎপর হয়ে উঠেন একজন। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাময়িক জয়ী এবং সাম্প্রতিক পরাজিত খন্দকার মোশতাক।

এ ধরনের বিদ্রোহের একটা আভাস সবসময় বাতাসে ছিল এবং সিপাই অভ্যুত্থান ঘটবার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এর খবর পেয়ে যান মোশতাক। নিশ্চিত পরাজিতের দলেই অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছেন জেনে এই ঘোলাটে অবস্থার সুযোগ নেবার জন্য তিনি আবারও তার পুরনো পথই ধরেন, ষড়যন্ত্রের পথ। ষড়যন্ত্রে পেশাদারী দক্ষতা রয়েছে তার।

এসময় তিনটি কাজ করেন তিনি। এক, সিপাইদের মধ্যে ফারুক, রশীদ অধীনস্ত, প্রকারান্তরে মোশতাকের অনুগত যে দলটি সাময়িকভাবে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থায় যোগ দিয়েছিল তাদের একটি অংশকে তিনি চোরাগোপ্তা ব্যবহার শুরু

করেন। একটি দলকে মোশতাক পাঠান জেলে তার অনুগত মন্ত্রী ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম, তাহের উদ্দীন ঠাকুর, যাদের খালেদ মোশারফ বন্দি করেছিল তাদের মুক্ত করে আনতে। জাসদের নেতারা বেরিয়ে না এলেও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ছদ্মবেশে মোশতাকের লোক জেল থেকে বের করে নিয়ে আসেন তাদের দলীয় নেতাদের। দুই, দ্রুত তার অনুগত লোকজন দিয়ে তিনি আশপাশের মাদ্রাসা থেকে কিছু ছাত্র যোগাড় করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের সরকারি অফিসগুলোতে তখনও অনেক জায়গায় সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মোশতাকের ছবি, সেরকম কিছু ছবি সংগ্রহ করেন। মোশতাকের ছবিসহ ঐ মাদ্রাসার ছাত্রদের তিনি উঠিয়ে দেন তার অনুগত সৈনিকদের ট্রাকে। সৈনিকদের ট্রাকে টুপি পড়া কিছু বালক মোশতাকের ছবি হাতে নিয়ে স্লোগান দেয়, 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহ আকবার।' তিন. তিনি নিজে রওনা দেন রেডিও স্টেশনের দিকে, সেখানে একটি ভাষণ দিয়ে ঘটনা নিজের অনুকূলে আনবার পাঁয়তারায়।

ব্লান্ডার

ওদিকে এলিফ্যান্ট রোডে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাহের, ইউসুফ, ইনু কখন সৈন্যরা সেখানে নিয়ে আসবেন জেনারেল জিয়াকে। এরপর তারা শুরু করবেন অভ্যুত্থানের পরবর্তী পর্ব। কিছুক্ষণ পর হাবিলদার সিদ্দীক ট্রাক বোঝাই সিপাইদের নিয়ে হাজির হন এলিফেন্ট রোডের বাসায়। উদ্‌গ্রীব তাহের ক্রাচে ভর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করেন : জিয়া কোথায়?

হাবিলদার সিদ্দীক বলেন : উনি আপনাকে টু ফিল্ডে যেতে বলেছেন।

ভীষণ ক্ষেপে যান তাহের : তার মানে কি? তোমাদের না স্ট্রিক্টলি ইন্সট্রাকশন দিলাম জিয়াকে যেভাবে হোক এখানে আনতে হবে।

হাবিলদার সিদ্দীক বলেন : আমরা স্যার ভাবলাম, উনি তো আপনারই মানুষ, উনি যখন বললেন তখন আমাদের তাই করা উচিত।

তাহের মুখ ঘুরিয়ে ক্রাচে শব্দ তুলে পায়চারী করেন কতক্ষণ। ইনুকে বলেন, এরা একটা রিয়েল ব্লান্ডার করে ফেলল। আমি চেয়েছিলাম আমাদের বিপ্লবের কেন্দ্রটাকে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে নিয়ে আসতে। এখন জিয়া যদি ক্যান্টনমেন্টে থাকে তাহলে তো সে তার পুরো এনফ্লুয়েন্সটা ওখানে কাজে লাগাবে। আমাদের এখনই ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া দরকার।

জেনারেল জিয়ার ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে না আসার ঘটনার এই ছোট্ট মোচড় বস্তুত বদলে দেয় বাংলাদেশের পরবর্তী ইতিহাস।

ইউসুফ তার নিজস্ব ভক্সওয়াগন গাড়িটি বের করেন। পা নেই বলে তাহের গাড়ি ড্রাইভ করতে পারেন না। বাইরে কোথাও যাবার প্রয়োজন হলেই ইউসুফ

তার গাড়িতে তাকে নিয়ে যান বিভিন্ন জায়গায়। তাহের, ইনু, ইউসুফ রওনা দেন ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

বেলাল, বাহার, মোশতাক তাহেরের অফিসের জীপটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন মাইকিংয়ে। এর আগে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ গণবাহিনীর ইউনিটগুলোকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছেন।

ক্যান্টনমেন্টে যাওয়ার পথে তাহের মাইকে শুনতে পান বাহারের কণ্ঠ। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে শোনা যায় : আজ মধ্যরাতে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, বিপ্লবী গণবাহিনী ও ছাত্র যুবক শ্রমিক সম্মিলিতভাবে দেশে ষড়যন্ত্রকারীদের উৎখাত করে বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছে। সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান, এই অভ্যুত্থানী শক্তির সাথে রাজপথে সংগঠিতভাবে বেরিয়ে এসে একাত্মতা ঘোষণা করুন। আজ সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীর সকল সৈনিকদের উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এখানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং কর্নেল তাহের বক্তৃতা করবেন। পাশাপাশি ছাত্র ও জনসাধারণকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সেখানে মেজর জলিল, আবদুর রবসহ সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেবেন ...

তারা কর্নেল তাহেরের নামে স্লোগান দেয়। তাহের সে মুহূর্তে জিয়ার অবস্থান নিয়ে উৎকণ্ঠিত।

জান মঞ্জিল

বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে নারায়ণগঞ্জের জান মঞ্জিলে টেলিফোনের পাশে উৎকণ্ঠায় বসে তন্দ্রায় ঢুলছিলেন লুৎফা। ফোন বেজে ওঠে হঠাৎ। চমকে উঠে রিসিভার তোলেন লুৎফা। এক পরিচিত আত্মীয়ের কণ্ঠ, তিনি লুৎফাকে জিজ্ঞাসা করেন : চারদিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর কর্নেল তাহেরের নামে স্লোগান হচ্ছে, কী ব্যাপার?

লুৎফা বলেন, আমিও তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

আত্মীয় জিজ্ঞাসা করেন : তাহের ভাই কোথায়।

হঠাৎ কি বলবে লুৎফা বুঝতে পারেন না। আমতা আমতা করে বলেন : তাহের তো অসুস্থ, ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর আবার টেলিফোন। এবার বাহারের গলা : ভাবী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, গণবাহিনী আর জাসদ, তাহের ভাইয়ের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করেছে। এতক্ষণ শহরে মাইকিং করেছি আমি। বেলাল এখনও করছে। আনোয়ার ভাই গেছেন রেডিও স্টেশনে ঘোষণা দিতে। তাহের ভাই, ইউসুফ ভাই, ইনু ভাইকে

নিয়ে গেছেন ক্যান্টনমেন্ট। আজ ভোরেই তাহের ভাই আর জেনারেল জিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

লুৎফা জানে সেই কবে থেকে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে তাহের। কত বছর ধরে নিজেকে প্রস্তুত করছে সে। এ মুহূর্তে নিশ্চয়ই বুকভরা আনন্দ তাহেরের। তাঁর এই চরম আনন্দের সময়টিতে লুৎফা তাঁর কাছে নেই ভেবে বিষণ্ন বোধ করে সে। কিন্তু একটা অজানা আতঙ্কও ঘিরে থাকে তাকে। এত বড় একটা ঘটনা শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পারবে তো? কোথায় গিয়ে ঠেকবে ঘটনা?

লুৎফা আবারও অবাক হয়ে ভাবেন তাহেরের সবকটা ভাই এমন জটিল মুহূর্তে কেমন আগলে আছে তাকে। যেন সব ভাইরা মিলেই বদলে দিচ্ছে ইতিহাস।

ফসকে যাওয়া মাছ

ইউসুফের ভক্সওয়াগনে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওনা দিয়েছেন তাহের, ইনু। পথে পথে তারা দেখতে পান যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো সিপাইদের ট্রাক। স্লোগান দিচ্ছেন তারা, গুলি ছুড়ছেন আকাশে। ঢাকায় এক অস্বাভাবিক রাত। হঠাৎ সামনের একটা ট্রাক আচমকা ব্রেক করায় তাদের গাড়িটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গাড়িটি একরকম অকেজোই হয়ে পড়ে। তারা তাড়াতাড়ি সৈনিকদের একটি ট্রাকে উঠে পড়েন তারা। ক্রাচ নিয়ে ট্রাকে উঠতে সমস্যা হচ্ছিল তাহেরের। সিপাইরা তাকে কোলে করে ট্রাকে তোলেন।

টু ফিল্ড আর্টিলারিতে পৌঁছালে সৈনিক সংস্থার লোকরা তাহেরকে কোলে করে ট্রাক থেকে নামান। তাহেরের ক্রাচ ছিটকে পড়ে অন্যদিকে। তারা স্লোগান দেন কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ, জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ। কাঁধে করে তাহেরকে তারা নিয়ে আসেন জিয়ার সামনে। এক সিপাই পেছনে ফেলে আসা ক্রাচটি হাতে তুলে দেন তাহেরের। জিয়া সেখানে বসে আছেন অন্যান্য সিনিয়র অফিসার পরিবেষ্টিত হয়ে। তাহের তার ক্রাচটি ভর করে দাঁড়ালে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে আসেন জিয়া। কোলাকুলি করেন তাহেরের সঙ্গে, বলেন : তাহের ইউ সেভড মাই লাইফ, থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ।

উপস্থিত সবাই এই নাটকীয় দৃশ্য দেখেন।

তাহের বলেন : আমি কিছুই করিনি, করেছে এই সিপাইরা। অল ক্রেডিট গোজ টু দেম।

জিয়া : লেট মী নো হোয়াট নিডস টুবি ডান। তোমরা যেভাবে বলবে সেভাবেই সবকিছু হবে।

তাহেরের সঙ্গে তার ভাই ইউসুফ এবং ইনু। পুরো প্রেক্ষাপটে এরাই শুধু বেসামরিক ব্যক্তি। উপস্থিত অফিসাররা কেউ কেউ তাহেরকে কনগ্রাচুলেট

করলেও তারা ঠিক বুঝতে পারেন না তাহেরের মতো একজন অবসর প্রাপ্ত কর্নেল কেন এই মাঝরাতে হাজির হয়েছেন ক্যান্টনমেন্ট, কেনই বা জিয়া তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

জিয়া যতই তাকে ধন্যবাদ জানান, তার পরিকল্পনামতো জিয়া বাইরে না যাওয়াতে তাহের খানিকটা বিরক্ত। জিয়ার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতে চান তাহের। টু ফিল্ডের সিওর অফিসের পাশের ছোট্ট একটি রুমে গিয়ে বসেন জিয়া, তাহের, ইনু। ইউসুফ বাইরে অপেক্ষা করেন।

ঐমুহূর্তে বঙ্গভবনে আটকে থাকা খালেদ মোশারফের প্রধান সহকারী ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত ফোন করেন জিয়াকে। সৈনিক সংস্থার লোকেরা তখন বঙ্গভবন দখল করে নিয়েছে। শাফায়াত জিয়াকে ফোন করে উত্তেজিত হয়ে বলেন, তিনি সিপাইদের কাছে সারেন্ডার করবেন না। শাফায়াত মনে করেছেন, জিয়াই পুরো ঘটনা ঘটাচ্ছেন। শাফায়াত জিয়াকে টেলিফোনে বলেন : আপনি কিছু করবেন স্যার তো অফিসারদেরে নিয়ে করেন, এসব জোয়ানদের নিয়ে করতে গেলেন কেন?

জিয়া তাকে শান্ত হতে বলেন এবং সেখানে উপস্থিত তাহেরের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। অন্য অনেক অফিসারদের মতো শাফায়াত জামিলও এ দৃশ্যপটে তাহেরের উপস্থিতিতে অবাক। এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাহেরের সম্পর্ক, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না তার।

তাহের ফোন ধরে শাফায়াতকে বলেন : জাস্ট কোয়ায়েটলি সারেন্ডার। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল।

শাফায়াত আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন এবং সৈনিক সংস্থার লোকেরা বঙ্গভবন ঘিরে ফেললে, তিনি বঙ্গভবনের দেয়াল টপকে পালাতে গিয়ে তার পা ভেঙ্গে ফেলেন। ঐ আহত অবস্থাতেই রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করেন দোসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের অন্যতম কুশীলব শাফায়েত জামিল। শেখ মুজিবের অন্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদকারী রাগী সামরিক অফিসার শাফায়াত জামিল সেনাবাহিনীর এই নতুন পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে ব্যর্থ হন। নতুন পরিস্থিতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন তিনি। আর তার কমান্ডার খালেদ মোশারফ দৃশ্যপট ছেড়ে তখনও আশ্রয় নিয়ে আছেন দশম বেঙ্গলে। ঘটনা স্পষ্টতই হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদের।

কিন্তু নতুন অভ্যুত্থান কি পুরোপুরি এসেছে এর অগ্রগামী বাহিনী সিপাইদের হাতে? কিম্বা তাদের নেতা তাহেরের হাতে? তখনও তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

তাহের বসেন জিয়ার সঙ্গে আলাপে। ইনুকে পরিচয় করিয়ে দেন তাহের। তারা দুই তারিখ রাতে খালেদ মোশারফ ক্ষমতা দখল করার পর থেকে কি কি ঘটেছে এবং কিভাবে তারা এই বিপ্লবটি সংঘঠিত করেছেন তা জিয়াকে বিস্তারিত জানান।

তাহের বলেন, একটা ব্যাপার আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে যে পুরো বিপ্লবটা করেছে সিপাইরা, এখানে কোনো একক পাওয়ার টেকওভারের ব্যাপার নাই। আমরা এ মুহূর্তে জাসদের সরকার গঠন করতে চাচ্ছি না, আমরা জাতীয় সরকার করতে চাই। একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার করতে চাই। আপাতত একটা যৌথ উদ্যোগ দরকার। খুব তাড়াতড়ি একটা সাধারণ নির্বাচন দরকার, রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া দরকার, সৈনিকদের দাবি-দাওয়াগুলো নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লিঙ্কেজের ব্যাপারেও ডিসিশন নিতে হবে। আপনি এখানে একটা ক্রসিয়াল রোল প্লে করবেন। এসব নিয়ে আমাদের ডিটেইলে বসতে হবে।

জিয়া চুপচাপ মাথা নাড়িয়ে শুনতে থাকেন। বাইরে অপেক্ষা করছেন অগণিত অফিসার, শত শত সিপাই। তাহের বলতে থাকেন : তবে যেহেতু রাতের অন্ধকারে সিপাইরা বিদ্রোহ করেছে, দেশের সাধারণ মানুষ পুরো ব্যাপারটি নিয়ে অন্ধকারে থাকবে। কাজেই আমরা ঠিক করেছি আগামীকাল আমাদের প্রথম কাজ হবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটা সমাবেশ করা। সেখানে জাসদকর্মীসহ অন্যরাও থাকবে। সেখানে বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে অভ্যুত্থানের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। সেখানে আমি এবং আপনি বক্তৃতা দেবো।

এতক্ষণ চুপচাপ শুনলেও বক্তৃতার কথা শুনতেই জিয়া বেঁকে বসে। তিনি বলেন : দেখো তাহের, আমি তো পলিটিশিয়ান না, আমি জনসভায় ভাষণ দিতে পারব না। বক্তৃতা তুমি দাও, তোমরা যা ভালো মনে করো সেটা করো। আমাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে টানাটানি করো না।

তাহের বলেন : না, না, আমি একা বক্তৃতা দিলে তো হবে না। আপনিও তো পুরো ঘটনাটার একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট। দেশ একটা সংকট এবং বিভ্রান্তির মধ্যে আছে এ মুহূর্তে জনগণকে সুসংহত করা জরুরি।

জিয়া : তাহের তুমি এখন সিভিলিয়ান তুমি গিয়ে বক্তৃতা দিতে পারো। আই এম নট গোয়িং আউট অব দিস ক্যান্টনমেন্ট।

তাহের : তাহলে কিন্তু আপনি আপনার কমিটমেন্ট ভঙ্গ করছেন। আপনি বলেছেন আমরা যেভাবে বলব সেভাবেই আপনি কাজ করবেন।

জিয়া : কিন্তু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আমি যাবো না।

কিছুক্ষণ পর টু ফিল্ড আর্টিলারির হলরুমে উপস্থিত অফিসাররা দেখতে পান তাহের তার ক্রাচে ঠক ঠক শব্দ তুলে অত্যন্ত রাগান্বিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ইনুকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ঘর থেকে। বাইরে সিপাইদের এলোপাথারি আনাগোনা। সিপাই এবং অফিসারদের মধ্যে তখনও একটা অমীমাংসিত উত্তেজনা।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তাহের জিয়াকে বলেন : আপনি সমাবেশে বক্তৃতা না করতে চাইলে অন্তত রেডিওতে একটা বক্তব্য রাখেন। আপনি আমাদের সঙ্গে চলেন রেডিও স্টেশনে এবং একটা বক্তব্য রেকর্ড করে চলে আসবেন।

এর মধ্যে জিয়াকে ঘিরে ফেলেছেন সিনিয়র অফিসাররা। জিয়া আবারও বলেন তিনি এখন ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যাবেন না। তার পাশ থেকে ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত এবং আমিনুল হকও বলেন, না স্যারকে এখন বাইরে নেওয়া ঠিক হবে না। দরকার হলে বক্তৃতা এখানেই রেকর্ড করা হবে।

তাহের টের পান মাছ ফসকে গেছে তাদের হাত থেকে।

ইতিহাসের সুতো

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে তাহের, ইউসুফ, ইনু আবার রওনা দেন এলিফ্যান্ট রোডের দিকে। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে ইনু বলেন : জিয়া তো কোনো কথা রাখবেন বলে মনে হচ্ছে না।

তাহের : আমি আগেই বলেছিলাম জিয়াকে ক্যান্টনমন্টের বাইরে আনতে না পারাটা একটা ব্লান্ডার হয়েছে। বিপ্লবের পুরো সেন্টারটা যাতে বাইরে থাকে সেজন্য আমি অভ্যুত্থানের সময় ক্যান্টনমেন্টে গেলাম না। আমি চাচ্ছিলাম অভ্যুত্থানটার একটা সিভিল ডাইমেনশন তৈরি করতে। কিন্তু এখন তো দেখছি ঘটনা ঘুরে যাচ্ছে। অফিসাররা ঘিরে ফেলেছে তাকে। তাকে আর তারা ক্যান্টনমেন্টেন বাইরে আসতে দেবে না। দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারলে পুরো ব্যাপারটাই আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাবে। সোহওয়ারার্দী উদ্যানে মিটিং না হলেও শহীদ মিনারের মিটিংটা আমাদের কনটিনিউ করে যেতে হবে।

এলিফ্যান্ট রোডে পৌঁছালে রেডিও স্টেশন থেকে ফোন আসে হাবিলদার হাইয়ের। হাই তাহেরকে ফোনে বলেন, তিনি রেডিও স্টেশনে খন্দকার মোশতাককে দেখতে পাচ্ছেন এবং তিনি একটা কোনো বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন তাহের : কি শুরু করেছে সব এরা। ঐ কালপ্রিটটা ওখানে কি করে। আমাকে এখনই যেতে হবে রেডিও স্টেশনে। উই মাস্ট স্টপ ইট।

আবার ক্রাচটা হাতে উঠিয়ে নেন তাহের। ইনু এবং ইফসুফকে বলেন এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় থাকতে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে কোনো খবর আসে কিনা তা লক্ষ রাখতে। রেডিও স্টেশনে তিনি নিয়ে যান বেলালকে। এবার তার ড্রেজার সংস্থার গাড়িতে। গাড়ি দ্রুত চালাতে বলেন তাহের। তখন দিনের আলো একটু একটু করে ফুটছে।

তাহের রেডিও স্টেশনে পৌঁছেই হুঙ্কার দেন : মোশতাককে কে এনেছে এখানে? সিপাইদের সিংহভাগ তখনও তাহেরেই নির্দেশে চলছেন। রেডিও স্টেশন তখন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার দখলে। এক সৈনিক বলেন, বেঙ্গল ল্যান্সারের কিছু সিপাইদের সঙ্গে করে তিনি এখানে এসেছেন।

ক্রাচে ঠক ঠক শব্দ তুলে তাহের ঢুকে যান রেডিও স্টেশনে। দেখেন মোশতাক শান্তভাবে কাগজে কিছু লিখছেন, পাশে তাহের উদ্দীন ঠাকুর। তাহেরের সাথে আসা বেলাল মোশতাকের কাছ থেকে কাগজটা এক টানে কেড়ে নিয়ে দেন তাহেরের হাতে। তাহের দেখেন লেখা 'কন্টিনিউশন অব প্রেসিডেন্সি'। তাহের এক টানে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলেন এবং মোশতাককে বলেন : কন্সপিরেন্সির দিন শেষ। ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড এনাফ ট্রাবল ফর দিস নেশন। নাউ গেট আউট ফ্রম দিস রেডিও স্টেশন ইমিডিয়েটলি। তা না হলে আপনার জিহবা আমি টেনে ছিড়ে ফেলবো।

পাশ থেকে তাহের উদ্দীন ঠাকুর কিছু একটা বলতে নিলে, তাহের বলেন, ইউ শাট আপ।

রাগে কাঁপতে থাকেন তাহের। হাবিলদার হাইকে বলেন : এখনই বের করো এ দুজনকে।

হাবিলদার হাই একরকম টেনে মোশতাক এবং তাহের উদ্দীনকে বাইরে নিয়ে যান। মোশতাক কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। মোশতাক যখন রেডিও স্টেশন থেকে বেরুচ্ছেন তখন জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মোশতাকের দুই সঙ্গী, ওবায়দুর রহমান এবং শাহ মোয়াজ্জেম ঢুকবার চেষ্টা করছিলেন রেডিও স্টেশনে। ঐ দুজনকেও হাবিলদার হাই এবং সৈনিক সংস্থার অন্য সদস্যরা ধাক্কাতে ধাক্কাতে রেডিও স্টেশনের গেট থেকে বের করে দেন।

সিপাই জনতা ভাই ভাই

ভোরের আলো ফুটতেই ঢাকার মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। সারারাত তারা গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছেন, রেডিওতে অনেকেই শুনেছেন সিপাইদের অভ্যুত্থানের খবর। ক্যান্টনমেন্টেই রেকর্ড করা জিয়ার একটি বক্তৃতা প্রচার করা হয়েছে রেডিওতে। সেখানে জিয়া নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সিপাইদের অভ্যুত্থানের কথা বললেও বক্তৃতায় জিয়া কোথাও অভ্যুত্থানের পেছনে জাসদ কিম্বা কর্নেল তাহেরের কথা উল্লেখ করেননি।

কৌতূহলী মানুষ দেখেন ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ট্রাক, ট্যাঙ্ক বোঝাই সিপাই। যেন ক্যান্টনমেন্টের ঘেরাটপ ভেঙ্গে সৈনিকেরা ধেয়ে আসছে মানুষের দিকে। সাধারণ মানুষও গত চার, পাঁচ দিন ধরে ছিল এক গুমোট অনিশ্চয়তা আর অন্ধকারের ঘেরাটোপে। নভেম্বরের সাত তারিখ ভোরে তারাও যেন বেরিয়ে এসেছে সে ঘেরাটোপ ভেঙ্গে। বিভ্রান্ত সৈনিক এবং জনতা পরস্পরের সাথে সেদিন মিলিত হয় ঢাকার রাজপথে। এ যেন দুজনেরই বিজয়। সাধারণ মানুষ উঠে পড়ে সৈনিকদের ট্রাকে, কেউ গিয়ে ফুলের মালা পড়িয়ে দেয় কামানের

নলের গলায়, কেউ উঠে পড়ে ট্যাঙ্কে। সিপাই জনতার মিলনমেলার এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় সেদিনের ঢাকার রাজপথে। সিপাই সিপাই ভাই ভাই ছেড়ে এবার স্লোগান ওঠে 'সিপাই জনতা ভাই ভাই।'

সাধারণ মানুষ তখনও স্পষ্ট জানেন না ক্যান্টনমেন্টে ঠিক কি ঘটেছে আগের রাতে। শুধু টের পান একটা কোনো বড় পরিবর্তন ঘটেছে। দেশে যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল তা কেটে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মানুষের বিভ্রান্তি তবু কাটে না। কোনো কোনো সিপাইদের ট্রাক থেকে শোনা যায় স্লোগান 'কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ', কোন ট্রাকে 'জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ' আবার কোনো কোনো ট্রাক থেকে ভেসে আসছে ধ্বনি 'নারায়ে তাকবীর, খন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ।' সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারেন না কে ঘটালো অভ্যুত্থান, তাহের, জিয়া না মোশতাক?

৭ নভেম্বর সকাল থেকেই জাসদের গণবাহিনী শহরের নানা স্থানের নিয়ন্ত্রণ নেবার তৎপরতা শুরু করে এবং শহীদ মিনারে জনসমাবেশের আয়োজন করতে থাকে। সায়েন্স এনেক্স বিল্ডিংয়ের একটা কক্ষে ঢাকা নগর গণবাহিনীর কন্ট্রোলরুম বসানো হয়। সকাল থেকে গণবাহিনীর সদস্যরা মোহাম্মদপুর থানাসহ শহরের কয়েকটি থানা দখল করে। পুলিশ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। অন্যদিকে শহীদ মিনারে গণবাহিনীর সদস্য আবুল হাসিব খান মাইকে ঘোষণা দিতে থাকেন—একটু পরেই শুরু হবে এক ঐতিহাসিক লং মার্চ। লং মার্চে নেতৃত্ব দেবেন কমরেড আবু তাহের, কমরেড জিয়াউর রহমান...

মাঝরাতে অভ্যুত্থান শুরু হয়ে ভোর হয়েছে। কিন্তু বাতাসের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে ঘটনা প্রবাহ। অভ্যুত্থানের প্রথম পর্বের সামরিক মিশনটি, যার দায়িত্বে ছিলেন তাহের সফল হলেও তৈরি হচ্ছে নানা বিভ্রান্তির বীজ। আর এর দ্বিতীয় অংশ বেসামরিক মিশনটি, যার দায়িত্বে ছিলেন জাসদের অন্যান্য নেতারা, দানা বেঁধে উঠেনি তখনও। শহীদ মিনারে গণবাহিনীর বেশ কিছু সদস্য জড়ো হলেও আশানুরূপ ছাত্র, শ্রমিক জমায়েত হয়ে উঠেনি। সিরাজুল আলম খান তখনও অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপন করে টেলিফোনে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ড. আখলাক আছেন পীরের দরবারে। জাসদ নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান, মির্জা সুলতান রাজা পোস্তগোলা থেকে শ্রমিকদের সংগঠিত করে শহীদ মিনারে আনবার চেষ্টা করছেন কিন্তু সেদিন রাতেই জেল থেকে বেরিয়েছেন তারা, ফলে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে। অন্যান্য জাসদ নেতারাও খানিকটা অপ্রস্তুত। এতবড় ঘটনায় পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যোগী হচ্ছেন না তারা।

এ সময় শহীদ মিনারে এক আকস্মিক ঘটনা ঘটে। হঠাৎ বেশ কয়েকটি ট্রাক শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়। সেখানে সৈনিকদের পাশাপাশি খন্দকার মোশতাকের

ছবিসহ টুপি পড়া মাদ্রাসার ছেলেরা। তারা শ্লোগান দেয়, 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, খন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ।' উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সমাবেশে। সৈনিক সংস্থার কয়জন সদস্য ট্রাক থেকে মোশতাকের ছবি নিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলেন। এ সময় ট্রাক থেকে মোশতাকপন্থী সৈন্যরা সমাবেশের উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এতে কেউ হতাহত নাহলেও সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়।

উপমহাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় এই সিপাই অভ্যুত্থান ঘটবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেটিকে বানচাল করে দেবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে দুটি শক্তি, একদিকে জেনারেল জিয়া, আরেক দিকে খন্দকার মোশতাক। খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাহেরকে নীরব সমর্থন দিলেও এভাবে সেনাবাহিনীর খোল নালচে পাল্টে, সিপাই অফিসারদের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে বৈপ্লবিক কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবার মানুষ জিয়া নন। তার মুক্তির জন্য তাহেরের সঙ্গের সুসম্পর্কটি ব্যবহার করেছেন তিনি। এখন তার বিশ্বস্ত অফিসারদের বেষ্টনীতে ঘটনার মোড় ফেরাবার চেষ্টায় আছেন তিনি। আর দেশ যখন একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একেবারে দ্বারপ্রান্তে তখন এর মোড় পুঁজিবাদী এবং ইসলামপন্থীদের দিকে ফেরাবার জন্য শেষ মরিয়া চেষ্টা চালাতে শুরু করেছেন মোশতাক।

আর এই বিপরীতমুখী স্রোতের তোড়ে উজান ঠেলে একজন পঙ্গু মানুষ তখন ক্রাচে ভর দিয়ে উদভ্রান্তের মতো এক জায়গা থেকে ছুটে বেড়াচ্ছেন আরেক জায়গায়।

ক্যান্টনমেন্টে আবার

রেডিও স্টেশনে খন্দকার মোশতাককে সামাল দিয়ে তাহের আবার ছুটে যান ক্যান্টনমেন্টে টু ফিল্ড আর্টিলারিতে। সেখানে গিয়ে দেখেন মিটিং শুরু হয়েছে। জাসদের অন্যকোনো নেতারও এখন ক্যান্টনমেন্টের আলোচনায় থাকা উচিত বলে মনে করেন তাহের। সিনিয়র নেতারা অধিকাংশই জেলে। সিরাজুল আলম খান এধরনের প্রকাশ্য মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন না, তিনি তার রহস্য নিয়ে তখনও গোপন স্থানে। তাহের ইনুকে বলেন ড. আখলাককে নিয়ে আসতে।

তাহেরকে মিটিংয়ে ডাকা হয়নি। তবু তিনি তার সশব্দ ক্রাচ নিয়ে ঢুকে পড়েন মিটিংয়ে। দেখেন সেখানে উপস্থিত আছেন মেজর জেনারেল জিয়া, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব, রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান, জেনারেল ওসমানী, মাহবুবুল আলম চাষী। নানা কৌশলে তাহেরকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলেও উপস্থিত সকলেই জানেন তাহেরকে উপেক্ষা করবার শক্তি তাদের নেই। ওসমানী উঠে গিয়ে স্বাগত জানান তাহেরকে। বলেন : কাম অন তাহের হ্যাভ এ সিট।

তাহের ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। গম্ভীর মুখে ক্রাচটা পাশে রেখে চেয়ারে বসেন। মাহবুবুল আলম চাষী বলেন : কর্নেল তাহের, উই হ্যাভ ডিসাইডেড টু কন্টিনিউ দি গভর্নমেন্ট উইথ মোশতাক অ্যাজ দি প্রেসিডেন্ট।

তাহের সাথে সাথে আবার তার ক্রাচটি হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন : ওয়েল ইফ ইউ হ্যাভ অলরেডি ডিসাইডেড ইট, দ্যান আই হ্যাভ নো বিজনেস টু স্টে হেয়ার।

ওসমানী উঠে এসে তাহেরকে হাতে ধরে চেয়ারে বসান : প্লিজ তাহের স্টে অন। টেল আস হোয়াট প্ল্যানস ডু ইউ হ্যাভ।

মিটিংয়ের সবাই জানেন এ মুহূর্তে তাহেরকে ক্ষেপিয়ে কোনো লাভ হবে না। ঘটনার মোড় যেদিকেই তারা নিতে চান না কেন তাহেরকে ছাড়া কোনো দিকে যাবার উপায় তাদের নেই। সারা শহর তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈন্যরা। তাহের বলেন : উই ক্যান নট এলাউ দিস নুইসেন্স টু গো অন ফর এভার। আই ওয়ান্ট খন্দকার মোশতাক টু বি কম্প্লিটলি আউট অব দি সীন।

ওসমানী বলেন : হুম ডু ইউ হ্যাভ ইন ইওর মাইন্ড?

তাহের : প্রথমত আমাদের একটা বিপ্লবী পরিষদ করতে হবে, গঠন করতে হবে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার। সে সরকারের কাজ হবে যত দ্রুত সম্ভব একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন দেওয়া। আর সব পলিটিক্যাল পিজনার্সদের ইমিডিয়েটলি মুক্ত করা। এছাড়া অন্য কোনোদিকে ঘটনা টার্ন করাবার চেষ্টা করবেন না আপনারা, তার পরিণতি অত্যন্ত খারাপ হবে। আর এই ইন্টেরিম পিরিয়ডে কাকে চার্জে রাখা যায় সে ব্যাপারে আপনারা প্রপোজ করতে পারেন।

তাহেরের দৃঢ় উচ্চারণ চুপচাপ শোনেন তারা। কেউ কেউ অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সায়েমের নাম প্রস্তাব করেন। তাহের সমর্থন করেন এবং বলেন : জাস্টিজ সায়েম আপতত হেড অব দি স্টেট থাকতে পারেন। জেনারেল জিয়া আর্মি চিফ থাকবেন। উই মাস্ট মুভ কুইকলি।

ক্যান্টনমেন্ট এবং রাজপথের দেয়াল উঠে গেছে তখন। সিপাইরা অবাধে চলে যাচ্ছেন বাইরে। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে তখনও যে সিপাইরা ঘুরছেন তারা এক পর্যায়ে মুখোমুখি হন তাহের এবং জিয়ার। তাহের ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ আছেন। তাহের ভেবেছিলেন জিয়াকে ব্যবহার করে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন এখন উল্টো জিয়া তাহেরকে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। অভ্যুত্থানের আদর্শকে যেন জিয়া বিপথগামী করতে না পারেন সেজন্য তাহের চেষ্টা চালিয়ে যান জিয়াকে যতটা সম্ভব তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে। সিপাইদের মুখোমুখি হলে, তাহের জিয়াকে বলেন : আপনি জোয়ানদের উদ্দেশে কিছু বলেন।

জিয়া খুব সংক্ষেপে বলেন : আমি রাজনীতি বুঝি না। ধৈর্য ধরেন। নিজের ইউনিটের শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। আপনাদের দাবিগুলো লিখিত দেন।

জিয়া যে ক্রমশ তার হাত থেকে পিছলে যাচ্ছেন তা বেশ টের পান তাহের।

তাহের তার পরিকল্পনা অনুযায়ী জিয়াকে সামনে রেখে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যান। তার মূল লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাসদের সব বন্দিদের মুক্ত করা। প্রত্যাশিত বাধা মোশতাককে প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও অপ্রত্যাশিত বাধা জিয়া যে ক্রমশ তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছেন তা বেশ টের পাচ্ছেন তাহের। টু ফিল্ডে গিয়ে তাহের জানতে পারেন খালেদ মোশারফকে হত্যা করা হয়েছে। চিন্তিত হয়ে পড়েন তাহের। উপস্থিত কয়জন সিপাইদের জিজ্ঞাসা করেন এই হত্যার সাথে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কেউ জড়িত আছে কিনা। তাহের জানতে পারেন, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কেউ এতে জড়িত নয়। টেনথ বেঙ্গলের হেডকোয়ার্টারের সিও নওয়াজিসের কাছে আশ্রয় নেবার পর তার ইউনিটেরই আসাদ এবং জলিল নামে দুই মেজর খালেদ মোশারফ, কর্নেল হুদা ও হায়দারকে প্রকাশ্যে গুলি করেছেন। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে। টু ফিল্ডে মিটিং সেরে তাহের আবার রওনা দেন এলিফ্যান্ট রোডে জাসদ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে। এত দ্রুত ঘটনার পট পরিবর্তন হচ্ছে যে এর সঙ্গে তাল রাখা হয়ে উঠছে দুষ্কর।

বারো দফা

এলিফ্যান্ট রোডের ৩৩৬ বাড়িটির আর বিশ্রাম নেই। সেখান থেকেই মুহূর্তে মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে ইতিহাস। সেখানে মিলিত হন জাসদ এবং সৈনিক সংস্থার নেতৃবৃন্দরা। গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসেন সিরাজুল আলম খান, আসেন ড. আখলাকও। মিটিং শুরু হবার আগে ইউসুফ তাহেরের কাছে অভ্যুত্থানের সময় সিরাজুল আলম খান এবং ড. আখলাকের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা জন্য উষ্মা প্রকাশ করেন। তাহের বলেন : এখন এসব কথা বাদ দিলেই ভালো। উনি তো বরাববই ওরকম। কিন্তু উনার পলিটিক্যাল অ্যাডভাইসটা আমাদের দরকার।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করতে বসেন তারা। ব্যাপারটা সবাই অনুধাবন করেন যে হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। এক রাত আগেও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে অমিত শক্তিধর মনে হলেও রাত পোহাতেই দ্রুত যেন তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে। মোশতাক, ফারুক, রশীদের অনুসারী সিপাইরা সৈনিক সংস্থার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো, কারণ খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানের পাল্টা কোনো ব্যবস্থা নেবার অবস্থা তাদের ছিল না। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার উদ্যোগ তাদের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। ফলে অভ্যুত্থান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের মুখোশ সরিয়ে মোশতাকের প্ররোচনায় নেমে পড়েছে ঘটনা নিজেদের দিকে টেনে নেবার ষড়যন্ত্রে। ওদিকে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার তুরুপের তাস জিয়া স্বয়ং চলে গেছেন তাদের হাতের মুঠোর বাইরে।

জিয়াকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়াতে অভ্যুত্থানের কেন্দ্র রয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্টে। রাজপথে সিপাই আর জনতা মিছিল করলেও সেখানে পরিকল্পনা মতো জাসদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাদের জনসভা ভণ্ডুল হয়ে গেছে, তাদের কর্মীবাহিনীকে যথাযথভাবে তারা মাঠে নামাতে পারেননি, নেতারাও জেল থেকে বেরিয়ে আসেননি। সব মিলিয়ে জাসদের নেতৃবৃন্দ টের পান যে অভ্যুত্থানের ওপর তাদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়েছে।

তাহের বলেন : আমাদের সময় খুব কম। হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। জিয়াকে আমাদের গ্রিপে আনতে হবে। জিয়া বলেছেন লিখিত আকারে সৈনিকদের দাবি দেয়াগুলো তাকে দিতে। এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে সৈনিকদের দাবি-দাওয়াগুলো লিখে ফেলা এবং তার পর সেগুলো তার কাছ থেকে সই করে নেওয়া। আজকের মধ্যেই তার সই নিতে হবে এবং তারপর তাকে বাধ্য করা হবে ঐ দাবিগুলো মানতে। সিরাজ ভাই আপনি কি বলেন?

সিরাজুল আলম খান তাহেরের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এলিফ্যান্ট রোডে উপস্থিত সৈনিকরা খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুব্ধ, বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন তখন। তাহের তাদের বলেন : যেহেতু তোমাদেরই দাবি এগুলো, দাবিনামাটা তোমরা তৈরি করো। সিপাইদের তৈরি করা দাবি নামা সিরাজুল আলম খান, তাহের, ইনু মিলে খানিকটা পরিমার্জনা করে দেন।

দাবিগুলো দাঁড়ায় এইরকম :

এক, আমাদের বিপ্লব নেতা বদলের জন্য নয়, বিপ্লব হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বার্থের জন্য। এতদিন আমরা ছিলাম ধনীদের বাহিনী, ধনীরা তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করেছে। পনেরোই আগস্ট তার প্রমাণ। তাই এবার আমরা ধনীর দ্বারা বা ধনীদের স্বার্থে অভ্যুথান করিনি, আমরা বিপ্লব করেছি জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। আমরা জনতার সঙ্গেই থাকতে চাই, আজ থেকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী হবে গরিব শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী গণবাহিনী।

দুই, অবিলম্বে রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

তিন, রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

চার, অফিসার এবং জওয়ানদের ভেদাভেদ দূর করতে হবে। অফিসারদের আলাদাভাবে নিযুক্ত না করে, সামরিক শিক্ষা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী থেকেই পদ মর্যাদা নির্ণয় করতে হয়।

পাঁচ, অফিসার এবং জওয়ানদের এক রেশন এবং একই রকম থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

ছয়, অফিসারদের জন্য আর্মির কোনো জওয়ানকে ব্যাটম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা যাবে না।

সাত, মুক্তিযুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থান এবং আজকের বিপ্লবে যারা শহীদ তাদের পরিবারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আট, ব্রিটিশ আমলের আইনকানুন বদলাতে হবে।

নয়, দুর্নীতিবাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ ও বিদেশে যারা টাকা জমিয়েছে সেই টাকা ফেরত আনতে হবে।

দশ, যে সমস্ত সামরিক অফিসার এবং জওয়ানদের বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তাদের দেশে ফেরত আনতে হবে।

এগারো, জওয়ানদের বেতন সপ্তম গ্রেড হবে, ফ্যামিলি অ্যাকোমডেশন ফ্রি দিতে হবে।

বারো, পাকিস্তান ফেরত সামরিক বাহিনীর লোকদের আঠারো মাসের বেতন দিতে হবে।

বিকাল পাঁচটায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আমূল পাল্টে ফেলার দাবিগুলো নিয়ে তাহের, ইনু এবং সৈনিক সংস্থার কয়জন নেতা চলে যান রেডিও স্টেশনে। বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়েছে। তাহের জানেন বিকালে সায়েম আসবেন নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে রেডিওতে ভাষণ দিতে, সঙ্গে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি মোশতাক এবং জিয়াও থাকবেন। অন্যস্থানে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেলেও রেডিও স্টেশন তখনও ছিল পুরো তাদের দখলে। সন্ধ্যার দিকে জিয়া রেডিও স্টেশনে গেলে সৈনিকরা তাকে ঘিরে ধরেন এবং দাবি দেওয়া গুলো পেশ করেন। সৈনিকরা তখন উদ্ধত। তারা বলেন এই দাবি দেওয়া না মানা হলে জিয়াকে তারা রেডিওতে ঢুকতে দেবেন না, এমনকি রাষ্ট্রপতিকেও না।

সৈনিক সংস্থার সদস্যদের দ্বারা ঘেরাও হলেও তেমন বিচলিত নন জিয়া, তিনি জানেন তার অবস্থান এখন মোটেও নাজুক নয়। হাবিলদার হাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি দাবি দেওয়াগুলো শোনেন। জিয়া বলেন : রাজবন্দিদের তো মুক্তি দিতেই হবে। মেজর জলিল আমার ইয়ার। জলিল, রবকে আজই জেল থেকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করব। আর সিপাইদের বেতন অত তো বাড়ানো যাবে না , তিন শ টাকা দেওয়া যেতে পারে, তা না হলে দেশের অন্য লোক খাবে কি? আর হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ ব্যাটম্যান প্রথাও তো বাতিল হতে হবে।

এভাবে অন্য দাবিগুলোর ব্যাপারেও নানা টুকরো মন্তব্য করে তিনি সেগুলো মেনে নেবার একটা ঝাপসা প্রতিশ্রুতি দেন। পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁসছেন তাহের।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন : আপনি মুখে না বলে এই দাবি নামার কপিগুলোতে সই করেন।

জিয়া বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন : অফ কোর্স, দেখি কপি গুলো, কলম আছে কারো কাছে?

একজন সিপাই একটা কলম এগিয়ে দেন এবং জিয়া বারো দফা দাবির তিন কপিতে সই করেন। এক কপি নিজের কাছে রাখেন, এক কপি রাখে সৈনিক সংস্থা এবং তাহের বলেন আরেক কপি রেডিও এবং পত্র পত্রিকায় পাঠাতে প্রচারের জন্য।

জিয়া তাহেরের সঙ্গে আর কোনো কথা না বলে সোজা ঢুকে যান রেডিও স্টেশনে। সন্ধ্যায় নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ভাষণ দেন বিচারপতি সায়েম। কিন্তু তাহের নিশ্চিত হতে পারেন না কতটা প্রতিশ্রুতি জিয়া রাখবেন।

পদে পদে আশা, সন্দেহ, ক্ষোভ, বিভ্রান্তির এক কুয়াশার মধ্য দিয়ে দ্রুত এগুতো থাকে ঘটনা।

অফিসারের রক্ত চাই

অভ্যুত্থানের প্রাথমিক উত্তেজনায় বিবিধ স্লোগানের মধ্যে কোনো কোনো সিপাই স্লোগান দিয়েছিলেন 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই অফিসারের রক্ত চাই।' অফিসারদের উপর চরম ক্ষুব্ধ তখন সিপাইরা। অভ্যুত্থানপূর্ব মিটিংয়ে কেউ কেউ জিয়া এবং অন্য অফিসারদের হত্যা করার ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাহেরের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল কোনোভাবে হত্যায় জড়িয়ে পড়া যাবে না। কয়েক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়ে তাহের সিপাইদের উগ্রতা প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের বার বার বুঝিয়েছেন হত্যাকাণ্ডই বিপ্লব নয়। তার বক্তৃতা অভ্যুত্থানের তুঙ্গ মুহূর্তে কাজ দিয়েছে। তা না হলে জিয়াকে যখন মুক্ত করা হয় তখন তার চারপাশে সব সশস্ত্র সৈনিক, যে কারো পক্ষে তাকে তখন হত্যা করা খুবই সহজ। হত্যা তখন আটপৌড়ে ব্যাপার। একইভাবে সাত তারিখ ভোর রাতে মেস এবং বাসা থেকে অসংখ্য অফিসারদের ধরে এনে সৈনিকরা লক আপ করে রেখেছেন টু ফিল্ড আর্টিলারিতে। ঘুমের পোশাক পড়া, নিরস্ত্র সেইসব অফিসারদের সদলবলে ব্রাশফায়ার করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারত সৈনিকরা। তাহেরের বারংবার সাবধানী নির্দেশ তাদের সে কাজ থেকে বিরত রেখেছে প্রাথমিকভাবে।

কিন্তু সাত তারিখ সারাদিন ধরে পরিস্থিতি কেবল ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। সৈনিকরা বেরিয়ে এসেছেন রাজপথে। কথা ছিল তারা জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সম্মিলিতভাবে ডাক দেবেন বিপ্লবের। কথা ছিল জিয়া আর তাহের এসে

উন্মুক্ত জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। কিছুই ঘটেনি। জিয়া রয়ে গেছেন ক্যান্টনমেন্টে, তাহের তার ক্রাচে ভর করে ছোটাছুটি করছে ক্যান্টনমেন্ট, এলিফ্যান্ট রোড, রেডিও স্টেশন। এর মাঝে আবার হঠাৎ নারায়ে তাকবীর ধ্বনি তুলে মাটি ফুড়ে বেরিয়েছে মোশ্‌তাকের দল। সৈনিকেরা তখনও শহরময় ঘোরাঘুরি করছেন। তারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছেন মাঝ রাতে, এরপর তারা কি খাবেন, কোথায় থাকবেন ঠিক নাই। জাসদ নেতৃবৃন্দও স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা দিতে পারছেন না। তাহের তার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করছেন আপ্রাণ। স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাহের এবং জিয়ার দূরত্ব। রাতের অন্ধকারে অস্ত্রাগার ভেঙ্গে, হাতে হাতে অস্ত্র নিয়ে সিপাইরা রাজপথে বেরিয়ে এসেছিল যুগান্তকারী এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলবার স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু স্বপ্ন যেন দিন না ফুরাতেই ধূলিসাৎ হতে বসেছে। সৈনিকদের মধ্যে জন্ম নিতে থাকে দ্বিধাদ্বন্দ, সন্দেহ, অনিশ্চয়তা। তাদের চেপে থাকা ক্ষোভ উসকে ওঠতে থাকে আবার।

সন্ধ্যারাতে এক সৈনিক হঠাৎ আর্মির এক লেডি ডাক্তারকে সামনে পেয়ে গুলি করে দেন। কিছুদিন আগে এই সিপাই তার গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে এই মহিলা ডাক্তারের কাছে গেলে অফিসার ডাক্তারটি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। এই ঘোলাটে অবস্থার সুযোগে সৈনিকটি তার প্রতিশোধ নেন। এক ক্যাপ্টেন জনসমক্ষে সৈনিকদের নিয়ে টিটকারী করলে সোজা তার বুক লক্ষ করে গুলি ছোড়ে এক সিপাই। ব্যক্তিগত আক্রোশ, হঠাৎ উস্কানী ইত্যাদি মিলিয়ে সিপাইদের হাতে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় ক্যান্টনমেন্টে। রাতে কিছু ক্ষুব্ধ সৈনিক নানা অফিসারের বাসায় হামলা চালান। কোনো কোনো অফিসারকে লাঞ্ছিত করেন। অফিসারদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। তারা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে শুরু করেন ক্যান্টনমেন্ট থেকে।

রাত পোহায়। থমথমে হয়ে ওঠে ক্যান্টনমেন্ট। সৈনিকরা খোঁজ পেয়েছেন তাদের যে বারো দফা পত্রিকা এবং রেডিওতে প্রচারিত হবার কথা ছিল তা বন্ধ করে দিয়েছেন জেনারেল জিয়া। সৈনিকদের সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে ধোঁয়া উঠতে থাকে আবার। অসংখ্য সৈনিক তখনও ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ঢাকা শহরের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে, ক্যান্টনমেন্টের ভেতর যারা আছেন তারা অস্ত্র হাতে ক্ষুব্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছেন যত্রতত্র। অফিসাররা সন্তস্ত্র। অফিসে যাওয়ার পথে এক ক্যাপ্টেনের কাঁধের র‍্যাঙ্কের পিপগুলো ছিঁড়ে ফেলেন বিক্ষুব্ধ কিছু সৈনিক। অফিসাররা কোনো র‍্যাঙ্ক না লাগিয়ে যাতায়াত শুরু করেন অফিসে। এয়ার পোর্টে, ক্যান্টেনমেন্টের কয়েকটি জায়গায় কিছু অফিসার হত্যার খবর পাওয়া যায়। জিয়া ফোন করেন তাহেরকে : তাহের, তোমার লোকেরা আমার অফিসারদের হত্যা করছে।

তাহের বলেন : আমি এখনি আসছি ক্যান্টনমেন্টে।

জিয়া : তোমার আসার কোনো দরকার নাই। ক্যান্টনমেন্টের বাইরের সোলজারদের তুমি ভেতরে পাঠাও।

তাহের ইনু এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতাদের রাগান্বিত হয়ে বলেন : আমার ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন ছিল কোনো রকম কিলিংয়ে না যাওয়া, তারপরও কেন এসব কিলিং হলো?

ইনু : তাহের ভাই, আমারও স্পষ্ট নির্দেশ আছে কোনো হত্যাকাণ্ড না ঘটাতে। আপনি জানেন যে খালেদ মোশারফ মারা গেছেন তারই ইউনিটের মেজর আসাদ আর জলিলের গুলিতে, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কেউ সেখানে জড়িত ছিল না। আসলে মোশতাকের তৈরি একটা খুনী চক্র অফিসার হত্যার আওয়াজ তুলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দোষ চাপাচ্ছে সিপাইদের ওপর। জিয়ারও কোনো ইশারা এখানে থাকতে পারে। আর আমাদের পক্ষ থেকে যদি অফিসার হত্যার কোনো নির্দেশ থাকত তাহলে এতক্ষণে ক্যান্টনমেন্টে কয়েকশত অফিসারের লাশ পড়ে থাকত। চাইলে পুরো ক্যান্টনমেন্ট সাফ করে দিতে পারত আমাদের সৈনিকরা। বিচ্ছিন্নভাবে দশ, বারোজন অফিসার এই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।

হাবিলদার হাই বলেন : খালেদ মোশারফের খুব কাছের মানুষ কর্ণেল গাফফারকে স্যার আমিই সাত তারিখ রাতে নিরাপদ হেফাজতে রেখে আসছি। এয়ার ফোর্সের কয়জন কিছু আর্মি অফিসারদের মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল। আমি তাদের সবাইকে বাঁচাইছি। কিন্তু সৈনিকদের সামাল দেওয়া মুস্কিল হচ্ছে স্যার। ঘটনা কোনো দিকে যাচ্ছে তারা বুঝতে পারছে না। ক্ষেপে গিয়ে যাকে তাকে মারছে।

তাহের : ঘটনা আমাদের প্ল্যান মতো হচ্ছে না। সৈনিকদের বারো দফা পেপারে, রেডিওতে যায়নি। রবকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু সাবধানে মুভ করতে হবে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ড কিছুতেই চালানো যাবে না।

আলোচনা ওঠে সৈনিক সংস্থার যারা শহরের বাইরে আছেন তাদের ক্যান্টনমেন্টে ফেরত যেতে বলা হবে কিনা। সৈনিক সংস্থার সদস্যরা বলেন : ক্যান্টনমেন্টে একবার ঢুকে গেলে তারা পুরোপুরি জিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে যাবেন, তাদের আর কোনো শক্তিই থাকবে না। তারা বলেন বারো দফা না মানা পর্যন্ত তারা অস্ত্র জমা দেবে না, ক্যান্টনমেন্টে ফেরত যাবে না। যেমন একাত্তরের রণাঙ্গনে তেমনি যেন আবার সৈনিক আর জনতা মিলেছে শহরের রাস্তায়। সৈনিকরা আর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইছিলেন না।

তাহেরও এই অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের কথাই বলে আসছেন অবিরাম, বলছেন সিপাই আর জনতার মিলনের কথা। সিপাইরা যত জনতার সঙ্গে মিলিত থাকবে তত বাড়বে তাদের শক্তি। তাহেরও বলেন : আমি তোমাদের সাথে একমত।

এখন ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাওয়া বোকামী হবে। তবে যে উদ্দেশে আমরা অভ্যুত্থান করেছি তা রক্ষা এবং বাস্তবায়নের জন্য সিপাইদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বাইরে থেকেই জিয়া ও নতুন সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করব আমরা। তবে আমাদের যারা ক্যান্টনমেন্টে আছে, তাদের স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে , কোনো কিলিং যেন এখন না হয়।

হাইজ্যাক হয়ে যাওয়া বিপ্লবকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন তারা। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আবার অসংখ্য লিফলেট ছাপিয়ে সারা শহরে বিলি করা হয়। লিফলেটে বিরাট অক্ষরে লেখা হয় : 'সিপাই বিপ্লবকে এগিয়ে নিন।'

বিকালে জাসদ এবং গণবাহিনীর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে জনসভার সিদ্ধান্ত হয়। জিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রব এবং জলিলকে মুক্তি দেওয়া হবে। জাসদ প্রত্যাশা করেছিল মুক্ত হয়ে জলিল এবং রব এই জনসভায় বক্তৃতা দেবেন এবং অভ্যুত্থানের পেছনে জাসদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করবেন। অভ্যুত্থানের সময় আত্মগোপন করলেও সিরাজুল আলম খান জনসভা সংগঠনে নেমে পড়েন। বিকালে বায়তুল মোকাররমে বিশাল জনসমাগম হলেও অনেক বিলম্বে জলিল এবং রবকে মুক্তির দেওয়ার কারণে তারা সে সভায় যোগ দিতে পারেননি। পুলিশ হামলা করে সে জনসভায়। জাসদ ছাত্রলীগ নেতা মাহবুবুল হক পুলিশের গুলিবর্ষণে আহত হন।

এ ঘটনায় আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকারী বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা। শৃঙ্খলার দুর্বলতার সুযোগে অনেক স্বশস্ত্র গণবাহিনীর সদস্যও তখন ঢুকে পড়েছেন ক্যান্টনমেন্টে। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য, গণবাহিনীর সদস্যরা আওয়াজ তোলেন যে জেনারেল জিয়া ১২ দফা মানবার কথা দিয়ে কথা রাখেননি, ওয়াদা খেলাপ করেছেন, প্রতারণা করেছেন তাদের সঙ্গে। সে রাতে আরও কয়েকজন অফিসার নিহত হন। অফিসাররা পারিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকেন ক্যান্টনমেন্টে থেকে। কোনো কোনো অফিসার রাতের অন্ধকারে বোরখা পড়েও গা ঢাকা দেন।

নয় নভেম্বর জাসদের নেতারা আবার মিটিংয়ে বসেন। মিটিংয়ের নিয়মিত সদস্যের বাইরেও এবার যোগ দেন জলিল এবং রব, যারা জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন সদ্য। ঢাকার বাইরে থেকে এসে যোগ দেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া। আর্মি অফিসারদের মধ্যে জাসদের অন্যতম এবং একমাত্র সক্রিয় সদস্য মেজর জিয়াউদ্দীন যিনি অভ্যুত্থানের সময় ছিলেন খুলনায়, তিনিও ফিরে এসে যোগ দেন মিটিংয়ে।

তাহের বলেন : এটা স্পষ্ট যে মূলত দুটো কারণে হাতের মুঠোয় সাফল্য পেয়েও আমরা তা ধরে রাখতে পারিনি। প্রথমত জিয়াউর রহমানের

বিশ্বাসঘাতকতা, দ্বিতীয়ত আমাদের গণজমায়েত করার ব্যর্থতা। আমাদের বিপ্লবের মিলিটারি ডায়মেশনটা সাকসেসফুল হলেও সিভিল ডায়মেশনে আমরা ফেইল করে গেছি। জাসদের যে শক্তির কথা আপনারা বলেছিলেন আমি বিশ্বাস করেছিলাম কিন্তু তার প্রতিফলন রাস্তায় ঘটেনি। আমাদের প্রধান বাধা এখন একটাই, জিয়াউর রহমান। তাকে আমরা কিভাবে ট্যাকল করব সেটাই প্রশ্ন।

ড. আখলাক বলেন : আমি তো আগেই বলেছিলাম আমরা এখন রেডি না। এই মুহূর্তে জিয়ার সাথে আবার কনফ্রন্টেশনে যাওয়া কি ঠিক হবে?

তাহের : জিয়া যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন, ডেফিনিটলি অবস্থা আমাদের কন্ট্রোলে আনতে পারতাম। জিয়ার সাথে আপস করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

জলিল, রব সকলেই তাহেরকে সমর্থন করেন। সিদ্ধান্ত হয় সৈনিকদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত জিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। ঠিক হয় যে সৈনিকরা ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চলে এসেছেন, তারা অস্ত্র জমা দেবেন না। পাশাপাশি জলিল, রব যেহেতু মুক্ত হয়েছেন তারা জাসদের গণসংগঠনগুলোকে সক্রিয় করে তুলবেন। সিপাই বিদ্রোহের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিলি অব্যাহত রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত হয় ঢাকায় যেহেতু নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেছে সুতরাং ঢাকার বাইরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে হবে। তারপর সেখান থেকে চাপ সৃষ্টি করতে হবে ঢাকার ওপর। ঢাকার বাইরের ক্যান্টনমেন্টগুলোতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কর্মকাণ্ড সীমিত মাত্রায় ছিল তাকে বেগবান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদেরও সংগঠিত করবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সৈনিকদের। মেজর জিয়াউদ্দীনকে বলা হয় সুন্দরবন গিয়ে তার পুরনো এলাকার দখল নিতে। শরীফ নুরুল আম্বিয়া দায়িত্ব নেন ঢাকার বাইরের গণবাহিনীর কর্মকাণ্ড সমন্বয় করার।

তাহের যখন জিয়াকে মোকাবেলার নানা পথ বের করছেন, জিয়া তখন ধরেছেন অন্য পথ। তিনি একের পর এক সিপাইদের সাথে মিটিং করে চলেন, ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে মাঠে, গ্যারিসন হল অডিটরিয়ামে, গলফ পার্কের কাছে। নানা নাটকীয়তা করেন তিনি সেসব মিটিংয়ে। তিনি সিপাইদের বলেন : আমি সৈনিক, রাজনীতি বুঝি না। ব্যারাকেই থাকব। আপনারা শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। এরপর তিনি একটি কুরআন শরীফ আনতে বলেন, সবার সামনে কুরআন ছুঁয়ে বলেন, আমি নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন দেব। আরেক সভায় বক্তৃতা করতে গেলে অনেক সৈনিকই বারো দফার দাবি তোলেন। হৈ হট্টোগোল তৈরি হয় সভায়। সেই সভায় উত্তেজনাবশত এক সিপাইয়ের অস্ত্র থেকে ভুলক্রমে গুলি

বেরিয়ে গেলে সেখানেই দুজন সিপাই নিহত হন। চরম এক অরাজক অবস্থা। জিয়া হঠাৎ তার ইউনিফর্মের বেল্ট খুলে রেখে বলেন, আপনারা আমার কথা শুনছেন না, আমি আর আপনাদের চিফ থাকব না।

সেনাপ্রধানের এ আচরণ দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে সিপাইরা। তারাই আবার দ্রুত গিয়ে তার বেল্ট ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, কি করেন স্যার, কি করেন স্যার। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন সিপাইরা। বহু বছরের নির্দেশ পালনের অভ্যস্থতায় তারা কোন দিকে যাবেন বুঝে উঠতে পারে না। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থেকে তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহের আর ভেতরে নির্দেশ দিচ্ছেন সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া। দোদুল্যমান সিপাইদের কাছে ক্রমশ ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের নির্দেশই শক্তিশালী হতে থাকে। দুর্বল হতে থাকে তাহেরের অবস্থান।

ঘনিষ্ঠ অফিসারদের জিয়া জড়ো করেন তার চারপাশে। তাকে ঘিরে আছেন মীর শওকত আলী, আমিনুল হক, কর্নেল হামিদ, নুরুদ্দীন প্রমুখরা। দিল্লিতে কোর্স করছিলেন ব্রিগেডিয়ার হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, তাকে ঢাকায় এনে পদোন্নতি দিয়ে ডিপুটি চিফ অফ স্টাফ করেন তিনি। তাদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসেন জিয়া। তারা এই পরিস্থিতিতে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার জন্য জিয়ার ওপর চাপ দেন। তারা বলেন : সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড তো গত কয়েক মাস ধরে ভেঙ্গেই পড়েছে, যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে তাহেরের এই অভ্যুত্থান। একে আর কোনো রকম প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। নানা মন্তব্য চলতে থাকে মিটিংয়ে :

—অফিসার, সিপাই সমান সমান এসব স্টুপিড কথা শুড বি স্টপড ইমিডিয়েটলি।

—কি ঠেকা পড়েছে যে সিপাইদের এত তোষামোদ করে চলতে হবে আমাদের?

—বহু অপমান সহ্য করা হয়েছে, আর না। এবার ওদের শায়েস্তা করতে হবে।

—ঐ ল্যাংড়া তাহেরই সব নষ্টের মূল। তাকে টাইট দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারা জিয়াকে এও বলেন যে, গুজব উঠেছে তাহের জিয়াকে হত্যা করে এবার ক্ষমতা দখল করার প্ল্যান করছে।

জিয়া বলেন : আপনারা ধৈর্য ধরেন। আমাদের এ অবস্থাটা ফেস করতে হবে। আমি ওদের দাবি দেওয়া মিটায়ে দেব।

জিয়া যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে স্পেশাল কমান্ডো ইউনিটকে ঢাকায় এনে ঘিরে ফেলেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। কিছু কিছু ইউনিটকে তিনি বদলি করেন ঢাকার

বাইরের ক্যান্টনমেন্টে। কয়জন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গেও গোপনে মিটিং করেন তিনি। জিয়ার ঘনিষ্ঠ অফিসাররা এদিকে নিয়মিত সৈনিকদের সঙ্গে মিটিং করে তাদেরকে বারো দফার অসারতা বুঝাতে থাকেন। বুঝান, হাতের পাঁচ আঙ্গুল এক না, চাইলেই সিপাই আর অফিসার এক হয়ে যায় না। তাদের বলেন, তোমাদের বিপ্লব শেষ, এখন ঠিকমতো কাজে আস।

যেমন আর্মির সিনিয়র অফিসাররা তেমনি বিপ্লব বিরোধী বুদ্ধিজীবীরাও তখন এসে দাঁড়িয়েছেন জিয়ার পাশে। ডানপন্থী পত্রিকা ইত্তেফাকের কলামিস্ট এই অভ্যুত্থান বিষয়ে লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেন : 'অন্ধকার গহ্বর হইতে সার্পেন্টাইনরা বাহির হইয়াছে। গোড়াতে ইহাদের আন্ডাবাচ্চাসহ নির্মূল করিতে হইবে। মার্ক টাইম করিবার সময় নাই।'

চীনাপন্থী বাম নেতারা তাহেরের এই তৎপরতাকে বলেন ভারতীয় উস্কানী। তারা বলেন, অফিসারদের হত্যা করে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে জাসদ আসলে ভারতের পক্ষে কাজ করছে। কেউ কেউ বলেন, এই অভ্যুত্থান পেটি বুর্জুয়া হঠকারিতা, রোমান্টিকতা।

চকিত সঙ্গ

রোমান্টিক বিপ্লবের নেতার অবশ্য কোনো ক্লান্তি নেই। দোসরা নভেম্বর অসুস্থ শরীরে গাড়ির পেছনে লুৎফার বানিয়ে দেওয়া বিছানায় শুয়ে সেই যে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসেছে তাহের এর পর আর লুৎফার সঙ্গে কোনো দেখা নেই। ফোনে বার কয়েক কথা হয়েছে মাত্র। সাতই নভেম্বরের তোলপাড়ের বেশ কয়দিন পর লুৎফা নারায়ণগঞ্জ থেকে এলিফ্যান্ট রোডে আসেন। তুমুল ব্যস্ত তখন তাহের। একের পর এক মিটিং করে চলেছেন। ছুটে বেড়াচ্ছেন এ জায়গা থেকে সে জায়গায়। লুৎফাকে দেখে মিটিং থেকে ছুটে আসেন তাহের : ভয় পাওনি তো?

লুৎফা : ভয় পাবো না মানে? তোমার একটুও চিন্তা হলো না? এতবড় একটা অ্যাকশন করলে, আমি নারায়ণগঞ্জে আছি কি হয় না হয়।

হো হো করে হেসে ওঠে তাহের : আরে তোমাকে কিছু করার সাহস এ দুনিয়ায় কারো আছে নাকি?

অভিমান করেন লুৎফা : থাক আর বাহাদুরি ফলাতে হবে না। তুমি তো জনগণের নেতা, আমাকে সময় দেবার ফুসরত আছে নাকি তোমার?

তাহের : একটু ধৈর্য ধরো প্লিজ। প্রচণ্ড একটা ক্রাইসিসের মধ্যে আছি। সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

লুৎফা : তোমার আলসারের ব্যাথাটা কেমন?

আলসারের চিন চিন ব্যাথাটি তাহেরের সর্বক্ষণিক সঙ্গী, কিন্তু তিনি তখন ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত।

তাহের বলেন : ঐ ব্যথার কথা তো ভুলেই গেছি।

লুৎফার গালে হালকা স্পর্শ করে বলেন, পরে কথা হবে। তাহের আবার ঢুকে যান মিটিংয়ে।

পেছন থেকে দেখে লুৎফা। সেই চেনা মূর্তি। হাফ প্যান্ট পড়া। একটি পায়ে হাঁটুর নিচ থেকে শূন্যতা। সেখানে কাঠের পায়ের ঠক ঠক। ঐ শব্দ তুলেই তিনি যেন কেবল এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে, তার নিয়তির দিকে।

বন্দি

তাহের জাসদ নেতৃবৃন্দের সাথে অলোচনা করে আরেকটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। সিদ্ধান্ত নেন এবার জিয়াকে উৎখাত করবেন। জিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবেন তারা। জিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রচালনার পরিকল্পনা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এবার আর কারো মাধ্যমে নয় নিজেরাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবেন। জাসদের কোনো কোনো নেতৃবৃন্দের দোদুল্যমানতা থাকলেও তাহের দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এবার জিয়ার বিরুদ্ধেই আরেকটি অভ্যুত্থান সংগঠিত করবেন তিনি। সেনাবাহিনীর জোয়ান, কৃষক, শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে অবিলম্বে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করার আহ্বান জানিয়ে ১৫ নভেম্বর জাসদের পক্ষ থেকে একটি লিফলেট ছাড়া হয় শহরে।

জিয়া নিজেকে নিয়ে গেছেন শক্ত অবস্থানে। তিনিও তার বিপদ আঁচ করতে থাকেন, জানেন তাহের সহজে হাল ছাড়বেন না। কিন্তু পরিস্থিতি এখন অনেকটাই তার দখলে। জিয়া জাসদ এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে দমন করতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। শুরু হয় ব্যাপক গ্রেফতার। আদমজী থেকে জাসদ নেতা ফজলে এলাহী বিরাট শ্রমিক মিছিল নিয়ে ঢাকায় রওনা দিলে সেনাবাহিনীর লোকেরা পিটিয়ে মিছিল ভেঙ্গে দেয় এবং ফজলেকে গ্রেফতার করা হয়। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অন্যতম নেতা হাবিলদার হাই ফজলেকে উদ্ধার করতে গেলে গ্রেফতার করা হয় তাকেও। গোয়েন্দা বিভাগকে কাজে লাগিয়ে ক্যান্টনমেন্টে সৈনিক সংস্থার সদস্যদের চিহ্নিত করে এক এক করে গ্রেফতার করা শুরু হয়। অভিযান চলে সারাদেশে। গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার জাসদের গণবাহিনী কর্মী।

কানাঘুষা শোনা যায় তাহেরকে গুপ্ত ঘাতক দিয়ে মেরে ফেলা হবে। ইউসুফ বলেন : তোমার আর এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় থাকার দরকার নেই। ইউসুফ গাড়ি ড্রাইভ করে একেকদিন একেক জায়গায় রেখে আসেন তাহেরকে।

এলিফ্যান্ট রোডে জাসদের মিটিং করা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মিটিং হয় এককে দিন এককে গোপন জায়গায়। ইউসুফই গাড়ি চালিয়ে বিভিন্ন গন্তব্য থেকে নিয়ে আসেন তাহেরকে। ইউসুফ ছাড়া কেউ জানেন না তাহেরের অবস্থান।

৭ নভেম্বরের পর বেশ কিছুদিন নারায়ণগঞ্জে তাহেরের বাসা পুলিশ পাহারা দেয়। ২১ নভেম্বর লুৎফা হঠাৎ লক্ষ করে পুলিশ পেট্রোল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাহের তখন ঢাকায় আত্মগোপন করে আছেন। তাহের ফোন করলে তাকে এখবর জানান লুৎফা। তাহের বলেন : সাবধান থেকো।

ঐদিন রাতে ইউসুফ আর তার স্ত্রী নারায়ণগঞ্জে গিয়ে লুৎফার সঙ্গে থাকেন। পরদিন সকালে তারা চলে যান ঢাকায়। ঘণ্টাখানেক পর ইউসুফের ফোন পান লুৎফা : জেলখানা থেকে বলছি।

লুৎফা : কি ব্যাপার?

ইউসুফ : তোমার ওখান থেকে ফিরে বাসায় গিয়ে দেখি আর্মি, পুলিশ ঘিরে রেখেছে চারদিক। আমাকে ধরে গাড়িতে করে নিয়ে এলো।

লুৎফা জিজ্ঞাসা করেন : তাহের কোথায়?

ইউসুফ : ফোনে বলতে পাচ্ছি না কিন্তু নিরাপদে আছে।

লুৎফা শাহাজাহান সিরাজের বাসায় ফোন করেন। কে একজন তাকে জানায় : একটু আগেই এখান থেকে জলিল, রব, ইনুসহ সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

ভয় পেয়ে যান লুৎফা। নিশ্চয় ওরা তাহেরকে হণ্যে হয়ে খুঁজছে?

সন্ধ্যায় অজ্ঞাত স্থান থেকে ফোন করেন তাহের : ইউসুফ ভাই তো জেলে।

লুৎফা বলেন : আমি জানি। তুমি কিন্তু সাবধানে থাকো।

ক্রোধ, আক্রোশ আর খানিকটা অসহায়তা ঘিরে ধরে যেন তাহেরকে। টের পান পরিস্থিতি তার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। জানেন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তবু তাহের একবার চেষ্টা করেন জেনারেল জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের। যে লোকটির সঙ্গে তেলাঢালার মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে বহুদিন চা খেতে খেতে গল্প করেছেন একসাথে, বাড়ির লনে বসে দেশের ভবিষ্যতের কথা বলেছেন, মাঝরাতে ফোন করে যে লোকটি তার কাছে জীবনরক্ষার অনুরোধ জানিয়েছে, বন্দি দশা থেকে মুক্ত যে লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন ধন্যবাদ, তার সঙ্গে একবার সরাসরি কথা বলতে চান তাহের। টেলিফোন করেন বহুবার কিন্তু বারবার তাকে বলা হয় তিনি ব্যস্ত আছেন, ফোন ধরতে পারবেন না। জেনারেল জিয়া তখন তাহেরের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাহের বেশ টের পান জিয়া তখন আর কোনো ব্যক্তি নন, জিয়া তখন একটি রাষ্ট্র। যেন তখন তিনি রক্তকরবীর রাজা, অদৃশ্য কিন্তু ক্ষমতাধর। জিয়া তখন তার বিখ্যাত সানগ্লাস দিয়ে

অদৃশ্য করে রাখেন তার চোখ। জানবার উপায় নেই তার চোখে কি খেলা করছে তখন।

একদিন শুধু তাহের ফোনে পান উপ সেনাপ্রধান এইচ এম এরশাদকে। তাহের ক্ষুব্ধ হয়ে এরশাদকে বলেন : জিয়াকে বলবেন সে একটা বিশ্বাসঘাতক এবং আমি কখনই আপস করব না। সৈনিকদের ১২ দফা দাবির ব্যাপারে কোনো ছাড় দেব না। জাসদ লিডার আর আমার ভাই ইউসুফকে এরেস্ট করার পরিণাম ভালো হবে না। তাকে বলবেন বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম তাকে ভোগ করতেই হবে।

এরশাদ বলেন : আমি তো কেবল ইন্ডিয়া থেকে আসলাম। আমি এসবের কিছুই জানি না।

বাংলাদেশের এই নাটকীয় পরিস্থিতিটি কাছ থেকে দেখবার জন্য এসময়ে আসেন সেই মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎজ, যার সঙ্গে অনেকদিন আগে তাহেরের কথা হয়েছিল বাংলাদেশের নদী আর বন্যা নিয়ে। তিনি জেনে বিস্মিত হয়েছিলেন যে এই নদী প্রেমিকই বস্তুত সিপাই বিপ্লবের নেতা। আত্মগোপনে থাকা তাহেরের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেন লিফশুলৎজ। যতই তিনি আত্মবিশ্বাস দেখান না কেন, ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারেন অবস্থা নাজুক।

লিফশুলৎজের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন তাহের। বলেন : আসলে ঘটনার গতিধারা আমাদের অ্যাকশনে যেতে বাধ্য করেছে। সময়ের আগেই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ঘটনার আকস্মিক এত দ্রুত, উত্থান, পতন আর উত্তেজনাকর পরিস্থিতির স্রোতে আমরা ভেসে যেতে বাধ্য হয়েছি। তবে সিপাইরা কিন্তু খুব সফলভাবেই অভ্যুত্থানটা সংগঠিত করেছে। ব্যাপারটা বানচাল করে দিয়েছে অফিসাররা, যার আশঙ্কা আমি করেছিলাম। আর এখন এই স্বার্থান্বেষী অফিসারদের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে জিয়া। আর জাসদের গণ সংগঠনগুলো থেকে যে সাড়া আশা করেছিলাম সেটা তারা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকার গণসংগঠনের যে ধারণা আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার পুরোটা হয়তো ঠিক না। আর আমার নিজের তো মোবিলিটির একটা রেস্ট্রিকশন আছে, নিজে সরেজমিনে গিয়ে পরিস্থিতি দেখবার সুযোগ আমার ছিল না। আমাকে বিশ্বাস করতে হয়েছে। তবু আমি হাল ছাড়ব না।

ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ পত্রিকায় তাহেরের ছবিসহ অভ্যুত্থানের খবর ছাপেন লিফশুলৎজ। তাহেরের ছবির নিচে লেখেন, 'নভেম্বর বিপ্লবের স্থপতি'। লিফশুলৎজ তাহেরের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখবার জন্য ঢাকায় অপেক্ষা করেন। বহুবছর পর তিনিই প্রথম তাহেরকে নিয়ে গন্থ রচনা করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই ব্যতিক্রমী মানুষটির দিকে।

তাঁর ভাই এবং অন্যতম সহকর্মীরা বন্দি হয়ে গেলেও গোপনে তৎপরতা চালিয়ে যান তাহের। গণবাহিনী এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার যতটুকু অবশিষ্ট শক্তি আছে তাঁকে কাজে লাগিয়ে আঘাত হানার পরিকল্পনা করেন তিনি। আনোয়ার তখনও আছেন তাঁর সঙ্গে।

২৩ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার একটি পূর্বনির্ধারিত গোপন মিটিংয়ে অংশ নেন তাহের, সঙ্গে আনোয়ার। সে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় ২৪ নভেম্বর সৈনিক সংস্থার বিভিন্ন ইউনিট সংগঠকদের প্রতিনিধিত্বমূলক সভা হবে। আনোয়ারের বন্ধু এস এম হলের আবাসিক শিক্ষকের বাসায় এই মিটিং হবে ঠিক করা হয়। তাহের রিকশায় আনোয়ারসহ মোহাম্মদপুরে বড় ভাই আরিফের বাসায় যান। ইউসুফের স্ত্রী ছিলেন সেখানে। তাহের ঠাট্টা করেন তার সঙ্গে : ভাবী চিন্তা করবেন না, ইউসুফ ভাই জেলে গিয়ে তো বিখ্যাত হয়ে গেছে।

সেদিন তাহের এবং আনোয়ার সোবহানবাগে তাঁদের ফুফুর বাসায় থাকেন। সকালে বেরিয়ে যান আনোয়ার। ফিরে আসেন দুপুরের একটু পরে। তাঁদের মিটিং বিকাল পাঁচটায়। ভেবেছিলেন তাহেরকে নিয়ে একসঙ্গে যাবেন। আনোয়ার এসে শোনেন তাহের এস এম হলে রওনা হয়ে গেছেন। একটি বেবিট্যাক্সি নিয়ে রওনা দেন আনোয়ার। হল গেটের কাছে পৌঁছাতেই দেখেন কয়েক ট্রাক পুলিশ হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আনোয়ার দ্রুত সরে পড়েন। জানতে পারেন তাহেরসহ মিটিংয়ে উপস্থিত সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। বুঝতে পারলাম আগের দিনের মিটিংয়ে উপস্থিত কোনো সদস্যই ধরিয়ে দিয়েছে তাহেরকে। তাহেরকে ধরিয়ে দেবার জন্য নানা কৌশল, ফাঁদ, পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে তখন সেনাবাহিনী।

ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসেন আনোয়ার। হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তাহেরের গ্রেফতারে চরম হতাশা নেমে আসে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা এবং জাসদের মধ্যে। তাদের মনে হয় তাহের বন্দি হওয়াতে যেন শেষ আশাটিও নির্বাপিত হলো।

জেল থেকে লুৎফাকে ফোন করেন তাহের : এরেস্ট হয়ে গেলাম। সাহস রাখো, চিন্তা করো না।

পরদিন জেল গেটে লুৎফা আর তাহেরের বড় ভাই আরিফ শীতের হাওয়ায় শুকনো পাতার উড়াউড়ি দেখতে দেখতে বসে থাকেন। তাদের কাছে তাহেরের জন্য কয়েকটি জামা-কাপড় আর তার নকল পা'টি। জেল প্রহরী জিনিসগুলো তাদের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে বিদায় করে দেন তাঁদের। তাহেরের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মেলে না।

জীবন মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা আর গণবাহিনীর সদস্যদের মনে হয় অনেকদিন ধরে গড়ে তোলা একটা স্বপ্নের পাহাড় যেন তাদের চোখের সামনে ধসে পড়ছে। এই মরিয়া মুহূর্তে এক মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে গণবাহিনীর আগে থেকে তৈরি করে রাখা সুইসাইড স্কোয়াড। এই স্কোয়াডের নেতা বাহার। তাহেরেরই দুর্ধর্ষ সাহসী, সুদর্শন ভাই। সদস্য তাঁর ভাই বেলালও। তাদের সঙ্গে আছেন চার তরুণ সবুজ, বাচ্চু, মাসুদ এবং হারুন। তারা সিদ্ধান্ত নেয় সুইসাইড স্কোয়াডের মাধ্যমে কোনো একজন রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করে জিয়া সরকারকে বাধ্য করা হবে তাহেরসহ অন্যান্য বন্দি জাসদ নেতাদের মুক্তি এবং সৈনিকদের দাবি মানতে বাধ্য করতে। এ প্রসঙ্গে তারা আলাপ করে নেন ঢাকা শহরের গণবাহিনীর প্রধান আনোয়ারের সঙ্গেও। প্রয়োজনে দূতাবাসের কাউকে জিম্মি করার এমন পরিকল্পনা সুইসাইড স্কোয়াডের আগেই ছিল। বাহারের নেতৃত্বে প্রস্তুত হয় আত্মঘাতী ছয় জনের ঐ দল। সিদ্ধান্ত নেন নিজের জীবনের বিনিময়ে মুক্ত করবেন তাঁর ভাই, তার সহযোদ্ধাদের।

আগেই নানা দূতাবাসের কিছু তথ্য সংগ্রহ করা ছিল তাদের। বিশেষত তারা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কখনো যদি কোনো রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করার প্রয়োজন হয় তাহলে তারা মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করবেন। তখন বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদুত বোস্টার। তার ব্যাপারে এই স্কোয়াড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বোস্টারের সব কর্মকাণ্ড তারা রেকি করে রেখেছিলেন। বোস্টারের বাসা ছিল ধানমণ্ডি মাঠের উল্টোদিকে। তারা লক্ষ করেছেন যে, প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠেন বোস্টার। একঘণ্টা জগিং করেন। তারপর নাস্তা করে বের হন সকাল আটটায়। চলে আসেন আদমজী কোর্ট বিল্ডিং-এর অফিসে। বোস্টার কোনোদিন লিফট ব্যবহার করেন না। পুরো পাঁচতালা সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন দ্রুত। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার তাদের জন্য কারণ তার যাবতীয় গতিবিধি তাদের নখদর্পণে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টান তারা। জাসদের ব্যাপার তখন একটি মহলের ব্যাপক প্রচারণা ছিল যে, তারা ভারতীয় এজেন্ট। এ ধারণা খণ্ডাবার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকেই তারা জিম্মি করবেন।

তাহের গ্রেফতার হয়েছেন ২৪ নভেম্বর, তারা সিদ্ধান্ত নেন ২৬ নভেম্বরই অপারেশনে যাবেন। দেরি করবার সুযোগ তাদের নেই। মাঝখানের একটি দিন তারা রাখেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের ব্যাপারে রেকি করতে। রেকির জন্য মোটেও তা পর্যাপ্ত সময় নয়। রেকিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে দলের সদস্যদের ইন্ডিভিজুয়াল রেকি, তারপর টোটাল রেকি এবং শেষে সামিং আপ হবার কথা। কিন্তু হাতে

যথেষ্ট সময় নেই তাদের। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তখন সমর সেন। তার বিষয়ে ভালো তথ্য ছিল না তাদের কাছে। দলের মধ্যে শুধু বাচ্চুর কিছুটা ধারণা ছিল ভারতীয় দূতাবাস এবং রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে। এছাড়াও ২৫ তারিখ বেলাল এবং বাহার দুজনই সাধারণ সাক্ষাতপ্রার্থী হিসেবে ঘুরে আসেন ভারতীয় দূতাবাস। দূতাবাসের রিসেপশনে বাহার বলেন কজন বন্ধু মিলে পায়ে হেঁটে ভারত হয়ে বিশ্বভ্রমণে বের হতে চান তারা, এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কারো সঙ্গে কথা বলবার জন্য পরদিন সকাল দশটায় একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেন। এ সুযোগে দূতাবাসের বিভিন্ন অবস্থান এবং সমর সেনের গতিবিধিও পরীক্ষা করে নেন তারা।

নিজেদের দেখা এবং অন্যান্য কয়েকটি সূত্র থেকে যে তথ্য তারা পেয়েছেন তাতে তারা জেনেছেন সমর সেনের সঙ্গে নিয়মিত ৪ জন সিকিউরিটি থাকে। ঐ চারজন একটা জীপে সবসময় তার গাড়ির পেছন পেছন স্কর্ট করে আসে। সমর সেন মাঝে মাঝে তার গুলশানের বাসা থেকে মেয়েকে নিয়ে বের হন এবং তাকে ড্রপ করে গাড়ি মেয়েকে নিয়ে স্কুলে চলে যায়। এই চারজন বিশেষ নিরাপত্তা পুলিশ ছাড়াও ভারতীয় দূতাবাসের গেটের বাইরে পাহারায় থাকে বাংলাদেশের পুলিশ এবং ভেতরে ভারতীয় পুলিশ। সবুজ বলেন, অফিসে আসার পথেই তাকে কিডন্যাপ করলে বোধহয় ভালো হবে। বাহার বলেন, কিন্তু জিম্মি করার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে জানানো প্রয়োজন যে, তাদের হাইকমিশনার কিডন্যাপড হয়েছে, তাতে সাথে সাথেই তারা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে প্রেসারাইজ করতে শুরু করবে। সুতরাং অফিসে কিডন্যাপ করলে তাড়াতাড়ি কমিউনিকেট করা যাবে, ইন্ডিয়ান আর বাংলাদেশ দুই গভর্নমেন্টের সাথেই। তাছাড়া রাস্তা থেকে কিডন্যাপ করে কোনো বাড়িতে নিয়ে উঠালে গভর্নমেন্ট কি করবে জানো? রেসকিউয়ের নামে পুরা বাড়ি ঘেরাও করে সমর সেন সুদ্ধ আমাদের সবাইরে মেরে ফেলবে। তারপর বলবে কিডন্যাপারারাই হাইকমিশনারকে মারছে। আমাদের কোনো অবজেকটিভই ফুলফিল হবে না।

সুতরাং দূতাবাস আক্রমণ করাই সবদিক থেকে ঠিক হবে বলে তারা সিদ্ধান্ত নেন। জিম্মি করার পর যে দাবিনামা তারা পেশ করবেন সেটিও চূড়ান্ত করে নেন :

এক. তাহেরসহ জাসদের সব বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি। তারা মুক্ত হয়ে নিরাপদ স্থানে যাবার পরই ধরে নেওয়া হবে দাবি মানা হয়েছে।

দুই. পর্যায়ক্রমে সৈনিকদের ১২ দফা মানার অঙ্গীকার।

তিন. অন্য সব রাজবন্দির মুক্তি।

চার. নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা।

পাঁচ. বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপকারী আমেরিকা এবং ভারতের দূতাবাস সাময়িক বন্ধ ঘোষণা।

আর এই জিম্মির অজুহাতে ভারত কোনো রকম হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাত সমর সেনকে হত্যা করা হবে।

২৬ নভেম্বর সকাল সাড়ে নটায় ছয় জনের দলটি পৌঁছান ধানমণ্ডি ভারতীয় দূতাবাসে। স্কোয়াডের কমান্ডার বাহার। দুটো দলে তারা ভাগ করেন নিজেদের। এক দলে বেলাল, বাহার আর সবুজ অন্য দলে আসাদ, বাচ্চু ও মাসুদ। জার্মান কালচারাল সেন্টারের কাছে প্রথম দলটি আর অন্য দলটি ভিসা অফিসের সামনে। তাদের সবার কাছে লুকানো রিভলভার, মাস্ক, কর্ড নাইলন রোপ আর ছুড়ি। আর দাবি দাওয়াসহ রেডিওতে প্রচারের জন্য একটি ভাষণের কপি। দুর্ধর্ষ এক অভিযানের দ্বারপ্রান্তে তারা, হয় জয়, নয়তো মৃত্যু। বাংলাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই সুইসাইড অপারেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাহেরের সবচেয়ে ছোট ভাই, অকুতো ভয় বাহার। অন্যতম সহযোগী আরেক ভাই বেলাল। সঙ্গে মরণের নেশায় পাওয়া চার টগবগে তরুণ।

সকাল পৌনে দশটার দিকে তারা দেখতে পান সমর সেনের গাড়িটি আসছে। সমর সেনের গাড়িটি ঢুকবার আগেই বেলাল, বাহার আর সবুজের প্রথম দলটি ঢুকে যান দূতাবাস চত্বরের ভেতরে। সবাই পরিপাটি পোশাক পরা। রিসেপশন রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ান তিনজন। সমর সেনের গাড়ি এসে পোর্টিকোতে দাঁড়ায়। পেছনের জীপটিও আসে। জীপ থেকে চার জন সিকিউরিটি নামে। সমর সেনের গাড়ি এবং জীপের পেছন পেছন সুইসাইড স্কোয়াডের দ্বিতীয় দল আসাদ, বাচ্চু ও মাসুদ ঢোকে। সমর সেন গাড়ি থেকে নামেন। তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় সিকিউরিটি চার জন। তাদের কাঁধে ইন্ডিয়ান এসএমজি আর দুটো করে ম্যাগাজিন। সমর সেন দু ধাপ সিঁড়িতে উঠেন। ঠিক এইসময় আচমকা বেলাল গিয়ে জাপটে ধরেন সমর সেনকে এবং তাঁর অস্ত্র বের করেন। বেলাল চিৎকার করে বলেন : মি. সেন টেল ইওর মেন নট টু ফায়ার, আদারওয়াইজ, আই শ্যাল কিল ইউ। ইউ আর আওয়ার হস্টেজ। বেলাল কথাগুলো প্রথমে ইংরেজিতে, তারপর হিন্দিতে এবং সবশেষে বাংলায় বলেন।

বাহার অস্ত্র বের করে সমর সেনের চার জন বডিগার্ডকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। স্কোয়াডের বাকিরাও তাদের সঙ্গে অস্ত্র বের করেন। সমর সেনের বডিগার্ডরা বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে। এসময় সবুজ এসে সমর সেনের একটি হাত ধরেন, অন্য হাত ধরেন বেলাল। বাহার রিভলভার হাতে সমর সেনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান। এ অবস্থায় সমর সেনকে ধরে তারা দোতলায় তার অফিসরুমের দিকে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকেন। সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে উপরে উঠবার জন্য তারা একটি বাঁক নিতে যাবেন এসময় হঠাৎ ভেতরের প্যাসেজ থেকে শুরু হয় ফায়ার। এটি ছিল হাইকমিশনারের নিরাপত্তারক্ষাকারী গোপন অতিরিক্ত দল। এর খবর সুইসাইড স্কোয়াডের কারো জানা ছিল না।

প্রথম গুলিটি লাগে বাহারের। গুলি খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকেন বাহার। পড়তে পড়তেই তিনি চিৎকার করে দলের সদস্যদের বলেন : সমর সেনরে গুলি কইরোনা কিন্তু।

তারা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একেবারে অপরাগ না হলে সমর সেনকে সহজে গুলি করবেন না তারা। এতে করে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের একটি অজুহাত পেয়ে যেতে পরে। সিঁড়ির উপরই নিথর হয়ে যায় বাহারের দেহ। আচমকা লাগাতার গুলিবর্ষণে বাহারসহ ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান হারুন, মাসুদ, বাচ্চু। গুলি লাগে সমর সেনের এবং সুইসাইড স্কোয়াডের বাকি দুই সদস্য বেলাল আর সবুজেরও।

এসময় দুজন ভারতীয় নিরাপত্তাকর্মীকে জড়িয়ে ধরে তাদের ঢাল হিসেব ব্যবহার করেন বেলাল এবং সবুজ। এরপর তারা আত্মসমর্পণ করেন বাংলাদেশ পুলিশের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে এসে পৌঁছান ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিজিএস ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর। যে মঞ্জুর তাহেরের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন পাকিস্তান থেকে। বেলালকে চিনতে পারেন তিনি। বেলাল এবং সবুজকে নিয়ে যাওয়া হয় সিএমএইচে চিকিৎসার জন্য এবং সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জেলে। করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে এদেশের ইতিহাসে অনন্য এক দুঃসাহসিক অভিযানের।

সুইসাইড স্কোয়াডের মৃত চার সদস্যদের নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেলের মর্গে। দ্রুতই ঘটনার খবর পেয়ে যান আনোয়ার। তাঁর ভাই আর মৃত সহযোদ্ধাদের দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন তিনি। মর্গের দিকে রওনা দেন। কিন্তু গোয়েন্দা তখন তাকে খুঁজছে। আনোয়ার রাতে মেডিকেল কলেজের কিছু ছাত্রের সহায়তায় এ্যাপ্রোন পড়ে মেডিকেল ছাত্র সেজে চলে যান মর্গে। ডোম একটি ঘর খুলে দিলে আনোয়ার দেখতে পান মেঝেতে পড়ে আছে তার চার অকুতভয় শহীদ সাথী। তাদের মধ্যে একজন তার ভাই বাহার। যে বাহার যুদ্ধের সময় বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া তরুণীদের মুগ্ধ চোখের সামনে দিয়ে রাইফেল কাঁধে নিয়ে চলে যেত অপারেশনে। সাতই নভেম্বর ঢাকার রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মাইকে ভেসে উঠেছিল যার কণ্ঠ ... ষড়যন্ত্রকারীদের উৎখাত করে বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে... আনোয়ার দেখে মর্গে নিস্পাপ মুখে শুয়ে আছে সে, যেন ঘুমিয়েছে কেবল।

এর কদিন পরই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থারই এক সদস্য, বিমানবাহিনীর কর্পোরাল ফখরুল আলম, যিনি গোয়েন্দাদের চর হয়ে ঢুকেছিলেন সংস্থায় এক প্রতারণার ফাঁদ পেতে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন আনোয়ারকে, তার সাথে বন্দি হন গণবাহিনীর স্পেশাল স্কোয়াডের সদস্য মুশতাক আর গিয়াস। এই কর্পোরাল ফখরুল আলমই পরে হন মামলার রাজসাক্ষী।

তাহের এবং তাঁর সবকটি ভাই একে একে গ্রেফতার হয়ে নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে। একই পরিধিতে তারা একে অপরের কাছাকাছি। যেমন তারা সবাই ৭ নভেম্বরের সিপাই বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে ছিলেন একই পরিধিতে, কাছাকাছি। যেমন তারা সবাই ১১ নম্বর সেক্টরের রণাঙ্গনেও ছিলেন একই পরিধিতে, কাছাকাছি। সহোদরদের এ এক বিরল যৌথ জীবন।

বন্দি করার পর তাহের, ইনু, ইউসুফকে কিছুদিন এক সঙ্গে রাখা হয় ঢাকা কারাগারের ৮ নং সেলে। এটি কনডেম সেল নামে বিখ্যাত, যা ফাঁসির আসামিদের জন্য নির্ধারিত। সেখানেই তারা ভারতীয় দূতাবাসের ট্র্যাজিডির কথা শুনতে পান। বাহারের আত্মহুতি আবেগাক্রান্ত করে তোলে তাহেরকে। নিজের ভাইয়ের জন্য, বিপ্লবী সহযোদ্ধাদের জন্য এতটা ভালোবাসা, এতটা সাহস মজুদ রেখেছিল তার এই দুরন্ত ভাইটি ভেবে বিষণ্ন হয়ে পড়েন তাহের। বলেন : আমাদের কঠিন দুঃসময় এখন। প্রতিটি জীবন আমাদের জন্য সম্পদ। ভেবেচিন্তে এগুতে হবে আমাদের। এই অপারেশনের সিদ্ধান্তটা বোধ হয় ঠিক হয়নি।

কিছুদিন পর বন্দি জাসদ নেতাদের একেকজনকে একেক জেলে স্থানান্তর করা হয়। হেলিকপ্টারে করে তাহেরকে পাঠানো হয় রাজশাহী জেলে। ইনুকে সিলেটে। তাহেরের অন্য ভাইদেরও বিভিন্ন জেলে। কেবল সাঈদ তখনও ফেরারি হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

লুৎফার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই তাহেরের। পরিবারজুড়ে আতঙ্ক, অনিশ্চিয়তা। লুৎফা দিনের পর দিন কারা কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্ণা দেন, খোঁজ চান তাহেরের, দেখা করতে চান তার সঙ্গে। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ কিছুই জানান না।

দূরে দেখা আলোর শিখার দিকে একটা ঘোর লাগা পতঙ্গের মতো ছুটে চলছিলেন তাহের। স্থির হবার সময় ছিল না এক মুহূর্ত। একটার পর একটা লক্ষ্য ডিঙ্গিয়ে তাহের ছুটে চলেছিলেন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। কিন্তু এই জেল জীবন যেন হঠাৎ স্তব্ধ করে দেয় তাকে। থামিয়ে দেয় তার চলার পথ। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, তাকে যেন দাঁড় করিয়ে দেয় তার নিজের মুখোমুখি। এমন নিরবচ্ছিন্ন, কর্মহীন জীবন কখনো ছিল না তার। জেলের ছোট্ট সেলে শুয়ে, বসে, পায়চারী করে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন তাহের। সময় কাটাতে জেলের লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়েন। আর বসে বসে চিঠি লেখেন সবাইকে। প্রতিটি চিঠি জেল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে সিল দেন Cencored and Passed', তারপরই কেবল সেই চিঠি যায় জেলের বাইরে। কখনো কখনো চিঠির কিছু অংশ কালি দিয়ে ঢেকে দেন কর্তৃপক্ষ। নিরীহ, আটপৌড়ে কথাই লিখতে হয় তাকে। লুৎফাকে লেখেন '...এখানে বন্দি হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো সমস্যা

নাই। একেবারে অলস দিন কাটচ্ছি। কারো সাথে কথা বলবার নেই, কিচ্ছু করবার নেই। এখানকার লাইব্রেরীটা বাজে। বই সব প্রায় পড়ে শেষ করে ফেলেছি। তোমাকে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় তাহলে অবশ্যই প্রচুর বই আনবে। এখানকার আবহাওয়া অদ্ভুত। সকালে খুব শীত তো দুপুরে প্রচণ্ড গরম।'

মাকে লেখেন '...আমি ভালো আছি, চিন্তা করবেন না। আর গুজবে কান দেবেন না ...।' তাহেরকে নিয়ে অনেক সত্য-মিথ্যা কথা হয়তো কানে আসছে তার মায়ের, তাই আশ্বস্ত করছেন তাকে।

রাজশাহী জেল থেকে পাওয়া চিঠির মাধ্যমেই লুৎফা প্রথম খোঁজ পান তাহেরের। মনে খানিকটা স্বস্তি এলেও দুশ্চিন্তা যায় না লুৎফার। তাহেরের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতির জন্য হন্যে হয়ে ঘোরেন নানা জনের কাছে। অনুমতি মেলে না।

সব ভাইরা যখন জেলে বন্দি, সাঈদ কেবল নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ান ফেরারি হয়ে। তার নেতা ভাই তাহেরের জন্য মন ভেঙ্গে আসে তার। আত্মগোপনে থেকে বন্ধুকে বলেন : তাহের ভাই খালি কয় মানুষরে বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো ঐ বিশ্বাসই তার কাল হইলো। জিয়ারে বিশ্বাস করল উনি, সিরাজুল আলম খানরে বিশ্বাস করল। আমি তারে সাবধান করছিলাম বার বার। এঙ্গেলসের একটা কথা পড়ছিলাম বহু আগে—'যুদ্ধের মতো অভ্যুত্থানও একটা আর্ট, অভ্যুত্থান নিয়া খেলা কইরো না।'

গোপন বিচার

১৯৭৬-এর জুনে দেশের নানা জেলে ছড়িয়ে থাকা জাসদ এবং সৈনিক সংস্থার বন্দিদের একে একে আবার আনা হয় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। এসময় পত্রিকায় খবর বেরোয়, বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে এবং এই ট্রাইবুনালকে সাধারণ আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ, সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে অপরাধ, সামরিক আইনের বিরুদ্ধ অপরাধ সব ক্ষেত্রেরই বিচারের এক্তিয়ার দেওয়া হয়েছে। বন্দিরা টের পান একটা বিচারের মুখোমুখি করবার জন্যই তাদেরকে জড়ো করা হচ্ছে।

বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইবুনালের প্রধান নিয়োগে জটিলতা দেখা দেয় কারণ কোনো মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার এই ট্রাইবুনালের প্রধান হতে অস্বীকৃতি জানান। শেষে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান করা হয় কর্নেল ইউসুফ হায়দারকে। যিনি বাঙালি হলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হয়ে চাকরি করেছেন। এই ট্রাইবুনালের সদস্য করা হয় দুজন সামরিক অফিসার এবং দুজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে। প্রচলিত রীতিতে মার্শাল ল কোর্টে বিচার বিভাগ থেকে সেশন জজ, অতিরিক্ত সেশন জজ প্রমুখদের বিচারক হিসেবে

নেওয়া হলেও এই ট্রাইবুনালে তেমন কোনো নিশানা দেখা যায় না। সেই সঙ্গে জারি করা হয় আশ্চর্য এক অধ্যাদেশ। যে অধ্যাদেশে বলা হয় এই ট্রাইবুনাল যে রায় দেবে তার বিরুদ্ধে কোনো রকম আপিল করা চলবেনা। বলা হয় বিচার চলবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে এবং বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

যেদিন ট্রাইবুনাল গঠনের অধ্যাদেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে সেদিনই ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ইউসুফ হায়দার সদলবলে জেল পরিদর্শনে আসেন। ডিআইজির ছোট রুমটিকেই রূপান্তরিত করা হয় একটি আদালতে। লোহার জাল দিয়ে ঘরটাকে দুভাগ করা হয়। অভিযুক্তদের বসার ব্যবস্থা করা হয় সেই লোহার খাঁচার ভিতর আর খাঁচার বাইরে আইনজ্ঞদের বসার স্থান। পাশাপাশি কোর্টের মতো করে ট্রাইবুনাল সদস্যদের বসার ব্যবস্থা। এরপর দিন সেনাবাহিনীর লোকদের জেলখানাকে ঘিরে ফেলতে দেখা যায়। জেলের ভেতরে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র সদস্য থাকবার কোনো নিয়ম না থাকলেও জেলখানার গেটে, আশপাশের বাড়ির ছাদে এমনকি জেলের ভেতরেও ভারী মেশিনগান নিয়ে পাহাড়ায় বসে সিপাইরা।

একটা তাড়া, কঠোর গোপনীয়তা আর কড়া নিরাপত্তার তোড়জোড়। তাহের বুঝতে পারেন নিভৃতে, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করবার পাঁয়তারা শুরু হয়েছে।

১৮ জুন ভোরে একে একে বিচ্ছিন্ন সেল থেকে সবাইকে জড়ো করা হয় জেলখানার ভেতরে ডিআইজির রুমে। জাসদ, গণবাহিনী, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন নানা জেলে, অনেকদিন পর পরস্পর মুখোমুখি হন তারা। ইউসুফ, বেলাল, জলিল, রব, ইনু, ড. আখলাক, মো. শাজাহান, মেজর জিয়াউদ্দীন, মান্না, হাবিলদার হাই প্রমুখেরা একে অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ঘোষণা করা হয় অভিযুক্তদের নাম। সামরিক, বেসামরিক মিলিয়ে মোট বত্রিশজন অভিযুক্ত। অভিযুক্তরা তখনও স্পষ্টভাবে জানেন না কি অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে।

সবাই তাহেরকে খোঁজেন। তাকে দেখা যায় না। শোনা যায় তাহের এ মামলায় উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

অভিযুক্তদের পক্ষে মামলা লড়তে আসেন বাংলার এককালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ আইনজীবী আতাউর রহমান খান, আইনজীবী জুলমত আলী খান, আমিনুল হক, আবদুর রউফ, অ্যাডভোকেট গাজীউল হক প্রমুখ।

আতাউর রহমান খান দেখা করেন তাহেরের সঙ্গে। তাহের উত্তেজিত হয়ে বলেন : কিসের মামলা? যে গভমের্ন্টকে আমি পাওয়ারে বসিয়েছি এত বড় সাহস যে তারা আমার বিরুদ্ধে মামলা করে?

আতাউর রহমান খান বলেন : সেটা ঠিক তাহের। কিন্তু এখন একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আপনি আদালতে আসেন।

তাহের শেষে তাঁর ক্রাচে শব্দ তুলে এসে হাজির হন আদালতে। তাহেরকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন সবাই। নেতার সঙ্গে বুকে বুক মেলান সকলে। সবাইকে দেখে আনন্দিত হন তাহের। কিন্তু ভেতর ভেতর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তিনি। বাকি সবার মনেই অনিশ্চয়তা আর ক্রোধ। বিরক্তি নিয়ে তাহের বসেন আসামিদের জন্য বরাদ্দ লোহার খাঁচার বেস্টনীতে।

আসামিদের বিরুদ্ধে দু ধরনের অভিযোগ আনা হয়, এক, সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র, দুই সশস্ত্র বাহিনীকে বিদ্রোহে প্ররোচণা দান। মামলার কাগুজে নাম রাষ্ট্র বনাম মেজর জলিল গং। জাসদের সভাপতি হিসেবে মেজর জলিলের নামটিই আগে আসে কিন্তু সবাই জানেন যে মামলার আসল লক্ষ্য কর্নেল তাহের।

বিচারকাজ শুরু হবার আগে আইনজীবীদের শপথ করানো হয় যে ৭ বছর সময়ের মধ্যে এ বিচারের চূড়ান্ত গোপনীয়তা মানতে হবে এবং এ শপথ ভঙ্গ করলে হবে কঠিন শাস্তি।

নিয়মমাফিক প্রথমে এক এক করে আসামিদের হাজিরা। নাম ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে উঠে দাঁড়াতে বলা হয়। আবু ইউসুফের নাম ডাকার পরও তিনি বসে থাকেন। তিনি বলেন : আমার নাম ঠিকমতো উচ্চারণ করা না হলে আমি উঠব না।

ট্রাইবুনাল সদস্য বলেন : আপনার নাম আবু ইউসুফ, তাই তো ডাকা হয়েছে।

ইউসুফ বলেন : আমার সঠিক নাম আবু ইউসুফ বীরবিক্রম। যুদ্ধ করে এ খেতাব আমি অর্জন করেছি কারো দয়ায় নয়, এটা আমার নামের অংশ।

বীরবিক্রম খেতাবসহ তার পুরো নাম ডাকলে ইউসুফ উঠে দাঁড়ান। অভিজাত ভঙ্গিতে একটি প্রতিবাদের দৃশ্যের অবতারণা করেন ইউসুফ।

এরপর রাজসাক্ষীদের আনা হয় আসামি চিহ্নিত করতে। প্রধান রাজসাক্ষী কর্পোরাল ফখরুল যিনি আনোয়ারকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, বিপক্ষ দলের চর হিসেবেই বস্তুত তিনি কাজ করছিলেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থায়। এছাড়া হাবিলদার বারি যিনি অভ্যুত্থানের আগে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লিফলেটটি লিখেছিলেন এবং সুবেদার মাহবুব যিনি অভ্যুত্থান শুরুর প্রথম ফায়ারটি করেছিলেন। বারী এবং মাহবুব ভয়াবহ নির্যাতনের মুখে রাজসাক্ষী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজসাক্ষী হবার বিনিময়ে তারা পেয়েছিলেন মামলা থেকে মুক্তি এবং বিদেশে যাবার সুযোগ। বহু বছর পর জার্মান প্রবাসে গিয়ে একটি বই লেখেন মাহবুব, যে নির্যাতনের রাজসাক্ষী হয়েছিলেন তার রোমহর্ষক বর্ণনা দেন তিনি।

অভিযুক্তদের আইনজীবীরা রাজসাক্ষীদের লিখিত ভাষ্যগুলো দেখতে চান। কিন্তু রাজসাক্ষীদের সাক্ষ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করে কোর্ট। সরকারি এবং অভিযুক্তদের আইনজীবীদের মধ্যে শুরু হয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান তাহের। বলেন : আপনাদের ইচ্ছামতো একটা রায় লিখে দিলেই পারেন, আমাদের এখানে বসিয়ে রাখার তো প্রয়োজন নেই। আই রিফিউজ টু এটেন্ড দিস কোর্ট। এই বলে তাহের লোহার বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে ক্রাচে শব্দ তুলে এগিয়ে যেতে থাকেন সামনে। অন্যরাও তখন তার পেছনে পেছনে উঠে গিয়ে স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে যান আদালত থেকে। যাবার সময় অভিযুক্তদের মধ্যে কে একজন জুতা ছুড়ে মারেন ইফসুফ হায়দারের দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন বিচারকরা। আদালত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

প্রথম দিন অভিযোগ উত্থাপনের পর মামলা মুলতবী রাখা হয় আট দিন। যদিও সরকার কয়েক মাস ধরে এ মামলা সাজিয়েছে, কিন্তু আসামিদের মামলার কাগজপত্র সাজানো এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় দেওয়া হয় এই আট দিনই। আট দিন পর আবার অভিযুক্তদের আনা হয় আদালতে। এবার তাদের আনা হয় খালি পায়ে এবং হাতে হাত কড়া পরিয়ে, যাতে জুতা ছোড়ার মতো কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এমনকি প্রথমবারের মতো কোনো নাটকীয়তা যাতে তৈরি না হয় সেজন্য আসামিদের লোহার খাঁচার ভেতর বসিয়ে তালা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবার। যেন ক্ষিপ্ত কতকগুলো জন্তুকে আটকে রাখবার চেষ্টা চলছে।

সাংবাদিক লিফশুলৎজ তখনও ঢাকায়। তাহের এবং তাঁর সঙ্গীদের যেদিন দ্বিতীয় দফা বিচার কাজ শুরু হয় সেদিন এই ট্রাইবুনালের সদস্যদের সাথে কথা বলবার ইচ্ছা নিয়ে লিফশুলৎজ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেটে গিয়ে দাঁড়ান। অনেক উঁচু, রংচটা, হলুদ বিবর্ণ দেয়ালের ভেতর তখন এ অঞ্চলের ইতিহাসে বিরল এক বিচারের প্রস্তুতি চলছে। মামলার পোশাক পড়া আইনজীবীরা জেল গেট দিয়ে ঢোকেন আর বন্ধ হয়ে যায় ভারী গেট। লিফশুলৎজ ইউসুফ হায়দারসহ দু একজন ট্রাইবুনাল সদস্যদের ছবি তোলেন। পুলিশ এসে বাধা দেন ছবি তুলতে। বলেন : এ মামলার কাজ রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার অন্তর্ভুক্ত আপনি ছবি তুলতে পারাবেন না।

লিফশুলৎজ বলেন : আমি এক বছর ধরে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা করছি কখনো তো এমন নিয়মের কথা শুনিনি। আমাকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের লিখিত নির্দেশ না দেখালে আমি এখান থেকে সরছি না। এটা সাংবাদিক হিসেব আমার দায়িত্ব।

এরপর লিফশুলৎজকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলের ভেতরে নিয়ে যান। পুলিশ তার কাছ থেকে ছবিগুলো চান কিন্তু লিফশুলৎজ দিতে অস্বীকার করেন। পুলিশ কর্মকর্তা তখন এনএসআই এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফোন করেন।

কিছুক্ষণ পরই আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে কয়েকজন অফিসার এসে জেরা শুরু করেন লিফশুলৎজকে। তারা জিজ্ঞাসা করেন : এ মামলা নিয়ে আপনার এত আগ্রহ কেন?

লিফশুলৎজ বলেন : গোপন রাজনৈতিক বিচার সেটা স্ট্যালিন, ফ্রাঙ্কো , জিয়া যেই করুন না কেন আমি সমানভাবে আগ্রহী।

একজন আর্মি অফিসার তখন তার ক্যামেরাটি কেড়ে নেন, ফিল্মগুলো খুলে ফেলেন। লিফশুলৎজকে কিছুদিন নজরবন্দি করে রাখার পর দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়।

মামলা শুরু হলে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা ট্রাইবুনালের অভিযোগগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এক এক করে খণ্ডন করতে শুরু করেন।

আসামিদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ বৈধ সরকারকে উৎখাতের অপচেষ্টা। তারা প্রশ্ন তোলেন কোন বৈধ সরকারের কথা বলা হচ্ছে এখানে? প্রথমত বৈধ সরকার ছিল শেখ মুজিবের, তাকে উচ্ছেদ করেছেন মোশতাক সরকার, দ্বিতীয়ত, মোশতাক সরকারকে উচ্ছেদ করেছেন খালেদ মোশারফ। কিন্তু খালেদ মোশারফ তো কোনো সরকারই গঠন করেননি। তিনি নিজে তো কোনো সরকার প্রধান ছিলেন না। তারা প্রশ্ন তোলেন ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কি কার্যত কোনো সরকার ছিল? যদি থাকে তাহলে কে ছিলেন সে সরকার প্রধান? দেশের প্রেসিডেন্ট তখন বিচারপতি সায়েম, যাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন খালেদ মোশারফ। জেনারেল জিয়া এবং কর্নেল তাহের উভয়েই সিপাই অভ্যুত্থানের পর বিচারপতি সায়েমকেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল রাখলেন। তাহলে উৎখাত হলো কে? আর এটি যদি অবৈধ সরকারই হয় তাহলে জিয়া ৭ নভেম্বরের এই দিনটিকে বিপ্লব দিবস হিসেবেই বা পালন করছেন কেন? অভিযোগের এই অসংখ্য স্ববিরোধিতা তুলে ধরলেও সরকার পক্ষ থাকেন নীরব।

দ্বিতীয় অভিযোগটি গোলমেলে। অভিযোগ করা হয়েছে সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির। অভিযুক্তদের আইনজীবী আদালতকে স্মরণ করিয়ে দেন, 'ভুলে যাবেন না তাহেরের নেতৃত্বে সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন জিয়া এবং জেনারেল জিয়াই তাহেরকে এরকম একটি উদ্যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সর্বোপরি এও ভুলে গেলে চলবে না যে এই অভ্যুত্থানের, তথাকথিত বিশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ বেনিফিসিয়ারি জেনারেল জিয়া এবং আমাদের স্মরণ রাখেতে হবে জেনারেল জিয়াই এই দিনটিকে ঘোষণা করেছেন সংহতি দিবস হিসেবে। বলেছেন এই দিনে সেনাবাহিনী এবং জনগণ দেশের সার্বভৌমত্ব সংহত করেছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে একই দিনে বিশৃঙ্খলা আর সংহতি হয় কি করে? এ বড় অদ্ভুত, অসাড় অভিযোগ।'

আইনজীবীরা প্রশ্ন তোলেন সাতই নভেম্বর যদি সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিচারযোগ্য উদাহরণ হয়ে থাকে তাহলে ১৫ আগস্টে ফারুক, রশীদ প্রমুখেরা সেনাবাহিনীতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিচারের সম্মুখীন না হয়ে কি করেই বা বিদেশে উচ্চপদের কূটনৈতিক চাকরি করছেন?

এই মামলার এমনি সব অসংখ্য স্ববিরোধিতা আর অযৌক্তিকতা তুলে ধরলেও আদালত সেগুলো গ্রাহ্য করে না। আদালতে দাঁড়িয়ে রাজসাক্ষীরাও নানা গোঁজামিল বক্তব্য দিতে থাকেন। কর্পোরাল ফখরুল এক পর্যায়ে বলেন যে তিনি কর্নেল তাহেরকে দেখেছেন ড. আখলাকের বাসা থেকে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা ভোরার সাথে ফোনে কথা বলতে। অথচ ড. আখলাক জানান তার বাসায় কোনোদিন কোনো ফোনই ছিল না। রাজসাক্ষীদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য নিয়মমাফিক নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গ্রহণের দাবি জানান অভিযুক্তের আইনজীবীরা। কিন্তু সে নিয়মও পালন করা হয় না।

এটি যে নেহাত একটি প্রহসনের বিচার আসামিদের তা আর বুঝতে বাকি থাকে না। ফলে এক পর্যায়ে বন্দিরা সবাই মিলে আদালতকে নানাভাবে অসহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। বিচার কাজ চলার সময় তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ চালিয়ে যান। কেউ কেউ বিচারকদের দিকে পা তুলে বসে থাকেন। আ স ম আবদুর রব একদিন বিচারকদের উদ্দেশে বলেন : মনে রাখবেন আপনারা মরলেও কবর থেকে তুলে আপনাদের চাবকানো হবে।

বাতিস্তা সরকার ঠিক এমনিভাবে একসময় যখন কিউবার বিপ্লবের নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর গোপন বিচার করছিল তখন কাস্ট্রো তাঁর বিচারকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এই ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে। তাহেরও একদিন তাদের ট্রাইবুনালের বিচারকদেরও বাতিস্তার সেই বিচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন : চাকরির দায়ে ষড়যন্ত্রের তাবেদারী করছেন, এখনও সময় আছে সত্যের পক্ষে এসে দাঁড়ান। নইলে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না।

বলাবাহুল্য, তাতে কোনো কাজ হয় না। তাহের এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন : মামলা যদি করতেই চান, তাহলে আমি জেনারেল জিয়া আর জেনারেল ওসমানীকে এই আদালতে দেখতে চাই। তারাই সাক্ষী দিক ঘটনার। তারা এসে দাঁড়াক আমাদের মুখোমুখি।

যথারীতি গ্রাহ্য করা হয় না এই প্রস্তাবও।

এক সাথে এতজন টববগে, দুর্ধর্ষ বিপ্লবী ফাঁদে আটকা পড়ে তড়পাতে থাকেন। সুন্দরবনের বীরযোদ্ধা মেজর জিয়াউদ্দীন গলা ছেড়ে গাইতে থাকেন, 'শিকল পড়ার ছল মোদের এই শিকল পড়ার ছল।' সবাই গলা মেলান তাঁর সঙ্গে। আনোয়ার কোর্ট শেষে তার উদাত্তকণ্ঠে শুরু করে সুকান্তের কবিতার

আবৃত্তি। তার কবিতা শোনার জন্য পুলিশ আর আর্মির লোকেরাও ভিড় জমায়। একমাত্র মহিলা আসামি জাসদকর্মী সালেহা নানা ঠাট্টা, কৌতুক করে বিব্রত করে রাখেন কোর্টকে। আর মনের চাপা পড়া আবেগ মুক্ত করতে প্রায় সবাই লিখতে শুরু করেন কবিতা, পড়ে শোনান একে অন্যকে। কোর্টরুমের ঐ ছোট্ট বদ্ধ ঘরে প্রতিদিন যেন জন্ম নিতে থাকে অনেক সুকান্ত আর নজরুল।

তেলাপিয়া মাছ

কারাগারের রুদ্ধ দেয়ালের ভেতর কি ঘটছে কিছুই জানে না বাইরের মানুষ। এ সংক্রান্ত কোনোরকম সংবাদ পরিবেশন নিষিদ্ধ। আসামিদের সঙ্গে বাইরের কারো দেখা সাক্ষাত, চিঠি পত্র আদান প্রদানও নিষিদ্ধ। তবু গোপনে আইনজীবীদের মাধ্যমে লুৎফাকে কখনো চিরকুট, কখনো ছোট চিঠি পাচার করতে সক্ষম হন তাহের।

একটি চিঠিতে লেখেন : 'কোর্ট শুরু হবার পর থেকে আমরা সবাই সারাদিন একসঙ্গে থাকতে পারি এটাই বর্তমানে বড় লাভ। এ কোর্টের বৃত্তান্ত যদি খবরের কাগজে বের হতো তাহলে আমাদেরকে এখন পর্যন্ত কেউ জেলে আটকে রাখতে পারত না। ... এ কোর্টটি একটি আজব ব্যাপার। একে কোর্ট কোনো অর্থেই বলা চলে না। চেয়ারম্যানের আচরণ ও ব্যবহার থানার দারোগার মতো। আমরাও তার সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করি। তারা তাদের কাজ করে আমরা আমাদের আলোচনা নিয়ে থাকি।... সাতই নভেম্বর আমি রক্তপাত ছাড়া যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলাম, ধনিক শ্রেণী তা ব্যাহত করে তাদের জন্য একটি বৃহৎ রক্তপাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।'

লুৎফা তাহেরের চিঠির মাধ্যমে তাহেরের প্রতিদিনকার জেল জীবনের একটা চিত্রও পান। তাহের লেখেন :

'ভোর চারটায় উঠে তোমাকে লিখছি, এতে তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে। জেলখানায় এসে এটা একটা বড় পরিবর্তন। ভোর চারটায় ঘুম ভেঙ্গে যায়। শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না। এ সময় লেখার কাজগুলো শেষ করি। চারটা থেকে সাতটা পর্যন্ত। তুমি তো জানো গ্রেফতারের পর থেকে আমাকে একলা রাখা হয়। ঢাকা জেলেও সে অবস্থা। নানাকাজে সাহায্য করার জন্য চার জন কয়েদি দেওয়া হয়েছে। জেলখানায় এরাই এখন আমার অনুগত অনুসারী। আমার প্রতি এদের যত্নের বাড়াবাড়ি অনেক সময় উপদ্রপ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত কাজগুলি করে হালিম। ১৮ বছরের ছেলে। রাজনৈতিক দলের সদস্য। অস্ত্র আইনে দেড় বছরের সাজা হয়েছে। আমার বিছানা ছাড়ার সাথে সাথে সে উঠে বসবে। ৭টা পর্যন্ত তিন কাপ চা খাওয়া হয়ে যায়। ভোরের এই সময়টা ভালোই লাগে। ঢাকা জেলে কাক ছাড়া আর কোনো পাখি নেই। কাক ডাকা শুরু হয় ভোর পাঁচটা থেকে। জেল

গেটের পাশেই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে একটি বেশ বড় জায়গায় আমাকে রাখা হয়েছে। দুটো বড় বড় কামরা। বাথরুম কমোড রয়েছে। ভাববে না। বেড়াবার জায়গাও আছে। বাগান রয়েছে। ঘরের বাইরের পানির ট্যাঙ্কে অনেক তেলাপিয়া মাছ ছেড়েছি। এদের জন্ম, জীবন, প্রেম ভালোবাসা, বংশবৃদ্ধি ও জীবন সংঘাত সম্বন্ধে বেশ বিজ্ঞ হয়ে উঠেছি।'

জেলের চার দেয়ালের ভেতর নিঃসঙ্গ পঙ্গু যে মানুষটি তেলাপিয়া মাছের জীবনবৃত্তান্ত লক্ষ করছেন তাকে বরাবর একজন নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী বলেই মনে হয়। একটি খেয়াল পোকা যেন ভেতর থেকে তাকে ঠেলছে অবিরাম। কখনো একা, কখনো দলে সবার সামনে থেকে তিনি এগিয়ে গেছেন অরণ্যের সবচেয়ে অজানা, সবচেয়ে বিপদসংকুল পথটিতে। সেই পোকা তাকে ঠেলে দিচ্ছে ডাকাতের সামনে, হাজার মাইল পথ ঠেলে তাকে হজির করছে রণাঙ্গনে, ঠেলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে শত্রু বুহ্যের বিপজ্জনক গণ্ডির মধ্যে, ঠেলে দিচ্ছে এক বৃত্ত থেকে আরেক বৃত্তে, ঠেলে দিচ্ছে নিয়ম পাল্টে ফেলার অভিযানে, সে অভিযাত্রায় হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো মোহাবিষ্ট করছেন তার ভাই বোন, স্ত্রী পরিজনকেও, যারা একটি ক্ষুদ্র মিছিলের মতো অরণ্যের বাঁকে বাঁকে অনুসরণ করে গেছেন তাকে। একটা স্থির লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে গেছেন, ঝুঁকি নিয়েছেন, বিশ্বাস করেছেন। পথে পথে সঙ্গী পেয়েছেন কিন্তু বার বার রয়ে গেছেন একাই। সেই খেয়াল পোকা তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছে এমন এক প্রান্তে যেখানে তিনি হয়ে উঠেছেন নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর। সেই একাকী অভিযাত্রী এখন গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন তেলাপিয়া মাছের জন্ম, জীবন, প্রেম ভালোবাসা, বংশবৃদ্ধি আর জীবন সংঘাত।

বন্দিরা ক্রমশ টের পান তাদের আবেদন, প্রতিবাদ কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শুধু। টের পান এক বিশাল চক্রান্তের ঘেরাটপে পড়ে গেছেন তারা। বুঝতে পারেন তাদের মুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। কিন্তু তারা কি বেঁচে থাকবেন? স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সজ্জিত বুটধারী প্রহরীরা খট খট শব্দ তুলে রাতের আলো আঁধারীতে বন্দিদের সেলগুলোর সামনে সেন্ট্রি ডিউটি দেয়। ঘুম আসে না কারো। একটা অজানা আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে থাকেন সবাই।

একদিন জেল থেকে চিঠিতে লুৎফাকে লেখেন তাহের :

'... মেজর জলিল আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হচ্ছে। কয়দিন ধরে সে নাকি স্বপ্ন দেখছে—চারদিকে হাজার হাজার উৎসাহভরা সৈনিকের মাঝে সাদা হাতিতে চড়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু সাদা হাতি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথাও তো পাওয়া যায় না। বিকল্প ব্যবস্থা অনুযায়ী হাতির গায়ে হয়তো সাদা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।'

সাদা কাপড়ের অনুষঙ্গে বুকটা কেমন ছলকে ওঠে লুৎফার।

আসামিদের জেরা, সাক্ষ্য শেষ হয় এক পর্যায়ে। রায়ের আগে অভিযুক্তরা আদালতে তাদের জবানবন্দি দিতে চান। মঞ্জুর করা হয় আবেদন। কদিন ধরে এক এক করে জবানবন্দি দেন আনোয়ার, ইউসুফ, জলিল, ইনু, মান্না। তারা তাদের রাজনৈতিক আদর্শ, অভ্যুত্থানের তাদের ভূমিকা এবং এই ষড়যন্ত্রের মামলার ব্যাপারে তাদের ঘৃণার কথা জানান। সব শেষে জবানবন্দি দিতে উঠেন তাহের। সবচেয়ে দীর্ঘ জবানবন্দি দেন তিনি। ক্রাচ হাতে উঠে দাঁড়িয়ে তাহের বলতে শুরু করে—

'আপনাদের সামনে দাঁড়ানো এই মানুষটি, যে মানুষটি আজ আদালতে অভিযুক্ত, সে একই মানুষ যে এই দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য রক্ত দিয়েছিল, শরীরের ঘাম ঝরিয়েছিল, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত পন করেছিল। সেসব আজ ইতিহাসের অধ্যায়। ইতিহাস সেই মানুষটির কর্মকাণ্ড আর কীর্তির মূল্যায়ন অতি অবশ্যই করবে। আমার সব কাজে, সমস্ত চিন্তায় আর স্বপ্নে এ দেশের কথা যেভাবে অনুভব করেছি সে কথা এখন এখানে দাঁড়িয়ে বোঝানো সম্ভব নয়।

অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। যে সরকারকে আমিই ক্ষমতায় বসিয়েছি, যে ব্যক্তিটিকে আমিই জীবন দান করেছি, তারাই আজ এই ট্রাইবুনালের মাধ্যমে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। এদের ধৃষ্টতা এত বড় যে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো অনেক বানোয়াট অভিযোগ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিচারের ব্যবস্থা করেছে। আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার সবই বিদ্বেষপ্রসূত, ভিত্তিহীন, ষড়যন্ত্রমূলক, সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি সম্পূর্ণ নিরাপরাধ।

রেকর্ডকৃত দলিলপত্রে স্পষ্টতই দেখা যায় যে ১৯৭৫-এর ৬ ও ৭ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে আমার নেতৃত্বে সিপাই অভ্যুত্থান হয়। সেদিন এভাবেই একদল বিভ্রান্তকারীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নির্মূল করা হয়। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান আর দেশের সার্বভৌমত্ব থাকে অটুট। এই যদি হয় দেশদ্রোহিতার অর্থ তাহলে হ্যাঁ, আমি দোষী। আমার দোষ আমি এদেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছি। এদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছি। সেনাবাহিনী প্রধানকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করেছি। সর্বোপরি বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্নে মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছি। সে দোষে আমি অবশ্যই দোষী।'

এরপর তাহের তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো খণ্ডন করার আগে দেশের রাজনৈতিক অতীত এবং তার ব্যক্তি জীবনের দীর্ঘ বর্ণনা দেন। তাহের তার আর্মিতে ঢোকার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন, আর্মিতে কৃতিত্ব, পাকিস্তানি শাসক, বিশেষত আর্মিরা বাঙালিদের প্রতি যে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করত তার নানা উদাহরণ তুলে ধরেন। বলেন দীর্ঘদিন ধরে একটি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক

বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে নিজেকে প্রস্তুত করার কথা। তাহের মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিনগুলোতে পাকিস্তানে তার বন্দিদশার কথা বর্ণনা করে। বলেন, পাকিস্তানের সিনিয়র বাঙালি অফিসাররা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার বদলে পাকিস্ত ানিদের তাবেদারীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যাদের কেউ কেউ তখন ঐ কোর্ট কক্ষেও উপস্থিত।

ভাষণের এই পর্যায়ে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ইফসুফ হায়দার তাহেরকে বাধা দিয়ে বলেন, এখানে এ ধরনের কথা বলা যাবে না।

বলাবাহুল্য, ইউসুফ হায়দার পাকিস্তানিদের তাবেদারী করবার দলেরই একজন।

তাহের বলেন : আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিলে আমি বরং চুপ থাকাটাই ভালো মনে করব। এমন নিম্নমানের ট্রাইবুনালের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি যে নিজের উপরই ঘৃণা হচ্ছে।

তাহেরের আইনজীবীদের সঙ্গে এ নিয়ে তখন ট্রাইবুনাল সদস্যদের বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাহেরকে আবার বলতে সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর তাহের পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে তার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তারপর মুক্তিযুদ্ধের প্রচলিত ধারার সঙ্গে তার বিরোধ, ১১ নং সেক্টরে তার নিজস্ব ধারার গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে দীর্ঘ বর্ণনা করে তাহের। তাহের স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্থানীয় যুদ্ধ নায়কদের বর্ণনা করতে গিয়ে রৌমারীর সুবেদার আফতাবের কথা তোলেন। তাহের জানান কি করে আঠারো মাইল পথ হেঁটে তিনি কোদালকাঠিতে দেখা করতে গেছেন সুবেদার আফতাবের সঙ্গে। এখানে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ইউসুফ হায়দার আবার তাহেরকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, এসব কথা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

তাহের ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন : এ কথাগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। আপনি তো যুদ্ধে ছিলেন না, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে আপনার তো কোনো ধারণা থাকবার কথা নয়।

এই বলে তাহের আবার তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তাহের যুদ্ধে তাঁর রৌমারী, চিলমারী, কামালপুর আক্রমণের ঘটনা বর্ণনা করেন, বর্ণনা করেন যুদ্ধে তার পা হারানোর কথাও। তাহের তাঁর সহঅভিযুক্ত সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের বীরত্বের কথা বলেন, বলেন আসম আবদুর রবের কথাও। তাহের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সবকটি ভাইবোন যে যোগ দিয়েছেন, যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য যে বীরত্বসুচক খেতাব পেয়েছেন সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এই মামলায় তাঁর অন্য ভাইদের অভিযুক্ত করা, মর্মান্তিক রাজনৈতিক দুর্ঘটনায় তার ভাই বাহারের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে তাহের বলেন, 'মনে হচ্ছে আমাদের পুরো পরিবারটিকে ধ্বংস করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে।' এরপর তাহের স্বাধীনতার পরবর্তী প্রেক্ষাপটটি বর্ণনা

করেন। মানুষের আশাভঙ্গ হওয়া, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তার ভিন্নধর্মী জনমুখী সেনাবাহিনী তৈরি, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিরোধের প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ এবং ড্রেজার সংস্থার চাকরিতে যোগ দেওয়ার ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করেন।

এসময় ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান তাহেরকে বলেন, আপনার বক্তব্য অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে।

তাহের বলেন : জনাব চেয়ারম্যার এবং মামলার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমাকে সবকিছু বলতেই হবে।

এরপর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবের শক্তি এবং ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন তাহের। খন্দকার মোশাতাকের ষড়যন্ত্র এবং ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। মুজিব হত্যার পরবর্তী সময়টিকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত থেকে রক্ষা করার তার বিবিধ তৎপরতার কথা বর্ণনা করেন, বর্ণনা করেন সেনাবাহিনীতে উদ্ভূত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা এবং সেই সূত্রে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান আর তারই ধারাবাহিকতায় সিপাইদের বিপ্লবের প্রেক্ষিতটি।

ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান তাহেরকে আবার বলেন, আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

তাহের বলেন : 'আমার যা বলা দরকার তা আপনাদের শুনতেই হবে। নয়তো আমি কোনো কথাই বলব না। এখনি ফাঁসি দেন না কেন, আমি ভয় পাই না। কিন্তু আমাকে বিরক্ত করবেন না।' তাহের আবার বলতে শুরু করে।

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান, জিয়ার মুক্তি, তার পরবর্তী ঘটনাবলি এবং তাদের গ্রেফতারের প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দেন তাহের।

তাহের বলেন, 'জিয়া শুধু আমার সঙ্গেই নয়, বিপ্লবী সেনাদের সঙ্গে, সাত নভেম্বরের পবিত্র অঙ্গীকারের সঙ্গে, এক কথায় গোটা জাতির সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। ... আমাদের জতির ইতিহাসে আর একটাই মাত্র এরকম বিশ্বাসঘাতকতার নজির রয়েছে , তা হচ্ছে মীর জাফরের। ...'

তাহেরকে এ পর্যায়ে আবার বাধা দেয়া হয়। তাকে বলা হয়, বক্তব্য সংক্ষেপ করার আশ্বাস না দিলে তাকে আর বক্তব্য পেশ করতেই দেওয়া হবে না। এই নিয়ে আবার কোর্টে বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। তাহেরের পক্ষের আইনজীবী বলেন : অনুগ্রহ করে তাকে বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি দিন। এই ট্রাইবুনালের অবশ্যই অধিকার আছে তাকে সেই সুযোগ না দেওয়ার কিন্তু তিনি প্রধান বিবাদি, যত বড়ই হোক না কেন বক্তব্য উপস্থাপন করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তাকে দিতেই হবে।

এরপর তাহের এক এক করে এই মামলার অযৌক্তিতা এবং অসারতা তুলে ধরেন। তার বিরুদ্ধে আনা প্রতিটি অভিযোগ খণ্ডন করেন। তাহের আবারও মেজর জেনারেল : জিয়াউর রহমান, রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি তোয়াব, জেনারেল ওসমানী, বিচারপতি সায়েমকে সাক্ষী হিসেবে কোর্টে আনতে অনুরোধ করেন। তাহের বলেন তিনি দেখতে চান এই মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগগুলোর সমর্থনে তারা একটি কথা বলবার সাহস পান কিনা।

তাহের বলেন : আমি একজন অনুগত নাগরিক নই বলে অভিযোগ করা হয়েছে। একজন মানুষ যে তার রক্ত ঝরিয়েছে, নিজের দেহের একটা অঙ্গ পর্যন্ত হারিয়েছে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তার কাছ থেকে আর কি আনুগত্য আপনারা চান? আর কোনোভাবে আমি এদেশের প্রতি আমার আনুগত্য প্রকাশ করতে পারি?'

তাহের তার বক্তব্যের শেষে বলেন :

'বাংলাদেশ বীরের জাতি। সাত নভেম্বর অভ্যুত্থান থেকে ওরা যে শিক্ষা এবং দিকনির্দেশনা পেয়েছে তা ভবিষ্যতে তাদের সব কাজে পথ দেখাবে। জাতি আজ এক অদম্য প্রেরণার উদ্ভাসিত। যা করে থাকি না কেন তার জন্য আমি গর্বিত। আমি ভীত নই। জনাব চেয়ারম্যান, শেষে শুধু বলব, আমি আমার দেশ ও জাতিকে ভালোবাসি। এ জাতির প্রানে আমি মিশে আছি। কার সাহস আছে আমাদের আলাদা করবে? নিশঙ্ক চিত্তের চেয়ে জীবনে আর কোনো বড় সম্পদ নেই। আমি তার অধিকারী। আমি আমার জাতিকে তা অর্জন করতে ডাক দিয়ে যাই।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। দীর্ঘজীবী হোক স্বদেশ।'

ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টার বক্তব্য শেষ করেন তাহের। আদালতের সবাই এমনকি প্রহরীরাও সম্মোহিতের মতো তার জবানবন্দি শোনেন।

অশান্ত মন

জবানবন্দি দেবার পর ক্লান্তি নেমে আসে তাহেরের শরীরে, মনে। অন্তহীন ঝড় ঝাপটায় অশান্ত তিনি। মনের গভীরতম বেদনার কথা বলতে ইচ্ছা হয় কাউকে। সে রাতেই চিঠি লিখতে বসেন লুৎফাকে—'আমাদের জীবনে নানা আঘাত, দুঃখ এসেছে তীব্রভাবে। প্রকাশের অবকাশও নেই। ভয় হয় যদি সে প্রকাশ কোনো সহকর্মীকে দুর্বল করে তোলে, ভয় হয় যদি কেউ আমাকে সমবেদনা জানাতে আসে, আমাকে, আমার জাতিকে ছোট করে। তাই মাঝে মাঝে মন ব্যাকুল হয়। তোমাকে পেতে চাই নিবিড়ভাবে। তোমার স্পর্শ, তোমার মৃদু পরশ, আমাকে শান্ত করুক।'

কিন্তু তাহের কিংবা লুৎফা কেউ জানেন না পরস্পরকে স্পর্শ করে নিজেদেরকে শান্ত করবার সেই সুযোগ আর তাদের জীবনে আসবে না কোনোদিন।

টালমাটাল নৌকা

উত্তাল ঢেউয়ের উপর টালমাটাল এক নৌকার মতো তখন দুলছে বাংলাদেশ। সে কোনোদিকে যাবে? ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পৃথিবী তখন স্পষ্ট ভাগ হয়ে আছে পুঁজিবাদ আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে। পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে তখন চলছে এই দড়ি টানাটানি। কে কাকে কোন শিবিরে টানবেন। ছোট্ট এই বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। একে নিয়েও ভেতরে বাইরে চলছে গভীর টানাপোড়েন। বাংলাদেশ নৌকার বিহবল মাঝি শেখ মুজিব নানা দোদুল্যমানতার শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পালে লাগাবেন সমাজতন্ত্রের হাওয়া। কিন্তু তার রক্তাক্ত দেহ নদীতে ছুড়ে ফেলে নৌকাকে পুঁজিবাদী স্রোতে টেনে নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন খন্দকার মোশতাক। দৃশ্যপটে মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন খালেদ মোশারফ। নৌকা, পুঁজিবাদ না সমাজতন্ত্রের দিকে যাবে তা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না তার, তিনি চাইছিলেন সেনাবাহিনীর ছোট্ট একটি দ্বীপের শৃঙ্খলা আর তার একটি পদ। দৃশ্যপট থেকে সরে গেছেন তিনি। আবির্ভাব ঘটেছে তাহের নামের এই স্বপ্নবাজ কর্নেলের। হাল ঘুরিয়ে নৌকাকে আবার তিনি নিতে চাইছেন সমাজতন্ত্রের দিকে, ধোঁয়াচ্ছন্ন কোনো সমাজতন্ত্র নয়, কায়েম করতে চাইছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। দেশে আরও যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে কেউ এর আগে রাষ্ট্রকে এতটা তীব্রভাবে আঘাত করে ক্ষমতার এতটা কাছাকাছি আসতে পারেননি।

ফলে এই কর্নেলকে মোকাবেলার জন্য এবার দেশের বাইরের, ভেতরের যাবতীয় সেইসব শক্তি একত্রিত হয়েছেন যারা চিরতরে সমাজতন্ত্রের নাম বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলতে চান। সেইসব শক্তি এবার ভর করেছে এই বিপরীতমুখী স্রোতের অনিশ্চিত সাতারু জেনারেল জিয়ার ওপর। যার বিশেষ কোনো স্রোতের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব নেই, যিনি, যখন ফলাফল অস্পষ্ট তখন খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে শেষ মুহূর্ত পযন্ত সব রকম পথ খোলা রাখেন। যেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আজ্ঞা পালন করলেও চূড়ান্ত ক্ষণে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন বাঙালির দিকে। কারণ তিনি টের পেয়েছিলেন ভবিষ্যত ঐদিকেই। তেমনি দীর্ঘকাল নিরন্তর তাহেরের দিকে দরজা খুলে রাখলেও শেষ মুহূর্তে বন্ধ করে দিয়েছেন সে দরজা কারণ তাকে তখন ঘিরে রেখেছে আরও পরাক্রমশালী নানা শক্তি এবং তিনি টের পেয়েছেন ভবিষ্যৎ সেদিকেই। জিয়া আর তখন কোনো একক ব্যক্তি নন, একটি সম্মিলিত শক্তির

প্রতিভূ। কারাগারে যখন গোপন বিচার চলছে জিয়া তখন সেনাবাহিনীর ভেতরে বাইরে, দেশের ভেতরে বাইরে নানা শক্তির সঙ্গে সেরে নিচ্ছেন বোঝাপড়া।

নানা কাকতালীয় যোগাযোগ, সুযোগ আর সৌভাগ্য মিলিয়ে মাত্র পাঁচ বছরে জিয়াউর রহমান একজন সাধারণ মেজর থেকে হয়ে উঠেছেন রাষ্ট্রের প্রধান কুশীলব। দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন, অবসর জীবন যাপনের পাঁয়তারা করছিলেন। একটা ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে উদ্ধার পেয়ে পাকচক্রে জিয়া নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন কর্নধারের ভূমিকায়। রাষ্ট্রের শীর্ষ আসনটি তখন তার নাগালের মধ্যে। কিন্তু ঐ আসনে যাবার পথে এ জগৎসংসারে তার একমাত্র বাধা তখন ক্রাচ হাতে ঐ কর্নেল, যে কিনা ঘটনাচক্রে তার উদ্ধারকারীও বটে। এই বিপজ্জনক কর্নেল সেনাবাহিনীর ভেতরে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করতে চান, তিনি বুর্জুয়া রাষ্ট্রের সবচেয়ে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে পাল্টে ফেলতে চান। এই কর্নেলকে প্রতিহত করতে পারলে লাভ বহুমুখী। সে মুহূর্তে বিপরীত শিবিরের শক্তি কেন্দ্র ঐ কর্নেল, বাকিরা ছায়া মাত্র। এই কর্নেলকে রাবারের মতো ঘষে দৃশ্যপট থেকে মুছে ফেলতে পারলে বুর্জুয়া রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষের কফিনটিতে শেষ পেরেকটি ঠোকা যায়। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের দরজাটিতে তালা ঝুলিয়ে চাবিটিকে ফেলে দেওয়া যায় সমুদ্রে। পাশাপাশি খুলে দেওয়া যায় বিপরীত দরজাটি যেদিক দিয়ে ঢুকবে ধনতন্ত্র আর ধর্মের হাওয়া, যে হাওয়াই তখন প্রবল। জিয়ার উত্থানের অন্যতম সাক্ষী তাহের। এই সাক্ষীকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে ইতিহাস তার হাতের মুঠোয়। নানাদিক থেকে বিপজ্জনক এই জিনকে যখন বোতলে পোড়া গেছে, তখন তাকে আর বোতলের বাইরে আনবার বোকামী কেন? বোতল থেকে বেরুলে হয় জিন থাকবে নয়তো জিয়া।

জিয়া ইতিহাসকে হাতের মুঠোয় নিয়েছিলেন বটে কিন্তু তারও পরিসমাপ্তি ঘটেছে বীভৎস রক্তগঙ্গায়। সে কাহিনী জমা রইল ভবিষ্যতের জন্য।

রায়

১৭ জুলাই শনিবার। সব অভিযুক্তদের কাঠগড়ায় আনা হয়। সেদিন রায় ঘোষণা করা হবে। ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান কর্নেল ইউসুফ হায়দার এসে বসলেন চেয়ারে। রায় ঘোষণা করলেন তিনি। বললেন, সরকার উৎখাত ও সশস্ত্র বাহিনীকে বিনাশ করার চেষ্টা চালানোর দায়ে বাংলাদেশে ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১২১ (ক) ধারা এবং ১৯৭৫ সালের ১নং রেগুলেশনের ১৩নং সামরিক আইন বিধি বলে তথাকথিত গণবাহিনী ও অধুনালুপ্ত জাসদের কয়েকজন নেতা সম্পর্কে বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনাল নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন :

ড. আখলাক, বি এম মাহমুদ, মো শাহাজাহান, শরীফ নুরুল অম্বিয়াসহ ১৫ জনকে মামলা থেকে বেকসুর খালাস। হাবিলদার হাইসহ বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কয়জন সদস্যকে এক থেকে সাত বছরের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড। সিরাজুল আলম খানকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা। আ স ম আবদুর রব, হাসানুল হক ইনু, আনোয়ার হোসেনকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা। মেজর জিয়াউদ্দীনকে বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিশ হাজার টাকা জরিমানা। অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম এ জলিল এবং আবু ইউসুফের ব্যাপারে বলা হয় এদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। তবে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তাদের মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যহতি দেওয়া হচ্ছে। এদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।

ঐ ছোট্ট অস্থায়ী আদালতে তখন পিনপতন নিস্তব্ধতা। শুধু একজনের রায় ঘোষণা বাকি। স্বাধীনতাযুদ্ধে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ বীরউত্তম খেতাবধারী, পঙ্গু এই মানুষটির জন্য কি শাস্তি নির্দিষ্ট করা আছে? বিচারক ঘোষণা করলেন, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো এবং তা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কার্যকর করা হবে। বিচারকের গলা খানিকটা কাঁপলো যেন। রায় ঘোষণা করেই সব বিচারকরা দ্রুত আদালত থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন সবাই। তাকালেন তাহেরের দিকে। তাহের হাসছেন। রায় শুনে বিচারে খালাস পাওয়া সাংবাদিক এ বি এম মাহমুদ কেঁদে ওঠেন হু হু করে। সাতই নভেম্বরের বিপ্লবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মিটিংটি তার বাসাতেই হয়েছিল। তাহের তার পিঠে হাত রেখে বলেন : কাঁদছেন কেন মাহমুদ ভাই?

মাহমুদ বলেন : আমি এজন্য কাঁদছি যে একজন বাঙালি কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ড রায় ঘোষণা করতে পারল। মামলায় সাজাপ্রাপ্ত একমাত্র নারী সালেহা কাঁদতে কাঁদতে আদালত থেকে বেরিয়ে যেতে নিলে তাহের তাকে ডেকে বলেন : তোমার কাছ থেকে এ দুর্বলতা কখনই আশা করি না বোন।

সালেহা বলেন : আমি তো কাঁদছি না ভাই, হাসছি।

তাহেরের ভাই ইউসুফ আর আনোয়ার বিচারককে লক্ষ করে চিৎকার করে বলতে থাকে : আমাদের কেন মৃত্যুদণ্ড দিলেন না, আমাদেরও ফাঁসি দিন।

এসময় হঠাৎ ছাত্রনেতা মান্না স্লোগান তোলেন, 'তাহের ভাই লাল সালাম'। বিহ্বল অভিযুক্তরা সবাই যোগ দেন সেই স্লোগানে। কেঁপে ওঠে ঐ ছোট্ট কোর্ট রুম। সে আওয়াজ ছড়িয়ে যায় পুরো জেল খানায়।

মেজর জিয়াউদ্দীন শুরু করেন সদ্য লেখা তার কবিতাটির আবৃত্তি—'জন্মেছি, সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলতে, কাঁপিয়ে গেলাম...।'

তাহের বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেন, দারুণ হয়েছে তোমার কবিতা, কবিতাটা দাও আমাকে।

কাগজের টুকরোটি পকেটে পোড়েন তাহের।

তাহেরের পক্ষের আইনজীবীরা এগিয়ে আসেন তার কাছে। তারা হতবাক। বলেন : যদিও নিয়ম করা হয়েছে এই ট্রাইবুনালের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাবে না, তবু আমরা সুপ্রিমকোর্টে রীট করব। সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে এ মামলা চালিয়েছে আদালত। আমরা রাষ্ট্রপতির কাছেও আবেদন করব।

তাহের বলেন : না, রাষ্ট্রপতির কাছে কোনো আবেদন করবেন না। এই রাষ্ট্রপতিকে আমিই রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়েছি। এই দেশদ্রোহীর কাছে আমি প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারি না।

পুলিশ এসময় সবাইকে যার যার সেলে যাবার তাগাদা দেয়। সবাই ঘিরে ধরেন তাহেরকে। তাহের বলেন : আমি যখন একা থাকি তখন ভয়, লোভ-লালসা আমাকে চারদিক থেকে এসে আক্রমণ করে। আমি যখন আপনাদের মধ্যে থাকি তখন সমস্ত ভয়, লোভ দূরে চলে যায়। আমি সাহসী হই। এমন একটা অপারাজেয় শক্তি আমার ভেতর ঢোকে যে মনে হয় সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে পারব।

তাহের যখন কথা বলছেন তখন সবার চোখে পানি। পুলিশ আবার তাগাদা দেয় যার যার সেলে যেতে। এক এক করে তাহেরকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়ান সবাই, জলিল, রব, জিয়াউদ্দীন। আসেন আনোয়ার, ইউসুফ, বেলাল।

ফাঁসির আসামির জন্য নির্ধারিত ৮ নং সেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাহেরকে।

মঞ্চ প্রস্তুত

অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মামলার রায়ের দাপ্তরিক সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। রায় ঘোষণার মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাড়াহুড়া করে ট্রাইবুনাল চেয়ারম্যান মামলার সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে চলে যান বঙ্গভবনে। রাত আটটার দিকে সেখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সচিবকে রায়ের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করতে আদেশ দেন। প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হয় পরদিন ১৮ জুলাই ৭৬—এর সকাল বেলা পর্যন্ত। কিন্তু পরদিন রোববার, ছুটির দিন। তাড়াহুড়া করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন সচিব। তিনি সুপারিশ করেন সাতই নভেম্বরের নায়ক হিসাবে এবং উত্থাপিত অভিযোগগুলোর আলোকেই কর্নেল তাহেরের শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হউক। কিন্তু পরদিন সরকারের উচ্চপর্যায়ের আরেকটি মিটিং এ এই সুপারিশ নাকচ করা হয়। ১৮ জুলাই রাষ্ট্রপতি সায়েম, তাহেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখে কাগজে সই করেন। অথচ বছর কয়েক আগেই মামলায় বিবাদীর অধিকার পুরোপুরি রক্ষা না হওয়ার পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল নামের জনৈক ব্যক্তির উপরে আরোপিত মৃত্যুদণ্ডাদেশ খারিজ করে দিয়েছিলেন বিচারপতি সায়েম। অখ্যাত পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের ব্যাপারে যে

আইনী উদারতা দেখাতে পেরেছিলেন বিচারপতি, এই বিপজ্জনক সময়ে তাহেরের মতো একজন আসামির ব্যপারে সে উদারতা দেখানো তার পক্ষে হয়ে ওঠে অসম্ভব। তিনিও তখন এব বিশাল শক্তির ক্রীড়ানক।

ব্যাপারটি হাস্যকর হয়ে ওঠে যখন মামলায় বলা হয় স্বাধীনতাযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য জলিল এবং ইউসুফকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। অথচ তাহের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তাদের দুজনের চেয়েও উচ্চতর খেতাবের অধিকারী আর একটি পা বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধে তার অবদানের চিহ্ন তিনি তার শরীরেই বহন করে চলেছেন অবিরাম। অথচ অন্যেরা পেলেও তাহের এর জন্য শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।

বিস্ময়ের ষোলকলা পূর্ণ হয় যখন এ সত্যটিও আবিষ্কার হয়, যে অপরাধের জন্য তাহেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সে অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেবার মতো কোনো আইনই নেই। রায় ঘোষণার দশদিন পর একত্রিশ এ জুলাই ১৯৭৬ আইন মন্ত্রণালয় সামরিক আইনের বিশতম সংশোধনী জারি করেন। তাতে প্রথমবারের মতো বলা হয়, সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরে রাজনৈতিক মতবাদের প্রচার নিষিদ্ধ ও বেআইনী এবং সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

তাহেরের পক্ষের প্রবীণ আইনজীবী আতাউর রহমান খান বিষণ্ন হয়ে শুধু বলেন : দিস ইজ এ স্যাড কেস অব জুডিসিয়াল মার্ডার।

পরদিন সংবাদ পত্রে শিরোনাম হয়, 'তাহের টু ডাই'।

শেষ চেষ্টা

বিচার শুরু হবার পর থেকে লুৎফা নিরন্তর ভেবে এসেছেন কি হতে পারে শাস্তি? কারাদণ্ড? কতবছর? যাবজ্জীবন? মনের গভীর কোনে দু-একবার উঁকি দিয়েছে, তাকে কি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিতে পারে? মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে তার। মনে হয়েছে তা অসম্ভব। কিন্তু রায় ঘোষণা হবার পর অদ্ভুত অসার এক অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়ে ওঠেন তিনি। সাত মাস আগে গ্রেফতার হয়েছেন তাহের, এর মধ্যে তাদের দেখা সাক্ষাত হয়নি একবারও। শুধু দূর থেকে একবার দেখেছিলেন কোর্টে যাওয়ার পথে, গরাদের ওপারে। হাত নেড়ে তাহের শুধু বলেছিলেন, ভালো থেকো। মাঝে মাঝে পাওয়া টুকরো টুকরো চিঠি আর চিরকুটেই চলেছে তাদের যোগাযোগ। রায় ঘোষণা হবার পর লুৎফা তাহেরের সঙ্গে দেখা করার অনুমতির চান, অনুমতি দেয়া হয় না তাকে।

তাহেরের মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের নানা তৎপরতা চালান তারা। আইনজীবিরা সুপ্রিমকোর্টে রিট করার সিদ্ধান্ত নেন। ফাঁসির আদেশ স্থগিত করার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমার জন্য আবেদন করার পরিকল্পনা করেন। আবেদনে

তাহেরের স্বাক্ষর প্রয়োজন। কিন্তু তাহের আবারও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন কোনো অবস্থাতেই তিনি তার প্রাণভিক্ষার আবেদন করবেন না। আইনজীবীরা তখন তাহেরকে না জনিয়ে লুৎফার সই সহ ফাঁসির আদেশ স্থগিত করার আবেদন পাঠান রাষ্ট্রপতির কাছে।

লুৎফা ওদিকে ছুটে যান টাঙ্গাইলের সন্তোষে বর্ষীয়ান নেতা ভাসানীর কাছে। ভাসানী তাহেরের মৃত্যুদণ্ড খারিজ করার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম লেখেন রাষ্ট্রপতি সায়েমকে।

অ্যামন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান কার্যালয় থেকে তাহেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আসে জরুরি আপিল। আপিলে লেখা হয় : 'সামরিক আইনের আওতায় জেলের ভিতরে গোপনে অনুষ্ঠিত একটি বিচার জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের পর্যায়ে পড়ে না। সর্বোচ্চ আইনগত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার অধিকারসহ ফৌজদারী আদালতে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করা যেতে পারে।'

লুৎফার ভাই রাফি, যার বাসায় কেটেছে তাহের আর লুৎফার মধুচন্দ্রিমা, তার কিছু সঙ্গী নিয়ে লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে তাহেরের ফাঁসির আদেশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ অনশন শুরু করেন।

প্রাগৈতিহাসিক নীরবতায় ডুবে থাকে সরকার পক্ষ। শুরু হয় বহু বছর ধরে অকার্যকর, অব্যবহৃত ঢাকা জেলের ফাঁসীর মঞ্চ সংস্কারের কাজ।

ছোট্ট, পরিষ্কার সেল

ফাঁসির আসামিদের জন্য নির্ধারিত ৮ নং সেল থেকে তাহের ১৮ জুলাই লেখেন তার শেষ চিঠি। এবার শুধু লুৎফাকে নয়, বাবা, মা ভাই বোন সবাইকে উদ্দেশ্য করে। মামলার রায় ঘোষণা এবং সে সময় আদালতের দৃশ্যপট বর্ণনা করেন তাহের। ক্ষোভ প্রকাশ করেন পত্রিকায় প্রকাশিত মামলা বিষয়ে সরকারি মিথ্যাচার নিয়ে। লেখেন তার কনডেম সেলে আসার অভিজ্ঞতা—

—'ছোট্ট সেলটি ভালোই, বেশ পরিষ্কার। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন জীবনের দিকে তাকাই তখন তাতে লজ্জার কিছু দেখি না। আমার জীবনের নানা ঘটনা আমাকে আমার জাতির সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এর মতো বড় সুখ আর বড় আনন্দ আর কি হতে পারে। ... নীতু, যীশু, মিশুর কথা, সবার কথা মনে পড়ে। তাদের জন্য অর্থ সম্পদ কিছুই রেখে যাইনি। কিন্তু আমার সমগ্র জাতি রয়েছে তাদের জন্য। ... আমাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। আমি আমার সমগ্র জাতির মধ্যে প্রকাশিত। আমাকে হত্যা করতে হলে পুরো জাতিকে হত্যা করতে হবে। কোনো শক্তি কি তা করতে পারে?...

বার বার আবেদন করেও তাহেরের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পাচ্ছিলেন না লুৎফা কিন্তু হঠাৎ জুলাইয়ের ১৯ তারিখ প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে খবর এলো পুরো পরিবারকে তাহেরের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। বলা হলো যেতে হবে এক্ষুনি। এত ঘটা করে দেখা করবার আয়োজনে খটকা লাগে সবার। দুপুরের খাওয়ার আয়োজন হচ্ছিল। না খেয়েই সবাই রওনা দেয় জেলের দিকে। লুৎফা নীতু আর যীশুকে সঙ্গে নেন, মিশু ছিল নানা বাড়িতে তাকে নেওয়া হয় না। তাহেরের বাবা, মা, বোনরা আসেন। আসেন আরিফ, একমাত্র ভাই যিনি জেলের বাইরে, আসেন ইউসুফের স্ত্রী ফাতেমা। সাঈদ তখনও ফেরারি।

পরিবারের সবাইকে ফাঁসির আসামিদের কনডেম সেলের পাশে নিয়ে যাওয়া হয়। লুৎফা মিশুর একটা ছবি নিয়েছিলেন সঙ্গে কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তা ভেতরে নিতে দেয় না। তখন আমের মৌসুম। লুৎফা যাওয়ার পথে কয়েকটা ফজলি আম কিনে নেন। আমগুলো নেওয়ার অনুমতি দেয় জেল কর্তৃপক্ষ।

সেলের কাছে যাওয়া মাত্রই তাহের হইচই বাঁধিয়ে দেন : জেলার সাহেব আমার স্ত্রী, মা , ভাই এসেছে এদের জন্য একটু চেয়ারের ব্যবস্থা করেন। প্রাণবন্ত তিনি। জয়াকে দেখে বলে উঠেন : আরে আমার মেয়েটার পা খালি কেন? তাড়াহুড়ায় আসতে গিয়ে জয়াকে জুতা পরাতে পারেনি লুৎফা। জয়ার ছোট্ট খালি পায়ে হাত বোলায় তাহের। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে : আপনার শরীর কেমন, কাজলায় ফসল কেমন হলো? এমনভাবে আলাপ করছেন তাহের যেন পৃথিবীর কোথাও কিছু ঘটেনি। যেন এটি আটপৌরে কোনো এক দিন। একফাঁকে তাহের বলেন : কালকে যে চিঠিটা আপনাদের সবাইকে লিখলাম সেটা পড়ে শোনাই। ডেথ সেলে লেখা তার শেষ চিঠিটি জোরে জোরে পড়তে শুরু করেন তাহের : শ্রদ্ধেয় আব্বা, আম্মা, প্রিয় লুৎফা, ভাইজান আমার ভাই ও বোনেরা, গতকাল বিকাল বেলা ট্রাইবুনালের রায় দেওয়া হলো, আমার জন্য মৃত্যুদণ্ড...।

দীর্ঘ চিঠিটি পড়ে শোনান তাহের। তার চারপাশে স্তব্ধ হয়ে শোনে নানা বয়সের গুটিকয় মানুষ। তাদের চোখে অশ্রু।

তাদের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না একজন মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষের সাথে কথা বলছেন তারা। বিশ্বাস হয় না এটিই তাহেরের সঙ্গে তাদের শেষ দেখা।

চিঠির শেষ কটা লাইন পড়েন তাহের... আমি সমগ্র জাতির মধ্যে প্রকাশিত—

আশরাফুন্নেসা তাহেরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার চোখে কোনো অশ্রু নেই। একটি প্রতিষ্ঠানের মত দশ সন্তানের পরিবারটিকে গড়ে তুলেছেন তিনি। প্রতিটি সন্তানের মুখ তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন মাটির দিকে, সাধারণ

মানুষের দিকে। অজানা পথে পা বাড়াবার সাহস দিয়েছিলেন সবসময়। তার সবকটি সন্তান সংসারের চেনা পথ ছেড়ে পা রেখেছেন অচেনা বিপদসংকুল পথে। তারা সবাই আশরাফুন্নেসার গর্ভজাত সন্তান শুধু নয়, তারা তারই সৃষ্টি। অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটবার যে মন্ত্র তিনি সবার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, সে মন্ত্র সবচেয়ে দূরে নিয়ে গেছে তার তৃতীয় সন্তান নান্টুকে। আমাদের কর্নেল। গরাদের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন নান্টু। যে সন্তান আগামীকাল মৃত্যুবরণ করবে তার সামনে দাঁড়িয়ে কি বলতে পারেন মা? এই অস্বাভাবিক মুহূর্তে শুধুমাত্র একটি ভাষাই সম্ভবত যোগাযোগ ঘটাতে পারে পরস্পরের, সেটি নীরবতা। আশরাফুন্নেসা একটি কথাও আর বলেন না। শুধু তাহেরের মাথায়, পিঠে হাত বোলান।

সবার নীরবতায় একটু যেন অপ্রস্তুত তাহের। যতই তিনি স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা করুন না কেন, খুব ভেতরে বন্ধ কোনো একটা কুঠুরিতে তখন চাপা কম্পন। একটি দীর্ঘশ্বাস নেন তিনি। তিনি জানেন তার জন্য বরাদ্দকৃত শ্বাসের সংখ্যা কমে আসছে প্রতি পলে।

নীরবতা ভাঙেন তাহের। বোন জলিকে বলেন : একি আপনার চোখে পানি কেন? আমি তো মরব না, আমাকে কেউ মারতে পারে না।

সবার মনে হয় তাহেরের কথাই সত্য। কিছুতেই তাহেরের মৃত্যু হতে পারে না। একটা কিছু অলৌকিক নিশ্চয়ই ঘটবে আর বেঁচে যাবেন তাহের।

একসময় আরিফ বলেন : দণ্ড মওকুফের একটা আবেদন কি তুমি করতে পারো না নান্টু?

তাহের বলেন : বড় ভাইজান আপনি বলেন, আমার জীবনের মূল্য কি জিয়া কিংবা সায়েমের জীবনের চাইতে কম? আমি তো ওদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারি না।

পাহারারত পুলিশ বলেন : আপনাদের সময় শেষ।

তাহের বলেন : আমার আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু একা থাকতে দিন কিছুটা সময়।

এক এক করে সবাই বুকে জড়িয়ে ধরেন তাহেরকে, বিদায় নেন। কেউ ভেবে পান না একজন ফাঁসির আসামিকে বিদায়ের সময় কি কথা বলা যেতে পারে? তাকে তো বলা চলে না আবার দেখা হবে, কিংবা ভালো থেকো।

সবাই চলে যাবার পর থেকে যান লুৎফা। তাহের লুৎফার একটি হাত চেপে ধরেন। লুৎফার সমস্ত শরীর ঐ হাতে এসে ভর করে যেন। কেমন অবশ বোধ হয় তার।

তাহের বলেন, তুমি এমন মন খারাপ করলে চলবে ? আমি তো মৃত্যুকে ভয় পাই না। দেখো আমার এই মৃত্যুর জন্য একসময় তুমি গর্ববোধ করবে। সবাই তো আছে। আমি সবার মধ্যে বেঁচে থাকব দেখো।

লুৎফা কোনো কথা বলতে পারেন না। শুধু শক্ত করে চেপে ধরে থাকেন তাহেরের হাত।

তাহের বলেন : জানো ক্ষুদিরামের পর আমিই প্রথম এভাবে মরতে যাচ্ছি?

পাহারারত পুলিশ বলে : আপনাদের শেষ করতে হবে, টাইম নাই।

লুৎফা বুক ভেঙ্গে আসে একটা কিছু বলবার জন্য। কিছুই মনে আসে না তার, মুখে আসে না তার।

পুলিশ বলে : টাইম শেষ।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান তাহের। লুৎফা তার পাশ থেকে এগিয়ে দেন ক্রাচটি। তাহের বলেন আমাদের দেখা হবে আবার।

লুৎফা বুঝতে পারেন না, কি অর্থ করবেন এই কথার। একটি কথাও বলতে না পেরে কান্না চেপে চলে আসেন সেলের বাইরে।

তাহের গরাদের ওপাশ থেকে হাত নেড়ে বিদায় জানান।

৪টা ১ মিনিট

পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা হলেও রায় ঘোষণার পর জেলে বন্দি ইউসুফ, আনোয়ার, বেলালের সঙ্গে তখনও দেখা হয়নি তাহেরের। ২০ জুলাই বন্দি তিন ভাইকে বলা হয় তাহেরের সঙ্গে কনডেম সেলে দেখা করতে। তারা একে একে তাহেরের সেলে যান। গরাদের ওপাশে একটা চেয়ারে বসেন তাহের, পাশে শুইয়ে রাখেন সঙ্গী ক্রাচটি। এপাশে এক এক করে তার ভাইরা এসে বসেন। প্রথমে আসেন ইউসুফ। যথারীতি বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারেন না। মুখ খোলেন তাহেরই : আপনার মনে আছে ভাইজান আমি একটা লেখা লিখেছিলাম, সোনার বাংলা গড়তে হলে।

ইউসুফ : হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

তাহের : লিখেছিলাম আমি এমন একটা বাংলাদেশের কল্পনা করি যার নদীর দুপাশে উঁচু বাঁধ। সে বাঁধের উপর দিয়ে চলে গেছে সোজা পাকা রাস্তা, চলে গেছে রেল লাইন, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ লাইন। বাঁধের দুই পাশে ছড়ানো গ্রাম। সেখানে নির্দিষ্ট দূরত্বে সুন্দর নকশার অনেক বাড়ি নিয়ে এক একটা জনপদ। প্রতিটা বাড়ির সামনে একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগান, সেখানে ফুল। একদিকে খোলা মাঠ। বিকেল বেলা বুড়োরা এই মাঠের চারপাশে বসে গল্প করে। ছেলে মেয়েরা মেতে উঠে নানা খেলায়। সকালবেলা সামনের সোজা রাস্তা দিয়ে বাসের হর্ন শোনা যায়। হৈ চৈ করে ছেলে মেয়েরা যায় স্কুলে। এই দৃশ্যটা আজকে ভাবছিলাম। আমার বিশ্বাস ভাইজান এমন একটা দেশ একদিন হবে।

ইউসুফ : নিশ্চয়ই হবে নান্টু, আমরা লড়াই করে যাব।

তাহের : মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত ভাইজান। বহুবার আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। মৃত্যু আমাকে পরাজিত করতে পারেনি।

নীরব থাকেন ইউসুফ। সময় ফুরিয়ে আসলে উঠে পড়েন। কেন যেন তাহের এবারও বলেন : আবার দেখা হবে।

ম্লান হাসেন ইউসুফ।

আসেন বেলাল। তাহেরের সঙ্গে বয়সের অনেক পার্থক্য তার। তাহেরের সেলের পাশে বসে কিছু বলতে পারেন না তিনি। তাহের বলেন : মন খারাপ করবে না। আমরা যে মিশন নিয়ে শুরু করেছি তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, পারবে না?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানান বেলাল। বিদায় নেন তিনিও।

আনোয়ার যখন দেখা করবার জন্য তাহেরের সেলের দিকে যাচ্ছেন, তখন পাশের দালানের দোতালার সেল থেকে মেজর জলিল চিৎকার করে বলেন, আনোয়ার, তাহের ভাইকে বলো তার মরে গেলে চলবে না। তিনি যেন ক্ষমার এপ্লিকেশনে সই করেন। আনোয়ার বলেন : আমি এটা তাকে বলতে পারব না জলিল ভাই, এটা বলা ঠিক হবে না।

তাহেরের সঙ্গে দেখা হলে আনোয়ার মেজর জালিলের সঙ্গে তার কথোপকথনের কথা জানান। তাহের বলেন : তোমার কাছ এমন উত্তরই আমি আশা করি আনোয়ার। প্রহরীকে চা দিতে বলেন তাহের। চা খেতে খেতে কথা বলেন তাহের, এক এক করে জাসদ, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার পরিচিত সাথীদের কথা জিজ্ঞাসা করেন। সাবলীল, স্বাভাবিক। আনোয়ারের একবারও মনে হয় না এটিই তাদের শেষ দেখা। আনোয়ার ভাবেন, হয়তো সহসাই একটা কিছু ঘটবে, জাদুকরী কিছু, অসম্ভব কিছু, হয়তো মৃত্যুদণ্ড আর কার্যকরী হবে না। আনোয়ারও বিদায় নেন তাহেরের কাছ থেকে।

সন্ধ্যা নামে। জেলের একমাত্র পাখি কাকেরা ধীরে ধীরে থামায় তাদের কলরব। চৌবাচ্চায় তাহেরের ছেড়ে দেওয়া তেলাপিয়া মাছগুলো নিশ্চিন্তে ছোটাছুটি করে এপাশ থেকে ওপাশ।

রাত নামলে জেল কর্তৃপক্ষের দুজন দূত সেলের কাছে এসে তাহেরকে বলেন, আগামীকাল ভোর চারটায় আপনার ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

তাহের ভালো করে তাকান তাদের দিকে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেন আবার। যেন নিজেকে প্রস্তুত করেন। বলেন : আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।

তারপর নিঃশব্দে তার সামনে বেড়ে রাখা রাতের খাবার খান।

একটু দূরে বিশ নং সেলে মাহমুদুর রহমান মান্না, হাবিলদার হাই, সার্জেন্ট রফিক রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন। তাদের পাশের ঘরে মেজর জলিল।

সিপাইদের ডিউটি বদল হয়ে সেখানে এসেছেন তাদের প্রিয় চরিত্র রসিক বৃদ্ধ সিপাই নানা। হাবিলদার হাই ডাকেন : কি নানা, নানীর খবর কি?

ধমক দেন বৃদ্ধ কথা কইয়েন না। মন বালা নাই আইজ।

হাই বলেন : ক্যান নানীর লগে ঝগড়া হইছেনি।

বৃদ্ধ সিপাই গরাদের শিক ধরে গম্ভীর মুখে বলেন : না, আইজ বুঝি মানুষটা যায়। ঐ যে দেখেন না বাত্তি জ্বলতাছে?

সবাই চমকে তাকিয়ে দেখেন খানিকটা দূরে যেখানে ফাঁসির মঞ্চ সেখানে কখন যেন হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠেছে। উজ্জ্বল আলোকিত হয়ে গেছে চারদিক। সার্জন্ট রফিকের হাত থেকে ভাতের প্লেট পড়ে যায়। পাশের রুম থেকে মেজর জলিল বলেন : মান্না খবর শুনেছো, আজকে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি।

স্তব্ধ হয়ে পড়েন সবাই। ভাতের প্লেট পড়ে থাকে সামনে। কারো খাওয়া হয় না আর। তাহের যে আট সেলে আছেন সেখানে লোকজনের আনাগোনার ছায়া দেখতে পান তারা।

আট সেলে একজন মৌলভী আসেন। তাহেরকে বলেন, আপনাকে তওবা পড়াবার জন্য এসেছি। তাহের শান্তকণ্ঠে বলেন : আমি তওবা পড়ব কেন? আমি তো কোনো পাপ করিনি। আপনাদের সমাজের কোনো কালিমা তো আমাকে স্পর্শ করেনি। আমি সম্পূর্ণ শুদ্ধ। আপনি যান আমি এখন ঘুমাবো। তাহের বিছানায় শুয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়েন।

এদিকে পুরো জেলে খবর পৌঁছে গেছে যে আজ রাতে তাহেরের ফাঁসি। ঢাকা জেলের শত শত কয়েদি সেদিন কেউ আর রাতের খাবার স্পর্শ করেন না। তারা জেগে বসে থাকেন সবাই। ফাঁসির মঞ্চের উপর ফেলা হাজার পাওয়ারের ফ্লাসলাইট আলোকিত করে রেখেছে জেলখানার আকাশ। যার যার সেল থেকে সে আলোর দিকে তাকিয়ে বসে আছেন ইউসুফ, আনোয়ার, বেলাল। ফাঁসির মঞ্চে মহড়া হচ্ছে। শেষবারের মতো পরীক্ষা করা হচ্ছে নির্ধারিত দড়ি, যমটুপি। ঢাকা জেলের কোনো জল্লাদ রাজি হননি তাহেরর ফাঁসিতে যোগ দিতে। জল্লাদ আনা হয়েছে অন্য এক জেল থেকে। প্রস্তুত হন জেলার, জেলের ডাক্তার। মেয়েদের জেল, জেনানা ফটকে মামলার একমাত্র মহিলা আসামি সালেহা ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তাকে ঘিরে জাসদ নেত্রী শিরিন আখতারসহ অন্যরা। একটি মেয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে—পঙ্গু মানুষটাকে এভাবে...

রাত তিনটার সময় প্রহরীরা সেলের কাছে গিয়ে দেখেন ফাঁসির আসামি তাহের গভীর ঘুমে মগ্ন। তারা তাহেরকে ডেকে তোলেন। ঘুম থেকে উঠে তাহের জানতে চান কতক্ষণ সময় আছে। প্রহরীরা বলেন, এক ঘণ্টা। তাহের এরপর

দাঁত মাজেন, শেভ করেন, গোসল করে নেন। হাতের ক্রাচটি দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে নিজে নিজে তার নকল পা'টি পড়তে শুরু করেন। বিশেষ দিনগুলোতেই তাহের ক্রাচ ছেড়ে নকল পা'টি পড়ে থাকেন। আজ তার বিশেষ দিন। এসময় কারা রক্ষীরা তাকে সাহায্য করতে গেলে তাহের বলেন : কেউ আমাকে স্পর্শ করবেন না। আমার শরীর নিস্পাপ। আমি চাই না এ শরীরে আপনাদের কারো স্পর্শ লাগুক।

তাহের একা তার কৃত্রিম পা'টি পড়েন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন কারা রক্ষীরা। তাদের সবার চোখ ভেজা।

নকল পা'টি লাগিয়ে তাহের জুতা আর প্যান্ট পড়েন, একটা ভালো ইস্ত্রি করা শার্ট গায়ে দেন। হাত ঘড়িটা পড়ে নেন। চুলগুলো ভালোভাবে আচড়ান। যেন প্রস্তুত হচ্ছেন কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য। তারপর বলেন : আমার স্ত্রী কিছু আম এনেছিল, সেগুলো কি খেতে পারি।

কারারক্ষীরা লুৎফার আনা ফজলি আম কেটে দেন। কাটা আম কারা রক্ষীদের দিকে এগিয়ে দেন তাহের : আপনারাও খান আমার সঙ্গে।

উপস্থিত কারা রক্ষীরা অশ্রুসজল চোখে আমের টুকরো হাতে নেন।

তাহের বলেন : একটু চা খাওয়া যায় আর সিগারেট?

তাহেরকে চা আর সিগারেট দেওয়া হয়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে তাহের সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনারা এমন মন খারাপ করে আছেন কেন? একটু হাসেন। আমি তো মানুষের মুখে হাসিই দেখতে চেয়েছিলাম। কারারক্ষীরা বলেন : সময় শেষ হয়ে আসছে, আপনাকে মঞ্চের দিকে যেতে হবে। তাহের উঠে দাঁড়ান। এসময় কারা কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি তাহেরের কাছে জানতে চান : আপনার কোনো শেষ ইচ্ছা কি? তাহের একটু থামেন। মুখে মৃদুহাসি ফুটে ওঠে তার। বলেন : ইচ্ছা তো একটাই। আমার মৃত্যুর বিনিময়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি আসুক।

তাহের হেঁটে যান মঞ্চের দিকে। বরাবরের মতো তিনি তার লক্ষ্যের দিকে স্থির। লক্ষ্য তখন তার ফাঁসির মঞ্চ। সার্চ লাইটের তীব্র আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আছে মঞ্চ। মঞ্চের কাছে পৌঁছে তাহের জিজ্ঞাসা করেন : আর একটু সময় কি আছে?

কারা কর্তৃপক্ষ বলেন, আছে।

তাহের বলেন, তাহলে আমি একটি কবিতা পড়তে চাই।

তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। তাহের পকেট থেকে একটি ছোট কাগজে জেলে বসে সহযোদ্ধা মেজর জিয়াউদ্দীনের লেখা কবিতাটি বের করে আবৃত্তি করেন। শ্রোতা জল্লাদ, জেলার, ডাক্তার আর কয়েকজন কারারক্ষী। তাহের পড়েন :

জন্মেছি সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলতে
কাঁপিয়েই গেলাম।
জন্মেছি তাদের বুকে পদচিহ্ন আঁকব বলে
এঁকেই গেলাম।
জন্মেছি মৃত্যুকে পরাজিত করব বলে
করেই গেলাম।
জন্ম আর মৃত্যুর দুটো বিশাল পাথর
রেখে গেলাম।
সেই পাথরের নিচে শোষক আর শাসকের
কবর দিলাম।
পৃথিবী অবশেষে এবারের মতো বিদায় নিলাম।

এরপর তাহের বলেন, অলরাইট গো এহেড, ডু ইউর ডিউটি, আই এম রেডি।

তিনি নিজে ফাঁসির দড়ি তুলে নেন। যপটুপি পড়ানোর আগে তাহের বলেন, বিদায় বাংলাদেশ। বিদায় দেশবাসী।

স্তব্ধ চারদিক। পরিচিত কাক ডেকে উঠে একটা দুটো। রুদ্ধশ্বাসে রাত জেগে বসে আছে কারাগারের শত শত কয়েদি। যাদের সেল ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি তারা হঠাৎ ধরাস করে ফাঁসি কাঠের ডালা পড়ার শব্দ পান। ধড়মড়িয়ে উঠে ঘড়ি দেখেন বিশ সেলের মান্না, রাত তখন ৪টা ৫ মিনিট।

একটি মলিন চাদর

সারারাত তন্দ্রার মধ্যে কাটে লুৎফার। সারাক্ষণ ভাবেন একটা নাটকীয়, জাদুকরী কিছু ঘটবে। তিনি আবার ফিরে যাবেন তাহেরের কাছে, তাহের শক্ত করে ধরে রাখবে তার হাত। ভোরে ফোন করেন জেনারেল মঞ্জুরকে। মঞ্জুর তাহেরের সঙ্গে অন্ধকারে পাড়ি দিয়েছেন শিয়ালকোটের ধানক্ষেত। লুৎফার ফোন পেয়ে মঞ্জুর বলেন : দেখি এখনও যদি তাহের বেঁচে থাকে তাহলে চেষ্টা করে দেখব।

মঞ্জুরকে ফোন সেরে লুৎফা ছুটে যান তাহেরের বড় ভাই আরিফের বাসায়। সেখান থেকে গাড়ি করে কয়েক জায়গায় তাহেরের ব্যাপারে কথা বলতে যাবেন বলে যখন রওনা দিতে যাচ্ছেন তখন অ্যাডভোকেট জিনাত আলী এবং গণবাহিনীর নেতা মুশতাকসহ জাসদের কয়জন নেতাকর্মী হন্তদন্ত হয়ে আসেন। তারা বলেন : ভাবী আর কোথায় যাওয়ার প্রয়োজন নাই।

লুৎফা বসে পড়েন বিছানায়। তাকে আর কেউ কিছু বলে না। নিজেদের মধ্যেও কেউ কোনো কথা বলে না। একটা নিরালম্ব নীরবতা ঝুলে থাকে চারদিকে। বুঝতে দেরি হয় না লুৎফার।

ঢাকা জেলে সকাল বেলা আনোয়ার, ইউসুফ, বেলালকে কর্তৃপক্ষ জানান শেষবারের মতো তাহেরের মৃতদেহ দেখে আসতে। বেলাল গিয়ে দেখেন

তাহেরকে শুইয়ে রাখা হয়েছে স্ট্রেচারে। তার পাস্ট মোর্টেম হয়ে গেছে। মুখে কোনো বিকৃতি নেই। মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দ্রুত চলে আসেন বেলাল। আনোয়ার যাবার সময় জেলের বাগান থেকে কয়েকটা গাঁদা ফুল নিয়ে যান। তাহেরের লাশের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। ফুলগুলো বুকের ওপর ছড়িয়ে দেন। তারপর কি মনে করে সামরিক কায়দায় মৃত ভাইটিকে একটি স্যালুট দেন। আসেন ইউসুফ। একদৃষ্টে তাহেরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বোলান। হঠাৎ দেখেন তাহেরের পায়ের কাছে কয়েক ফোঁটা রক্ত লেগে আছে। ইউসুফ তার গায়ের পাঞ্জাবিটি খুলে ঐ রক্তটুকু মুছে নেন। সেলে ফিরে গেলে পাঞ্জাবির ঐ রক্ত ছুঁয়ে দেখেন সহযোদ্ধারা।

খবর পেয়ে আরিফ, লুৎফা এবং তাহেরের মা দুপুর বেলা জেল গেটে যান লাশ আনতে। তাদের বলা হয় লাশ তাদের দেওয়া হবে না। সরকার নিজের দায়িত্বে লাশ তাদের গ্রামের বাড়ি কাজলায় দিয়ে আসবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দেখা করেন আরিফ। অনুরোধ করেন তাহেরকে ঢাকায় কবর দিতে। রাজি হয় না তারা। বলেন : ঢাকায় কবর দেওয়া আমরা রিস্কি মনে করি। তাহেরকে কবর দিতে হবে তার গ্রামের বাড়িতেই।

ক্ষেপে যান আরিফ : আপনারাই তাহেরকে মেরেছেন, আপনারাই ঠিক করছেন কোথায় কবর দেবেন। তার চেয়ে তাকে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিলেই পারেন।

টাঙ্গাইল ঘুরে, ময়মনসিংহ হয়ে তারপর কাজলায় যাবার রাস্তা। অনেক লম্বা সে পথ। তাহেরের পুরো পরিবার নিয়ে দাফন করবার জন্য কাজলায় যাওয়া বিরাট ঝামেলা। তবু তারা অনড়, তাহেরকে ঢাকায় কিছুতেই কবর দেওয়া যাবে না। তারা বলেন : এখানে লাশ ছিনতাই হতে পারে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে আরিফ বলেন : লাশ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবার সময় যদি ছিনতাই হয় তাহলে কি হবে?

স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে কথা বলছিলেন আরিফ। আরিফের কথায় সচিব একটু যেন বিচলিত হন। নানা জায়গায় ফোন করতে শুরু করেন তিনি। তারপর এক পর্যায়ে আরিফকে জানান তাহেরের লাশ হেলিকপ্টারে কাজলা যাবে।

সরকারি আনুষ্ঠানিকতা সেরে বেলা আড়াইটায় তাহেরের লাশ পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সে করে জেল থেকে বের করা হয়। জেল গেটে লুৎফাসহ অন্যরা সবাই। লাশবাহী অ্যামবুলেন্সের আগে পেছনে চার পাঁচ ট্রাক সৈন্য। সঙ্গে গোয়েন্দাবাহিনীর প্রচুর সাদা পোশাকধারী। পরিবারের কেউ তখনও লাশ দেখেননি। অন্য একটা গাড়িতে উঠানো হয় পরিবারের লোকদের। গাড়ির বহর এসে থামে তেজগা বিমানবন্দরে। হেলিকপ্টারে উঠানো হয় লাশ। হেলিকপ্টারে একে এক ওঠেন জেলের বাইরে থাকা পরিবারের সদস্যরা। আরিফ, লুৎফা,

ফাতেমা, ডলি, জলি আর তাদের শুভানুধ্যায়ী অ্যাডভোকেট জিনাত আলী। বিকট শব্দে ঘুরছে হেলিকপ্টারের পাখা। ধুলা উড়ছে চারদিকে। হেলিকপ্টারকে ঘিরে আছে অসংখ্য সৈন্যদল। ভীতিকর এক পরিবেশ যেন।

এই প্রথম তাহেরের লাশ দেখেন লুৎফা। শুয়ে আছেন স্টেচারে। জেলের একটা মলিন চাদর গায়ের উপর দেওয়া। কপালটা একটু বেরিয়ে আছে, পা দেখা যাচ্ছে খানিকটা। আশরাফুন্নেসা হঠাৎ হৈ চৈ করতে থাকেন : এটা কেমন একটা চাদর দিয়েছেন আপনারা ছেলেটার গায়ে, আমার ছেলে কি একটা ভালো চাদরও পেতে পারে না?

বিকট শব্দে ঘুরছে হেলিকপ্টারের পাখা। আশরাফুন্নেসার কণ্ঠ পৌঁছায় না কারো কাছে। ধুলো উড়িয়ে আকাশে উঠে যায় হেলিকপ্টার। কিশোরী জুলিয়া জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে হেলিকপ্টারে। তার মনে হয়, সাথে যদি একটা দেশলাই থাকত তাহলে তখনই সে আগুন ধরিয়ে দিত ঐ হেলিকপ্টারে, সবাই মরে যেত একসাথে।

শ্যামগঞ্জ বাজারে নামে হেলিকপ্টার। তখন সন্ধ্যা। আগেই ময়মনসিংহ থেকে প্রচুর সৈনিক জড়ো করা হয়েছে সেখানে। হেলিকপ্টার নামার সঙ্গে সঙ্গে কমান্ডো স্টাইলে হেলিকপ্টারকে ঘিরে ফেলে তারা। ভয় এই বুঝি ছিনতাই হয়ে যায় লাশ। খবর পেয়ে অগণিত মানুষ ছুটে আসতে থাকে লাশের দিকে। আর্মি সামাল দেয় সে ভিড়। শ্যামগঞ্জ বাজারের কাছে তাহেরের এক চাচার বাসায় গোসল করানো হয় তাহেরকে, কাফনের কাপড় পড়ানো হয়। স্থানীয় ঈদগা ময়দানে জানাজা হয়। সশস্ত্র প্রহরায় তাহেরের লাশ কাঁধে নিয়ে সিপাইরা হেঁটে রওনা দেন কাজলায়। পেছন পেছন পরিবারের সবাই। কাজলায় পৌঁছাতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। হ্যাজাক জ্বালিয়ে সিপাইরাই পারিবারিক গোরস্তানে কবর খোঁড়ে। পারিবারের সদস্যরা দর্শক মাত্র। মহিলাদের শেষ বারের মতো লাশের মুখ দেখতে দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে ছুটে আসেন সাঈদ। তিনি তখনও এক মিথ্যা মামলার ফেরারি আসামি। ভাইয়ের মুখটা শেষ বারের মতো দেখতে সাধ হয় সাঈদের। কিন্তু চারদিকে তখন পুলিশ আর সেনাবাহিনীর পাহারা। একজন ফেরারি আসামির কি করে ঐ বেষ্টনীর ভেতর যাবে? এক আত্মীয়া একটি শাড়ি এনে সাঈদকে দিয়ে বলেন, ওটা পড়ে লাশের কাছে চলে যাও। সাঈদ, যিনি নানা প্রশ্নবাণে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রাখতেন তাহেরকে তিনি শাড়ি পড়ে একজন নারীর বেশে তার ভাইকে শেষবারের মতো দেখতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু ইতোমধ্যে সৈন্যরা তাহেরকে নামিয়ে ফেলেছে কবরে। কোদাল দিয়ে মাটি ফেলতে শুরু করে তারা। পাশের বাউসা বিল থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসে হু হু। বুঝি ঝড় আসবে।

বর্ষার দিন

কবর দেওয়ার পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা কবরের পাশে ক্যাম্প করে পজিশন নেয়। রাইফেল আর বেয়োনেট উঁচিয়ে কবরটিকে পাহাড়া দেয় তারা। এক সপ্তাহ যায়, দুসপ্তাহ যায় সেনা পাহাড়া তবু সরে না। পারিবারের একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছাড়া আর কাউকে তারা ভিড়তে দেয় না কবরের কাছে। দিন যায়। কাজলায় ভিড় করা পরিবারের সদস্যরা এক এক করে চলে যেতে থাকেন সংসারের টানে। থেকে যান শুধু লুৎফা। প্রতিদিন একবার বাড়ি থেকে হেঁটে কবরটার কাছে যান। কবর ঘিরে সশস্ত্র সেন্ট্রি। লুৎফা তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন নির্বাক।

তুমুল বৃষ্টি নামে একদিন। কি মনে হয় লুৎফার, ছাতা মাথায়, কাদা পথ হেঁটে হেঁটে কবরের কাছে চলে যান তিনি। বাতাসের ঝাপটায় ভিজে যায় তার শাড়ি। ঘন বৃষ্টিতে আবছা দেখা যায় অস্ত্র হাতে রেইনকোট পরা সিপাইরা দাঁড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। বৃষ্টিতে ঝুম ভিজছে কবরটি। পানি চুইয়ে চুইয়ে ঢুকছে কবরের অনেক ভেতরে। সেখানে শুয়ে আছেন একজন অমীমাংসিত মানুষ। লুৎফা ভাবেন : মানুষটা ভিজছে।